ইসলামী আইন:পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

[illegible].[illegible]. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ- ২০১৫

এপ্রিল- [illegible] খ্রি.

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ শ[illegible]

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]- [illegible], [illegible]।

[illegible]

মোঃইকবালহোসাইনভূঁইয়া

[illegible].[illegible]. [illegible]

রেজি. [illegible]- [illegible]

শিক্ষাবর্ষ২০১[illegible]- [illegible]খ্রি.

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

[illegible] [illegible]:পারপ্রেক্ষিত [illegible]

[illegible].[illegible]. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ- ২০১৫

এপ্রিল- [illegible] খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

[illegible] [illegible]: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

[illegible].[illegible]. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ- ২০১৫

এপ্রিল- [illegible] খ্রি.

তত্ত্বাবধায়ক

[illegible]. মোঃ শ[illegible]

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]- [illegible], [illegible]।

[illegible]

মোঃইকবালহোসাইনভূঁইয়া

[illegible].[illegible]. [illegible]

রেজি. [illegible]- [illegible]

শিক্ষাবর্ষ২[illegible]- [illegible]খ্রি.

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অঙ্গীকারনামা

আমিএইমর্মেঅঙ্গীকারকরছিযে, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়হতেপিএইচ.ডি.ডিগ্রীঅর্জনেরনিমিত্তে □পস্থাপিত“□□□□□ □ □□:**পারপ্রেক্ষিতবাংলাদে** ”শীর্ষকগবেষণাঅভিসন্দর্ভটিআমারপরমশ্রদ্ধেয় □□তত্ত্বাবধায়কড.মোঃশামছুলআলম,অধ্যাপক, ইসলামিকস্টাডিজবিভাগ, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়-এরপ্রত্যক্ষতত্ত্বাবধানেওনির্দেশনায়রচনাকরেছি।এটাআমারএককমৌলিকগবেষণাকর্ম।অন্যকোনবিশ্ববিদ্যালয়বাপ্রতিষ্ঠানেকোনপ্রকারডিগ্রী/ডিপ্লোমাঅর্জনেরজন্যবাপ্রকাশেরজন্যঅভিসন্দর্ভটিসম্পূর্ণকিংবাএরঅংশবিশেষউপস্থাপনকরিনি।

(মোঃইকবালহোসাইনভূঁইয়া)
□□□□.□. □□□□□
রেজি. □□- □□
শিক্ষাবর্ষ : □□□□- □□□□খ্রি.
ইসলামিকস্টাডিজবিভাগ
ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপ

এই প্রত্যয়নকরাযাইতেছে, মোঃইকবালহোসাইনভূঁইয়া,□□□□.□.□□□□□, ইসলামিকস্টাডিজবিভাগ, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়, □□□□.□.ডিগ্রীলাভেরনিমিত্তেউপস্থাপিত "□□□□□ □ □□:**পারপ্রেক্ষিতবাংলাদে**"শীর্ষকঅভিসন্দর্ভটি আমারপ্রত্যক্ষতত্ত্বাবধানেওনির্দেশনায়রচনাকরিয়াছে|আমিইহারপান্ডুলিপিআদ্যোপান্তপাঠকরিয়াছি|□□□ □□□□□□, গবেষকেরউপস্থাপিতঅভিসন্দর্ভেরসম্পূর্ণকিংবাইহারঅংশবিশেষঅন্যকোনবিশ্ববিদ্যালয়বাপ্রতিষ্ঠানেকোনপ্রকারডিগ্রী/ ডিপ্লোমালাভেরজন্যকিংবাপ্রকাশেরজন্যউপস্থাপনকরাহয়নি|□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□.ডিগ্রীপ্রদানেরনিমিত্তেঅভিসন্দর্ভটিপরীক্ষকগণেরনিকটপ্রেরণেরজন্যজমানেওয়ারসুপারিশকরা |

(□. মোঃ শামছুল আলম)
তত্ত্বাবধায়ক
□
অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
□□□- □□□□, □□□□□□□□

Dhaka University Institutional Repository

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার

“□□□□□ □□□:পারপ্রেক্ষিত ”শীর্ষকপিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ শেষকরতেপেরেসর্বপ্রথমপরমকরুণা আল্লাহতা'আলারদরবারেশুকরিয়াআদায়করছিএবংবিশ্ব মানবতারমহানশিক্ষকনবীকারীম (□□)

এরশানেঅসংখ্যদরূদএবংসালামপেশকরা |যথাযথসম্মানওশ্রদ্ধারসাথেআন্তরিককৃতজ্ঞতাপ্রকাশকরছি রপরমশ্রদ্ধেয়শিক্ষকওগবেষণাকর্মেরএকনিষ্ঠতত্ত্বাবধায়কবিশিষ্টশিক্ষাবি □□□□.মোঃশামছুলআলম,অধ্যাপ □,ইসলামিকস্টাডিজবিভাগ,

ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়এরপ্রতি|কর্মব্যস্ততাসত্ত্বেওতিনিআমারগবেষণাকর্মেরজন্যঅসামান্যত্যাগ, □□□,

শ্রমওমেধাবিনিয়োগকরেছেন|তাঁরনিরবিচ্ছিন্নউৎসাহ, অনুপ্রেরণা, আন্তরিকতাওসার্বক্ষণিকতত্ত্বাবধানেরফলেইআমারগবেষণাকর্মটিসম্পন্নকরাসম্ভবহয়েছেএবংতাঁরমূল্যবান

মর্শওদিকনির্দেশনারফলেঅভিসন্দর্ভটিমানসম্পন্নহয়ে |আমারএগবেষণাকর্মেরতথ্য-উপাত্তসংগ্রহএবংএরঅধ্য -

উপাধ্যায়বিন্যস্তকরণএবংএরঅবয়বওভাবসৌন্দর্যবৃদ্ধিসম্ভবহয়েছেতাঁরনিরলসআন্তরিকসাহায্যসহযোগিতায়|

এজন্য□□□□□□□□চিরকৃতজ্ঞওঋ□|সেসাথেআমিতাঁরসুস্বাস্থ্যওদীর্ঘায়ুকামনাকরি|

এসময়েগভীরশ্রদ্ধাওসম্মানেরসাথেস্মরণকরছিআমারপরমশ্রদ্ধেয়বাবাজনাবআলহাজ্বমোঃহাবিবুররহমানভূঁ

□□□□□□□□□□□□□□□|তাঁদেরঐকান্তিকসহযোগিতাওঅনুপ্রেরণাআমাকেএইপর্যায়েনিয়েএসেছে|□□

রজন্যমহানআল্লাহরকাছেহায়াতেতাইয়্যেবাকামনাকরছি|আল্লাহতা'আলাতাঁদেরকেসুস্থতারসাথেঅনেকদিন

বেঁচেথাকারতাওফিকদানকরুন|

আমারবড়ভাইএকটিবেসরকারিকোম্পানিতেচাকুরীরতজনাবমোঃজহিরুলইসলামভূঁইয়ারপ্রতিশ্রদ্ধাজা [illegible] । [illegible]

[illegible] ।পাশাপাশিআমাকেসার্বিকভাবেপরামর্শ

ওসহযোগিতাদিয়েছেনআমারমেঝভাইঢাকাকলেজেরসহকারীঅধ্যাপকজনাবমোহাম্মদওবায়দুলহক।

[illegible]আরওঅনেকেবিভিন্নদিকদিয়েসহযোগিতাকরেছেনযাদেরমধ্যেকয়েকজনেরনামউল্লেখনাকরলে

জেকে[illegible]- জনাবমুহাম্মদজহিরুলইসলা ,

সহকারীঅধ্যাপক,ইসলামিকস্টাডিজবিভাগ, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়,

বিশিষ্টইসলামীচিন্তাবিদজনাবমুহাম্মদনাজমুলহক, যিনিআমাকেবইপত্র, জার্নাল,

[illegible]।

আমিএকান্তভাবেকৃতজ্ঞতাজানাইআমারসহধর্মিণীজন[illegible]আক্তারকে,

তারঅসীমত্যাগওপ্রেরণাআমাকেযথেষ্টসাহসযুগিয়েছে।তাছাড়াআমারদু'

কন্যাসহপরিবারেরসকলসদস্যেরপ্রতিরইলআন্তরিককৃত[illegible] ।আমারগবেষণাকর্মেবিভিন্নভাবেঅনুপ্রেরণাদা

নেতাদেরজুড়িনেই।আমিতাদেরজন্যমহানআল্লাহরদরবারেনেককারওউঁচুমাপেরশিক্ষাবিদহিসেবেগড়েউঠার

দোয়াকরছি।

আমারঅভিসন্দর্ভটিরচনায়বিশেষভাবেবিভিন্নবিষয়েরউপরলিখিতদেশীবিদেশীলেখকেররচনারসাহায্যনিয়েছি

।এজন্যকৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনার্থেযথাস্থানেপাদটীকাওকোটেশনেসেসবলেখকেরনামওতাদেরগ্রন্থবাপ্রবন্ধেরনামউ

ল্লেখকরেছি।[illegible]লেখকেরকাছেআমিকৃতজ্ঞতাজানাই।তাছাড়াওআমারএইঅভিসন্দ

র্ভটিআমিনিজহাতেকম্পিউটারেকাজকরেছি,

এইক্ষেত্রেযিনিআমাকেঅত্যন্তকাছেথেকেসহযোগিতাকরেছেনজ[illegible]হাম্মদআসাদুজ্জামানভূঁইয়া(টিপু),

আমিতারকাছেআন্তরিকভাবেকৃতজ্ঞ।

সর্বোপরিযারাআমাকেএইঅভিসন্দর্ভটিসমাপ্তিকরণেবিভিন্নভা[illegible] অনুপ্রেরণাযুগিয়েছেনআমিতাদেরসকলকে

আমারঅন্তরেরঅন্তঃস্থলথেকেমোবারকবাদওধন্যবাদজা[illegible] ।

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ ইকবাল হোসাইন ভূঁইয়া

শব্দ সংক্ষেপনির্দেশনা

আলকুরআন, 0[illegible]:[illegible]	:	প্রথমসংখ্যাসূরারওদ্বিতীয়সংখ্যাআয়াতের
([illegible])	:	[illegible]ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
(ص)	:	صلى الله عليه وسلم
([illegible])	:	‘[illegible]
([illegible])	:	রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু
(رض)	:	رضى الله عنه
([illegible])/([illegible])	:	[illegible]ল্লাহি ‘আ[illegible]
(رح)	:	رحمه الله
[illegible]	:	[illegible]‘আব্দুল্লাহমুহাম্মদইবনইসমা‘[illegible]
[illegible]	:	আবুলহুসাইনমুসলিমইবনুলহাজ্জাজআল- কুশাইরীআননিশাপুরী
[illegible]	:	[illegible]‘ঈসামুহাম্মদইবন ‘[illegible]- [illegible]
[illegible]	:	[illegible]- সিজিস্তানী
[illegible]	:	আহমদইবনশু‘[illegible]- [illegible]
[illegible]	:	[illegible]‘আব্দুলাহমুহাম্মদইবনইয়াযীদইবনমাজাহআল- [illegible]
[illegible]	:	আহমাদইবনহাম্বল
ইমামত্বহাবী	:	[illegible]‘ফরআহমদইবনমুহাম্মদআত- ত্বহাবী
[illegible]	:	আবুলফিদাইমামুদ্দীনইসমা‘[illegible]
[illegible]	:	[illegible]‘ফরমুহাম্মদইবনজারীরআত- [illegible]
[illegible]	:	[illegible]
[illegible]/[illegible]	:	[illegible]
[illegible].	:	[illegible]
খ্রি.	:	খ্রিষ্টাব্দ
[illegible]. দ্র.	:	বিশেষদ্রষ্টব্য
[illegible].	:	ডক্টর

[illegible].	:	[illegible]
[illegible].	:	খন্ড
[illegible]	:	পৃষ্ঠা
[illegible]	:	[illegible]
[illegible]	:	[illegible]
[illegible].[illegible].[illegible]	:	ইসলামিকফাউন্ডেশনবাংলাদেশ
[illegible].	:	জন্ম
[illegible]	:	মৃত্যু
P.	:	Page
OP.Cit	:	Operace-Citrae
Ed.	:	Edition/Editor/Edited
JASB	:	Journal of Arabic Society 0f Bangladesh.
Ibid	:	(Ibidem) in the same place; from the same source.
V	:	Volume

আরবিবর্ণেরবাংলা প্রতিবর্ণায়ন

□ □□□□□□□			□ □□□□□□□		
ا	:	□/□	ض	:	□/□
ب	:	□	ط	:	□
ت	:	□	ظ	:	□
ث	:	□	ع	:	‘
ج	:	□	غ	:	□
ح	:	□	ف	:	□
خ	:	□	ق	:	ক্ক
د	:	□	ك	:	□
ذ	:	□	ل	:	□
ر	:	□	م	:	□
ز	:	□	ن	:	□
س	:	□	و	:	□/□
ش	:	□	ه	:	□
ص	:	□	ء	:	’
			ي	:	□

□□পত্র

অঙ্গীকারনামা.. 111

প্রত্যয়নপত্র.. 1V

আন্তরিককৃতজ্ঞতাস্বীকার........ V-V1

শব্দসংক্ষেপনির্দেশনা V11-V111

আরবিবর্ণেরবাংলাপ্রতিবর্ণ ।□□... 1X-X

সূচিপত্র.. X1-X111

□□□□ X1V-XX1

প্রথম অধ্যায় ....□-□□

বাংলাদেশের আদালত ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ

বাংলাদেশেরবিচারব্যবস্থারভবিষ্যৎ

দ্বিতীয় অধ্যায় ....□□-□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□

ইসলামীআইনেরগুরুত্বওপ্রয়োজনীয়তা

□□□□□ □□□□□ ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন

□□□□□ □□□তত্ত্ব

Dhaka University Institutional Repository

[illegible] অধ্যায়...[illegible]-[illegible]

ইসলামী আইনের উৎস

[illegible]

ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য

ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য

চতুর্থ অধ্যায়...[illegible]-[illegible]

বাংলাদেশে মুসলিম আইনের প্রচলন

[illegible]

মুসলিমআইনেরপ্রবর্তনওবিধিসমূহ

পঞ্চম অধ্যায়...[illegible]-[illegible]

[illegible]

ষষ্ঠ অধ্যায় ....[illegible]-[illegible]

ওয়ারিশাধিকার ও সম্পদ বন্টন আইন

দান বা হেবা [illegible]

[illegible]

সপ্তম অধ্যায় ....[illegible]-[illegible]

বিবাহ খোরপোষ ও দাম্পত অধিকার পুনরুদ্ধার আইন

বিবাহ বিচ্ছেদ ও তালাক আইন

দেনমোহর আইন

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায় .... □□□-□□□

ইসলামের শাস্তি আইন

হাদ্দ কিসাস ও দিয়াত এবং তা'যীর

□□□ **অধ্যায়** .... □□□-□□□

বাংলাদেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠায় সমস্যা ও করণীয়

□□□□□□□ .... □□□-□□□

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি .... □□□-□□□

Dhaka University Institutional Repository

□□□ □□□

পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা থেকেই আইন মেনে চলার প্রবণতা

□□□□□ □□□□□শাস্ত্র

□□□□□ □□□□□তত্ত্ব

□□□□□□

পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা থেকেই আইন মেনে চলার প্রবণতা

আইনসভ্যতারপ্রতী□।পৃথিবীরপ্রথমদিনথেকেমানুষসভ্যএবংপ্রথমদিনথেকেইআইনেরপ্রতিঅনু□ , □□□□□ প্রতি শ্রদ্ধাশীল।প্রথমে যে দু'□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ সৃষ্টিকর্তা এবং প্রেরণকারীআল্লাহরআইনের অনুগত থাকেন। □□□□,সভ্যতা,□□□, তিনটি তাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে □□□□ □□□□,সভ্যতা তারা তৈরীকরেন, আইন তাদেরকে দেয়া হয়। বরং বলা যায় আইনের মাধ্যমে তারা □□□□ ওসভ্যতাকে পরিশীলিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। প্রথম মানুষ তথাকথিত বন্য ও অসভ্য ছিলেন না। বরং তারা মাথা ঘামিয়ে চিন্তা ভাবনা করে প্রত্যেকটি কাজ করতেন। তারা আল্লাহর আইনের পূর্ণ অনুগত ছিলেন। আল্লাহরআইনের অমর্যাদা করে প্রথম যে ভুলটি করেন,সে জন্য তারা অনুতপ্ত হন এবং এ থেকে কিভাবে আইন মেনে চলতেহয় সে শিক্ষা লাভ করলেন।"তাঁরা বলে□□□ □□□□□ □□, □মরা আইন ভঙ্গ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□ করেছি। আর এ আইন ভঙ্গ করার যে স্বাধীন ক্ষমতা আমাদের আছে, যদি তুমি তা নিয়ন্ত্রন ক□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ ধ্বংস □□□ □□□□"।[1]

"They said: "Our Lord! We have wronged ourselves. If You forgive us not, and bestow not upon us Your Mercy, we shall certainly be of the losers." (Surah 7. Al-A'raf. Part 8. Ayat 23.)

এভাবে পৃথিবীতে মানুষের সত্তাতার রবের সত্তার সহযোগিতায় আইনের যথাযথ আনুগত্য করে এগিয়ে □লতে অভ্যস্ত হয়। পদে পদে মানুষ ভুল করে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। পৃথিবীতে মানুষের জীবন

[1]আলকুরআন, □:□□ -قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخسرين-

□□□□□□□□ □□□□র সমৃদ্ধ। একজন মানুষের □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□|কিন্তু জন্ম ও মৃত্যুরধ□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ বছরকে সুদীর্ঘকালে পরিণত করেছে|কা□□□ □ঙ্গীনা□ □□□□ থেকে আরেকজন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেই চলেছে। তাই আজকের একজন মানুষের জীবন কেবল একজন মানুষের নয়। বরং সমগ্র মানবতার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট। আর মানুষের এই অভিজ্ঞতা আইনের শৃঙ্খলে গ□□বেষ্টিত। মানুষ পদে পদে আইন তৈরী করেছে, আবার আইন ভঙ্গ করেছে|□□□ বহির্ভূত পথে যে মা□□□□□□ □□□□□□ □□□ পক্ষে জনমত সায় দেয়নি। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে আইনবহির্ভূত কার্যকলাপওদেখাগিয়েছে। কিন্তু তা ছিল সাময়িক।তার কোন ধারাবাহিকতা □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ আরেক জাতি। অন্তর্বর্তীকালে □□□□□ □□□□ অনিয়ম হতে পারে। কিন্তু মানুষ আবার আইন শৃঙ্খলায় ফিরে এসে |এটাই মানবিক এতিহ্য। □□□□আল্লাহর নিয়ম| আল্লাহ ত‘□□□ □□□□□ “এভাবে যদি আল্লাহ □‘□□□ □□□□□□□ □□□□□□ সাহায্যে অন্যদলকে প্রতিহত নাকরতেন তাহলে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনায় বিপর্যয় দেখা দিতো।কিন্তু দুনিয়াবা□দের প্রতি আল্লাহর অপার করুণা যে তিনিএভাবে বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা করেন”|[2]

“And if Allah did not check one set of people by means of another, the earth would indeed be full of mischief. But Allah is full of bounty to the ‘Alamin” (mankind, jinn and all that exists). (Surah 2. Al-Baqarah. Part 2. Ayat 251.)

অপরআয়াতেআল্লাহ

□‘□□□□□□□“তাদেরকেনিজেদেরঘরবাড়িথেকেঅন্যায়ভাবেবেরকরেদেয়াহয়েছেশুধুমাত্রএঅপরাধেযে, □□□□□□□□,

আল্লাহআমাদেররব|যদিআল্লাহলোকদেরকেএকেরমাধ্যমেঅন্যকেপ্রতিহতকরারব্যবস্থানাকরতে, তাহলেযেখানেআল্লাহরনামবেশি□করেউচ্চারণকরাহয়সেসবত , গির্জা, ‘ইবাদতখানাওমসজিদধ্বংসকরেদেয়াহত|আল্লাহনিশ্চয়ইতাদেরকেসাহায্যকরবেনযারাতাঁকেসাহায্যকরবে |আল্লাহবড়ইশক্তিশ□ওপরাক্রান্ত|”|[3]

---

[2]আলকুরআন, □:□□□. ولولادفعاللهالناسبعضهمببعضلفسدتالارضولكناللهذوفضلعلىالعلمين

[3]আলকুরআন, □□: □□ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله- ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع و صلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا- ولينصرن الله من ينصره- ان الله لقوى عزيز-

"Those who have been expelled from their homes unjustly only because they said: "Our Lord is Allah" For had it not been that Allah checks one set of people by means of another, monasteries, churches, synagogues, and mosques, wherein the Name of Allah is mentioned much would surely have been pulled down. Verily, Allah will help those who help His (Cause). Truly, Allah is All- Strong, All-Mighty." (Surah 22. Al-Hajj. Part 17. Ayat 40.)

মানুষের ইতিহাস আইন ভঙ্গ করার নয়, আইন মেনে চলার ইতিহাস। কিন্তু মানুষ কৌশলে আইনঅমান্য [illegible]।[illegible] [illegible]বহ। আল্লাহ আইন করে দিলেন, ইহুদী[illegible] [illegible]।কিন্তু শনিবার [illegible] [illegible]ভাগে বেশী বেশী মাছের আবির্ভাব দেখে একদল ইয়াহুদী লোভ সামলাতেপারলো না। [illegible] দরিয়ার পাশে পুকুর কাটল এবং শনিবার সেই পুকুরের সাথে দরিয়ার সংযোগ করে দিল। শনিবার পুকুরে মাছ ভরে গেলেতারা সংযোগ মুখ বন্ধ করে দিল। তারপর সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে অতি উৎসাহে সে [illegible]গুলো ধরতে লাগলো। [illegible] তারা আল্লাহর আইন অমান্য করার কৌশল অবলম্বন করল।একদল [illegible], কিন্তু অন্য একটি দল চুপ থাকলো।আল্লাহ এ[illegible] [illegible]রব দর্শক ও কৌশলে আইন অমান্যকা[illegible] 'টি দলকে চরম[illegible] শাস্তি দিলেন।এভাবে কৌশলে আল্লাহর আইনকে অমান্য করে শাস্তি লাভের অসংখ্য ঘটনা কুরআনেবর্ণিত হ[illegible]।

[illegible]শাস্ত্র

[illegible]শাস্ত্র এমন একটি বিষয় যা নি[illegible] [illegible]লমানগণ গর্ববোধ করতে পারেন। মানব ইতিহা[illegible] বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি আইনশাস্ত্রে তাদের নিজস্ব কিছু না কিছু উপাদানের সংযুক্তি ঘটিয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠ অবদান সম্ভবত আইনেরমূলনীতি[illegible]শাস্ত্রের সংযোজন।অন্ততঃ [illegible] আবির্ভাবের পূর্বেও আইন[illegible]স্ত্রের অস্তিত্ব ছিল।কিন্তু [illegible]শাস্ত্র(PRINCIPLE OF JURISPRUDENCE)পৃথিবীর কোথাও ছিলনা। এমনকি আজওআম[illegible] [illegible] করতে পারি এটি একমাত্র [illegible], [illegible]শাস্ত্রের বিরাট শূন্যতাকে এর মধ্য দিয়ে পূরণ করেছেন।

এটি সর্বজনবিদিত যে,প্রতিটি সমাজের নিজস্ব আইন বা বিধান [illegible] '[illegible]।একটি হচ্ছে অলিখিত আইন বা বিধানযেটি মুলতঃ প্রচলিত সামাজিকপ্রথা ও রীতিনীতির সমষ্টির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে। স্মরনাতীতকাল থেকেই প্রতিটি সমাজে এ ধরনের আইনের অস্তিত্ব র[illegible] [illegible] জানিনা কে বা কারা এগুলোর প্রণেতা বা স[illegible]; কিন্তু আমরা সকলেই এগুলো মেনে চলি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে কোন রাজা বা শাসক কর্তৃ সৃষ্ট বা আরোপিত আইন এবং এটি মুলতঃ লিখিত আকারে বিদ্যমান

□□□□।যে প্রকারের আইনই হোক না কেন, মানুষ তার প্রকৃতির চাহিদা অ□□□□ □□□ই প্রয়োজনে আইন তৈরী করে এবং সে অনুযায়ী □□□ □□□□ সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, আইন হচ্ছে প্রতিটি মানব সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। লিখিত আইনের ক্ষেত্রে প্রাচীনত□□□□ □□□□□ □□□□ □□দের কাছে আছে সেটি ইরাকের প্রাচী□ '□□□ □□□□□□□' □□□।সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযা□ □□□□□'□□□ □□□□□□□'।□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□(□) □□ □□□□□□□□ (□□□□ খ্রিস্টপূর্ব)। ইরা□□ প্রত্নতাত্ত্বিক □□□□□ □□□ □□□□□□ অতিসম্প্রতি □□□ □□□□□ □□□ '□□' নামে দু'টি মানবখুদিত একটি কালো পাথর আবিষ্কৃত হয়।এ দৃ'টি একটি সৃষ্টিকর্তার এবং অন্যটি রাজা হামুরাবির প্রতিরূপ বলে ধারণা করা হয়ে □□□□।ঐ ভাস্কর্যে দেখা যাচ্ছে ে , তিনি সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আইন লাভ করেছেন। এ পাথরটি একটি টি স্তম্ভের আকৃতির যাতে'মাইখি'হস্তলিপিতে আইনের বিভিন্ন ধারা উৎকীর্ণ রয়েছে। পশ্চিমা বিশেষজ্ঞগণ সম্প্রতি এ গুলোর মর্ম উদ্ধার করতে পেরেছেন এবং পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় এটি অনূদিতও হয়েছে। এটি □ৎপর্যময় ব্যাপার এজন্য যে, এটিই প্রাচীনতম লিখিত আইনের দৃষ্টান্ত। তবে এর অর্থ এই নয় যে,এটিই সর্বোৎকৃষ্ট আইন।রাজা □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ অনেক প্রাচীন আইন সম্পর্কে □□□□ যে□□ প্রাচী□ □□□□□□'গুঢ় শিলালি□□' □ □□□□□ কিছু আইনকে ধারণ করেছিল। এ ছাড়া পরবর্তীতে ছিল রোমান, গ্রীক, □□□ □□□ □□□□□ □ইন। তেমনি রেড ইন্ডিয়ানদের রয়েছে তাদের নিজস্ব আইন। মোট কথা আমরা প্রতিটি সংস্কৃতি ও প্রতিটি ক্ষেত্রেই আইনের অস্তিত্ব খুঁজে পাই। মূল□□ □□□□□□□ সুনির্দিষ্ট আইনের দৃষ্টান্ত ছিল, কিন্তু কোথাও আইনের মূলনীতিশাস্ত্র বলে কোন কিছু ছিলনা।আইন হিসে□ যা পাওয়া যেত, সেটি মুলতঃ ছি□ □□□□ □□□□□□□□ □ বর্জনীয় এর তালিকা। এক্ষেত্রে সবখানেই □□□□□ □□□□□শাস্ত্রের অভাব ছিললক্ষণীয়।বস্তুতঃ সেখানে আইনের প্রকৃতি বা কিভাবে আইন সৃষ্টি হচ্ছে অথবা কিভাবে এতে পরিবর্তন এবং সংশোধনী আনা হচ্ছে এ সব বিষয় নিয়ে কোন আলোচনা বা বিতর্ক ছিলনা। কিভাবে আইনকে ব্যাখ্যা করা হবে, অথবা দু'টি বিধানে কোনভাবে বিরোধ দেখা দিলে কিভাবে সমাধানে পৌঁছতে হবে এসব বিষয়েও ছিলনা কোন নির্দেশনা। মোটকথা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে কোন জাতির ইতিহাসকে আইনের সাথে সম্পর্কিত এর তত্ত্ব বা ধারণা (THEORY OR CONCEPT OF LAW) বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি।

□□□□□ □□□□□তত্ত্ব

Dhaka University Institutional Repository

'□□□□□ □□□□□তত্ত্ব' একটি শাস্ত্র হিসেবে কেবল ইসলামী আইনেই নয় পৃথিবীর যে কোন আইনের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য। কেননা এর রয়েছে সার্বজনীন আবেদন ও প্রয়োগযোগ্যতা। □□□□□তত্ত্বের জিজ্ঞাসাগুলোর সমাধান কি গ্রীক, কি হিন্দু অথবা চীনা ইত্যাদি যে কোন আইনই হোকনা কেন বের করা যেতে পারে। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আপনি ত□□ □□□□ □□ □□□□? কে আইন সৃষ্টি □□□?কিভাবে এবং কখন আইন সৃষ্টি করে? □ভাবে আইন পরিবর্তন করা হয়? কী□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□? আইনের মৌলিকনিয়□□□□গুলোই বা কী? এগুলোর উত্তর বিভিন্নরূপ হতে পারে,কিন্তু মুসলমানগণই প্রথমব□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ অন্তর্নিহিত এস□তত্ত্ব ও ধারণা সম্পর্কিত শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছেন। একে তারা বলেন 'উসূলুল ফিকহ' এই নাম কেন দেয়া হয়েছে □রকোনসুস্পষ্টতথ্যপাওয়াযায়না, □□□আমরা কেবল □□ □□□□□ কুর□□ □□□□□ □□টি আয়াতের উপর ভিত্তি করে এ অনুমা করতে পারি। □□ □□□ফের উক্ত আয়াতে □□□□□,আল্লা□□'□□□□□□□"উত্তম বাক্যের উপমা হচ্ছে পবিত্র একটি বৃক্ষ, যার মূল সুদৃঢ় এবং যার শাখা প্রশাখা উর্ধ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত"।[4]

"A goodly word as a goodly tree, whose root is firmly fixed, and its branches (reach) to the sky". (i.e.very high). (Surah 14. Ibrahim. Part 13. Ayat 24.)

এ আয়াতে দু'টি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে মুসলিম আইনজ্ঞগণ আইনের মূলনীতিশাস্ত্রকে □□□□□ □□□□□ □□□ (اصل) হিসেবে এবং আইন শাস্ত্রকে এর শাখা হিসেবে গণ্য করেছেন। বস্তুতঃ '□□□' শব্দটির আভিধানিক বা শব্দগত ব্যবহারিক আইনের মৌলনীতি ও ধারণা বিষয়ক প্রাচীনতম যে সমস্ত লিখিত গ্রন্থ রয়েছে সেগুলোর সবগুলোই লিখেছেন মুসলিম আইনজ্ঞগণ। গত শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোন জাতি এ বিষয়টি স্পর্শ করেননি। ১৯২৮ স□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ অধ্যাপকের লিখিত একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।এর □□□ □□□ 'ANGORA REFORM'লেখক কাউন্টঅস্ট্রোরগ।□□□□ এটি ছিল '□□□□□সিটি অব লন্ডন' □□ □□বার্ষিকী উৎযাপন অনুষ্ঠানে উত্থাপিত তার তিনটি বক্তৃতা বা পেপারের সমষ্টি। প্রথম বক্তৃতার শিরোনাম ছিল'ANGORA REFORMS' তৎকা□ন তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক যেসংস্কারমূ□□ □□□ □□□□□□ □□□□'ANGORA REFORMS' ছিল এ সম্পর্কিত বক্তৃতা। কামাল পাশা যেমনটি আমরা জানি, তুরস্কে ইসলামী আইন □□□□ □□□ □□□□ সেখানে সুইস ও ইটালিয়ান আইন চালু করেছিলেন। তিনি তুর্কী টুপি ব্যবহার বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে ইউরোপীয় হ্যাট ব্যবহার চালু করেছিলেন। সে সময় নতুন এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় উপরোক্ত ধরনের সংস্কারকে ঘিরে এ বক্তৃতা আবর্তিত ছিল। দ্বিতীয় বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ROOTS OF LAW' স্বীকার করতে দ্বিধা নেই আমি আমার নিজের জাতির ঐতিহ্য (অর্থাৎ আইনের মূলনীতিশাস্ত্র)সম্পর্কে এই বক্তৃতাটি পড়েই প্রথম অবগত হই।এ বক্তৃতায় কাউন্টঅস্টোরগলিখেন মূলনীতিশাস্ত্র ছিল বিশ্বকে প্রদত্ত মুসলিমদের

---

[4]আলকুরআন, □□: □□ - مثلاكلمةطيبةكشجرةطيبةاصلهاثابتوفرعهافىالسماء

পক্ষ থেকে এক অনন্য উপহার।ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে বলতে গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নবুয়্যত লাভের ঘোষণার পর থেকেই ইসলামী আইন সূত্রবদ্ধ করার সূচনা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কা নগরীতে প্রচলিত কিছু আচরণ ও রীতিনীতির সমষ্টি ইসলামী আইনের প্রাথমিক একটি অংশ তৈরী করে। পরবর্তীতে □□□, ◌ □ □ □□ণ নির্ভর আইন পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হতে থাকে। কিছু অন্যান্য উপাদান যেমন বিভিন্ন পক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তির ধারাসমূহ এবং পূর্বতন নবীগণের কিছু কিছু বিধি বিধানও এতে ধারণ করা হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে □□নের প্রধান একটি উৎস (অর্থাৎ হাদীসের ধা□) বন্ধ হয়ে যায়। বস্তুতঃ এর মধ্য দিয়েই ওহীর মাধ্যমে

আইন তৈরী □ □□□রপরিবর্তনের সম্ভাবনাই শেষ হয়ে যায়।এখন রাসূলুল্লাহ (□) যা রেখে গেছেন, সেটুকু নিয়েইপ্রত্যেককে সন্তুষ্ট থাক□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ অবস্থা যথেষ্ট জটিলতা সৃষ্টি করতে □□□□,কিন্তু আইন যিনি সৃষ্টি করেন তিনি (আল্লাহ) □□ □□ □□বাহক রাসূলুল্লাহ (□)□□□□□ □□□□□□□, আমরা কিভাবে এই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াব।মূল□ মৌলনী□ □□□□ □□□□ প্রাণসঞ্চার করেছে ও একে স্থায়িত্ব এনে দিয়েছে। এর ফলে প্রয়োজনের মুহূর্তে ইসলামী আইন সর্বদাই এ নীতির সাহায্য নিতে পারে। বস্তুতঃ যে কোন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকই একথা স্বীকার করবেন যে, প্রধানতঃ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ বছর ধরে কার্যকর রয়েছে এবং এখনও এটি উন্নততর ও বিকশিত হবার ক্ষমত □□□□এমন হওয়া অসম্ভব কিছু ন যে, কিছু লোক হাদীস থেকে কোন বিষয়ে

কাঙ্ক্ষিতসিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পেরে কখনো কখনো কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যেতে পারে।

□□□□ □□□□□□ (□□) সম্পর্কিত একটি উদাহরণ আমরা এখানে উল্লেখ করতেপারি। ইমাম অ□□□□□□ (□□) এর বুদ্ধিমত্তার তা'রী□ফ করা এ উদাহরণ দেয়ার উদ্দেশ্য নয়, বরং এ বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলাই এখানে উদ্দেশ্য যে, অনেক সময় কোন বিষয়ে কেউ কেউযেখানে সমাধান সম্পর্কে নিজেই ধারণা লাভ

□□□□ □□□□, সে বিষয়েই অনেকে কোন কিছুঅনুমান করতেও ব্যর্থ হয়।

এ সম্পর্কে একটি মজার ঘটনার কথা বলা যায়। ঘটনাটি নিম্নরূপঃএকবার এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মাঝে কোন বিষয়ে ঝগড়া বেঁধে যায়। রাতে স্বামী আল্লাহর নামে শপথ করে তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলল, ভোর ভোর □□□□□ আগে যদি স্ত্রী তার সাথে কথা না বলে, তবে সে তালাক প্রাপ্ত হবে। স্ত্রীও ছিল তখন অত্যন্ত বিরক্ত। সেও আল্লাহর নামে শপথ করে স্বামীকে বলল, সে ভোরের আগে তার সাথে কোন কথা বলবে না। এ কথা

বলার পর দু'জনের কেউ ভোর হওয়া পর্যন্ত কোন কথা বলল না। এভাবে এক সময় রাত কেটে গেল।

মুয়াযযিন মু'মিন বান্দাদেরকে ফজরের নামাযের জন্য আহবান জানালেন। স্বামীমসজিদে গেল নামায আদায়ের জন্য এবং নামাযের পর বিখ্যাত শাস্ত্রবিদ হযরত ইবন সিরীন (রহ)এর কাছে গেল। হযরত

□□□ □□□□ □□□□□, এজন্য স্বামীই দায়ী। কেননা ভোর হওয়ার আগে নীরবতা ভঙ্গ করে কথা বলার শর্ত স্বামীই আরোপ করেছিল। এখন যেহেতু স্বামী এ শর্ত পূরণ করেনি, অতএব তালাক কার্যকর হয়ে গেছে। □□□ □□শা নিয়ে স্বামী এবার গেল হযরত আবূ হানিফা (রহ) এর কাছে ঘটনাটি আদ্যোপান্ত খুলে □□□।বিবরণ শুনে হযরত আবূ হা□□□ (□□) □□□□□ কোন ব্যাপার নয়।আপনি আপনার স্ত্রীরকা□□ □□□ যেতে পারেন। এ কথা শুনে স্বামী কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। সে □□□ □□□ □□□□ (□□) □□ □□□ □□□ □□□□□□ (□□) এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁকে জানালো। আবূ হানিফা (রহ) এর সিদ্ধান্ত শুনে ইবন সিরীনও (□□) □□□ □□□□ তিনি ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়েবিষয়টিবুঝারজন্য □□□□□□ (□□)□□ □□□ গেলেন।তিনি বিষয়টি নিয়ে আবূ হা□□□ (□□)□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ যুক্তি দেখিয়ে বললেন □□□ □□□□ তালাক কার্যকর হয়ে গেছে। কাজেই এই অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীর কাছে ফিরে যায় এবং তার সাথে জীবন যাপন করে তবে সে ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত হবে। এ অপরাধের জন্য দায়ী হবে ইমাম □□□ □□□□ (□□)।কেননা তিনিই স্বামীকে বিভ্রান্ত করেছেন। আবূ হানিফা (রহ) স্বামী ব্যক্তিটির দিকে ফিরে তাকালেন। তিনি তাকে ঘটনাটি আবারও বর্ণনা করতে বললেন। লোকটি ঘটনাটি দ্বিতীয়বার বার সবিস্তারে বলল। □□□ □□□ □□□□□□ (□□) তার পূর্বের সিদ্ধান্তের পুনরুক্তি ক□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ লোকটি সে সম্পর্কে তার স্ত্রীকে স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। স্ত্রী তার স্বামীর ঐ □□□ □□□□ □□□□□, সেও তার সাথে কথা বলবে না। এ কথা বলার দ্বারাই স্ত্রী স্বামীকে উদ্দেশ্য করে □থা বলে ফেলেছে। এর ফলে স্বামী যেশর্ত দিয়েছিল ভোর হবার আগে স্ত্রী কথা না বললে তালাক হয়ে □বে সেটি এখানে ঘটেনি। কিভাবে দু'জন আইনবিদ একই ঘটনাকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন এ ঘটনা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। একজন আইনজ্ঞ এখানে ঘটনার কোন একটি সূক্ষ্ম দিক ধরতে পেরেছেন; যেটি অন্যজ□□□ □□র এড়িয়ে গেছে। □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□, □□□ □□□□□ আইন শুধু কু□□ □ □□সের মধ্যে সীমিত থাকত। এটি খুবই স্বাভাবিক যে, জাতির শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আইনজ্ঞ ব্যক্তিরাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইন খুঁজে পেতে ব্যর্থ হতে পারেন যা হয়ত নতুন কোন উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন।

□□□□□□

□□□□□□(اجتهاد)কোন কিছু হাসিলের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা। □□□□□ □□□'□□□□ □□□□□□□ □□□'আতের কোন নির্দেশ সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা ও সাধনার নাম ইজতিহাদ। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে কিয়াস প্রয়োগ করে ইজতিহাদ করা হয়ে থাকে। ইসলামের প্রথম যুগে

একই অর্থে ব্যবহৃত হত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিচার বিবেচনা ব্যতিরেকে অপরের মত মানিয়া লয়, তাকে মুকাল্লিদ বলা হয়।

পবিত্র কু আনে বহু সংখ্যক আয়াতে বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা গবেষণা ও সাধনার নির্দেশ রয়েছে। হ বর্ণিত আছে, “ ( ) ' ( ) কে আমীর নিযুক্ত ক জিজ্ঞাসা কর , হে মু' ! ? ' আয উত্তর ক ,

আল্লাহর কিতাব । ( ) , দি তুমি কুরআনে কোন নির্দেশ খুঁজে না পাও? মু'আয ( ) , ন্নাতের অ ( ) , ন্নাতেও এম ? ' , লে আমি আমার বিবেচনা প্রয়োগে (সমাধা) যথাসাধ্য চেষ্টা

তাতে কিছুমাত্র ত্রুটি করবনা। তখন ( ) তাঁর বক্ষে মৃদু করাঘাত করে বললে , সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন , যিনি তাঁর দূত (আল্লাহর) ন্তুষ্টির পথ প্রদর্শ ”।[5] সেবর্ণিতআছে, ( ) ,

“যদিকেউইজতিহাদকরতেযেয়েভুলওকরেবসেতাহলেওসেতারজন্য ।পক্ষান্তরে রইজতিহাদঠিকহলেসেতারজন্যদ্বি-গুণ ”।[6]

ত তিন প্রকার

ইজতিহাদ মুতলাক বা ব্যাগ

এটি কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা মাস'আলার সাথে যুক্ত নয়; ধর্মীয় সমস্ত আহকামের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এটি সর্বোত্তম প্রকারের ইজতিহাদ। এই প্রকারের ইজতিহাদের জন্য মুজতাহিদকে অবশ্যই কুর , ন্নাহ, ' সম্পর্কিত জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিকারী হ ' র যথেষ্ট দখল থাকা একান্ত প্রয়োজন। অধিকন্তু কুর ন্নাহ বর্ণিত আদেশ নিষেধ, উ শ্রেণিসমূহ এবং যুক্তি প্রমাণের ধারা ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাকে অবশ্যই পারদর্শী হতে হবে। বিশিষ্ট সাহাবী এবং প্রথমশ্রেণির ই গণই এইরূপ

ইজতিহাদ ফিল মাযহাব বা নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের সাথে সম্পর্কিত ইজ

---

[5] *মিশকাতআলমাসাবিহ, দিল্লী,*

[6] প্রাগুক্ত ,

কোন মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা (ইমাম) কর্তৃক প্রবর্তিত ধারা ও পদ্ধতি অনুসরণে এই প্রকারের ইজতিহাদ সাধিত হয়ে থাকে।এটি প্রথম প্রকারের ইজতিহাদ □তেনিম্নস্তরের। ইমাম আবূ হ□□□□ (□□) □□ □□□□□ ইমাম মুহাম্ম□ □□□□□ □□□□□□□ (□□)□□□ □□□□ □□□□ (□□) □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ শ্রেণির □□□□□□গণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

□ইজতিহাদ ফিল ফাতওয়া অর্থাৎ বিভিন্ন ফাতওয়া সম্পর্কে ইজতিহাদ

এই প্রকারের ইজতিহাদে যে সকল মাস'আলা সম্পর্কে ইজতিহাদ করা হয়, মুজত□□□□□□ পক্ষে শু□ সেই প্রকারের মাস'□□□ □ম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়াই যথেষ্ট। □ দ্বিতীয় প্রকারের ইজতিহাদ □তেওনিম্নমা□□□ □ভিন্ন মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ মুফতিগণ এই শ্রেণির মুজতাহিদের অন্তর্গত।

অনেকক্ষেত্রেএকই□ 'আলাসম্পর্কেবিভিন্নমুজতাহিদবিভিন্নমতপ্রকাশকরেথাকে |এরূপক্ষেত্রেপ্রশ্নউ □□□□□,তাদেরপ্রত্যেকেরঅভিমতইসঠিকওগ্রহণযোগ্য□ |ইহারসমাধানকল্পেবলাহয়েথাকেযে, মুজতাহিদগণেরঅভিমতযদিপরস্পরবি□□□নাহয়তাহলেক্ষেত্রবিশেষেতারপ্রতিটিইসঠিকবলেবিবেচিত□ □□□□|পক্ষান্তরেপর□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, ফাতওয়াগুলিরমধ্যেযেকোনএকটিরঅনুসরণকরাযেতেপা□ |প্রসঙ্গতউল্লেখযোগ্য□ , কোনবিষয়েকোনমুজতাহিদেরইজতিহাদভুলপ্রমাণিতহলেউক্তমতপরিহারকরাএকান্তকর্তব্য |

□□□□□□□ মনে করা হয় যে, বর্তমানকালে ইজতিহাদের দ্বার রুদ্ধ, কারোপক্ষে □□ □□□ □□□□□□□ □□□ সম্ভব নয়|কিন্তুপ্রকৃত পক্ষে এ□ একটি ভ্রান্ত ধারণা। কেননা বর্তমান যুগে যদি কেউ ইজতিহাদের জন্য আবশ্যক যাবতীয় গুণ ও জ্ঞানের □□□□□□ □□ □□□লে নির্দিষ্ট সীমা ও শর্তাধীনে □□□□□□□ □□□ □□র পক্ষে অবৈধ ও অসম্ভব ন□|[7]

---

7 *ইসলামীবিশ্বকোষ,*ই□□□□□ফাউন্ডেশন□□□□□□, □. □,□□□□

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের আদালত ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ
বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশের আদালত ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ

(Historical Development of Courts in Bangladesh)

বাংলাদেশের বর্তমান আইন ব্যবস্থা পাক ভারত উপমহাদেশে দু'শ বছর ধরে প্রচলিত বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার কাছে বহুলাংশে ঋণী যদিও বৃটিশ আদালত ব্যবস্থার কিছু কিছু অংশ প্রাচীন হিন্দু এবং মুঘল শাসন ব্যবস্থা থেকে এসেছে। ইহা বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে ক্রমান্বয়ে একটি চলমান ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার রূপ লাভ করেছে। এই বিবর্তন প্রক্রিয়াটি আংশিকভাবে প্রাচীন এবং আংশিকভাবে বিদেশী। বর্তমান আইন ব্যবস্থা একটি মিশ্র পদ্ধতি থেকে উৎসারিত যা ইন্দো, মুঘল এবং ইংলিশ আইন ব্যবস্থার গঠন, আইনগত মূলনীতি এবং মতবাদ দ্বারা ঢেলে সাজানো হয়েছে।[১] হিন্দু ও মুসলিম আমল এবং পরবর্তী বৃটিশ আমলসহ পাক ভারত উপমহাদেশের পাঁচশত বছরেরও অধিক সময়ের ইতিহাস বিদ্যমান এবং প্রত্যেকটি শাসনামলের একটি স্বতন্ত্র আইন ব্যবস্থা ছিল। এই ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলো খুব সহজে অনুধাবনের জন্য এগুলোকে পাঁচটি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথাঃ (ক) হিন্দু যুগ, (খ) মুসলিম যুগ,(গ) বৃটিশ যুগ, (ঘ) পাকিস্তান আমল এবং সর্বশেষ (ঙ) বাংলাদেশ আমল।

হিন্দু যুগ (Hindu Period)

প্রাচীন ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা (Ancient judicial System)

এই যুগের ব্যাপ্তি ছিল খৃষ্ট জন্মের পূর্বে ও পরে প্রায় ১৫০০ বছর। প্রাচীন ভারত বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেকটি রাজ্যে সংশ্লিষ্ট রাজাই ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাজাই ন্যায়বিচারের উৎসরূপে বিবেচিত হতেন। রাজ্যের ন্যায়বিচার বিধানের পবিত্র দায়িত্ব রাজার উপর অর্পিত ছিল। উক্ত বিচার ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপঃ

বিচারালয়ের গঠন প্রকৃতি (Organisation of Court Structure)

ক. রাজ দরবার বা রাজ আদালত (The King's Court)

রাজ আদালত ছিল দেশের সবোর্চ্চ আপিল আদালত। রাজ্যের সার্বিক গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলোর ক্ষেত্রে এটি মূল এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত ছিল। বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজাকে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ, প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকগণ, মন্ত্রীবর্গ, প্রবীণ ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় প্রতিনিধিগণ সহায়তা করতেন।

---

[১] Azizul Hoque, *The Legal System of Bangladesh,* BILLA, 1980, P. 1.

খ. প্রধান বিচারপতির আদালত (Chief Justice's Court)

রাজ আদালতের পরেই ছিল প্রধান বিচারপতির আদালত। এটি একজন প্রধান বিচারপতি ও তাঁকে সাহায্য করার জন্য অন্যান্য বিচারকদের বোর্ড নিয়ে গঠিত হত। বোর্ডের বিচারকদের নিয়োগ দেয়া হত তিনটি উচ্চবর্ণের সদস্যদের মধ্য থেকে এবং এ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদেরই প্রাধান্য ছিল।

গ. বিশেষ ট্রাইব্যুনাল (Special Tribunal)

কখনো কখনো প্রধান বিচারপতির আদালতের বোর্ড থেকে নির্দিষ্ট আঞ্চলিক এখতিয়ারসম্পন্ন বিচারকদের নিয়ে পৃথক ট্রাইব্যুনাল গঠিত হত।

ঘ. শহর বা জেলা আদালত (Town or District Court)

শহর কিংবা জেলা আদালতগুলোতে বিচারকার্য রাজার আদালতের অধীনে সরকারি কর্মচারীগণ দ্বারা পরিচালিত হত।

ঙ. গ্রাম পরিষদ (Village Council)

গ্রামে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য পাঁচ বা ততোধিক সদস্য নিয়ে গ্রাম পরিষদ বা কুলানি গঠিত হত। এটি গ্রামের ক্ষুদ্র দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করত।

আদালতের কার্যপদ্ধতি (Judicial Procedure)

ক. মোকদ্দমার বিভিন্ন পর্যায়

একটি মোকদ্দমা বা বিচারকার্যের চারটি পর্যায় ছিলঃ আরজি, জবাব বা উত্তর, বিচারকার্য ও তদন্ত এবং সবশেষে আদালতের রায় বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

খ. একাধিক বিচারক দ্বারা গঠিত বেঞ্চ (Bench of more than one Judges)

প্রাচীন ভারতের বিচার ব্যবস্থার মূলনীতি ছিল এই যে, একজন বিচারক দ্বারা গঠিত বেঞ্চ কখনো ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারে না। ফলে সাধারণতঃ দুই বা ততোধিক বিচারক দ্বারা গঠিত বেঞ্চ বিচারকার্য পরিচালনা করত। এমনকি রাজা তাঁর পরিষদবর্গ নিয়ে মোকদ্দমার রায় বা সিদ্ধান্ত দিতেন।

গ. বিচারক নিয়োগ ও বিচারের মান (Appointment of Judge and Judicial)

প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে গোত্রের বিষয়টি সবচেয়ে বেশী বিবেচিত হত। প্রধান বিচারপতিকে অবশ্যই ব্রাহ্মণ গোত্রের হতে হত। একজন শুদ্রের বিচারক হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। আইনে শিক্ষিত এবং উচ্চগুণাবলী সম্পন্ন লোকদের মধ্য থেকে বিচারক নিয়োগ করা হত। নারীদের বিচারক হওয়ার অধিকার ছিল না। নাগরিকদের বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে বিচারকদের নিরপেক্ষ থাকার শপথ নিতে হত।

ঘ. নজীরের মতবাদ (Doctrin of Precedent)

রাজ আদালতের সিদ্ধান্ত সকল নিম্ন আদালতের উপর বাধ্যকর ছিল। মোকদ্দমার বিচারের ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তে গৃহীত আইনের মূলনীতি নিম্ন আদালতগুলো সর্বদা বিবেচনা করত।

ঙ. সাক্ষ্য (Evidance)

বিচারকার্যে উভয়পক্ষ তাদের মামলা প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য উপস্থাপনে বাধ্য ছিল। সাধারণতঃ সাক্ষ্যের উপাদান ছিল দালিলিক সাক্ষ্য, মৌখিক সাক্ষ্য এবং নালিশী বিষয়বস্তুর দখল, এই তিন ধরনের যে কোন একটি বা সবগুলোই। ফৌজদারী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে কখনো কখনো পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য পর্যাপ্ত বিবেচনা করে দণ্ডদান বা খালাস প্রদান করা হত।

চ. অর্ডিল বা চরিত্র পরীক্ষার মাধ্যমে বিচার (Trial by Ordeal)

অর্ডিল বা চরিত্র পরীক্ষা ছিল এক ধরনের প্রথা যা ধর্ম ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে চরিত্র পরীক্ষার মাধ্যমে অপরাধীর অপরাধ নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতি সাধারণতঃ সে সব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত যেখানে উভয় পক্ষ থেকে কোন যথার্থ সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যেত না। অর্ডিল পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং বিপদজনক, কখনো কখনো অর্ডিল প্রদানকারী ব্যক্তিকে অর্ডিলের সময় মৃত্যুবরণ করতে হত। প্রাচীন ভারতে প্রচলিত কিছু চরিত্র পরীক্ষার (অর্ডিল) পদ্ধতি হল নিম্নরূপঃ

(১) অগ্নির মাধ্যমে চরিত্র পরীক্ষা (Ordeal by Fire)

হিন্দুরা আগুনকে দেবতা মনে করত এবং বিশ্বাস করত যে আগুনের মানুষকে পবিত্র করার ক্ষমতা রয়েছে। অগ্নির মাধ্যমে চরিত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে বলা হত। এ কাজ করতে গিয়ে যদি অপরাধীর কোন ক্ষতি না হত তবে তাকে নিরপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হত। আবার কখনো কখনো অভিযুক্তকে নগ্ন হাতে লাল উত্তপ্ত লোহার পাত নিতে বলা হত এবং তাকে কয়েক কদম হাঁটতে বলা হত। তাতে হাতে যদি পোড়ার দাগ না পড়ত তবে তাকে নিস্পাপ বলে ঘোষণা করা হত।

(২) পানির মাধ্যমে চরিত্র পরীক্ষা (Ordeal by Water)

হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীরা সর্বদাই পানিকে ধর্মীয় বিশুদ্ধতার প্রতীক মনে করত এবং একে অপরাধীর অপরাধ নির্ণয়ে ব্যবহার করত। পানি পরীক্ষার এই পদ্ধতিতে অভিযুক্তকে প্রথমে কোমর পানিতে দাঁড়াতে বলা হত। অতপর তাকে পানিতে বসতে বলা হত, একই সাথে একজন তীরন্দাজ তীর ছুঁড়বে এবং একজন দৌড়বিদ গিয়ে তীরটি নিয়ে না আসা পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পানির নীচে অবস্থান করতে বলা হত। যদি এ সময় পানির নীচে অবস্থান করতে সক্ষম হত তবে তাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হত। অন্য একটি পদ্ধতিতে অভিযুক্তকে প্রতিমা ধোয়া পানি পান করতে বলা হত। পরবর্তী চৌদ্দ দিনে যদি তার কোন ক্ষতি না হত তবে তাকে নিরপরাধ বলে ঘোষণা করা হত।

(৩) বিষপানের মাধ্যমে চরিত্র পরীক্ষা (Ordeal by Poison)

এই পদ্ধতির ভিত্তি হল এই যে, "ঈশ্বর নিরপরাধ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন"। এক্ষেত্রে অভিযুক্তকে বিষপান করতে দেয়া হত। তবে শর্ত ছিল যে, সে বমি করতে পারবে না। এরপরও যদি সে বেঁচে থাকতে পারত তাহলে তাকে নিস্পাপ ঘোষণা করা হত।

(৪) ধান শস্যের মাধ্যমে চরিত্র পরীক্ষা (Ordeal by Rice grains)

এই ব্যবস্থায় অভিযুক্তকে খোসা না ছাড়িয়েই ধান খেতে দেয়া হত এবং কিছুক্ষণ পর তাকে থু- থু ফেলতে বলা হত। যদি তার থু- থু তে রক্ত পাওয়া যেত তবে তাকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা হত অন্যথায় নয়।

(৫) লটারীর মাধ্যমে চরিত্র পরীক্ষা (Ordeal by Lot)

এই পদ্ধতিতে ধর্ম ও অধর্মকে প্রতিনিধিত্বকারী দু'টি বস্তু একটি পাত্রে রাখা হত। অতপর অভিযুক্তকে বলা হত যে কোন একটি বস্তু তোলার জন্য। যদি সে ধর্মের প্রতীকটি তুলত তবে তাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হত।

(ছ) জুরীর মাধ্যমে বিচার (Trial by Jury)

যদিও প্রাচীন ভারতে জুরী ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল কিন্তু তার প্রকৃতি বর্তমান কালের মত ছিল না। জানা যায় যে, বিচারকার্য পরিচালনায় সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য সদস্যগণ বিচারকগণকে সহায়তা করতেন। তারা কেবল মোকদ্দমায় দ্বন্দ্বের কারণ নিরূপণ করে সত্য ঘটনা বিচারকের নিকট উপস্থাপন করতেন, কিন্তু মামলার সিদ্ধান্ত বিচারক নিজেই প্রদান করতেন।

(জ) অপরাধ এবং শাস্তি (Crime and Punishment)

অপরাধ ও শাস্তির দর্শন ছিল এই যে, শাস্তি অপরাধীর পাপ মোচন করে তাকে সংশোধিত করে দেয়। প্রাচীন ভারতে বিচারকগণ শাস্তি প্রদানের পূর্বে কতগুলো বিষয়ে বিবেচনা করে দেখতেন। যেমন অপরাধের প্রকৃতি ও অভিপ্রায়, সময় ও স্থান, অপরাধীর সামর্থ্য, বয়স, আচরণ, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আর্থিকসঙ্গতি। শাস্তির পদ্ধতি ছিল চার ধরনের মৃদু তিরস্কার বা দোষারোপ, কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন, জরিমানা আরোপ এবং দৈহিক শাস্তি প্রদান। এসব শাস্তি আলাদাভাবে বা একত্রে অপরাধের ধরন বিবেচনা করে দেয়া হত। প্রকৃত শাস্তি দেয়ার আগে বিচারকগণ প্রাসঙ্গিক পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করতেন। শাস্তি প্রদানের সময় অপরাধীর বর্ণের ব্যাপারটিও বিবচনা করা হত। কয়েক শ্রেণির ব্যক্তি আবার শাস্তির আওতা বহির্ভূত ছিল। আশি বছরের বেশী বয়সের বৃদ্ধ, ষোল বছরের কম বয়সী বালক, মহিলা এবং অসুস্থ ব্যক্তিগণকে অর্ধেক শাস্তি প্রদান করা হত। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর কোন কাজকে অপরাধ বলে গণ্য করা হত না। ফলে তাদেরকে কোন শাস্তি দেয়া হত না। ধর্ষণ ও ব্যভিচারের ক্ষেত্রে অপরাধীর এবং মহিলার বর্ণ পরিচয় ভেদে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করা হত। মানহানির মামলায় এটা নিশ্চিত করা হত যে, উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের লোকদের কাছ থেকে যথাযথ সম্মান পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ যদি কোন নীচুবর্ণের লোক উচ্চবর্ণের কোন ব্যক্তির সাথে একই

Dhaka University Institutional Repository

বেঞ্চে বসত তবে ঐ নীচুবর্ণের লোকটিকে দাগী হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে বেত্রদণ্ড দেয়া হত। হত্যাকাণ্ডের শাস্তি হিসেবে কোন ব্যক্তি একজন খত্রিয়কে খুন করলে ১০০০ গরু, বৈশ্যকে খুন করলে ১০০ গরু, এবং একজন শুদ্রকে খুন করলে ১০টি গরু জরিমানা হিসেবে দিতে হত। এসব গরু নিহতের আত্নীয়ের কাছে দেয়ার জন্য রাজার নিকট প্রদান করা হত। খুনের জরিমানা হিসেবে রাজাকে একটি ষাঁড় দিতে হত। নীচুবর্ণের কোন ব্যক্তি একজন ব্রাহ্মণকে খুন করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হত এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত। কোন ব্রাহ্মণ অপর কোন ব্রাহ্মণকে হত্যা করলে তাকে দাগী হিসেবে চিহ্নিত করা হত এবং নির্বাসন দণ্ড প্রদান করা হত। যদি কোন ব্রাহ্মণ নীচুবর্ণের কোন লোককে হত্যা করত তবে তাকে জরিমানার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হত। রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা, জোরপূর্বক রাজার হেরেমে প্রবেশ করা, রাজার শত্রুদের সহায়তা করা, সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ করা, নিজের পিতা মাতাকে খুন করা, পরের সম্পত্তিতে মারাত্নক ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটানো ইত্যাদি অপরাধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতিতে যথা জীবন্ত দগ্ধ করে, পানিতে ডুবিয়ে, হাতি দিয়ে পিষ্ট করে, কুকুর দিয়ে খাইয়ে, খন্ড- খন্ড করে কেটে কিংবা শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হত। অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই ধারণা স্পষ্ট হয় যে, এ ধরনের শাস্তি প্রদানের প্রবণতা কোন ব্যাপক ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং খামখেয়ালীপনা এবং বর্ণবৈষম্য ছিল অত্যন্ত প্রকট যা সব ধরনের মানবিক ও নৈতিক ধারণার বিরোধী ছিল।

হিন্দু বিচার ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ (Defects of Hindu Judicial System)

(১) বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে গোত্রের বা বর্ণের বিবেচনা ছিল আধুনিক ধ্যান ধারণা বিরোধী এবং সেকেলে। সামাজিক শ্রেণিবৈষম্যের প্রভাব প্রকটভাবে বিচার ব্যবস্থায়ও বিরাজমান ছিল।

(২) বিচার ব্যবস্থায় নারীদের অধিকার, মর্যাদা ও অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল।

(৩) হিন্দু যুগের বিচার পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ খেয়ালী এবং বেশীরভাগ ধর্মকেন্দ্রিক। চরিত্র পরীক্ষার মাধ্যমে বিচার, অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে বিচার পদ্ধতি ছিল সেকেলে এবং ন্যায় নীতিবিবর্জিত। বিচারের এই পদ্ধতি ও ধরন অন্যান্য সাক্ষ্য গ্রহণ ও নজীরের মতবাদকে অনেকটাই অর্থহীন করে দেয়।[২]

মুসলিম যুগ (Muslim Period)

মধ্যযুগে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা (Judicial System in Medieval India)

১১০০ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে তুর্কী মুসলিমদের অধিক্রমনের সময় থেকে মুসলিম যুগের সূচনা হয়। তৎকালীন হিন্দু রাজ্যগুলি একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুতে তুর্কী অধিক্রমনের

[২] মোঃ আব্দুল হালিম, *বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা,* CCB FOUNDATION: LIGHTING THE DARK. প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৫, পুনর্মুদ্রণ, মে ২০১৩, পৃ. ২৫- ২৮

প্রভাবে ক্রমশঃ ছিন্ন- বিচ্ছিন্ন বা খণ্ড- বিখন্ড হতে থাকে। মুসলমানগণ রাজ্যগুলোতে আধিপত্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাদের ধর্মগ্রন্থ কুরআনের উপর ভিত্তি করে। কুরআনের বিধান অনুযায়ী সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর ন্যস্ত এবং রাজা হলেন পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুম বা আজ্ঞা প্রতিষ্ঠার জন্য এক বিনীত সেবক, তিনি (রাজা বা শাসক) সর্বশক্তিমান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি হওয়ায় কেবল প্রশাসনিক রক্ষক হিসেবে বিবেচিত হন।

সমগ্র মুসলিম যুগকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি হল দিল্লীর সালতানাত এবং অন্যটি মুঘল সাম্রাজ্য। দ্বাদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার পর মুহাম্মদ ঘুরী দিল্লীতে মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। ১২০৬ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩০০ বছর সময়কাল ধরে দিল্লীর সালতানাত বা সুলতানী আমল ভাল ছিল। ১৫২৬ সালে জহিরুদ্দীন বাবর দিল্লী দখল করলে দিল্লী সালতানাতের অবসান হয়। বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা করেন এবং তা ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল।

সুলতানী আমলের আইন ব্যবস্থা (Legal System under the Sultanate)

সুলতানী আমলে সুলতান বা রাজাই ছিলেন বিচার ব্যবস্থার সর্বময়কর্তা। দিল্লী সালতানাতের বিচার ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত হয়ে গড়ে উঠেছিল। আদালতগুলো একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণিবিভাগসহ বিভিন্ন ধাপে রাজধানী, প্রদেশ, জেলা, পরগনা এবং গ্রামে গড়ে উঠেছিল। এছাড়া প্রতিটি আদালতের ক্ষমতা এবং এখতিয়ারও সুনির্দিষ্ট ছিল।

কেন্দ্রীয় আদালত (Court at Centre)

সালতানাতের কেন্দ্রীয় রাজধানীতে যেসব আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল সেগুলো হচ্ছে রাজ আদালত, দেওয়ান-ই- মজলিস, দেওয়ান- ই- রিসালত, সদর জিহানের আদালত, প্রধান বিচারপতির আদালত এবং দেওয়ান-ই- সিয়াসত। রাজ আদালতে স্বয়ং সুলতান সভাপতিত্ব করতেন। সকল মোকদ্দমায় এই আদালত আদি ও আপিল এখতিয়ার ভোগ করত। এটি ছিল সালতানাতের সর্বোচ্চ আপিল আদালত। এখানে বিচারকার্যে উচ্চশিক্ষিত এবং আইনে দক্ষ দু'জন বিখ্যাত মুফতি সুলতানকে সহায়তা করতেন।

দেওয়ান- ই- মাযালিম এবং দেওয়ান- ই- রিসালাত ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ ফৌজদারী ও দেওয়ানী আপিল আদালত। সুলতান নামমাত্র এই দুই আদালতের বিচারক হলেও সুলতানের অনুপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি (কাযী- উল- কুযাত) এই দুই আদালতে সভাপতিত্ব করতেন। কাযী- উল- কুযাত ছিলেন বিচার বিভাগের প্রকৃত প্রধান এবং তিনি সকল ধরনের মোকদ্দমা পরিচালনা করতেন। সুলতান রাজ্যের সর্বোচ্চ গুণধর ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিতেন। ১২৪৮ সনে সুলতান নাসির উদ্দিন সদর জিহান

নামে একটি পদ প্রতিষ্ঠা করেন। এই পদ কাযী- উল- কুযাতের পদের অপেক্ষা উচ্চতর ছিল। ফলে তখন তিনি বিচার বিভাগের কার্যত প্রধানে পরিণত হন। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সদর জিহান এবং প্রধান বিচারপতির আদালত পৃথক ছিল। কিন্তু সম্রাট আলাউদ্দিন এই দু'টি প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করলেও পুণরায় সুলতান ফিরোজ তুঘলক এ দু'টোকে পৃথক করেন। দেওয়ান- ই- সিয়াসতের আদালত রাজদ্রোহী ও সামরিক অপরাধে অভিযুক্তদের বিচারের জন্য গঠিত হয়। এটি মূলতঃ ফৌজদারী আদালত হিসেবে কাজ করত। প্রধান বিচারপতির আদালতের সাথে যুক্ত আরো কতিপয় কর্মকর্তারা হলেন নিম্নরূপঃ

(ক) মুফতি (Mufti)

প্রধান বিচারপতি তাকে নির্বাচিত করতেন এবং সুলতান নিয়োগ প্রদান করতেন। তিনি আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করতেন এবং বিচারক ও মুফতির মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে সেক্ষেত্রে বিষয়টি সুলতানের কাছে চলে যেত এবং সুলতান সিদ্ধান্ত দিতেন।

(খ) পণ্ডিত (Pandit)

তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং হিন্দু আইনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। আর অমুসলিমদের দেওয়ানী বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে কাজ করতেন। তার পদমর্যাদা ছিল মুফতির সমান।

(গ) মুহতাসিব (Mohtasib)

বিধিবদ্ধ আইন ভঙ্গ সংক্রান্ত মোকদ্দমা পরিচালনার কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন।

(ঘ) ডাডবাক (Dadbak)

তিনি ছিলেন আদালতের রেজিস্ট্রার বা কেরানী এবং তার কর্তব্য ছিল সমন জারি করা হয়েছে এমন ব্যক্তির আদালতে হাজিরা নিশ্চিত করা। কখনো কখনো তাকে ক্ষুদ্র প্রকৃতির দেওয়ানী মোকদ্দমা পরিচালনার ভার দেয়া হত।

প্রাদেশিক আদালতসমূহ (Provincial Courts)

প্রতিটি প্রদেশ বা সুবাহর সদর দফতরে চার ধরনের আদালত বিদ্যমান ছিল। যেমনঃ নাজিম- ই- সুবাহর আদালত, কাযী -ই- সুবাহর আদালত, গভর্নরের বেঞ্চ (দেওয়ান- ই- সুবাহ) এবং সদর- ই- সুবাহর আদালত।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) নাজিম- ই- সুবাহর আদালত (Adalat Nazim- e- Subah)

এই আদালতের সভাপতি ছিলেন নাজিম। তিনি প্রদেশে সুলতানের সভাপতিত্ব করতেন এবং তিনি সুলতানের মত আদি ও আপিল এখতিয়ার সম্পন্ন ছিলেন। আদি প্রকৃতির মোকদ্দমায় তিনি একক বিচারক হিসেবে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। তার রায়ের বিরুদ্ধে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় আপিল আদালতে আপিল করা যেত। তিনি আপিল মোকদ্দমায় কাযী- ই- সুবাহের সাথে বেঞ্চ গঠন করে আপিল করতেন। এই বেঞ্চের রায় থেকে দিল্লীর কেন্দ্রীয় আপিল আদালতে দ্বিতীয় আপিল চলত।

(খ) কাযী- ই- সুবাহর আদালত (Adalat Qazi- e- Subah)

এই আদালতের প্রধান ছিলেন প্রদেশের প্রধান কাযী। এটি যে কোন ধরনের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করত। জেলা কাযীর রায়ের বিরুদ্ধে এই আদালতের আপিলএখতিয়ার ছিল। আবার এই আদালত থেকে আপিল শুনা হত নাজিম- ই- সুবাহর আদালতে। এছাড়াও কাযী- ই- সুবাহ বিচার প্রশাসনের তত্ত্বাবধান করতেন এবং জেলার কর্মরত কাযীগণ তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করছেন কি না সেটাও দেখতেন। কাযী- ই- সুবাহকে নিযুক্ত করতেন সুলতান কিন্তু প্রধান বিচারপতি মনোনয়ন দান করতেন। এক্ষেত্রে তিনি স্বনামধন্য ও লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আইনবোদ্ধা হিসেবে পরিচিত এবং উচ্চ চারিত্রিক গুণাবলীসম্পন্ন আর আপোষহীন সাধু ব্যক্তিদের মধ্য থেকে বেছে নিতেন। মুফতি, পণ্ডিত, মুহতাসিব এবং ডাডবাক এই চারজন কর্মকর্তাও এই আদালতের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।

(গ) দেওয়ান- ই- সুবাহ (Diwan- e- subah)

এই আদালতের রাজস্ব সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আদি ও আপিল এখতিয়ার ছিল। দেশের রাজস্ব সংক্রান্ত মোকদ্দমার সর্বোচ্চ আদালত ছিল দেওয়ান- ই- সুবাহ।

(ঘ) সদর- ই- সুবাহ (Sadre- e- Subah)

সদর- ই- সুবাহ ছিল প্রদেশে যাজক সংক্রান্ত সর্বোচ্চ আদালত। এছাড়া এটি প্রদেশে বৃত্তি প্রদান, ভূমিদান সংক্রান্ত বিষয়ও পরিচালনা করত।

জেলা আদালত (District Courts)

(ক) জেলা কাযি আদালত (The District Qazi's Court)

এই আদালতে সব ধরনের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচার করার এখতিয়ার ছিল। পরগনার কাযী, কোতয়াল এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়ের বিরুদ্ধে এই আদালতে আপিল শোনা হত। জেলা কাযী এই আদালতের সভাপতিত্ব করতেন এবং তিনি কাযী- ই- সুবাহর সুপারিশক্রমে সদর জিহান কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। পূর্বে উল্লেখিত চারজন কর্মকর্তা এই আদালতকেও সহায়তা করতেন।

(খ) ফৌজদারী আদালত (Faujder Court)

ফৌজদারের আদালতে নিরাপত্তা এবং সন্দেহভাজন অপরাধীদের ক্ষুদ্র ফৌজদারী অপরাধের বিচার হত। এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে নাজিম- ই- সুবাহর আদালতে আপিল করা যেত।

(গ) মীর আদিলের আদালত (Court of Miir Adils)

এই আদালত ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় বিচার করত। দেওয়ান- ই- সুবাহর আদালতে এই আদালত থেকে আপিল করা যেত।

(ঘ) কোতয়াল আদালত (Court of Kotwals)

এটি পুলিশি মোকদ্দমা এবং পৌরসভা সংক্রান্ত বিষয় বিচার হত।

পরগনা আদালত (Parganah's Court)

প্রতিটি পরগনার সদর দফতরে কাযী- ই- পরগনার আদালত আপিল এখতিয়ার ছাড়া জেলা কাযীর মত পরগনায় উদ্ভূত সকল দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করতেন। কোতয়াল পরগনার ক্ষুদ্র ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করতেন। এছাড়া তিনি ছিলেন পরগনার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

গ্রাম্য আদালত (Village Court)

কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে উঠেছিল গ্রামের সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনের জন্য। এছাড়া পঞ্চায়েত স্থানীয় সবধরনের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করত।

মুঘল যুগের আইন ব্যবস্থা (Legal System under the Mughal administration)

মুঘল আমলে (১৫২৬- ১৮৫৭) মুঘল সম্রাট ‘ন্যায়বিচারের মূল উৎস’ হিসেবে বিবেচিত হতেন। সম্রাট ন্যায়বিচার এবং প্রশাসন ঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা নিয়ন্ত্রনের জন্য মহকুমা- ই- আদালত নামে একটি পৃথক বিভাগ সৃষ্টি করেন। সে সময়ের প্রচলিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আদালত হচ্ছে নিম্নরূপঃ

রাজধানীর আদালতসমূহ (Courts at Capital)

গুরুত্বপূর্ণ আদালতগুলির কার্যক্রম ছিল রাজধানী দিল্লীতে। যেমনঃ

(ক) রাজার আদালত (The Emperor’s Court)

সম্রাটের আদালতে সম্রাট নিজেই সভাপতিত্ব করতেন। এটি ছিল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় আদালত। এই আদালত আদি প্রকৃতির দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করত। প্রথম স্তরের আদালত হিসেবে বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন দারগা- ই- আদালত, একজন মুফতি এবং একজন মীর আদিল সম্রাটকে সহায়তা করতেন। আপিল শুনবার সময় সম্রাট প্রধান বিচারপতি (কাযী- উল- কুযাত) ও প্রধান বিচারপতির আদালতের কাযিদের নিয়ে গঠিত একটি বেঞ্চের সভাপতিত্ব করতেন। কোন মোকদ্দমার কোন বিষয় সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য আইনের ব্যাখ্যা প্রয়োজন হলে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে মতামতের জন্য প্রেরণ করতেন।

(খ) প্রধান বিচারপতির আদালত (The Court of Chief Justice)

এটি ছিল রাজধানীতে অবস্থিত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আদালত। এই আদালতের সভাপতিত্ব করতেন স্বয়ং প্রধান বিচারপতি। প্রসিদ্ধ দু’জন কাযী বিচারকার্য পরিচালনার সময় প্রধান বিচারপতিকে সহায়তা করতেন এবং এসব বিচারপতি ছিলেন প্রধান বিচারপতির আদালতের অধঃস্তন বিচারক। এটি সব ধরনের আদি প্রকৃতির দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারকার্য সম্পন্ন করত এবং প্রাদেশিক আদালতের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা এই আদালতের ছিল।

(গ) মুখ্য রাজস্ব আদালত (Chief Revenue Court)

দিল্লীতে অবস্থিত তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ আদালত ছিল মুখ্য রাজস্ব আদালত। রাজস্ব মোকদ্দমা বিচারের ক্ষেত্রে এটি ছিল সর্বোচ্চ আপিল আদালত।

উপরোক্ত সকল আদালতেই দারোগা- ই- আদালত, মুফতি, মুহতাসিব এবং মীর আদিল নামক চারজন কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। রাজধানীতে এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আদালত ছাড়াও আরও দু'টি নিম্ন আদালতের কার্যক্রম ছিল। কাযী- ই-আশকারের আদালত ছিল সামরিক বাহিনীর অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত। এই আদালত দলবদ্ধ হয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে বিচারকার্য সম্পন্ন করত। আরেকটি আদালত ছিল দিল্লীর আদালত তথা কাযী- উল- কুযাতের অনুপস্থিতিতে বসত এবং স্থানীয় প্রকৃতির দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করত।

প্রাদেশিক আদালতসমূহ (Provincial courts)

প্রতিটি প্রদেশে নিম্নলিখিত তিন ধরনের আদালত ছিলঃ

(ক) গভর্নরের আদালত (আদালত- ই- নাজিম- ই- সুবাহ) (The Governor's Court) (Adalat- e- Najim- e- Subah)

এই আদালতের সভাপতিত্ব করতেন গভর্নর বা নাজিম এবং তার প্রাদেশিক রাজধানীতে উদ্ভূত সকল মোকদ্দমা বিচারের আদি এখতিয়ার ছিল। অধঃস্তন আদালত থেকে এই আদালত আপিলও শ্রবণ করত। এই আদালতের রায়ের বিপরীতে আপিল যেত রাজার আদালতে। প্রদেশে বিচার ব্যবস্থায় এই আদালতের তত্ত্বাবধানমূলক এখতিয়ার ছিল। একজন মুফতি এবং একজন দারোগা- ই- আদালত এই আদালতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

(খ) প্রাদেশিক মুখ্য আপিল আদালত (কাযী- ই- সুবাহর আদালত) (The Provincial chief Appeal Court) (Qazi- e- Subah's Court)

জেলা কাযীর আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে এই আদালতে আপিল শোনা হত। কাযী– ই- সুবাহর গভর্নরের সমান এখতিয়ার ছিল। এই আদালতের আদি প্রকৃতির দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তির এখতিয়ারও ছিল। এই আদালতে নিযুক্ত কর্মকর্তারা হলেন মুফতি, মুহতাসিব, দারোগা- ই- আদালত- ই- সুবাহ, মীর আদিল, পণ্ডিত, সাওয়ানেহ নইস এবং ওয়াকি নিগার।

(গ) প্রাদেশিক মুখ্য রাজস্ব আদালত (দেওয়ানের আদালত) (Provincial Chief Revenue Court (Diwan's Court)

দেওয়ান- ই- সুবাহ ছিলেন প্রাদেশিক মুখ্য রাজস্ব আদালতের সভাপতি। রাজস্ব মোকদ্দমার ক্ষেত্রে এই আদালতের আদি এবং আপিল এখতিয়ার ছিল। এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে দিল্লীর দেওয়ান- ই- আলার

মুখ্য রাজস্ব আদালতে আপিল করা যেত। পেশকার, দারোগা, কোষাধ্যক্ষ এবং ক্যাশিয়ার ছিলেন এই আদালতের সাথে নিযুক্ত চারজন কর্মকর্তা।

জেলা আদালত (District Courts)

প্রতি জেলায় নিম্নলিখিত চার ধরনের আদালত ছিলঃ

(ক) জেলা কাযী (District Qazi)

জেলার মুখ্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সভাপতিত্ব করতেন কাযী– ই- সরকার। সব ধরনের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিষয়ে এ আদালতের এখতিয়ার ছিল। এখান থেকে কাযী – ই- সুবাহর আদালতে আপিল করা যেত। কাযী– ই- সরকার ছিলেন জেলার প্রধান বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা। যে ছয়'জন কর্মকর্তা এই আদালতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা হলেন দারোগা- ই- আদালত, মীর আদিল, মুফতি, পণ্ডিত, মুহতাসিব, উকিল- শারী'আত।

(খ) ফৌজদার আদালত (Foujdar Adalat)

ফৌজদার এই আদালতের সভাপতিত্ব করতেন। তাঁর দাঙ্গা এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত মোকদ্দমা বিচার করার এখতিয়ার ছিল। এই আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গভর্নরের আদালতে আপিল করা যেত।

(গ) কোতয়াল আদালত (Kotwal Court)

কোতয়াল- ই- সরকার এই আদালতের সভাপতি ছিলেন এবং তিনি ক্ষুদ্র প্রকৃতির ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করতেন। এই আদালত এখানকার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল শোনা হত।

(ঘ) আমল গুজারী কাছারীঃ (Amal Guzari Kachari)

আমল গুজারীর সভাপতিত্বে এই আদালত রাজস্ব সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার করত। দেওয়ান- ই- সুবাহর আদালতে এখানকার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল শোনা হত।

পরগনার আদালত (parganah's Court)

প্রতিটি পরগনায় নিম্নলিখিত তিন ধরনের আদালত ছিলঃ

(ক) কাযী- ই- পরগনাহ আদালত (Qazi- e- Porganah's Court)

এই আদালতের মূল এখতিয়ারের মধ্যে আঞ্চলিক সীমানায় উদ্ভূত সব ধরনের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচারেরে এখতিয়ার ছিল। এ আদালতের আপিল এখতিয়ার ছিল না তবে এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জেলা কাযী আদালতে আপিল করা যেত।

(খ) পরগনাহ কোতয়াল আদালত (Court of Kotwal)

এই আদালত ক্ষুদ্র প্রকৃতির ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করত। জেলা কাযীর আদালতে এখান থেকে আপিল করা যেত।

(গ) আমীন- ই- পারগনাহ (Amin- e- Parganah)

একজন আমীনের সভাপতিত্বে এ আদালত সকল রাজস্ব মোকদ্দমার বিচার করত। এর রায়ের বিরুদ্ধে আমল গুজারী কাছারীতে আপিল করা যেত।

গ্রাম আদালত (Village Courts)

প্রতিটি গ্রামে দু'ধরনের আদালতের কার্যক্রম চালু ছিলঃ একটি হল গ্রাম পঞ্চায়েত এবং আরেকটি হল জমিদার আদালত। একজন প্রধান ব্যক্তি ও পাঁচজন সদস্য নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হত। এটি স্থানীয় প্রকৃতির দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করত। পঞ্চায়েতের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল করা যেত না। মুঘল শাসনের শেষের দিকে ক্ষুদ্র প্রকৃতির দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচারের জন্য জমিদারের আদালতকে ক্ষমতা দেয়া হয়।

মুঘল শাসন ব্যবস্থায় অপরাধ ও শাস্তির বিধান (Crime and Punishment in Mughal administration)

মুঘল আমলে আদালতগুলো সুনির্দিষ্ট বিচার পদ্ধতি অনুসরণ করত। সে সময় দু'টি প্রধান মুসলিম সংহিতা দ্বারা বিচার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হত। এগুলো হল ফিকহ- ই- ফিরোজ- শাহী এবং ফতওয়া- ই- আলমগীরি। সাক্ষ্য বিভক্ত ছিল তিন শ্রেণিতে যথাঃ

(ক) দৃঢ় ভাবে সমর্থন করা;

(খ) কেবল একজন ব্যক্তির সত্যতা প্রতিপাদনকারী সাক্ষ্য; এবং

(গ) দোষ স্বীকারোক্তিসহ স্বীকারোক্তি। আদালত সর্বদা অন্যান্য সাক্ষ্যের চেয়ে দৃঢ় সমর্থনমূলক সাক্ষ্যকে প্রাধান্য দিত।

মুসলিম ফৌজদারী আইন ব্যাপকভাবে অপরাধকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করেছে। যথাঃ

(ক) সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে অপরাধ;

(খ) রাজার বিরুদ্ধে অপরাধ; এবং

(গ) ব্যক্তি সাধারণের বিরুদ্ধে অপরাধ।

হিন্দু আমলে প্রচলিত অর্ডিল বা চরিত্র পরীক্ষার মাধ্যমে বিচার পদ্ধতিকে মুসলিম আমলে নিষিদ্ধ করা হয়। এর পরিবর্তে মুসলিম আইনে তিন ধরনের শাস্তি পদ্ধতি প্রচলিত ছিলঃ

(ক) হাদ্দ; (নির্ধারিত শাস্তি) (খ) তা'যীর; (বিবেচনামূলক শাস্তি) এবং

(গ) কিসাস বা প্রতিশোধমূলক শাস্তি এবং দিয়াত বা রক্তমূল্য। এই বিষয়ে পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলিম বিচার ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ (Defects of Muslim Administration of Justice)

মধ্য যুগে ভারতে প্রচলিত মুসলিম শাসন ব্যবস্থা বিশেষ করে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় অসংখ্য ত্রুটি বিদ্যমান ছিল। বৃটিশরা ধীরে ধীরে শাসনভার হাতে নিলে মুসলিম ফৌজদারী আইনের উপর তাদের শিকারীদৃষ্টি পতিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস এই বিচার ব্যবস্থাকে সর্বাপেক্ষা বর্বর ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেন। তাদের মতে, মুসলিম শাসন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলি নিম্নরূপঃ

(১) মুসলিম বিচার ব্যবস্থা এই অর্থে ত্রুটিপূর্ণ ছিল যে, তখন নির্বাহী ও বিচার বিভাগের মধ্যে কোন পৃথকীকরণ ছিল না। সম্রাট সরকার প্রধান হিসেবে একই সঙ্গে ন্যায়বিচারের উৎস বলে বিবেচিত হতেন আবার শাসন ব্যবস্থার উপরও কর্তৃত্ব করতেন।

(২) বেশ কিছু ক্ষেত্রে মুসলিম ফৌজদারী আইন যথার্থ এবং সুনির্দিষ্ট ছিল না। প্রকৃতপক্ষে হেদায়া ও ফাতোয়া-ই-আলমগীরিতে বর্ণিত বিধানাবলী ছিল পরস্পর বিরোধী। মুসলিম জুরীদের মতদ্বৈধতার কারণে কাযী আইনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এবং নির্দিষ্ট ঘটনায় প্রযোজ্য আইনের বিধান প্রয়োগে অনেকখানি স্বাধীন ছিল ফলে আইনের ব্যাখ্যা নির্ভর করত কাযীর উপর।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) 'প্রাইভেট ল' এবং পাবলিক ল' এর মধ্যে মুসলিম ফৌজদারী আইন কোন পার্থক্য করতে পারেনি। ফৌজদারী আইনকে এখানে 'প্রাইভেট ল' এর শাখা মনে করা হত। কিন্তু মুসলিম ফৌজদারী আইন ব্যবস্থায় এই ধারণা পূর্ণতা পায়নি যে, অপরাধ ব্যক্তিকেই ক্ষতিগ্রস্থ করে না একই সঙ্গে সমাজকেও ক্ষতিগ্রস্থ করে।

(৪) মুসলিম ফৌজদারী আইন ব্যবস্থা ছিল অযৌক্তিকতায় পরিপূর্ণ। এখানে স্রষ্টার বিরুদ্ধে অপরাধ হল জঘন্য চরিত্রের কাজ। ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধকে ব্যক্তিগত প্রকৃতির মনে করা হত এবং এজন্য শাস্তি প্রদান করাকে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধিকার বলে গণ্য করা হত।

মুসলিম বিচার ব্যবস্থার এই ত্রুটিগুলোর পিছনে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থাই দায়ী ছিল। কোন সমাজ ব্যবস্থাই প্রথম থেকে সভ্য বা আধুনিক ছিল না; সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে বিচার ব্যবস্থারও বিকাশ ঘটতে থাকে। যে বৃটিশ জাতি মুসলিম বিচার ব্যবস্থাকে এরূপ কটাক্ষ করেছে তারাও ইতিহাসের এক পর্যায়ে এরূপ ত্রুটিপূর্ণ এবং সেকেলে করেনি। কুরআন বা হাদীসেও কোন নিষেধাজ্ঞা নেই যে মুসলিম বিচার ব্যবস্থাকে সময়ের পরিবর্তনের সাথে যথাযথ পরিবর্তন করা যাবে না। ইজমা' এবং কিয়াসের গুরুত্ব এখানেই নিহিত। সুতরাং তৎকালীন মধ্যযুগে ভারতে মুসলিম বিচার ব্যবস্থার যে সমালোচনা করা হয় তার জন্য তৎকালীন সমাজের প্রচলিত প্রথাই বেশীরভাগ দায়ী।[৩]

বৃটিশ যুগ (British Period)

প্রাচীন ভারতীয় আইনের আধুনিকায়নঃ (Modernisation of Ancient Indian law) প্রাচীন ভারতীয় আইনের আধুনিকায়ন ঘটে বৃটিশদের হাতে যারা বাণিজ্যিক কোম্পানি হিসেবে 'রয়েল চার্টারের' মাধ্যমে এদেশে আগমন করে। বৃটিশ ভারতে বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নের ধারাকে কয়েকটি স্তরে বা সময়ে ভাগ করা যেতে পারেঃ

(ক) ১৭২৬ সালের চার্টার পর্যন্ত প্রারম্ভিক বিচার ব্যবস্থা।

(খ) ১৭২৬ সালে চার্টার থেকে ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট পর্যন্ত বিচার ব্যবস্থা।

(গ) ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট থেকে ১৮৬১ সালের একীভূতকরণ পর্যন্ত; এবং

(ঘ) ১৮৬১ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত।

---

[৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯- ৩৮

প্রথম পর্যায় (First Period)

১৭২৬ সনের চার্টারের পূর্ব পর্যন্ত প্রারম্ভিক ব্যবস্থা

এই যুগে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় বৃটিশদের সম্পৃক্ততার সূচনা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, এ সময় কোম্পানি এদেশের বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে। ইস্ট- ইন্ডিয়া কোম্পানি ধীরে ধীরে মাদ্রাজ, বোম্বে কলিকাতায় তিনটি ফ্যাক্টরি বন্দোবস্তের (Settlement) দখল গ্রহণ করে। শুরুতে বাণিজ্যিক কেন্দ্র হলেও এসব বন্দোবস্ত পরবর্তীতে প্রেসিডেন্সি শহর হিসেবে পরিচিত হয় এবং এগুলোর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো মফস্বল হিসেবে পরিচিত হয়। ১৭২৬ সাল পর্যন্ত তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরে বিচার ব্যবস্থা ছিল বিশৃঙ্খল। স্থানীয় মুঘল প্রশাসনের সঙ্গে কোম্পানি বিচার ব্যবস্থায় অংশ নিতে থাকে। তিন প্রেসিডেন্সি শহরে বিচার ব্যবস্থায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চার্টারের মাধ্যমে পরিবর্তন আনা হলেও এগুলো ছিল ছোট খাট এবং প্রেসিডেন্সি শহর ভেদে পরিবর্তন ছিল ভিন্ন ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ ১৬৮৭ সালের চার্টারের অধীনে মাদ্রাজে প্রথম মেয়র আদালত স্থাপিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় (Second Period)

মেয়র আদালতের সময়কাল

১৭২৬ সনের চার্টার পরবর্তী সময় থেকে ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট পর্যন্ত বিচার ব্যবস্থা, এই যুগকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১৭২৬ সালের চার্টার থেকে ১৭৫৩ সালের চার্টার পর্যন্ত এবং ১৭৫৩ সালের চার্টার থেকে ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট পর্যন্ত। এই যুগের প্রথম অংশকে ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থায় বৃটিশ রাজতন্ত্রের হস্তক্ষেপের সূচনা করা হয়। কোম্পানিকে লেটার প্যাটেন্ট অনুমোদনের মাধ্যমে রাজা প্রথম জর্জ কর্তৃক ১৭২৬ সালের চার্টার প্রণয়নই ছিল ইন্ডিয়ায় ইংলিশ আইনের প্রবেশদ্বার স্বরূপ। ১৭২৬ সালের চার্টার প্রতিটি প্রেসিডেন্সি শহরের জন্য একটি কর্পোরেশন স্থাপন করে।

তৃতীয় পর্যায় (Third Period)

সুপ্রিম কোর্টের সময়কাল

১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট পরবর্তী সময় থেকে ১৮৬১ সালের একীভূতকরণ পর্যন্ত বিচার ব্যবস্থা। যদিও ১৭৫৩ সালের চার্টার প্রণীত হয়েছিল ১৭২৬ সালের চার্টারের ত্রুটিসমূহ দূর করার জন্য তথাপি মেয়র আদালত কিছু কিছু সুদূরপ্রসারি ত্রুটির সম্মুখীন হচ্ছিল। ১৭৭২ সালে হাউজ অব কমন্স কোম্পানির কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য একটি গোপন কমিটি (Secret Committee) গঠন করে। এই কমিটি এই মর্মে রিপোর্ট প্রদান করে যে, তৎকালীন মেয়র আদালত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা একটি অত্যাচারের যন্ত্রে পরিণত হয়ে

গিয়েছিল। কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে হাউজ অব কমন্সের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ হয়। এই অ্যাক্টটি রাজাকে কলকাতায় একটি সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের ক্ষমতা দেয়। ফলে রাজা ১৭৭৪ সালে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের জন্য একটি চার্টার জারি করেন। পরবর্তীতে ১৮০১ সালে মাদ্রাজে এবং ১৮২৪ সালে বোম্বেতে মেয়র কোর্ট বিলুপ্ত হয়ে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিস্থাপিত হয়।

চতুর্থ পর্যায় (Fourth Period)

একীভূতকরণের সময়কাল

১৮৬১ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত (সরাসরি বৃটিশ শাসনাধীনে বিচার বিভাগীয় সংস্কার) এই সময়কে দু'টি উপশিরোনামে ভাগ করা যেতে পারে

এক. ১৮৬১ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত (হাই কোর্টের যুগ), এবং

দুই. ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত (হাই কোর্ট ও ফেডারেল কোর্টের যুগ)।

সুপ্রিম কোর্ট ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে চরম দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ মাত্র সাত বছরের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট সকলের নিকট অপ্রিয় হয়ে উঠে। শুধুমাত্র গভর্নর জেনারেল নয় বাংলার জনগণও ইংল্যান্ডের রাজার কাছে আরজির আকারে অভিযোগ জানায়। ফলে ১৭৮০ সালে বাংলার বিচার ব্যবস্থার প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করার জন্য সিলেক্ট কমিটি নিয়োগ করা হয়। এই কমিটির রিপোর্ট অনুসারে ১৭৮১ সালে অ্যাক্ট অব সেটেলমেন্ট পাস করার প্রক্রিয়া চলে। এই অ্যাক্টটি সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা কাটছাঁট করে কাউন্সিলের হাতে প্রদান করতে পরামর্শ দেয়। ফলে সুপ্রিম রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় ও কোম্পানি কোর্টের ক্ষেত্রে তার ক্ষমতা হারায়। এ ব্যবস্থার ফলে নির্বাহী ও বিচার বিভাগের মধ্যকার দ্বন্দ্ব দূরীভূত হলেও সর্বোর্চ্চ আদালত হিসেবে এবং কোর্ট অব রেকর্ড হিসেবে এর নির্বাহী বিভাগের উপর আর কর্তৃত্ব না থাকায় এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, সুপ্রিম কোর্ট Constructive inhabitancy ব্যাখ্যা করে প্রেসিডেন্সি শহরের বাইরে বহু লোকের উপর এখতিয়ার খাটায়। আবার মফস্বল কোর্টেরও এসব ব্যক্তিদের উপর এখতিয়ার রয়েছে। ফলে এখতিয়ার এর প্রশ্ন নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট এবং মফস্বল আদালতের মাঝে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে।

তৃতীয়ত, এখতিয়ারের প্রশ্নে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়ার কারণে কখনো কখনো সুপ্রিম কোর্ট ও মফস্বল কোর্ট একই সাথে একই বিষয়ের উপর বিপরীত ডিক্রি প্রদান করত।

চতুর্থত, ডিক্রি জারি ও কার্যকর করার ক্ষেত্রেও গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। সুপ্রিম কোর্ট মফস্বল অঞ্চলে তার দেয়া ডিক্রি জারি ও কার্যকর করার চেষ্টা করত যদিও প্রেসিডেন্সি শহরের বাইরে তার এরূপ ক্ষমতা ছিল না।

অন্যদিকে মফস্বল আদালত প্রেসিডেন্সি শহরে তার ডিক্রি কার্যকর করতে পারত না। কার্যকর করতে হলে সুপ্রিম কোর্ট পৃথক একটি মোকদ্দমা দায়ের করতে হত। এসব অসন্তোষজনক কিছু ঘটনার পটভূমিতে ধীরে ধীরে এই প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি প্রতিষ্ঠান অঙ্গীভূত করা বা সমন্বিত করার বিষয়ে মতামত দৃঢ় হতে থাকে। ১৮৫৩ সালে এই দু'ধরনের আদালতকে একীভূত করার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়। এ সময় ইন্ডিয়ান প্রথম ল' কমিশন গঠিত হয় এবং সর্বভারতীয় আইন সভার জন্ম হয় যার প্রণীত আইন রয়েল চার্টার কিংবা কোম্পানি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সকল আদালতের উপর বাধ্যতামূলক করা হয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল দ্বিতীয় আইন কমিশন নিয়োগ যার উপর দায়িত্ব ছিল সদর আদালত ও সুপ্রিম কোর্টকে যুক্ত করার পদ্ধতি প্রণয়ন করা এবং সকল আদালতের জন্য কার্যবিধি প্রস্তুত করা। তৃতীয় পদক্ষেপ নেয়া হয় ১৮৫৮ সালে যখন ইষ্ট- ইন্ডিয়া কোম্পানি বিলুপ্ত করে ইন্ডিয়ার শাসনব্যবস্থা বৃটিশ সরকারের হাতে যায়। এ ঘটনা একীভূতকরণের বিষয়কে ত্বরান্বিত করে।

শেষ পদক্ষেপ হল তিনটি একক সংহিতার বিধিবদ্ধকরণ (দেওয়ানী কার্যবিধি, ফৌজদারী কার্যবিধি এবং দন্ডবিধি)। সাধারণ আইন কাঠামোর সমন্বয়ের পর দু'টি বিচার ব্যবস্থার একীভূতকরণ অনিবার্য হয়ে উঠে এবং বৃটিশ পার্লামেন্ট ১৮৬১ সালে ইন্ডিয়ান হাই কোর্ট'স অ্যাক্ট পাসের মাধ্যমে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সুপ্রিম কোর্ট ও সকল সদর আদালতকে যুক্ত করে তিন প্রেসিডেন্সি শহরে তিনটি হাই কোর্ট স্থাপিত হয়। কলকাতার সনদে ১৮৬২ সালে হাই কোর্টের বিধান রাখা হয় এবং ঐ বছরের ২ জুলাই থেকে হাই কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তান আমল (Pakistan Period)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টকে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালত করা হয় এবং প্রদেশগুলিতে তখনও হাই কোর্ট একইরূপে বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে সংবিধান গৃহীত হলেও বিচার বিভাগীয় গঠন প্রকৃতি ১৯৫৬ সালের সংবিধানের অনুরূপভাবে তৈরী করা হয়।

বাংলাদেশ আমল (Bangladesh Period)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের বর্তমান আদালত ব্যবস্থার অবকাঠামোর ভিত্তি হল দু'টি মৌলিক আইন Civil Courts Act, 1887 এবং Criminal Procedure Code, 1898 । এ দু'টি ছাড়াও বাংলাদেশের সংবিধান সুপ্রিম কোর্টের গঠন প্রকৃতির জন্য মৌলিক আইন। এ ছাড়া কিছু কিছু বিশেষ আইন রয়েছে যা কতিপয় বিশেষ বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালের গঠন প্রকৃতির ভিত্তি। উদাহরণস্বরূপ, শ্রম আদালত, Jevenile Court, পারিবারিক আদালত ইত্যাদি। বুঝার সুবিধার্থে বাংলাদেশের আদালত ব্যবস্থার প্রকৃতি ও কার্যক্রমকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

১। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট;

২। সাধারণ স্তরবিন্যাসে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসমূহ; এবং

৩। ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আদালত ব্যবস্থা।[৪]

---

৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে সুপ্রিম কোর্ট এবং সাধারণ স্তরবিন্যাসে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসমূহের একটি সম্মিলিত ছক দেয়া হলো।[৫]

এক নজরে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা

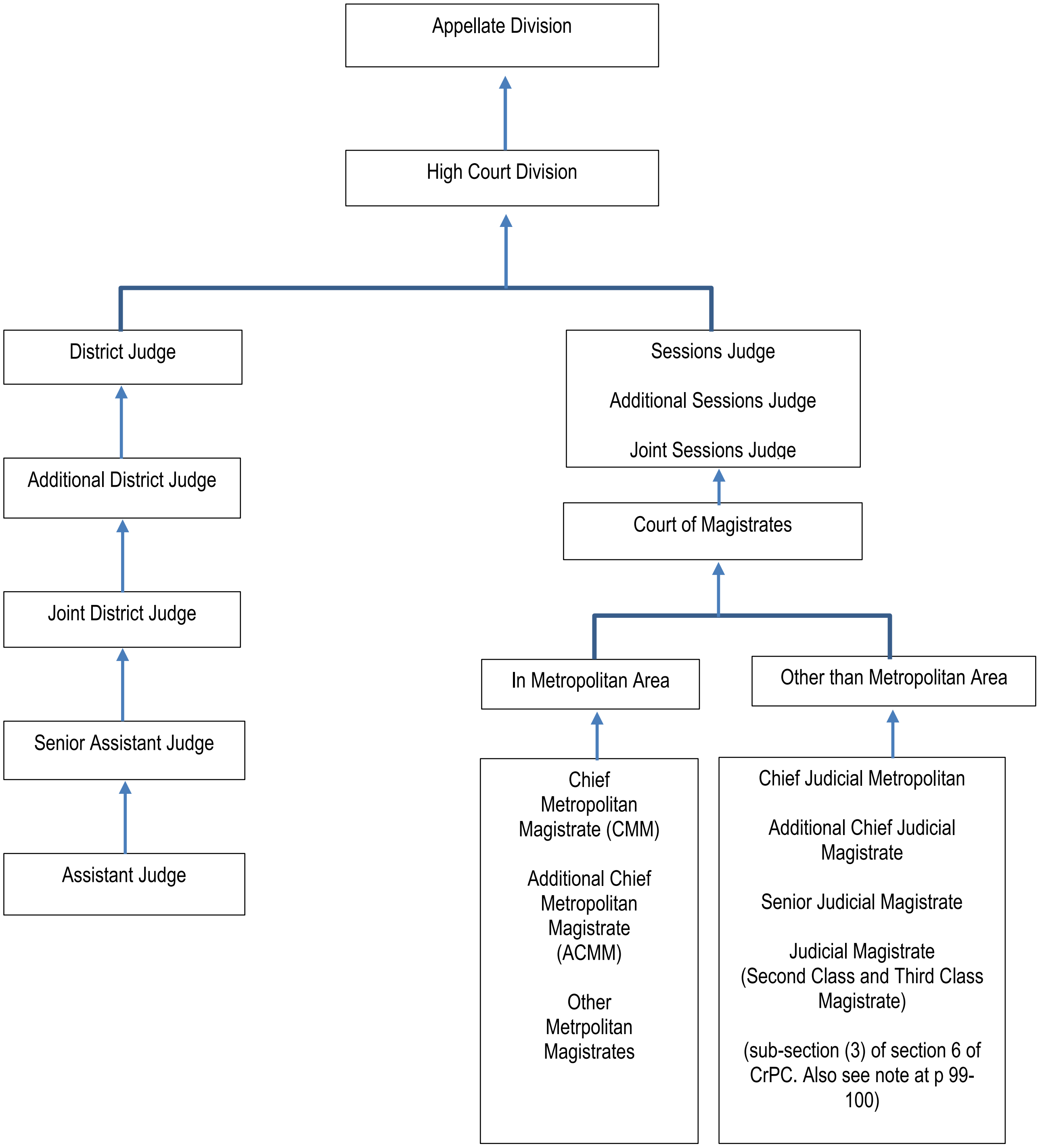

---

[৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪

উপরোল্লিখিত আদালতগুলো ছাড়াও বিশেষ প্রকৃতির কিছু ট্রাইব্যুনাল ও আদালত রয়েছে যেমন, শ্রম আদালত, জুভেনাইল কোর্ট, স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

সংবিধানের ১ নং অনুচ্ছেদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পাকিস্তান বা ভারতের মতো ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র না হওয়ায় ওই সকল দেশের মত বাংলাদেশে পৃথক সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট রাখার প্রয়োজনীয়তা সংবিধান প্রণেতারা সমীচীন মনে করেননি। সে জন্যে যুক্তরাজ্যের আদলে বাংলাদেশে আপিল বিভাগে ও হাই কোর্ট বিভাগ নিয়ে 'বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট' নামে একটি সর্বোচ্চ আদালত গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং উভয় বিভাগের বিচারপতিদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত। প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারপতিগণ কেবল ওই বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ হাই কোর্ট বিভাগে অংশ গ্রহণ করেন। সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করেন।[৬] প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।[৭]

১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পূর্বে সংবিধানে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ প্রদানের বিধান ছিল। ওই বিধান চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা বাতিল করা হলেও প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমেই সাধারণত সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ করা অব্যাহত থাকে। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর ফলে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ভিন্ন অন্য সকল কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে করতে হয় হেতু, কার্যতঃ প্রধানমন্ত্রীই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন। ১৯৯৪ সালে প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ ব্যতীত কতিপয় বিচারপতিকে নিয়োগ প্রদান করায় প্রধান বিচারপতি তাদের শপথদানে অস্বীকার করলে প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে আবার বিচারপতিদের নিয়োগ করা হতে থাকে। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি স্বীয় বিবেচনায় প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ দান করেন। নিযুক্তির পর বিচারপতিগণ গুরুতর অসদাচরণ বা শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারণে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অপসারিত না হলে

---

[৬] *বাংলাদেশের সংবিধান,* অনুচ্ছেদ ৯৪

[৭] *প্রাগুক্ত,* অনুচ্ছেদ ৯৫ (১)

৬৫ বৎসর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকতেন। সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর দ্বারা বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬৭ বছর করা হয়েছে।[৮]

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পূর্বে প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যুন দুই তৃতীয়াংশের গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাব ভিন্ন রাষ্ট্রপতি কোন বিচারককে অপসারণ করতে পারতেন না। সামরিক শাসনের সময় সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন বিচারপতিকে অপসারণ করা হলেও সংবিধানের উপরোক্ত বিধান অনুযায়ী অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে আজ পর্যন্ত একজন অতিরিক্ত বিচারপতি ভিন্ন অন্য কোন বিচারপতিকে অপসারণ করা হয়নি। সংবিধানের ৯৫ (২) অনুচ্ছেদে বিচারপতির পদে নিয়োগের যোগ্যতা ও ৯৯ অনুচ্ছেদে অবসর গ্রহণের পর বিচারপতিদের আইন পেশা ও চাকুরির অক্ষমতা সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

বাংলাদেশের রাজধানীতে অর্থাৎ ঢাকায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকলেও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে নে বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশনের ব্যবস্থা করতে পারেন।[৯] সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর দ্বারা উপরোক্ত বিধান বাতিল করে হাইকোর্ট বিভাগের রাজধানীতে স্থায়ী আসনে বসা ব্যতীত বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর ও সিলেটে আরো ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ গঠন করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ আনোয়ার হোসেন বনাম বাংলাদেশ মামলার রায়ে অষ্টম সংশোধনীর দ্বারা সংশোধিত সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদ বেআইনী ঘোষণা করে সংশোধনপূর্ব ১০০ অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করেন।[১০] উল্লেখ্য যে, ১৯৮২ সালে ঢাকার বাইরে তিনটি এবং   পরে আরো তিনটি মোট ছয়টি হাইকোর্ট বেঞ্চ গঠিত হয়েছিল।[১১]

হাই কোর্ট বিভাগ

সংবিধানের ১০১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা ও এখতিয়ারের উৎস দু'টি সংবিধান এবং সাধারণ আইন। সুতরাং হাই কোর্ট বিভাগের এখতিয়ারকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণ এখতিয়ার এবং সাংবিধানিক এখতিয়ার।

---

৮ *প্রাগুক্ত,* অনুচ্ছেদ ৯৬

৯ *প্রাগুক্ত,* অনুচ্ছেদ ১০০

১০ ১৯৮৯ বি. এল. ডি (বিশেষ সংখ্যা), পৃ. ১- ৪১; ডি. এল. আর (এ. ডি), পৃ. ১৬৫

১১ বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন, *কাজী এবাদুল হক,* বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশঃ পৌষ ১৪০৪/ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ২৪১- ৪২

সাধারণ এখতিয়ার

দেশের সাধারণ আইনসমূহ হাই কোর্ট বিভাগকে যে এখতিয়ার দিয়ে থাকে তাকে হাই কোর্ট বিভাগের সাধারণ এখতিয়ার বলে। সাধারণ এখতিয়ার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এগুলো নিম্নরূপঃ

১. আদি এখতিয়ার (Original Jurisdiction)

আদি এখতিয়ার বলতে হাই কোর্ট বিভাগের সেই ক্ষমতাকে বুঝায় যে ক্ষমতার বলে হাই কোর্ট বিভাগ প্রাথমিকভাবেই (as court of first instance) মামলা গ্রহণ করতে পারে। কোন কোন বিষয়ের উপর হাই কোর্ট বিভাগের আদি এখতিয়ার থাকবে তা নির্ভর করে সংসদ কর্তৃক পাশকৃত সাধারণ আইনের উপর। সংসদ যদি কোন আইন প্রণয়ন করে বলে দেয় যে, নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের মামলা প্রথমেই হাই কোর্ট বিভাগে করতে হবে, ফলে উক্ত বিষয়ে হাই কোর্ট বিভাগের আদি এখতিয়ার থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, কোম্পানি আইন ১৯৯৪, এডমিরালটি আইন ১৮৬১, ব্যাংকিং কোম্পানিজ অধ্যাদেশ, ১৯৬২ ইত্যাদি আইনে হাই কোর্ট বিভাগে আদি এখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

২. আপিল এখতিয়ার (Appellate Jurisdiction)

হাই কোর্ট বিভাগের এখতিয়ার দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার হতে পারে। সংসদ যে কোন আইনে হাই কোর্ট বিভাগের উপর আপিল এখতিয়ার দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ফৌজদারী কার্যবিধি ও দেওয়ানী কার্যবিধি হাই কোর্ট বিভাগকে আপিল এখতিয়ার দিয়েছে (দেওয়ানী কার্যবিধির Part V11)।

৩. রিভিশনাল এখতিয়ার (Revisional Jurisdiction)

যে এখতিয়ার বলে হাই কোর্ট বিভাগ তার অধঃস্তন আদালতসমূহের রায় পরীক্ষা করতে পারে তা হল রিভিশনাল এখতিয়ার। এ ধরনের এখতিয়ারের ভিত্তি হল সাধারণ আইন। উদাহরণস্বরূপ, দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারায় হাই কোর্ট বিভাগকে উহার অধঃস্তন আদালতের উপর রিভিশনাল এখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

৪. রেফারেন্স এখতিয়ার (Reference Jurisdiction)

অধঃস্তন আদালত কর্তৃক পাঠানো কোন মামলার আইনগত প্রশ্ন হাই কোর্ট বিভাগ যে এখতিয়ার বলে পরীক্ষা করতে পারে এবং তার উপর মতামত দিতে পারে তাকে হাই কোর্ট বিভাগের রেফারেন্স এখতিয়ার বলে। এরূপ এখতিয়ারের ভিত্তি সাধারণ আইন। উদাহরণস্বরূপ, দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৩ ধারায় হাই কোর্ট বিভাগকে রেফারেন্স এখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

হাই কোর্ট বিভাগের এখতিয়ারকে বিভিন্ন আইনের আলোকে এভাবে অনেক করে লেখা যায়। কিন্তু এই এখতিয়ারকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। কারণ সংবিধানের ১০১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, যে কোন আইন হাই কোর্ট বিভাগকে যেরূপ এখতিয়ার দিবে সেরূপ এখতিয়ার হাই কোর্ট বিভাগের থাকবে।

হাই কোর্ট বিভাগের সাংবিধানিক এখতিয়ার

এবার আমরা হাই কোর্ট বিভাগের সাংবিধানিক এখতিয়ার ও ক্ষমতাসমূহ আলোচনা করব। স্বয়ং সংবিধান হাই কোর্ট বিভাগকে নিম্নলিখিত তিন ধরনের এখতিয়ার দিয়েছেঃ

ক. রিট জারির এখতিয়ার (Writ Jurisdiction)

সংবিধান হাই কোর্ট বিভাগকে শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রে আদি এখতিয়ার দিয়েছে। সেটি হল রিট জারির এখতিয়ার। এ এখতিয়ারের ভিত্তি হল সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ। যে এখতিয়ার বলে হাই কোর্ট বিভাগ মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে তা বলবত করতে পারে এবং বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনাকে কার্যকর করতে পারে তাকে হাই কোর্ট বিভাগের রিট এখতিয়ার বলা হয়। কারোর মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে সে সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত অধিকার বলে সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য রিট পিটিশন দায়ের করতে পারে এবং হাই কোর্ট বিভাগ ১০২ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য কতিপয় আদেশ জারি করতে পারে।

খ. হাই কোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা (Jurisdiction as to uperintendence and Control)

সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছদে বলা হয়েছে যে, হাই কোর্ট বিভাগ তার অধঃস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রন করতে পারবে। তবে তত্ত্বাবধানের একটি শর্ত হল যে, নিম্ন আদালত বা ট্রাইব্যুনালকে অবশ্যই হাই কোর্ট বিভাগের অধঃস্তন (subordinate) হতে হবে। একটি নিম্ন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল হাই কোর্ট বিভাগের অধঃস্তন হবে যদি উক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনাল হাই কোর্ট বিভাগের হয়।
(১) আপিল এখতিয়ার, অথবা

(২) রিভিশনাল এখতিয়ারের আওতায় থাকে (must be subject of High Court Divisions appellate or revision jurisdiction) হাই কোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রনমূলক ক্ষমতা একটি ব্যাপক বিষয়। ইহাতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেঃ

Dhaka University Institutional Repository

(১) হাই কোর্ট বিভাগ অধঃস্তন আদালত বা ট্রাইব্যুনালসমূহকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে।

(২) অধঃস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের কর্মচারীবৃন্দ কিভাবে খাতাপত্র এবং হিসাবপত্র রক্ষা করবে সে বিষয়ে নির্দেশ দান করতে পারবে।

(৩) অধঃস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালগুলো আইনানুযায়ী কাজ করেছে কি না, তারা তাদের সীমালঙ্ঘন করছে কি না, সীমা অনুযায়ী (within the authority) তারা কাজ করছে কি না তা তদারকি করতে পারবে।

(৪) অধঃস্তন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের প্রশাসনিক বা বিচার বিভাগীয় যে কোন আদেশ (order) হাই কোর্ট বিভাগ পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারে।

গ. মামলা হস্তান্তরের ক্ষমতা (Jurisdiction as to Transfer of Cases)

১১০ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে হাই কোর্ট বিভাগ তার অধঃস্তন কোন আদালত (ট্রাইব্যুনাল নয়) থেকে মামলা হস্তান্তর করে নিজের কাছে আনতে পারে। কিন্তু শর্ত হল যে, হাই কোর্ট বিভাগকে এ মর্মে সন্তুষ্ট হতে হবে যে, মামলাটিতে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আইনের কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে; অথবা মামলাটি এমন যে উহাতে জনগুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় জড়িত আছে। এ মর্মে হাই কোর্ট বিভাগ সন্তুষ্ট হলে উক্ত অধঃস্তন আদালত থেকে হাই কোর্ট বিভাগ মামলাটি প্রত্যাহার করে নিতে পারে এবং প্রত্যাহার করে নিম্নলিখিত তিনটি বৈকল্পিক কাজ করতে পারে।

১। হাই কোর্ট বিভাগ স্বয়ং মামলাটি বিচার ও মীমাংসা করতে পারে; অথবা

২। উক্ত আইনের প্রশ্নটি হাই কোর্ট বিভাগ নিস্পত্তি করে নিস্পত্তিকৃত রায়ের নকল সহ যে আদালত থেকে মামলাটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল সে আদালতে পাঠিয়ে দিতে পারে এবং আদালত তা প্রাপ্ত হওয়ার পর হাই কোর্ট বিভাগের রায়ের সাথে সঙ্গতি রেখে মামলাটি মীমাংসা করবে; অথবা

৩। উক্ত আইনের প্রশ্নটি হাই কোর্ট বিভাগ নিস্পত্তি করে নিস্পত্তিকৃত রায়ের নকলসহ অথবা যে কোন অধঃস্তন আদালতে মীমাংসার জন্য পাঠাতে পারে এবং তা প্রাপ্ত হওয়ার পর উক্ত আদালত হাই কোর্ট বিভাগের রায়ের সাথে সঙ্গতি রেখে মামলাটি মীমাংসা করবে।[১২]

[১২] *প্রাগুক্ত*, ৬৫- ৭০

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ানী আদালতগুলোর পাশাপাশি দেশে বেশ কিছু ট্রাইব্যুনাল এবং বিশেষ আদালত রয়েছে। এগুলো রাষ্ট্র ও নাগরিক এবং নাগরিক ও নাগরিকের মধ্যকার বহুবিধ বিরোধের মীমাংসা করে থাকে। এই পর্যায়ে প্রচলিত ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এবং বিশেষ আদালত নিয়ে আলোচনা করব।

ট্রাইব্যুনালসমূহ (Tribunals)

বিংশ শতাব্দীতে কমনওয়েলথ দেশসমূহে বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নের একটি বৈশিষ্ট্য হল ট্রাইব্যুনাল ব্যবস্থার দ্রুত বিস্তার। এসব ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা ও গুরুত্ব এতটাই তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়ে গিয়েছে যে, বর্তমানে তা আর সাধারণ আদলতের অনুষঙ্গ বলে মনে করা হচ্ছে না বরং ট্রাইব্যুনালসমূহ প্রচলিত আইন প্রক্রিয়ার অনিবার্য অংশ হয়ে উঠেছে। শধু রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যকার বিরোধের মীমাংসা করে বলে পূর্বে প্রফেসর ডাইসী এরকম স্বতন্ত্র বিচার ব্যবস্থার (Droit administratiff) ধারণা বাতিল করে দেন। এ ধরনের মতবাদ বেশী দিন টিকেনি কেননা বর্তমানে বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল ব্যাপক কার্যক্রম সম্পাদন করছে। প্রশ্ন উঠতে পারে কেন ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে? আসলে এ ব্যবস্থা গড়ে উঠার পিছনে কারণ হল প্রচলিত কমন ল’ আদালতসমূহের আনুষ্ঠানিকতা, গতিহীনতা, আইনের কিছু ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যক্তির অভাব, ব্যয়বাহুল্য প্রভৃতি অসুবিধা আর সামাজিক ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদ্ভব হওয়ায় সাথে সাথে কল্যাণমূলক আইন প্রণয়নের চিন্তাভাবনা ইত্যাদি। অন্যদিকে ট্রাইব্যুনালগুলোর অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি, তুলনামূলকভাবে দ্রুত মামলা শ্রবণের ক্ষমতা, সহজলভ্যতা, বিশেষ বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞের উপস্থিতি প্রভৃতি সুবিধা এ ধরনের ব্যবস্থা গড়ে উঠার বিষয়কে প্রভাবিত করেছে। এ ছাড়া ট্রাইব্যুনালগুলোতে বিচার পদ্ধতির অনানুষ্ঠানিকতা, সাক্ষ্য আইনের কঠোর পদ্ধতির অনুপস্থিতি দেখা যায়। যে কোন ব্যক্তি এ ধরনের আদালতে হাজির হয়ে মামলা পরিচালনা করতে পারে।

আদালত এবং ট্রাইব্যুনালের মধ্যে পার্থক্য (Difference between a Court and a Tribunal)

আদালত এবং ট্রাইব্যুনালের মধ্যে পার্থক্য অনেক সময় অস্পষ্ট। প্রত্যেকটি আদালতই ট্রাইব্যুনাল। কিন্তু প্রত্যেকটি ট্রাইব্যুনাল যে আদালতের সংজ্ঞায় পড়বে তেমনটি বলা যায় না। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত নামকরণ সুস্পষ্ট কোন নির্দেশিকা নয়। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাজ্যের Employment Appeal Tribunal একটি আদালত অথচ Local Valuation Court একটি ট্রাইব্যুনাল। Attorney General Vs. BBc [1980] 3 All ER মোকদ্দমায় House of Lords অভিমত দেয় যে Local Valuation Court কোন অধঃস্তন আদালত (Inferior court) নয় যদিও এটি একটি আদালত নামে পরিচিত। বস্তুত এর কার্যাবলীর ধরন অনেকটা

বিচারের চেয়ে প্রশাসনিক সংস্থার মত। যদিও কোন কোন সময় যুক্তি দেখানো হয় যে, ট্রাইব্যুনালগুলো প্রশাসনিক প্রকৃতির কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি এমন নয়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কোর্ট ও ট্রাইব্যুনালের মধ্যে পার্থক্য বহুলাংশে বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা নির্দিষ্ট থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন কারণ প্রকৃতপক্ষে ট্রাইব্যুনালগুলো কোর্টের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। কোন কোন সময় ট্রাইব্যুনালকে আধা বিচার বিভাগীয় (Quasi-Judicial) কর্তৃপক্ষ হিসেবে যুক্তি দেখানো হয়। অপর পক্ষে কোর্টকে বলা হয় প্রকৃত বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এটা কেবল সংশ্লিষ্ট প্রণীত আইন দ্বারা নামকরণের দিক থেকে সত্য। যদি কোন বিশেষ আইন একে আধা বিচার বিভাগীয় হিসাবে সৃষ্টি করে তবে এটা আধা বিচার বিভাগীয় সংস্থাতেই রূপান্তরিত হবে। বাংলাদেশের অধিকাংশ ট্রাইব্যুনাল, VAT ট্রাইব্যুনাল প্রভৃতি বিশেষ আইনের অধীনে গঠিত আধা বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। সেহেতু এগুলো বিচার বিভাগীয় এবং বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন সদস্য নিয়ে গঠিত। কিন্তু কার্যাবলী ও এখতিয়ারের দিক দিয়ে এগুলোর প্রকৃতি বিচার বিভাগীয়। এটা এজন্য যে, উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে পূর্ণ শুনানী অনুষ্ঠিত হয়; সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে বা আপিল অধিক্ষেত্রের অধীনে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনার (Judicial review) বিধান সর্বক্ষেত্রে পরিলক্ষিত। তাছাড়া অধিকাংশ আপিল ট্রাইব্যুনালকে Contempt এর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ এবং সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত Advisory Board কে ট্রাইব্যুনালের সকল মর্যাদা দেয়া হয়েছে যদিও বাস্তবিক অর্থে একে ট্রাইব্যুনাল বলা হয় না। অপর পক্ষে, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ ক্ষমতা আইনের অধীনে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নামকরণের দিক থেকে ট্রাইব্যুনাল কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটি সুপ্রিম কোর্টের অধীন এবং সাধারণ বিচার পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বিধিমালা (১৯৮২) এর ৭ নং বিধি অনুযায়ী যতদূর সম্ভব ট্রাইব্যুনালগুলো ডিক্রি সহ প্রায় কার্যকরণের পদ্ধতির ক্ষেত্রে CPC এর বিধানসমূহের অবশ্যই অনুসরণ করবে। অথচ CPC র' এই বিধান একটি দীর্ঘ অধ্যায় যেমন ঝামেলাপূর্ণ, বিরক্তিকর প্রক্রিয়া যা ডিক্রিধারীর জন্য খুবই ব্যয়বহুল। সংক্ষিপ্ত এবং সহজ পদ্ধতিতে বিচারের পর তা বাস্তবায়নের জন্য এরূপ দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টির কোন যুক্তি থাকতে পারে না। শুধু তাই নয় অধিকাংশ ট্রাইব্যুনালই এ ধরনের অসংখ্য অমীমাংসিত মোকদ্দমার চাপে জর্জরিত।

বিভিন্ন ধরনের ট্রাইব্যুনাল (Different Types of Tribunal)

ট্রাইব্যুনালগুলো বিধিবদ্ধ (Statutory) এবং সাধারণ (Domestic) এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত যদিও এগুলো বিভিন্ন সংহিতা দ্বারা সৃষ্টি হয়। এই শ্রেণি বিভাগ নির্ভর করে মূলতঃ তারা যেসব বিষয়বস্তুর সিদ্ধান্ত দেয় তার উপর ভিত্তি করে। বিধিবদ্ধ ট্রাইব্যুনালগুলো জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন ট্যাক্স আপিল ট্রাইব্যুনাল রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে ট্যাক্স সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করবে, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সরকার ও তার কর্মচারীর মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োগ সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা করে। অন্যদিকে কতগুলো ট্রাইব্যুনাল আছে যেগুলো জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না, বরং ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয় নিস্পত্তি করে থাকে। এ জাতীয় ট্রাইব্যুনালকে সাধারণ ট্রাইইব্যুনাল (Domestic Tribunal) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, পেশাজীবী সংগঠনগুলোর শৃঙ্খলা কমিটি যেমন বার কাউন্সিল, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন, ট্রেড ইউনিয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ইত্যাদি।[১৩]

[১৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩-১৫

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে বিচার ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও বিচার ব্যবস্থার পটভূমি

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বৃটিশ পার্লামেন্টের ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের বিধান অনুযায়ী ভারতীয় উপমহাদেশ পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। বৃটিশ আমলের বাংলা প্রদেশের পূর্বাংশের জেলাগুলো পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়। ওই আইনের ৯ নং ধারার বিধান অনুযায়ী প্রণীত ১৯৪৭ সালের হাইকোর্ট (বেঙ্গল) অর্ডার দ্বারা ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় যা ঢাকা হাই কোর্ট নামে পরিচিত ছিল। নব প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্ট পূর্ববঙ্গ, পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশে কলকাতা হাই কোর্টের যাবতীয় আদি ও আপিল ক্ষমতা পরিচালনা করার অধিকারী হয়।[১৪] কলকাতা হাই কোর্টের স্থায়ী বিচারপতি জনাব আকরাম ও জনাব ওরমণ্ড, অতিরিক্ত বিচারপতি জনাব টি এইচ, এলিস ও জনাব আমির উদ্দিন আহমেদ ও অস্থায়ী বিচারপতি জনাব আমিন আহমেদকে নিয়ে তখন পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্ট গঠিত হয়েছিল।[১৫]

পূর্ব বঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তান ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিধান অনুযায়ী পাকিস্তানের অন্যতম প্রদেশ হিসেবে শাসিত হতে থাকে। বৃটিশ শাসনের অবসান হলেও দেশে বিচার ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বৃটিশ প্রতিষ্ঠিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতগুলো পূর্ব বঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানের মহকুমা ও জেলাগুলোতে চালু থাকে। ওই সকল অধঃস্তন আদালতগুলো নব প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্টের অধীনস্থ হয়। বৃটিশ আমলের ১৮৮৭ সালের দেওয়ানী আদালত আইন, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি ও ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির বিধান অনুযায়ী মহকুমা ও জেলা আদালতগুলোর গঠন ও এখতিয়ার নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। তাছাড়া বৃটিশ আমলের যাবতীয় আইন সামান্য সংশোধিত আকারে দেশে চালু থাকে। ১৯৫০ সালের ফেডারেল কোর্ট (এনলার্জমেন্ট অব জুরিসডিকশন) অ্যাক্ট এবং এই সালের প্রিভিকাউন্সিল (এবলিশন অব জুরিসডিকশন) অ্যাক্ট এর বিধান অনুসারে ১৯৪৭ সালের ফেডারেল কোর্ট অর্ডার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ফেডারেল কোর্টে, ঢাকা হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে, বিলেতের প্রিভিকাউন্সিলের পরিবর্তে আপিল দায়ের করার বিধান করা হয়েছিল।[১৬]

---

[১৪] বদরুল হায়দার চৌধুরী, এভ্যুলিউশন অব সুপ্রিম কোর্ট অব বাংলাদেশ, পৃ. ৫

[১৫] *১৯৪৭ সালের হাই কোর্ট রিপোর্ট, পৃ. ১*

[১৬] মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারি, *লিগ্যাল সিস্টেম অব বাংলাদেশ,* ঢাকা- ১৯৯১, পৃ. ৮

১৯৫৬ সালে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধান চালু হলে ওই সংবিধানের বিধান অনুযায়ী পাকিস্তান ফেডারেল কোর্টের স্থলে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্ট সহ সব প্রাদেশিক হাই কোর্ট পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের অধীনে ন্যস্ত হয়। ওই সংবিধানে সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্টকে সাবেক কলকাতা সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্টের মত সারা দেশের এলাকায় রিট এখতিয়ার পরিচালনা করার ক্ষমতা দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৫৪ সালে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন সংশোধন করে নব সংযোজিত ২২৩ ক ধারার বিধান অনুযায়ী পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়ার পূর্ব থেকেই হাই কোর্টকে রিট এখতিয়ার পরিচালনার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই সংশোধনী আইনটি পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের সম্মতি লাভ না করায় তমিজুদ্দিন খানের মামলায় সংশোধনী আইনটি পাকিস্তান ফেডারেল কোর্ট বেআইনি ঘোষণা করেছিল।[১৭]

তখন মহকুমা ও জেলার অধঃস্তন আদালতগুলো পূর্বের মত হাই কোর্টের অধীনস্থ ছিল। বৃটিশ শাসনামলে দায়রা আদালতে জুরীর মতামত নিয়ে ফৌজদারী মামলা বিচার করার যে পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হওয়ার পর ২২-৬-১৯৫৯ তারিখ থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে দায়রা বিচারে জুরী পদ্ধতি বাতিল করা হয়। তারপর থেকে জুরীর পরিবর্তে দায়রা আদালতে এসেসরদের সাহায্যে ফৌজদারী মামলা বিচার করা হতো। জুরির মতামত যেমন বিচারকের উপর বাধ্যকর ছিল এসেসরদের মতামত তেমন বাধ্যকর ছিল না। ১-৭-১৮৭৯ তারিখ থেকে ১৯৭৮ সালের আইন সংস্কার অধ্যাদেশের বিধান কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এসেসরদের মতামত নিয়ে দায়রা মামলা বিচার করার বিধান ছিল। উক্ত অধ্যাদেশ দ্বারা দায়রা আদালতে বিচারের জন্যে আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ ফৌজদারী কার্যবিধির ১৮ নং পরিচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তদন্ত করার বিধান সহ দায়রা আদালতে এসেসরদের সাহায্যে ফৌজদারী মামলা বিচার করার বিধান বাতিল করা হয়েছিল।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন চালু হলে ১৯৬৫ সালের সংবিধান বাতিল করে দিয়ে সামরিক আইনের বিধান অনুযায়ী দেশের যাবতীয় আদালতগুলোকে বহাল রাখা হয়েছিল। তবে কোন আদালত সামরিক আইন বা সামরিক প্রশাসকের কোন আদেশের বৈধতা সম্পর্কে কোন মামালা গ্রহণ করতে পারতো না। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন দেশ থেকে তুলে দিয়ে প্রধান সামরিক প্রশাসক আইয়ুব খান তার প্রণীত সংবিধান দেশে চালু করেছিলেন। এই সংবিধানে সুপ্রিম কোর্ট সহ দেশের যাবতীয় আদালতের এখতিয়ারগুলো বহাল ছিল। ১৯৬৯ সালের জেনারেল ইয়াহিয়া খান দেশে পুণরায় সামরিক আইন জারি করে ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রধান সামরিক প্রশাসক ও তার অধীনস্থ সামরিক

[১৭] *৭ ডি. এল. আর (এফ. সি.), পৃ. ২৯১*

আদালতের বিরুদ্ধে রিট মামলা গ্রহণ করা ছাড়া সুপ্রিম কোর্ট সহ যাবতীয় আদালতের পূর্বের সকল প্রকার এখতিয়ার বহাল রাখা হয়েছিল।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন তুলে নিয়ে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সংবিধান প্রণয়ন ও দেশের শাসনভার জনপ্রতিনিধিদের নিকট হস্তান্তর করার লক্ষ্যে ১৯৭০ সালে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কস অর্ডার জারি করে ঐ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু নব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সংবিধান প্রণয়নের জন্যে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ তারিখে ডাকা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ১ মার্চ তারিখে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বন্ধ রাখার ঘোষণা দিলে সারা পাকিস্তানে তার প্রতিবাদে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। তখন ৭ মার্চ তারিখে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামীলীগ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার ঘোড়দৌড় ময়দানের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে) জনসভায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকারের জন্যে সবার্ত্নক সংগ্রামের ঘোষণা দিয়েছিল। তার সে ঘোষণার মধ্যে প্রধান কথা ছিল “এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”। এরপর ২৫ মার্চের মধ্যরাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী নিরীহ বাঙালী সৈনিক, পুলিশ ও জনতার উপর সশস্ত্র আক্রমণ আরম্ভ করলে বাঙালী সৈনিকগণ ও পুলিশ বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। তখন ২৬ মার্চ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল।[১৮]

স্বাধীনতা ঘোষণাকে অনুমোদন ও কার্যকর করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর থেকে ‘স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র’ জারি করে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ বলে ঘোষণা করা হয় এবং একই তারিখে ১৯৭১ সালের ‘ল’জ কন্টিনিউয়েন্স এনফোর্সমেন্ট অর্ডার’ জারি করে বিধান করা হয় যে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তারিখে পূর্ব পাকিস্তানের প্রচলিত সকল আইন উক্ত ঘোষণাপত্র ও প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশে চালু থাকবে এবং বিচার বিভাগসহ সকল সামরিক ও বেসামরিক সরকারি কর্মচারী বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্যের শপথ নিলে তারা স্ব- স্ব পদে বহাল থাকবেন। মুক্তিযুদ্ধের ফলে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের পর ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারী তারিখে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ‘বাংলাদেশ সাময়িক সংবিধান আদেশ’ জারির দ্বারা প্রধান বিচারপতি ও অন্য বিচারপতিদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ হাই কোর্ট গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারী তারিখে ‘বাংলাদেশ হাই কোর্ট অর্ডার’ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ৫ নং আদেশ) জারি করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত ঢাকা হাই কোর্ট নামে পরিচিত পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্টকে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে বলে গণ্য করা হয় এবং ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পূর্বে সাবেক ঢাকা হাই কোর্ট রিট বিষয় ছাড়া যে সকল ক্ষমতা ও এখতিয়ার পরিচালনা করতেন বাংলাদেশ হাই কোর্টে ঐ

---

১৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭০- ৭৩

সকল ক্ষমতা ও এখতিয়ার ন্যস্ত করা হয় এবং বাংলাদেশ হাই কোর্ট আদেশ জারি হওয়ার পূর্বে ঢাকা হাই কোর্টে বিচারাধীন সকল মামলা বাংলাদেশ হাই কোর্টকে বিচার করার ক্ষমতা দেয়া হয়। তা ছাড়া সাবেক ঢাকা হাই কোর্টের সকল কর্মচারীকে বাংলাদেশ হাই কোর্টে কর্মচারী হিসেবে এবং সকল এডভোকেটকে বাংলাদেশ হাই কোর্টের এডভোকেট হিসেবে গণ্য করা হয়। এক কথায় ঢাকা হাই কোর্ট উক্ত আদেশবলে বাংলাদেশ হাই কোর্টে রূপান্তরিত হয়। তবে এই আদেশের ৩ নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নবগঠিত বাংলাদেশ হাই কোর্টের একজন প্রধান বিচারপতি কয়েকজন বিচারপতি নিযুক্ত করেছিলেন। সাবেক ঢাকা হাই কোর্টের বিচারপতি জনাব আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি ও ওই হাই কোর্টের কয়েকজন বিচারপতিসহ অন্য কয়েকজনকে তখন বাংলাদেশ হাই কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া 'ল'জ কন্টিনিউয়েন্স এনফোর্সমেন্ট অর্ডার' দ্বারা দেশের সকল অধঃস্তন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত চালু থাকে এবং অধঃস্তন আদালতের বিচারকগণ বাংলাদেশের আনুগত্যের শপথ নিয়ে স্ব- স্ব পদে বহাল থাকেন। অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও পাকিস্তান আমলের বিচার ব্যবস্থা ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধান চালু হওয়া পর্যন্ত চালু থাকে।[১৯]

১৯৭২ সালের ৩ আগস্ট তারিখে ১৯৭২ সালের ৯১ নং রাষ্ট্রপতির আদেশ জারি করে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯১ ধারার বিধান মতে হাই কোর্টের হেবিয়াস কপার্স রিট জারি করার ক্ষমতাও লোপ করা হয়। তাছাড়া সাবেক পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন মামলাগুলো বিচার করার জন্য বাংলাদেশ হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্য দু'জন জ্যৈষ্ঠ বিচারপতিকে নিয়ে আপিল বিভাগ গঠন করে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন মামলাগুলো আপিল বিভাগে স্থানান্তর করা হয়।[২০]

আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের আবশ্যকতা

দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় "সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত" করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। আইনের শাসন ও সুবিচার নিশ্চিত করার জন্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ ছাড়াও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ও বাংলাদেশে অধঃস্তন আদালত এবং বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল আছে। বাংলাদেশের সংবিধান বলবৎ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত দেশে 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথে অনেক প্রকার বাধা ও অন্তরায় দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ এখন একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম

---

[১৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

[২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪- ১৫

করছে। মূলতঃ একটি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে শিল্প বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকায় এ দেশবাসীদের পরস্পরের মধ্যে আর্থসামাজিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটছে। এর ফলে দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং রাজনৈতিক ও সমাজিক অস্থিরতা বাড়ছে। স্বাধীনতার চুয়াল্লিশ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীভূত না হওয়া, মূল্যবোধের অবক্ষয়, নরহত্যা, বল প্রয়োগে অর্থ আদায়, রাহাজানি, ডাকাতি প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের বৃদ্ধি, দ্রুত অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা, শিক্ষার মানের অবনতি, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের দারিদ্র প্রভৃতি অনেক কারণেই 'আইনের শাসন' এখন পর্যন্ত সকল নাগরিকের নিকট অর্থবহ হয়ে উঠতে পারছে না। জনসাধারণের অধিকাংশই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি থাকলে কেউ সংক্ষুব্ধ হলে আইন আদালতে গিয়ে ন্যায়বিচারের জন্যে অপেক্ষা করছে না। তাছাড়া প্রভাব প্রতিপত্তি থাকলে অনেকেই এখন অন্যের অধিকারের প্রতি কোন শ্রদ্ধা দেখাচ্ছে না এবং নিজের হাতে আইন তুলে নিতে দ্বিধাবোধ করছে না। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের প্রকৃত অপরাধীকে যথাশীঘ্র ধৃত করে বিচারের জন্য দ্রুত সোপর্দ করতে ব্যর্থতা, আদালতে মামলা মোকদ্দমা বিচারের দীর্ঘসূত্রতা, ব্যয়বহুলতা এবং অনেক সময় ন্যায়বিচার লাভে ব্যর্থতা যেমন আদালতের প্রতি আস্থাহীনতার জন্ম দেয় তেমনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার সৃষ্টি করে এবং অনেককে নিজের হাতে আইন তুলে নিতে প্ররোচিত করে। দেশের নির্বাহী কর্তৃপক্ষের এবং জনসাধারণের উপর দেশের প্রচলিত আইন সমভাবে বাধ্যকর। যে কেউ যত ক্ষমতাবান এবং প্রভাবশালী হোক না কেন সে আইন মেনে চলতে বাধ্য। আর যদি কোন কর্তৃপক্ষ বা নাগরিক আইন ভঙ্গ করে অন্যের আইনসংগত অধিকার ক্ষুণ্ন করে তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তবে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ দেশের প্রতিষ্ঠিত আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী।

"দি চ্যালেঞ্জ অব ল' রিফর্ম" নামক গ্রন্থে লেখক আর্থার, টি, ভেল্ডারবিল্ট এ সম্পর্কে বলেছেন "আইন সভায় নয়, বরং আদালতেই আমাদের নাগরিকেরা আইনের সুতীক্ষ্ম দংশন উপলব্ধি করেন। আদালতের কাজের প্রতি যদি তাদের শ্রদ্ধা থাকে, তাহলে সরকারের অন্য যে কোন শাখার দুর্বলতা সত্ত্বেও তাদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা অব্যাহত থাকে। কিন্তু যদি তারা তাদের আদালতের কাজের উপর শ্রদ্ধা হারায়, তাহলে আইন শৃঙ্খলার উপরও তাদের শ্রদ্ধা লুপ্ত হয়ে যায়, যা সমাজের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর"।[২১]

দক্ষ বিচারক ও ন্যায়বিচার

আদালতের কাজের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও আস্থা অক্ষুন্ন রাখতে সব দেশেই দক্ষ, নিরপেক্ষ, সৎ ও দায়িত্বশীল বিচারকদের উপর মামলা মোকদ্দমা বিচারের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়ে থাকে। যদি কোন দেশের বিচারকগণ দক্ষ, নিরপেক্ষ, সৎ এবং দায়িত্বশীল না হন তবে দেশের ভাল আইনের সুফল থেকেও

---

[২১] *কাজী এবাদুল হক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৪০৪/ জানুয়ারী ১৯৯৮, পাণ্ডুলিপি: সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ। প্রথম পুনর্মুদ্রণ: জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬/জুন ২০০৯, পৃ. ২৯২- ২৯৩

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিকগণ বঞ্চিত হন। এজন্যে অপর একজন লেখক ইভান হাইন্স "দি সিলেশান এন্ড টেনিউর অব জাজেস" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে বিচারের উৎকর্ষতা যতটা বিচারকের দক্ষতার উপর নির্ভর করে ততটা তারা যে আইনের ভিত্তিতে বিচার করেন তার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করেন না"। এ সম্পর্কে নিযামুল মুলক তার রচিত 'সিয়াসতনামা' গ্রন্থে বলেছেন, "শুধু বিদ্বান, ধর্মভীরু ও অর্থলোভহীন ব্যক্তিদেরই বিচার পদে অধিষ্ঠিত রাখা উচিত, আর যে সমস্ত বিচারকের মধ্যে এ সমস্ত গুণাবলীর সবাবেশ নেই তাদের সাথে সাথে ছাঁটাই করে যোগ্যতর ব্যক্তিদের দ্বারা শূন্যপদগুলো আবার পূরণ করা উচিত। যোগ্যতা অনুসারে বিচারকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিলে তাদের অসৎপথ অবলম্বনের আর কোন অযুহাত থকবে না"। দক্ষ বিচারকদের দ্বারা মামলা মোকদ্দমা নিস্পত্তির ব্যবস্থা করতে হলে সর্বোর্চ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে বিচারের কাজে নিযুক্ত করতে হয় এবং তাদের যেমন স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করতে দিতে হয় তেমনি নির্বাহী কর্তৃপক্ষ বা অন্য যে কোন শক্তির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হলে তাদের যেমনি উপযুক্ত বেতন ভাতা ও সুবিধাদি দিতে হয় তেমনি বিচারকার্যে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হয়। এ সকল ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হলেই বিচারকার্যের দ্বারা কারো বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কমে গিয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা

দেশের আইন শৃঙ্খলা সুষ্ঠুভাবে বজায় না থাকলে, অপরাধীর দ্রুত শাস্তি বিধান করা না হলে এবং কেউ কারো কোন অধিকার ক্ষুণ্ন করে তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করলে তার দ্রুত ও সুষ্ঠু প্রতীকারের ব্যবস্থা না হলে সামাজিক অস্থিরতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হয়। অপরাধীর দ্রুত শাস্তি বিধান ও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির দ্রুত প্রতীকার লাভের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্পর্কে কারো কোন প্রকার দ্বি-মত নেই। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির দ্রুত ও সুষ্ঠু প্রতীকার লাভের জন্যে দেশের বিচার ব্যবস্থাই তার শেষ আশ্রয়স্থল। আর এ বিচার ব্যবস্থাকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে হলে আইনে দক্ষ, সৎ ও কর্মনিষ্ঠ বিচারক যেমন আবশ্যক তেমনি আইনে পারদর্শী, কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্বশীল আইনজীবীরও প্রয়োজন। দক্ষ বিচারক ও আইনজীবীর সহায়তা ভিন্ন কোন বিচার ব্যবস্থা সফল হতে পারে না। আমাদের বর্তমান বিচার ব্যবস্থা অপরাধীদের দ্রুত শাস্তি বিধান ও নাগরিকদের অধিকার ক্ষুণ্ন হলে তার দ্রুত ও সুষ্ঠু প্রতিকারের ব্যবস্থা কতটুকু করতে পারছে এবং তা করতে না পারলে কেন পারছে না তা পর্যালোচনা করা দরকার এবং দেশে দ্রুত ও সুষ্ঠু বিচারের পথে অন্তরায় বা বাধাগুলো কী তা যেমন নির্ণয় করা দরকার তেমনি ওই সকল বাধা কীভাবে অতিক্রম করা যায় তা আলোচনা করা দরকার। আমাদের একটি দুর্বলতা আমরা কোন সমস্যা হলে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্যে সচেষ্ট হই না। অপরদিকে এই সমস্যার সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিতে এবং সমস্যার সমাধানের চেষ্টা না করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে

থাকতে অভ্যস্ত। কোন সমস্যা সমাধান করতে হলে ওই সমস্যার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে তা দূরীভূত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

বর্তমান বিচার ব্যবস্থার সমস্যা

আমাদের বর্তমান বিচার ব্যবস্থা কাঠামোগতভাবে যে কোন উন্নত দেশের বর্তমান বিচার ব্যবস্থার সাথে তুলনীয়। এ সত্ত্বেও দেশের মানুষ আমাদের বিচারালয় থেকে দ্রুত ও সুষ্ঠু প্রতীকার লাভ করতে পারছে না বলে যে অভিযোগ উঠেছে তার কারণ গভীরভাবে পর্যালোচনা দরকার। শুধু বিচারকগণ আইনজীবীদের দোষারোপ করলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য আইনজীবীদের কোন অসুবিধা কিংবা সমস্যা থাকলে তার যেমন সমাধান করা দরকার, তেমনি বিচারকদের, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অসুবিধা ও সমস্যা থাকলে তারও সমাধান করা দরকার। দেশে দক্ষ, নিবেদিত প্রাণ ও কর্তব্য জ্ঞানসম্পন্ন আইনজীবী, বিচারক, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী থাকলেই দেশের বর্তমান বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমেও জনসাধারণ দ্রুত ও সুষ্ঠু প্রতীকার লাভ করতে পারে। আইনজীবী, বিচারক, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা যেমন দ্রুত ও সুষ্ঠু বিচারের জন্যে প্রয়োজনীয় তেমনি তাদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততাও দ্রুত ও সুষ্ঠু বিচারের জন্যে অপরিহার্য। তাছাড়া দেশের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে বিচার ব্যবস্থায় কোন সংস্কার করা প্রয়োজন কিনা তাও দেখা উচিত। কারো কোন অভিযোগের দ্রুত ও সুষ্ঠু প্রতীকারের ব্যবস্থা করতে হলে যেমন আইনজীবী, বিচার, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমস্যা ও অসুবিধা দূর করতে হবে তেমনি ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বিচার প্রার্থীদের কোন প্রকার সমস্যা ও অসুবিধা থাকলে তারও সমাধান করতে হবে। তা করা না হলে দ্রুত ও সুষ্ঠু বিচারের পথের অন্তরায়গুলো দূর হবে না এবং জনসাধারণের আদালতের প্রতি আস্থা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়বে না।

বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যে কতিপয় প্রস্তাব

দেশে দ্রুত ও সুষ্ঠু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে ও আদালতের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বাড়াতে নিম্নেবর্ণিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে কিছু সুফল পাওয়া যেতে পারে। কারো প্রতি কোন প্রকার অনুরাগ বিরাগের বশবর্তী না হয়ে বাস্তব অবস্থার আলোকে এ বিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকলের বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে এবং সকলের সংশ্লিষ্ট আলাপ আলোচনার মাধ্যমে উপনীত সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সকলে যেন সচেষ্ট হন সেজন্যে নিম্নেবর্ণিত প্রস্তাবগুলো রাখা হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রায় প্রত্যেক দেশেই আইন ও বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের জন্যে আইন কমিশন গঠন করে তার মাধ্যমে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয় এবং আইন কমিশনের আইনতত্ত্ববিদদের সুচিন্তিত মতামত বিবেচনা করে আইনসভা সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। আমাদের দেশে ১৯৯৬ সালের

পূর্বে কোন স্থায়ী আইন কমিশন গঠন করে আইন ও বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। যদিও ১৯৭৬ সালের বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেনের নেতৃত্বে ও ১৯৮৩ সালে বিচারপতি আলতাফ হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত আইন কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দু'বার কিছু আইন সংশোধন করা হয়েছে। তাছাড়া বেশীরভাগ আইন সংশোধন করা হচ্ছে নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তাদের মর্জিমাফিক। তাতে প্রকৃত সমস্যার সমাধান হচ্ছে কিনা, তার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে বলে মনে হয়না। তাছাড়া দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বহুকালযাবত সংকটাপন্ন থাকায় ও আইনসভা প্রকৃত পক্ষে কার্যকর না থাকায় আইনসভা বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের জন্যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। বর্তমানে দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভিত্তির উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং আইন কমিশন গঠিত হওয়ায় উক্ত কমিশনের সুচিন্তিত সুপারিশের ভিত্তিতে আইনসভা বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশা করা যায়। ২০০১ সাল থেকে আইন সভা দেওয়ানী কার্যবিধি ও ফৌজদারী কার্যবিধিতে কতিপয় সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় এ উদ্যোগ আব্যাহত থাকলে বিচার ব্যবস্থার উন্নয়ন আব্যাহত থাকবে।[২২]

১. আইন শিক্ষা

দেশের প্রচলিত আইন ভালভাবে না জানলে দক্ষ ও সফল কর্মকর্তা, আইনজীবী ও বিচারক হওয়া যায় না। আর ভালভাবে আইন জানতে হলে আইন অধ্যয়ন করতে হয়। বর্তমানে প্রত্যেক দেশেই আইন শিক্ষা দেয়ার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ ব্যবস্থা আছে বা স্বতন্ত্র আইন মহাবিদ্যালয় আছে। বাংলাদেশেও কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অনুষদের অধীনে আইন বিভাগ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আইন মহাবিদ্যালয় বা কলেজ আছে। কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালের আইন বিভাগে যেমন উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী ছাত্রদের আইন শেখান বেশীরভাগ আইন মহাবিদ্যালয়ে ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমনি উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব দেখা যায়। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন সদ্য কলেজ থেকে পাশ করে তরুণ ও মেধাবী ছাত্র- ছাত্রীগণ আইন অধ্যয়নের জন্যে ভর্তি হন তেমনি আইন কলেজগুলোতে ভর্তি হন না। সাধারণতঃ আইন মহাবিদ্যালয়ে কর্মজীবী, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ আইন অধ্যয়নের জন্যে ভর্তি হন। বর্তমানে আইন মহাবিদ্যালয়গুলোতে সাধারণতঃ সান্ধ্যকালীন পাঠদান করা হয়। এ সকল মহাবিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক ও ছাত্রগণ দিনের বেলায় তাদের স্ব- স্ব কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকেন এবং সন্ধ্যা বেলায় আইন অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন করেন। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পর শিক্ষকদের অনেকের পক্ষেই ভালভাবে শিক্ষাদান করা এবং ছাত্র- ছাত্রীদের অনেকের পক্ষেই এই পাঠদান মনোযোগ দিয়ে শোনার ও হৃদয়ঙ্গম করার অবস্থা থাকার কথা নয়। তাছাড়া অনেক আইন মহাবিদ্যালয়ে

[২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৩- ২৯৫

উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক না থাকায় তাদের পাঠদানও শিক্ষার্থীদের নিকট মনোগ্রাহী ও আকর্ষণীয় হয় না। কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত শিক্ষক না থাকার অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। তাই ওই সকল বিশ্ববিদ্যালয়েও মানসম্মত আইন শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

বাংলাদেশে প্রচলিত বেশীরভাগ আইন ইংরেজী ভাষায় রচিত। অথচ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। এর ফলে যে সকল ছাত্র- ছাত্রী বাংলা ভাষার মাধ্যমে আইন অধ্যয়ন করেন তাদের পক্ষে ইংরেজী ভাষায় রচিত বেশীরভাগ আইনের বই পড়তে ও বুঝতে অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। বিশ্ববিদ্যালয় ও আইন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে যাদের ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান কম তাদের পক্ষে ইংরেজী ভাষায় রচিত আইন বুঝা সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া বাংলা ভাষায় বর্তমানে ছাত্র পাঠ্য নোট বই ছাড়া আইনের বেশীরভাগ বই না থাকায় যারা বাংলা ভাষার মাধ্যমে আইন অধ্যয়ন করেন তাদের পক্ষে ভালভাবে আইনের জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হয় না। বেশীরভাগ আইন মহাবিদ্যালয় আইন শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে এ সকল প্রতিষ্ঠানে খন্ডকালীন শিক্ষকদের পরিবর্তে আইন সম্পর্কে উচ্চশিক্ষিত সার্বক্ষণিক ও অভিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করা প্রয়োজন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে আইন শিক্ষার ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রেখেও যারা আইন মহাবিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করবেন তাদের ইংরেজী ভাষার জ্ঞান পরীক্ষা করা আবশ্যক। যাদের ইংরেজী ভাষার জ্ঞান পর্যাপ্ত নয় তাদের আইন শিক্ষাদানের পূর্বে বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং ইংরেজী ভাষায় পাঠদানের পর পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের ইংরেজী ভাষার জ্ঞান পর্যাপ্ত বলে স্থির হলেই মাত্র তাদের আইন বিষয়ে পাঠদান আরম্ভ করা যেতে পারে। যে সব আইন মহাবিদ্যালয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না, ওই সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া আইন শিক্ষার মান রক্ষার্থে অপরিহার্য। এর ফলে আইন শিক্ষার ব্যাপারে মফস্বলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হতে পারে তা রোধ করতে এবং আইন শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্যে প্রত্যেক বিভাগে অন্ততঃ পক্ষে একটি সরকারি আইন মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা আইন শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ সকল আইন মহাবিদ্যালয় সদ্য পাশ করা সার্বক্ষণিক ছাত্র- ছাত্রীদের মত কর্মজীবী ছাত্র ছাত্রীদেরও আইন শিক্ষাদানের জন্যে সান্ধ্যকালীন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আইন মহাবিদ্যালয়গুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পরীক্ষা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের মত পাক্ষিক, মাসিক ও ষাণ্মাসিক পরীক্ষা নেয়ারও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শুধু রচনামূলক উত্তর দেয়ার পরিবর্তে সমস্যা সমাধানমূলক উত্তর দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাত্ত্বিক শিক্ষার সাথে সাথে প্রায়োগিক শিক্ষারও ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। আইন মহাবিদ্যালয়ের মত বিশ্ববিদ্যালয়েও কর্মজীবী ছাত্র- ছাত্রীদের আইন শিক্ষাদানের জন্যে সান্ধ্যকালীন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আইনের ছাত্রদের প্রথম বর্ষে বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করায় যারা বাংলাভাষার

মাধ্যমে আইন শিক্ষা লাভ করবে তারাও ইংরেজীতে রচিত বেশীরভাগ আইনের বই পড়তে ও ভালভাবে বুঝতে পারবে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ও আইন মহাবিদ্যালয়গুলোতে আইন শিক্ষার যে পাঠ্যক্রম আছে তা সংশোধন করে উন্নত দেশের পাঠ্যক্রমের সাথে সংগতিপূর্ণ করার কথাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। নচেৎ আমাদের আইনজীবীগণ মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিশ্বব্যবস্থায় অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে না।

২. আইন পেশা

আইন শিক্ষার পরেই আসে আইন পেশার কথা। বর্তমানে বাংলাদেশে নির্বাচিত বার কাউন্সিল আইন পেশায় যোগদানের জন্যে আইনের স্নাতকদের পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করে সনদ প্রদান করেন এবং আইনজীবীদের পেশাগত অসদাচরণের জন্যে শাস্তি বিধান করে থাকেন। মক্কেলকে আইন সম্পর্কে পরামর্শ দান করা ও মক্কেলের পক্ষে আদালতে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করা আইনজীবীর ব্যবসায় নয়, এটি একটি সম্মানিত পেশা। আইনজীবী তার কাজের জন্য মক্কেলের নিকট থেকে নির্ধারিত হারে ফিস গ্রহণ করেন এবং ব্যবসায়ীর মত যত বেশী সম্ভব অর্থ দাবি করতে পারেন না এবং আইন বহির্ভূত অসৎ পরামর্শ দিয়ে যত বেশী সম্ভব অর্থ রুজি করতে পারেন না। তা করলে তিনি অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত হন। এখন বেশীরভাগ আইনের স্নাতকের আইনের জ্ঞান অনেক কম হওয়াতে এবং আইন বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দুর্বল হওয়াতে আইন পেশায় যারা নবাগত তাদের মধ্যে অনেকে সুনামের সাথে আইন পেশা চালাতে পারছেন না। বর্তমানে সনদ লাভের জন্যে বার কাউন্সিলের নির্ধারিত পরীক্ষা দেয়ার পূর্বে আইনের স্নাতকদের ছয় মাস সময় একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর অধীনে শিক্ষানবিস থাকার বিধান আছে। তা বাড়িয়ে এক বছর করা প্রয়োজন। কারণ ছয় মাস প্রশিক্ষণ প্রায়োগিক শিক্ষার জন্যে যথেষ্ট নয়। তাছাড়া অভিজ্ঞ আইনজীবীর অধীনে শিক্ষানবিস থেকে সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণ নেয়ার যে নিয়ম আছে অনেক শিক্ষানবিস তা রীতিমত ও সুষ্ঠুভাবে পালন করছেন না। অনেক অভিজ্ঞ আইনজীবীও তাদের অধীনে যে সকল আইনের স্নাতক শিক্ষানবিস থেকে প্রশিক্ষণ নেন তাদের প্রশিক্ষণ দানের বিষয়ে ততটা সচেষ্ট ও আগ্রহী নন। এর ফলে দেখা যায় অনেক উৎসাহী শিক্ষানবিশ যেমন ভালভাবে প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারছেন না তেমনি অনেক শিক্ষানবিস ইচ্ছাকৃতভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণে অবহেলা করছেন। প্রশিক্ষণ প্রদানকারী ও প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রত্যেককে দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করার জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান ও গ্রহণের ব্যবস্থা নিতে হবে। যে সকল শিক্ষানবিশ রীতিমত আইনজীবীর চেম্বার ও আদালতে হাযির না হয়ে তাদের প্রশিক্ষণকাল শেষ হওয়ার পর যে কোন উপায়ে যে সকল আইনজীবীর সাথে তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হন তাদের নিকট থেকে প্রত্যয়ন পত্র গ্রহণ করে বার কাউন্সিলের পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন তারা ভাল ফল করতে পারেন না। শিক্ষানবিসদের এরূপ প্রশিক্ষণে অবহেলা বন্ধ করার জন্যে তারা যে আদালতের আইনজীবীর অধীনে প্রশিক্ষণ লাভের জন্যে

Dhaka University Institutional Repository

চুক্তিবদ্ধ হবেন ওই আদালতে এবং ওই আদালতের আইনজীবীদের সমিতিতে রক্ষিত হাযিরা বইয়ে তাদের হাযিরা নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া প্রত্যেক আইনজীবী সমিতিতে অভিজ্ঞ আইনজীবীদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলে শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণদান করার এবং অন্ততঃপক্ষে প্রতি মাসে একবার প্রশিক্ষণদানকারী আইনজীবী ও প্রশিক্ষণগ্রহণকারী শিক্ষানবিশদের সাথে বৈঠক করে তাদের প্রশিক্ষণের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণকাল শেষে আইনজীবীর সাক্ষরিত ও আইনজীবী সমিতির সম্পাদকের প্রতিসাক্ষরিত রীতিমত প্রশিক্ষণ লাভের প্রত্যয়ন পত্র যে সব শিক্ষানবিশ লাভ করবেন কেবল তাদের মধ্যে অন্ততপক্ষে যারা প্রশিক্ষণকালের ৭৫% কর্ম দিবসে আদালতে ও আইনজীবী সমিতিতে উপস্থিত ছিল তাদের বার কাউন্সিল থেকে সনদ পাওয়ার জন্যে পরীক্ষা দেয়ার উপযুক্ত বিবেচনা করা উচিত। বর্তমানে সনদ লাভের পর দু'বছর যাবত অধঃস্তন আদালতে আইন পেশায় নিয়োজিত থাকার পর যে কোন আইনজীবী বার কাউন্সিল থেকে সুপ্রিম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগে আইন পেশায় নিয়োজিত হওয়ার জন্যে সনদ লাভ করে থাকেন। এতে হাই কোর্ট বিভাগে আইন পেশায় নিয়ম কানূন না শিখেই অনেকে সনদ লাভ করছেন। হাই কোর্ট বিভাগে আইন পেশার জন্যে সনদ লাভে যারা ইচ্ছুক তাদের সনদ লাভের পর অন্ততঃপক্ষে দু'বছর যাবত অধঃস্তন আদালতে আইন পেশায় নিয়োজিত থাকার পর এক বছর যাবত হাই কোর্ট বিভাগের অন্ততঃপক্ষে দশ বছর অভিজ্ঞ একজন আইনজীবীর অধীনে শিক্ষানবিস হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ভবনে লিগ্যাল এডুকেশন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট কিছুকাল যাবত নবীন আইনজীবীদের আইনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া আরম্ভ করেছেন। শিক্ষানবিস আইনজীবীদের সনদ দেয়ার পূর্বে প্রশিক্ষণ দেয়ার গুরুত্ব বার কাউন্সিল উপলব্ধি করে অধঃস্তন আদালতে আইন পেশা অবলম্বনকারীদের বেলায় যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন হাই কোর্ট বিভাগে আইন পেশায় যোগদানকারীদের বেলায়ও তদ্রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। বর্তমানে পেশাগত অসদাচরণের জন্যে এডভোকেটদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের বিচার করেন বার কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্যের সমবায়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অনেক অভিযোগকারীর পক্ষে সাক্ষী সাবুদ নিয়ে ঢাকায় এসে অভিযুক্ত এডভোকেটের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণ করা ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। অভিযুক্ত এডভোকেটের পক্ষেও সাক্ষী নিয়ে ঢাকায় এসে ওই মামলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। তাছাড়া এতে অনেক সময়ও ব্যয় হয়। এজন্যে প্রত্যেক আইনজীবী সমিতির সদস্যদের মধ্য হতে দু'জন বা চার জন ও স্থানীয় আদালতের একজন বিচারককে নিয়ে একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করে ওই ট্রাইব্যুনালের নিকট আইনজীবী সমিতির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে পেশাগত অসদাচরণের মামলার দ্রুত বিচার করার বিধান করা যেতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সমিতির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে পেশাগত অসদাচরণের অভিযোগের বিচার করার জন্যেও ওই সমিতির দু'জন বা চার জন সদস্য ও হাই কোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতিকে নিয়ে একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করে ওই সমিতির সদস্যদের পেশাগত অসদাচরণের

Dhaka University Institutional Repository

মামলা দ্রুত বিচার করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত রায় প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে আপিল করার বিধান করা যেতে পারে। জেলা আইনজীবী সমিতির ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে বার কাউন্সিলের দু'জন বা চার জন সদস্য ও হাই কোর্ট বিভাগে একজন বিচারপতির সমবায়ে গঠিত আপিল ট্রাইব্যুনালের নিকট সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত রায় প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে আপিল দায়ের করার বিধান করা যেতে পারে। তাছাড়া কোন এডভোকেটের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের বিচার বা আপিল চলাকালীন সময়ে তাকে তার পেশা থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করারও বিধান করা যেতে পারে। আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক শুধু আইনের প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করার বিধান করা যেতে পারে। অভিযোগ প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মামলা বিচার করার ও আপিল দায়ের করার ছয় মাসের মধ্যে আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আপিল নিস্পত্তি করার সময়সীমা বেধে দেয়া যেতে পারে। পেশাগত অসদাচরণের জন্যে এডভোকেটদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলেই তাদের মধ্যে পেশাগত অসদাচরণ অনেক হ্রাস পাবে। তাছাড়া চাকুরি, অন্য পেশা বা ব্যবসায় অনেক কাল কাটানোর পর যারা আইন পেশায় যোগ দিতে আসেন তাদের ওই কার্যকালে কোন অসদাচরণের ঘটনা ঘটছে কিনা তা ভাল করে তদন্ত করে দেখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অসৎ কাজে হাত পাকিয়ে আইন পেশায় ঢুকে মহৎ পেশাকে যেন কেউ কলুষিত করতে না পারে তার জন্যে সনদ প্রদানের পূর্বে ওই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেমন আবশ্যক তেমনি পরবর্তীতে ওই সময়ের কোন অসদাচরণের ঘটনা প্রকাশ পেলে সে কারণে বাতিল করার শর্তে তাদের সনদ প্রদান করার বিধানও করা যেতে পারে।

৩. অধঃস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বদলী, শৃঙ্খলা বিধান ও প্রশিক্ষণদান

১৯৮১ সালের বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী নিয়োগ বিধির বিধান অনুযায়ী আইনের স্নাতকদের মধ্য হতে সরকারি কর্মকমিশনের নির্ধারিত পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতেন তাদের সহকারী বিচারক পদে নিয়োগ করা হতো। সহকারী বিচারক পদে নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে আইনের স্নাতকগণ আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন কিনা তা বিবেচনা করা হতো না। বৃটিশ আমল থেকে নবনিযুক্ত মুন্সেফদের (বর্তমানে সহকারী জজ) বিভিন্ন অফিস ও আদালতে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। ধীরে ধীরে তা এক সময় অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। বৃটিশ আমল থেকেই আইনের স্নাতকদের মধ্য হতে মুন্সেফ পদে নিয়োগ করার বিধান থাকলেও তখন যে সকল প্রার্থী আইন পেশা থেকে যেতেন তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে নবনিযুক্ত সহকারী জজদের প্রশিক্ষণদান পুনরায় কার্যকর করা হলেও আইনের পেশা থেকে যারা সহকারী জজ পদে নিযুক্তি লাভের জন্যে সরকারি কর্ম কমিশনের বর্তমানে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন তাদের বর্তমানে কোন প্রকার অগ্রাধিকার দেয়া হয় না। পৃথিবীর বহু দেশেই আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের

মধ্য হতে বিচারক নিযুক্ত করা হয়। কয়েক বছর যাবত আইন পেশায় অভিজ্ঞতা অর্জন করে যারা বিচারক পদে নিযুক্ত হবেন তাদের একই শ্রেণির অন্য সরকারি কর্মচারীদের থেকে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বেশী দেয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করা যেতে পারে এবং তার যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। নচেৎ শুধুমাত্র আইনের স্নাতকদের মধ্য হতে সহকারী বিচারক পদে লোক নিযুক্ত করা হলে তারা অন্য বিষয়ের স্নাতকদের মধ্য হতে সরকারি কর্মকমিশন বা বিচারক কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার মাধ্যমে নিযুক্ত একই শ্রেণির অন্য সরকারি কর্মকর্তাদের থেকে চাকুরিতে বেশী বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দাবি করতে পারেন না। তাছাড়া যে সকল আইনের স্নাতক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আইন পেশায় নিয়োজিত থেকে বিচারকার্যে অংশ গ্রহণ করে বিচার ব্যবস্থা ও আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তারা বিচারক পদে নিযুক্ত হলে সহজে বিচারকার্য আরম্ভ করতে পারবেন এবং তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর খুব দ্রুত বিচারকার্যে দক্ষতা অর্জন করবেন। বর্তমানে অধঃস্তন আদালতের বিচারকগণ তাদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার স্বল্পতার দরুন তারা সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারছেন না বলে তাদের দাবি দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে দাবি উপস্থাপন করছেন। তাছাড়া বর্তমানে নিম্ন আদালতের বিচারকদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগও শোনা যায়। বিচারকদের অনেক দেশেই বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি সমপর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের থেকে বেশী দেয়া হয় এবং তাদের নিকট থেকে সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার উন্নত মান আশা করা হয় যেন তারা দৈনন্দিন অভাব হতে মুক্ত থেকে সুষ্ঠুভাবে তাদের কর্তব্য কাজ করতে পারেন। যে সকল আইনের স্নাতক অন্ততপক্ষে পাঁচ বছর পর্যন্ত আইন পেশায় বা তিন বছর পর্যন্ত বিচারাদালতের প্রশাসনিক চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন এবং যে সকল আইনজীবীর বয়স বত্রিশ বৎসর ও যে সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তার বয়স পয়ত্রিশ বছরের উর্ধ্বে নয় তাদের সহকারী বিচারক পদে নিয়োগ পরিক্ষাদানের উপযুক্ত গণ্য করে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া যেতে পারে। এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সহকারী বিচারকদের নিয়োগ করলে অধঃস্তন আদালতে সুযোগ্য বিচারক নিয়োগের পথ সুগম হবে এবং তাদের বর্ধিত হারে বেতন, ভাতা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের পদমর্যাদা বাড়ানোর সুযোগ ঘটবে। অভিজ্ঞ আইনজীবী ও বিচারাদালতের প্রশাসনিক চাকুরিতে নিযুক্ত যোগ্য লোকদের সহকারী বিচারক পদে নিযুক্ত করতে হলে বর্তমানে সহকারী বিচারকদের যে বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি আছে তা বাড়ানো প্রয়োজন এবং অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করার বয়সও বাড়ানো প্রয়োজন। নচেৎ আইন পেশা থেকে অনেকেই সহকারী বিচারক পদে যোগ দিতে আগ্রহি হবেন না। এজন্য সহকারী বিচারকদের প্রথম শ্রেণির অন্য সরকারি কর্মকর্তাদের থেকে বর্ধিত হারে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি দেয়ার ব্যবস্থা করা আবশ্যক এবং যে সকল স্থানে সরকারি বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই সেখানে তাদের সরকারি খরচে ভাড়া করা বাড়িতে বসবাসের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং যেখানে যাতায়াতের জন্যে সরকারি যানবাহন নেই সেখানে সরকারি খরচে তাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা

করা দরকার। তাছাড়া অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করার বয়সসীমা অন্ততঃপক্ষে বাষট্টি বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বাড়ানো দরকার।

বর্তমানে বিচারকর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রন (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরসহ) ও শৃঙ্খলা বিধান সংক্রান্ত সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত আছে। রাষ্ট্রপতির ওই সকল বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে কাজ করার কথা উল্লেখ আছে। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর পর রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সুপ্রিম কোর্টের উপর এককভাবে ওই সকল ক্ষমতা অর্পণ করা না হলে বিচারকর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ও বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রন ও শৃঙ্খলাবিধান করা যাবে না।

১৯৭৫ সালের চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রন ও শৃঙ্খলা বিধান সুপ্রিম কোর্টের পরিবর্তে সরকারের নির্বাহী প্রধানের উপর ন্যস্ত করার ফলে অধঃস্তন আদালতের শৃঙ্খলার ও কর্মদক্ষতার কতদূর অবনতি হয়েছে তা বুঝা যাবে, ওই সকল আদালতে মামলা বিচারের সংখ্যা থেকে এবং দৈনিক গড়ে কত ঘন্টা করে ওই সকল আদালতের বিচারকগণ বিচারকার্যে সময় ব্যয় করে থাকেন তা থেকে। একজন প্রধান বিচারপতিসহ সুপ্রিম কোর্টের তিন জন বিচারককে নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি তাদের ৩০-৬-৮৯ তারিখের প্রতিবেদনের ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, উপরের স্তরের কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া দেশের সকল অধঃস্তন আদালতের কোনোটিতে দৈনিক গড়ে দু'ঘন্টার বেশী বিচারকার্য চলে না। এই প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া বিচারকদের দক্ষতা অনেক কমে গেছে এবং বিচারকগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তৎপর নন এবং তাদের কাজের কোন প্রকার জবাবদিহীতা নেই বললেই চলে। এখন পর্যন্ত অধঃস্তন আদালতে উপরোক্ত অবস্থার সামান্য উন্নতি লক্ষ্য করা গেলেও সন্তোষজনক উন্নতি হয়েছে বলে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৯৮২ সালের শেষভাগ থেকে ১৯৮৪ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সময়ে ৪৫৭ টি উপজেলা সহকারী জজের পদ সৃষ্টি করে কর্মকমিশনকে এড়িয়ে তড়িঘড়ি করে যেভাবে সহকারী বিচারকের পদে লোক নিয়োগ করা হয়েছে এবং বিনা প্রশিক্ষণে এবং নাম মাত্র প্রশিক্ষণে তাদের বিচারকার্যে নিযুক্ত করা হয়েছে তাতে বিচারকদের কর্মদক্ষতার অবনতি ঘটার সুযোগ হয়েছে। অধঃস্তন আদালতের সুনাম সুনাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে বিচারকদের কর্মদক্ষতা বাড়াতে হলে সুপ্রিম কোর্টে কার্যরত বা অবসর প্রাপ্ত তিন জন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত একটি কমিটির নিকট অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের কর্মদক্ষতা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করার ভার ন্যস্ত করা যেতে পারে। উক্ত কমিটির মুল্যায়নের উপর ভিত্তি করে সরকার অদক্ষ বিচারকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ভাতাদি দিয়ে চাকুরি থেকে অবসর দেয়ার বা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী অন্য চাকুরিতে নিয়োগ

করার বিধান করা যেতে পারে। তদ্রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে প্রতি বৎসর উপযুক্ত প্রার্থীদের মধ্য হতে অধিক সংখ্যক সহকারী বিচারক নিযুক্ত করে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের ওই সকল শূন্যপদ পূরণ করার জন্যে তৈরী রাখতে হবে।

প্রত্যেক চাকুরিতেই চাকুরীজীবীদের কাজের মান উন্নয়নের জন্যে এবং দক্ষতা বাড়ানোর জন্যেও তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা আছে। সহকারী বিচারক পদে নিয়োগদানের পর তাদের বিভিন্ন কোর্ট কাছারিতে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া ছাড়াও তাদের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যে সরকার ১৯৯৬ সালে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট গঠন করেছেন এবং ১৯৯৭ সাল থেকে উক্ত ইনস্টিটিউট বিচারকদের বিচারকার্যে ও মামলার ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়ানোর জন্যে তাদের আইনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করেছেন। ভূমি জরিপের মতো হস্তলেখা ও হস্তরেখা সম্পর্কেও নবনিযুক্ত সহকারী বিচারকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হলে তা বিচারকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ও ওই সকল বিষয় সংক্রান্ত মামলা বিচারে সহায়ক হবে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী বিচারকদের সম্পর্কে প্রশিক্ষণদানকারীগণ যে মূল্যায়ন করবেন তা ভবিষ্যতে বিচারকদের চাকুরিতে স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতি দানের সময় বিবেচনা করা হলে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী ও একনিষ্ঠ হবেন বলে আশা করা যায়। উচ্চপদস্থ দক্ষ বিচারকদের ও বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী বিশেষজ্ঞদের মধ্য থেকে জুডিশিয়াল ইনস্টিটিউতে প্রশিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন। সুপ্রিম কোর্টের চাকুরিরত ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদেরও খন্ডকালীন প্রশিক্ষণদানের জন্যে জুডিশিয়াল একাডেমী আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন এবং তাদের ফলপ্রসূভাবে অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের প্রশিক্ষণদানের কাজে লাগাতে পারছেন। তাছাড়া বিচার বিভাগে নিযুক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরও মামলা ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিচারকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার সাথে সাথে বিচার বিভাগের উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরও প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করায় মামলার ব্যবস্থাপনাও সুষ্ঠুভাবে হবে বলে আশা করা যায়।

৪. দেওয়ানী আদালতে মামলার ব্যবস্থাপনা

দেওয়ানী আদালতে আর্জি, জবাব, দরখাস্ত দাখিল করা, সমন, নোটিশ জারি করা, মামলা শোনানীর জন্যে প্রস্তুত করা, নকল প্রদান করা, ডিক্রি প্রস্তুত করা, ডিক্রি জারি করা ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব পালন করেন প্রত্যেক আদালতের প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা সেরেস্তাদার ও তার অধীনস্ত সেরেস্তার আমলা, পেশকার, নকলনবীশ, নাজির, জারিকারক ও অন্য পেয়াদা। প্রত্যেক আদালতের বিচারকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থেকে এ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ দেওয়ানী আদালতে দায়েরকৃত মামলার ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। আদালতের বিচারক হচ্ছেন আদালতের প্রধান কর্মকর্তা। তার প্রধান কাজ হল মামলা বিচার করা। অধঃস্তন আদালতের প্রত্যেক বিচারক মামলা ব্যবস্থাপনার চেয়ে মামলা বিচারের প্রতি সঙ্গত কারণেই বেশী গুরুত্ব

দিয়ে থাকেন এবং মামলার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আদালতের উপরোক্ত কর্মচারীর উপর নির্ভরশীল থাকেন। এর ফলে বর্তমানে দেওয়ানী আদালতে আর্জি দায়েরের পর থেকে অনেক সময় সমন জারি করা ও বিবাদীর জবাব দাখিল করা পর্যন্ত অনেক মামলায় কয়েক বছর সময় ব্যয় হয়। অন্যান্য কারণের মধ্যে জারিকারক পেয়াদার গাফিলতি বা অসততার কারণে সমন, নোটিশ ইত্যাদি জারিতে অনেক সময় ব্যয় হয় বলে অনেকে অভিযোগ করে থাকেন। আর সমন জারির পর পেশকার ও আমলার গাফিলতি বা অসততার কারণে জবাব দাখিল করতে, কি মামলা শোনানীর জন্যে প্রস্তুত করতে দেরী হয় বলে অনেকে অভিযোগ করে থাকেন। বর্তমানে সহকারী বিচারক থেকে জেলে বিচারক পর্যন্ত জেলার সকল আদালত জেলা সদরে অবস্থিত বিধায় একজন জ্যৈষ্ঠ বিচারককে বিচারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে প্রত্যরক জেলা সদরে জেলা বিচারকের অধীনে সকল প্রশাসনিক কাজের তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব অর্পণ করা হলে জেলা বিচারকের প্রশাসনিক কাজের চাপ যেমন কমবে তেমনি মামলার ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কাজ আরো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা যায়। কারণ বিচারকরূপে অনেক দিন যাবত কাজ করার পর একজন বিচারককে প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করা হলে তার পক্ষে মামলা ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে করা যেমন সম্ভব অন্য কারো পক্ষে তা করা সম্ভব নয়।

৫. দেওয়ানী মামলার সময়দান ও ত্বরিত বিচার

এতদিন যাবত দেওয়ানী মামলায় বিবাদীর জবাব দাখিল, ইস্যু গঠন, পক্ষগণের তদবীর গ্রহণ, শোনানীর তারিখ ধার্যকরণ প্রভৃতির জন্যে নির্দিষ্ট সময়সীমা আইনে নির্দিষ্ট করা থাকলেও তা মানা হচ্ছিল না এবং মামলার চূড়ান্ত শোনানী আরম্ভ হলে তা দ্রুত নিস্পত্তি করার জন্যে সিভিল রুলস এন্ড অর্ডারসের বিধান অনুযায়ী নিরবিচ্ছিন্নভাবে মামলা শোনানী করা হচ্ছিল না। বিভিন্ন অযুহাতে মামলা দায়েরের পর থেকে সময় নেয়া হচ্ছিল। এভাবে মামলা নিস্পত্তি দীর্ঘায়িত হওয়ার ফলে মামলাকারীগণ যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল তেমনি আদালতের উপর জনসাধারণের আস্থা কমে যাচ্ছিল। দেওয়ানী কার্যবিধি সংশোধন করে বার বার সময় নেয়া বন্ধ করার বিধান করার ফলে বিচারের দীর্ঘ সূত্রতা রোধ হবে বলে আশা করা যায়। সাধারণত নিম্ন আদালতে সময়ের দরখাস্তের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ আদালতে আপত্তি উত্থাপন না করলে এতদিন যাবত আদালতের পেশকারই মামলায় জবাব দাখিল বিচার বিষয় নির্ধারণ, তদবীর গ্রহণ ও শোনানীর তারিখ ধার্য করে, আদেশনামায় বিচারকের স্বাক্ষর গ্রহণ করে থাকতেন। আশা করা যায় উপরোক্ত সংশোধনীর ফলে বিচারকগণ সক্রিয় হবেন ও পেশকারের দৌরাত্ন কমবে। বিচারক এ সকল ব্যাপারে পেশকারের উপর নির্ভর না করে সচেষ্ট হলে এবং সামান্য অযুহাতে সময় দেয়া বন্ধ করলে মামলা দ্রুত নিস্পত্তি করা সম্ভব। তাছাড়া মামলায় জবাব দাখিলের পর বিচার্যবিষয় নির্ধারণ করার সময় উভয় পক্ষের আইনজীবীর উপস্থিতিতে বিচারক শোনানী করে যদি মামলার বিচার্যবিষয় নির্ধারণ করেন এবং পক্ষদের বাচনিক ও দালিলিক সাক্ষ্যের তালিকা,

বাচনিক সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও দলীলের অনুলিপি দাখিল ও অন্য তদবীরের জন্যে তারিখ ধার্য করে ওই তারিখের মধ্যে ওই সকল কাজ সমাধান না করলে পরবর্তীতে খুব যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত তা করার সুযোগ না দেন তবে দেওয়ানী মামলা দ্রুত নিস্পত্তি করা সম্ভব হবে।

৬. সালিশের রোয়েদাদ দ্রুত কার্যকর করতে কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ

আদালতে মামলা এড়াতে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত ও অন্যান্য অনেক চুক্তিতে প্রায়শ সালিশে বিরোধ নিস্পত্তির শর্ত থাকে। কিন্তু পূর্বে সালিশের রোয়েদাদ ডিক্রিতে পরিণত করতে হলে তা সহকারী বিচারক বা উপবিচারকের আদালতে দাখিল করতে হতো। ১৯৪০ সালের সালিশ আইনের ৩৩ ধারার বিধান মতে ওই রোয়েদাদের বিরুদ্ধে ওই সকল আদালতে আপত্তি দেয়া যেতো। ওই আপত্তি নিস্পত্তি করতে অনেক সময় ব্যয় হতো। এই রায়ের বিরুদ্ধে ঊর্ধ্বতন আদালতে আপিলও করা যেতো। তাতেও অনেক সময় নষ্ট হতো। এতে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হতো ও সালিশের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতো। এ জন্যে ২০০১ সালের সালিশ আইনে রোয়েদাদকে ডিক্রিতে পরিণত করা হয়েছে এবং রোয়েদাদ প্রকাশের বিরুদ্ধে ৬০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিলের বিধান করা হয়েছে এবং তদ্রূপ আপত্তি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঊর্ধ্বতন আদালতে আপিল করার বিধান বহাল রাখা হয়েছে। ডিক্রিতে পরিণত রোয়েদাদের টাকার অর্ধেক আদালতে জমা না দিলে তদ্রূপ আপত্তি বা আপিল গ্রহণ না করার বিধান করা যেতে পারে। উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সালিশের রোয়েদাদ দ্রুত কার্যকর করা সম্ভব হবে।

৭. মিথ্যা ও হয়রানিমূলক ফৌজদারী মামলায় ক্ষতিপূরণ দান

ফৌজদারী মামলায় মিথ্যা ও হয়রানিমূলক অভিযোগে কাউকে অভিযুক্ত করলে বর্তমানে ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়ার পর ফৌজদারী কার্যবিধির ২৫০ ধারায় তৃতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট ৫০০ টাকার পর্যন্ত এবং প্রথম ও দ্বিতীয়শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্যে অভিযোগকারীকে নির্দেশ দিতে পারেন। এ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ তৃতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত, প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষেত্রে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত, দায়রা বিচারকদের ক্ষেত্রে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের ক্ষেত্রে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত বর্ধিত করার বিধান করা যেতে পারে। উপরোক্ত মতে উচ্চহারে ক্ষতিপূরণ দানের বিধান করা হলে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক ফৌজদারী মামলা দায়েরের সংখ্যাও অনেক কমে যাবে এবং আদালতে মামলার সংখ্যাও কমবে।

৮. অপরাধীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়

ফৌজদারী মামলার প্রায় অপরাধে আসামী দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান আছে। কিন্তু আসামীর অপরাধের দ্বারা যে পরিমাণে কোন ব্যক্তি বা তার ওয়ারিশ ক্ষতিগ্রস্থ হয় তার সাথে অর্থদণ্ডের পরিমাণ সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং এই অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দানেরও বর্তমানে কোন বিধান নেই। সেজন্যে অর্থদণ্ডের পরিমাণ আসামীর অপরাধের দ্বারা যে ক্ষতি হয় তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে অর্থদণ্ডের টাকা আসামীর নিকট থেকে আদায় করে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দানের বিধান করা প্রয়োজন। এরূপ ব্যবস্থা নেয়া হলে সমাজের প্রভাবশালী ও অর্থশালী ব্যক্তিগণ প্রভাব প্রতিপত্তিহীন ও গরীব লোকদের নির্যাতন করে যে সকল অপরাধ করেন তার সংখ্যা অনেক কমে যাবে।

৯. ক্ষতিপূরণ দিয়ে ফৌজদারী মামলা আপোষ নিস্পত্তি

বর্তমানে অন্য কতিপয় অপরাধসহ সামান্য আঘাত ও কতিপয় ধরনের গুরুতর আঘাত সংক্রান্ত অপরাধ ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৫৪ ধারায় পক্ষগণ স্বেচ্ছায় বা আদালতের অনুমোদনক্রমে আপোষ নিস্পত্তি করতে পারেন। কিন্তু খুন, শাস্তিযোগ্য নরহত্যা, কি কতিপয় গুরুতর আঘাত, হঠকারী ও অবহেলাজনিত কাজের দ্বারা পঙ্গুত্ব ও মৃত্যু ঘটানো প্রভৃতি মামলা আদালতের অনুমোদনক্রমেও বর্তমানে আপোষ নিস্পত্তি করার বিধান নেই। অনেক সময় দেখা যায় যে, যে সকল মামলা আদালতের অনুমতি নিয়েও আপোষ করা যায় না সে সকল মামলাও অভিযোগকারী আসামীর সাথে আপোষ নিস্পত্তি করে আদালতে সাক্ষী হাযির না করলেও প্রকৃত সত্য না দিয়ে আসামীকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়ার ব্যবস্থা করেন। অনেক সময় দেখা যায় ওই ধরনের মামলায় উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলেও অনেক অতি সংবেদনশীল বিচারক আবেগের বশবর্তী হয়ে আসামীকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। এ সকল মামলায় আসামী উচ্চ আদালতে তাকে প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করলে ওই সকল আপিল সহজেই মঞ্জুর হয়। তবে ইতোমধ্যে আসামীকে কয়েক বছর কারাদণ্ড ভোগ করে খালাস পেতে হয়। ওই ক্ষেত্রে অনেক সময় অভিযোগকারী পক্ষ আপোষ নিস্পত্তি করে আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানে বিরত থেকেও বা প্রকৃত সাক্ষ্য গোপন করেও প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণ অপরিশোধিত থাকলে তা থেকে বঞ্চিত হয়। এরূপ মামলাও যেন আদালতের অনুমতি নিয়ে আপোষ করলে বা মামলার রায় ঘোষণার পূর্বে আসামী আপোষে অভিযোগকারী পক্ষকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে এবং অভিযোগকারী পক্ষ ক্ষতিপূরণ নিতে সম্মত হলে আদালত উক্ত আপোষের প্রবৃত্তিমূলে আসামীর শাস্তির পরিমাণ কমিয়ে দিতে বা আসামীকে শাস্তি ভোগ করা থেকে ভবিষ্যতে সদাচরণের মুচলেকা দান সাপেক্ষে অব্যাহতি দিতে পারেন তার বিধান করা যেতে পারে। তাহলে আদালতে মামলা বিচারে সময় কম ব্যয় হবে এবং বিচারকের পক্ষে এ ধরনের মামলা দ্রুত নিস্পত্তি করা সম্ভব হবে।

১০. আর্থিক ও আইনগত সহায়তা

মামলার বিচার প্রার্থীদের মামলা চালাতে একটি বড় অসুবিধা তাদের দারিদ্র ও আর্থিক অসামর্থ্য। দেওয়ানী মামলায় নিঃস্ব বাদী আর্থিক অসামর্থ্যের কারণে কোর্ট ফি দিতে না পারলে দেঃ কাঃ বিঃ ৩৩ নং আদেশ অনুযায়ী আদালতে দরখাস্ত দিলে এবং শোনানীর পর ওই দরখাস্ত মঞ্জুর হলে বিনা কোর্ট ফিতে মামলা চালাতে পারেন। দেওয়ানী কার্যবিধির ওই বিধান অনুযায়ী দরখাস্ত মঞ্জুর হতে বহু সময় ব্যয় হয়। এজন্যে ওই দরখাস্ত দায়েরের পদ্ধতি সহজ ও সরল করার লক্ষ্যে শুধু বাদী তার আর্জির সাথে মামলার বিষয়বস্তু ছাড়া তার অন্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ যুক্ত একটি হলফনামা দাখিল করে তিনি যে মামলার কোর্ট ফি দিতে সমর্থ একথাও তিনি তার জবাবে উল্লেখ করে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। মামলায় অন্য বিচার্য বিষয়ের সাথে বাদীর আর্থিক সঙ্গতিও অন্যতম বিচার্য বিষয় হবে। মামলায় বাদী তার দাবি প্রমাণ করতে পারলে যদি তার কোর্ট ফি দেয়ার সঙ্গতি আছে বলে সাব্যস্ত হয় তবে তিনি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কোর্ট ফি দাখিল না করলে ডিক্রি পাবেন না। যদি আদালত সাব্যস্ত করেন যে, বাদীর কোর্ট ফি দাখিল করতে হবে না। তবে ডিক্রি জারি করে বিরোধীয় সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা অর্থ আদায় করার পর বাদীকে আদালতে কোর্ট ফি দাখিল করতে হবে। কোর্ট ফি ছাড়াও মামলার অন্যতম প্রধান খরচ উকিলের ফিস। দারিদ্রের কারণে বাদী বা বিবাদী উকিলের ফিস দিতে না পারলে তার পক্ষে উকিল নিয়োগ করে ভাল ভাবে মামলা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তেমনি ফৌজদারী মামলায়ও দারিদ্রের কারণে আসামী উকিল নিযুক্ত করতে না পারলে তার পক্ষে ভাল ভাবে আত্নপক্ষ সমর্থন করা যায় না। এজন্যে দরিদ্র বাদী বিবাদী যেন দারিদ্রের উকিল নিযুক্ত করে মামলা পরিচালনা করা থেকে বঞ্চিত না হয় সে জন্যে সরকার ১৯৯৪ সালের ১৮ জানুয়ারী বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অসচ্ছল বিচার প্রার্থীদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্যে প্রত্যেক জেলা ও দায়রা বিচারককে চেয়ারম্যান করে আইনগত সহায়তা কমিটি গঠন করেছিলেন। ওই কমিটির সদস্য সচিব ছিলেন প্রত্যেক জেলা আদালতের হিসাব বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারক। আর অপর সদস্যগণ ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি, সরকারি উকিল, সরকারি অভিশংসক ও সরকারের মনোনীত একজন প্রতিনিধি। ওই কমিটিকে প্রতি দু'মাস কমপক্ষে দু'টি সভায় মিলিত হয়ে সহায়সম্বলহীন বিচার প্রার্থীকে আইনগত পরামর্শ ও সাহায্য দানের বিধান করা হয়েছিল এবং সরকার প্রদত্ত তহবিল হতে ওইরূপ বিচার প্রার্থীদের মামলা পরিচালনার জন্যে জেলা বিচারক, জেলা প্রশাসক ও সরকার মনোনীত প্রতিনিধির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের মধ্য থেকে প্যানেল তৈরী করার এবং ওই আদালত ওই দরখাস্ত ওই কমিটির বিবেচনার জন্যে পাঠালে ওই কমিটি বিষয়টি তদন্ত করে দরখাস্তকারিকে আর্থিক সহায়তা দানের বিধান করা হয়েছিল। ১৯৯৩- ৯৪ সালে আর্থিক বৎসরে এইরূপ বিচার প্রার্থীদের সাহায্যের জন্যে বরাদ্দকৃত ৪০ লক্ষ টাকার মধ্যে ওই বছর ৩৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে বাকী ৬ লক্ষ টাকা ফেরত এসেছিল। পরবর্তী বছরের বরাদ্দকৃত ৪০ লক্ষ টাকার মধ্যে কত টাকা

খরচ হয়েছিল এবং এ বরাদ্দ পর্যাপ্ত ছিল কি না তা জানা যায়নি। তদ্রূপ সাময়িক ব্যবস্থা ফলপ্রসূ না হওয়ায় তার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো নিরসনের জন্যে আইনগত সহায়তাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করার জন্যে ২০০১ সালের আইনগত সহায়তা আইন প্রণীত হয়েছে। ওই আইনের আইনগত সহায়তা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে আইনমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় ব্যবস্থাপনা বোর্ড ও প্রত্যেক জেলায় জেলা বিচারকের নেতৃত্বে একটি জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত দরিদ্র আসামীদের সরকার কর্তৃক সাহায্য করার জন্যে যেরূপ ব্যবস্থা আছে অপর দরিদ্র আসামীদের সাহায্য করার জন্যে সরকারি অভিশংসকদের মত পাবলিক ডিফেণ্ডার (সরকারি প্রতিরোধকারী) নিযুক্ত করা যেতে পারে।[২৩]

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার যে সকল সমস্যার কথা আলোচনা করা হল এ সকল সমস্যা বিশেষ করে আদালতে অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা বেড়ে যাওয়া ও মামলা বিচারের দীর্ঘসূত্রতা পৃথিবীর সব দেশেই দেখা যায়। বিচার ব্যবস্থার সমস্যাগুলো সমাধান করার লক্ষ্যে অনেক দেশেই আইন কমিশন, কমিটি প্রভৃতি গঠন করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে আইন কমিশন বা কমিটি বা বিচারপতিদের রায়, গবেষণা সংস্থা প্রভৃতি বিচার ব্যবস্থা সংস্কার করার জন্যে যে সকল সুপারিশ করেন তার ভিত্তিতে আইন সংশোধন ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিচার ব্যবস্থার সমস্যাগুলোর সমাধান করা হয়। যে কোন দেশের বিচারকগণই বিচার ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। সৎ, কর্মদক্ষ, কর্তব্যনিষ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণ বিচারক না হলে, আদালতে মামলার যথাযথ ব্যবস্থা না হলে ও দক্ষ এবং দায়িত্বশীল আইনজীবীর সহায়তা না থকলে দ্রুত ও সুষ্ঠু ন্যায়বিচার করা যায় না। এ জন্যে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকে আরো কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে আদালতগুলোকে সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে শিক্ষার মান আরো উন্নত করে দক্ষ আইনজীবী ও বিচারক সৃষ্টি করার জন্যে, বিচারকের পদে উপযুক্ত লোক আকৃষ্ট করার জন্যে বিচারকের বেতন ভাতাদি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি বাড়াবার ব্যবস্থা করতে ও বিচারকদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও চাকুরিতে যোগদানের পর সকল স্তরে প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা বাড়াতে সংবিধানের বিধানসহ কার্যবিধি ও বিচার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কতিপয় আইন সংশোধন করার জন্যে উপরোক্ত প্রস্তাবগুলো উত্থাপন করা হয়েছে। দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করে জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন ও অ-শিক্ষা ও দারিদ্র দূর করতে হলে সংবিধানে ঘোষিত অঙ্গীকার অনুযায়ী ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী, পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক যেন "আইনের শাসন ও সুবিচার" থেকে বঞ্চিত না হয় সে জন্যেই বর্তমান বিচার ব্যবস্থাকে আরো সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে আদালতের উপর জনগণের শ্রদ্ধা ও আস্থা বাড়াতে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

---

[২৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৫- ৩১৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী আইনের পরিচিতি

ইসলামী আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন

ইসলামী আইনতত্ত্ব

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী আইনের পরিচিতি

(Introduction to Islamic Law)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন কর্তৃক মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম এমন একটি জীবন বিধান যেখানে মানব জাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়া আছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, জাতীয়, আন্তর্জাতিক নীতি, বিচার ব্যবস্থা সহ সকল বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা আছে এতে। বিচার ব্যবস্থা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার স্বাধীনতার উপর একটি দেশের সুশাসন এবং জাতির কল্যাণ নিহিত। স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা বলতে আমরা যা বুঝি শারী'আহ বিচার ব্যবস্থা তারই নমুনা। কোন রাষ্ট্রে ও সমাজে শারী'আহ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে সে রাষ্ট্র ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। শারী'আহ বিচার ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য এক বিরাট নি'আমত। তাই শারী'আহ বিচার ব্যবস্থা প্রতিটি রাষ্ট্র ও সমাজে শান্তি ও মানব জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে একান্ত ভাবেই প্রয়োজন।

ইসলাম শব্দের বিশ্লেষণ

(الاسلام) পৃথিবীর সকল দেশের মুসলিম নিজেদের ধর্মকে ইসলাম নামে অভিহিত করে থাকেন। ইহা (س ل م) শব্দমূল হতে গঠিত, باب افعال এর মাসদার (ক্রিয়ামূল)। আল কুরআনের সাত জায়গায় ইসলাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

---

[১] আল কুরআন, ৩: ১ ان الدين عند الله الاسلام -

আল কুরআন, ৫: ৩ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما احل لغيرالله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذالكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم -

আল কুরআন, ৬:১২৫ فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فى السماء كذالك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون -

আল কুরআন, ৯: ৭ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغنهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوايك خيرالهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما فى الدنيا والاخرة وما لهم فى الارض من ولى ولا نصير -

আল কুরআন, ৩৯:২২ افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك فى ضلل مبين -

আল কুরআন, ৪৯:১৭ يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للا يمان ان كنتم صدقين -

Dhaka University Institutional Repository

সালম (سلم) শব্দটির নিম্নোক্ত বুৎপত্তিগত অর্থগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

(১) বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ উভয়বিধ অপবিত্রতা (বিপদ আপদ) ও দোষ ত্রুটি হতে মুক্ত (পবিত্র) থাকা;

(২) সন্ধি ও নিরাপত্তা; (৩) শান্তি; এবং (৪) আনুগত্য ও হুকুম পালন। সালাম (سلم) এবং (سلم) সালিম এই উভয় শব্দেরই অর্থ হচ্ছে আনুগত্য, আত্মসমর্পণ ও হুকুম পালন।[২] উক্ত অর্থগুলোর মধ্যে 'পবিত্র ও দোষত্রুটি মুক্ত হওয়া' অর্থটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

সিলম (سلم) , সিলাম (سلام) এবং সালিম (سلم) এর অর্থ কঠিন প্রস্তর; কারণ ইহাতে কোমলতা নাই, নরম হওয়া হতে মুক্ত। সালাম (سلام) এর অর্থ বাবলা বৃক্ষের ন্যায় কন্টকযুক্ত বৃক্ষ; যে বৃক্ষ কন্টক থাকায় বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকে।[৩]

আসসালাম (السلام) শব্দটির মধ্যেও যা আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম যাতে যাবতীয় দুর্বলতা হতে মুক্ত হবার অর্থ নিহিত রয়েছে। রুহুল মা'আনি গ্রন্থে আসসালাম শব্দটির নিম্নোক্ত অর্থ বর্ণিত রয়েছেঃ

(১) ذوالسلامة من كل نقص و افة " যাবতীয় বিপদাপদ ও দোষত্রুটি হতে মুক্ত"।

(২) هو الذى ترجى منه السلامة "সেই সত্তা যাঁর নিকট হতে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের আশা করা যায়"।

(৩) ইবনুল আদির মতে السلامة اسم الله تعالى لسلامته من العيب والنقص। আসসালাম আল্লাহ তা'আলার একটি নাম এই কারণে যে, তিনি যাবতীয় দোষত্রুটি হতে মুক্ত ও পবিত্র" ।[৪]

ইসলাম শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে 'ইবাদাত দীন এবং 'আকীদাকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট করা। الاسلام الدخول فى السلم। অর্থাৎ "আনুগত্যে প্রবেশ কর" ।[৫]

الاسلام والاستسلام الانقياد। "আল ইসলাম এবং আল ইসতিসলাম উভয় শব্দের অর্থ আনুগত্য করা"।[৬] এই শব্দমূল হতে গঠিত বহু শব্দ উপরোক্ত ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সমূহে ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দমূল কয়েকটি

---

২ *আস সিজিস্তানী, গারীবুল কুরআন, আল মুফরাদাত, লিসানুল আরব, তাজুল আরুস, আল ইশতিকাফ, আস সিহাহ*

৩ *প্রাগুক্ত,*

৪ *আন নিহায়া: খ. ২, পৃ. ১৯২*

৫ *আল মুফরাদাত, পৃ. ২৪০*

৬ *প্রাগুক্ত,*

Dhaka University Institutional Repository

আয়াতে বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ উভয়বিধ কলুষ ও দোষত্রুটি হতে মুক্ত ও পবিত্র থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ

مسلمة لاشية فيها "উহা সম্পূর্ণ দোষত্রুটিমুক্ত, এতে কোন খুঁত থাকবে না"।[৭]

الا من اتى الله بقلب سليم "কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে"।[৮]

নিম্নের আয়াত সন্ধি ও নিরাপত্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

فلا تهنوا وتدعوا الى السلم "অতএব তোমরা হীনবল হয়ে যেওনা এবং সন্ধি এর প্রস্তাব করোনা"।[৯]

নিম্নের আয়াত আনুগত্য ও বাধ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

هم اليوم مستسلمون "বরং আজ তারা অনুগত"।[১০]

নিম্নের আয়াত আত্মসমর্পণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اسلمت لرب العلمين "আমি জাতসমূহের প্রতিপালক প্রভূর নিকট আত্মসমর্পণ করলাম"।[১১]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده "যে ব্যক্তির জিহ্বা ও হাত হতে মুসলমানগণ নিরাপদে থাকে সে ব্যক্তিই হচ্ছে প্রকৃত মুসলিম"।[১২] উক্ত হাদীসে (সালিম) سلم শব্দটি 'নিরাপদ রয়েছে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শারী'আতের পরিভাষায় "ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে (আল্লাহর প্রতি) আনুগত্য প্রকাশ ও আত্মসমর্পণ এবং রাসূল (সা) কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে আনিত সূন্নাহকে

---

[৭] আল কুরআন, ২: ৭১ *قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقى الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الئن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون -*

[৮] আল কুরআন, ২৬: ৮৯ *الا من اتى الله بقلب سليم*

-

[৯] আল কুরআন, ৪৭: ৩৫ *فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم -*

[১০] আল কুরআন, ৩৭: ২৬ *بل هم اليوم مستسلمون*

-

[১১] আল কুরআন, ২: ১৩১ *اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العلمين -*

[১২] *বুখারী কিতাব- ২, বাব- ৪, মুসলিম, কিতাব-১, বাব- ৬৫,*

দৃঢ়রূপে গ্রহণ ও ধারণ"।[১৩] ان الدين عند الله الاسلام "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম"।[১৪]

এই আয়াতের তাফসির বর্ণনা প্রসঙ্গে ইসলাম শব্দের নিম্নোক্ত চারটি অর্থ বর্ণনা করেছে

(১) الاسلام هو الدخول فى الاسلام اى الانقياد والمتابعة 'ইসলামে প্রবেশ'।

(২) الاسلام معناه اخلاص الدين والعقيدة- والمسلم اى المخلص لله عبادته

"আকীদা এবং দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা, যে ব্যক্তি স্বীয় 'ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে সে মুসলিম"।

(৩) فى عرف الشرع فالاسلام هو الايمان 'ঈমান'।

(৪) الاسلام عبارة عن الانقياد 'আনুগত্য ও ফরমাবরদারী'।[১৫]

The Meaning of Islam

The word Islam is derived from the Arabic root "SLM" which means, among other things, peace, purity, submission and obedience. In the religious sense the world Islam means submission to the Will of God and obedience to His law. The connection between the original and the religious meanings of the word is strong and obvious. Only through submission to the Will of God and by obedience to His Law can one achieve true peace and enjoy lasting purity.[১৬]

আইন শব্দের বিশ্লেষণ

আইন (ائين) বহু পুরাতন ফারসী শব্দ। এর অর্থ Ordinance (অধ্যাদেশ), Order (নির্দেশ), Religion (ধর্ম, নিয়ম), Ethic (নীতি) ইত্যাদি। আব্বাসী যুগে এটি সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। 'আঈন নামাহ'[১৭] নামক

---

[১৩] ইমাম রাযী, *লিসানুল 'আরাব (মৃ. ৬০৬/ ১২০৯)*

[১৪] *আল কুরআন,* *ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جائهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايت الله فان الله سريع الحساب -*

[১৫] *তাফসীর- ই কাবীর, মিসর, ১৩১০ হি, খ. ২, পৃ. ৬২৮,*

[১৬] Islam in Focus, Hummah Abdalati, Second Edition 1416 A.C. page 7.

[১৭] *আল ফিহরিস্ত,* পৃ. ১১৮, ইবনুল মুকাফফা কর্তৃক সংকলিত পাহলবি হতে আরবিতে অনুদিত একখানি গ্রন্থ,

একখানি গ্রন্থেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নামের অনুবাদ অনেক সময় 'আরবিতে (كتاب الرسم) 'কিতাবু- র- রুসম' করা হয়েছে। খুদা'ঈ নামার ন্যায় এই গ্রন্থও অর্ধ- সরকারি মর্যাদা সম্পন্ন ছিল। তাতে সম্ভবত সাসানি শাসন ব্যবস্থা ছাড়াও উচ্চতর শ্রেণির লোকদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ অধিকারের উল্লেখ ছিল। এতে দরবারী জীবনের ও দরবারী আদব কায়দা ও রীতিনীতির বিস্তারিত বর্ণনা ছিল। সে জন্যই Christensen এটাকে পুরাতন বাদশাহী কর্মসূচি (Levieil almanch royal) নামকরণ করেছেন। এটার অধিকাংশ প্রবন্ধই শিক্ষাপ্রদ ও উপদেশ মূলক ছিল। ইবন কুতায়বাঃ রচিত 'উয়ূনুল আখবার' (عيون الاخبار) নামক গ্রন্থে 'আইন নামাহ'র উপরোক্ত অনুবাদের কয়েকটি উদ্ধৃতি রক্ষিত আছে। Inostranzev এই গ্রন্থে আলোচিত যুদ্ধবিদ্যা, তীরন্দাযী, পোলো খেলা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন; এটা সম্ভব এই জন্য যে, এই বিরাট সরকারি আইন নামাহর সঙ্গে সঙ্গে বিন্যস্ত বিশিষ্ট বিষয়সমূহ সম্বলিত পৃথক পৃথক সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা বর্তমান ছিল। আল ফিহরিস্ত- এ উল্লেখিত আরো কয়েকখানি গ্রন্থের নাম পাঠ করলে উপরোক্ত ধারণাই জন্মে। উদাহরণঃ আঈনু'র রামই (তীরন্দাযীর নিয়ম) এবং আঈনু'দ দারব বিস সাওয়ালিজা (গালফ খেলার নিয়ম)।

ইহা ধারণা করা যায় যে, এগুলো বৃহৎ আইন নামাহর খণ্ড বা তা হতে সংকলিত গ্রন্থ। আল মাস'উদিও (তানবিহ ১০৪- ১০৬) সাসানি আইন নামাহর উল্লেখ করেছেন। আল জাহিয এর 'কিতাবু- ত- তাজফি আখলাকিল মুলুক' যেখানে সাসানিদের আইন ও আদব সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় সেখানে 'আঈনুল ফুরস' নামক গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়, যদিও তা হতে সরাসরি কোন উদ্ধৃতি দেয়া হয়নি।

পরবর্তীকালে ফারসীতে রচিত অন্যান্য গ্রন্থও 'আঈন' নামে অভিহিত হয়েছিল। এই সমস্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিল ইসলামী নিয়ম কানূন ও প্রথা, যথা আবুল ফাযল আল্লামী [১৫৫১-১৬০২ খৃ.] কর্তৃক ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত আকবর নামার ঐ অংশের নাম আঈন- ই- আকবারী (ائين اكبري) যাতে আকবরের দরবারের [১৫৫৬-১৬০৫ খৃ.] আদব ও রীতিনীতির বর্ণনা আছে।

বাংলা ভাষায় আইন শব্দটিকে বুঝতে ইংরেজীতে দু'টি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় Law এবং Act আইনের মূলে যে সূত্র আছে তাকে Law বলা হয়। যেমন, Laws on Evidence, Laws on Contract. আর Act বলতে একটি বিশেষ আইন বা একটি নির্দিষ্ট আইন বুঝায়। যেমন Evidence Act, Contract Act. সংসদ যে আইন পাশ করে তাকে Act বলা হয়। বাংলা ভাষায় Law এবং Act এই দু'টি শব্দের জন্যই আইন শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

দু'টি অনুবাদ গ্রন্থ, অংশীদারী আইন ও পণ্য বিক্রয় আইন এ Act এর স্থলে 'আইন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১৮]

কানূন (قانون)

আরবি কানূন গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি আইন, নিয়ম, সূত্র, বিধি, বিধান, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়ঃ -قانون الاخلاق هو الخير- قانون المنطق هو الحق وقانون العدالة هو الحكم بين الناس بالعدل- অর্থাৎ চরিত্রের মূলনীতি হলো উত্তম হওয়া, কথা বলার আসল নিয়ম হলো সত্য কথা বলা এবং আদালতের ধর্ম হলো ন্যায়সঙ্গতভাবে মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা করা।[১৯] পরিভাষায় 'কানূন' শব্দটির ব্যাপক ও বিশেষ দু'ধরনের অর্থ রয়েছে। ব্যাপকার্থে আইন বলা হয় অবশ্যপালনীয় সাধারণ আচরণবিধিকে যা মানুষের সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণ এবং এ আচরণবিধি লঙ্ঘনের শাস্তি নিরূপণ করে। তদুপরি রাষ্ট্র যে নীতি পালন করতে জনগণকে বাধ্য করে এবং প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে, তাকেও আইন বলা হয়। পক্ষান্তরে বিশেষ অর্থে কানূন বলা হয় ঐ সব নীতি বা নীতি সমষ্টিকে, যা রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। যেমন বলা হয়, قانون التجارة (বাণিজ্যিক আইন), قانون الشراكة (কোম্পানি আইন) ইত্যাদি।

কানূন এর পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মান্নাউল কাত্তান [১৩৪৫-১৪২০ হি.] বলেনঃ

مجموعة القواعد والمبادئ والانظمة التى يضعها هل الرائي فى امة من الامم لتنظيم شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية استجابة لمتطلبات الجماعة وسدا لحاجتها – "কানূন বলা হয় ঐ সব নীতি, বিধি ও নিয়মের সমষ্টিকে, যা কোন জাতির চিন্তাশীল বিচক্ষণ ব্যক্তিরা মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তাদের আর্থ সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য প্রণয়ন করেন"।[২০]

সাধারণভাবে আরবি কানূন শব্দটির সাথে কোন দেশকে সংযুক্ত করলে তা দ্বারা উক্ত দেশের জাতীয় আইন বুঝায়। যেমন যদি বলা হয় قانون بنغلاديش (বাংলাদেশী আইন), তখন এর দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রণীত ও বাংলাদেশে প্রচলিত আইনকেই বুঝানো হয়।

---

[১৮] গাজী শামছুর রহমান, *আইনবিদ্যা, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৩১*

[১৯] ড. গালিব আলী আদ- দাওআদি, *আল মাদখাল ইলা ইলমিল কানূন, আম্মান: দারু ওয়াঈল লিত তিবাআতি ওয়ান নাশরি,* ৭ম প্রকাশ, ২০০৪ ইং, পৃ. ১০

[২০] মান্না খলিল আল কাত্তান, *তারিখু তাশরিঈল ইসলামী,* কায়রো: মাকতাবাতু ওয়াহাবাহ, ৫ম প্রকাশ, ২০০১ ইং, পৃ. ১২

আইন শব্দটির বিভিন্ন রূপ আছে। যেমন, ওহী ভিত্তিক আইন (Divine Law). এ আইন হচ্ছে ঐসব আইন যে সকল বিধি- বিধান আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। ব্যক্তিগত বিবেক ও জনসমাজের মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আদর্শ মানবিক আচরণ নির্দেশ করে এমন বিধি- বিধান হলো নৈতিক আইন (Moral Law). প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত নিয়ম কানুনকে 'প্রাকৃতিক আইন' (Natural Law) বলা হয়। প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাবলী ও কার্যকরণের গতিধারা নিয়ন্ত্রন করে এবং মানুষের ইচ্ছা- অনিচ্ছা নির্বিচারে কাজ করে এমন নিয়ম কানূনকে 'বৈজ্ঞানিক আইন' (Scientific Law). বলা হয়।[২১]

উল্লেখ্য যে, আইন শব্দটি কেবল আইনজীবীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত কোন শব্দ নয়, এটি জ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন বৈজ্ঞানিকগণ মধ্যাকর্ষণের আইনের কথা বলেন, ধর্মতাত্ত্বিকগণ ওহী ভিত্তিক আইনের কথা বলেন, আবার কখনো সম্মান প্রদর্শন আইন, বিভিন্ন খেলার আইনের কথা শোনা যায়। যদিও এই আইনগুলো আদালতের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়।[২২]

আইনের সংজ্ঞা

বিশ্ববরেণ্য আইনবিদগণের দেয়া আইনের একাধিক সংজ্ঞা পাওয়া যায়।

Justinian বলেন, Law is the king of all mortal and immortal affairs, which ought to be the chief, the ruler and the leader of the noble and the base and thus the standard of what is just and unjust, the commander to animals naturally social of what they should do, forbidder of what they should not do.?[২৩]

Blackstone বলেন, Law its most general and comprehensive sense significs a rule of action and is applied indiscriminately to all kinds of actions, Whether animate or inanimate, rational or irrational. Thus we say the law of gravitation or optics, as well as the laws of nature and of nations.[২৪]

---

২১ *প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২*

২২ *প্রাগুক্ত,*

২৩ V.D. Mahajan, *Jurisprudence and Legal theory,* India: Estern Book company, Law publishers and Book sellers, 2003. P. 27.

২৪ *Ibid*

Justice Holmes বলেন, Law is a statement of the circumstance in which the public force will be brought to bear upon men through courts.[২৫]

Bentham বলেন, Law or the law, indefinitely, is an abstract or collective term, which when it means anything, Can mean meither more or less than the sum total of a number of individual laws taken together.[২৬]

Ulpaain বলেন, The art of science of what is equitable and good. [২৭]

Pinder Keteton বলেন, The king of all both mortals and immortals.[২৮]

Cicero বলেন, "The highest reason implanted in nature". [২৯]

Professor Keeton বলেন, To attempt to establish a single satisfactory definition of law is to seek to confine jurisprudence within a stritjaket from which it is continually striving to escape.[৩০]

প্রফেসর হার্ট আইন ব্যবস্থার সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি পাঁচটি উপাদানের কথা বলেছেন যেগুলো একটি আইন ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য।

1. Rules either forbade certain conduct or compelled certain conduct at pain of sanctians;

2. Rules equiring people to compensate those whom they injured;

3. Rules stating what needs to be done in certain 'mechanical' areas of law such as making a contract or making a will;

4. A system of courts to determine what rules are, whether they have been broken and what the appropriate sanction; and

---

[২৫] Ibid, p. 29.

[২৬] Ibid, p. 30.

[২৭] Ibid. p. 31

[২৮] Ibid., p. 32

[২৯] Ibid., p. 33

[৩০] Ibid., p. 34

5. A body whose responsibilitiy it is to make rules, and amend or repeal them as necessary.

উপরোক্ত পাঁচটি উপাদান একটি আইন মানার জন্য একান্ত অপরিহার্য। উক্ত উপাদানগুলোর আলোকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় প্রথমোক্ত তিন প্রকারের উপাদান বাংলাদেশের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনে বিদ্যমান। প্রথমটি ফৌজদারী আইনে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপাদানগুলো দেওয়ানী আইনে বিদ্যমান। কারণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় ধরনের আদালত বাংলাদেশে বিদ্যমান। বাংলাদেশের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা পার্লামেন্ট পঞ্চম উপাদানের পরিপূরক। একটি দেশের আইন ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হল ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। এই ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা তথা পুরো বিচার ব্যবস্থার তিনটি দিক থাকে।

প্রথম দিকটি হল প্রাতিষ্ঠানিক যা নিম্নলিখিত উপাদানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেঃ দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং বিশেষ আদালতসমূহ; জুডিসিয়ারী অর্থাৎ, বিচারকবৃন্দ, আইন পেশা, আইনজীবী, আইন কর্মকর্তা, এটর্নি জেনারেল, পাবলিক প্রসিকিউটর, পাবলিক প্লিডার, কোর্টের রেজিস্ট্রার, কারা কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ।

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য দ্বিতীয় দিকটি হল পদ্ধতিগত (Procedural Aspect)। এই পদ্ধতিগত দিক নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। বিচার বিভাগীয় এবং আধা- বিচার বিভাগীয় পদ্ধতি যার মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হয়; অনুসন্ধান, তদন্ত, মামলা দায়েরের পদ্ধতি, সাক্ষ্য নেয়া, জেরা করা, আপিল পদ্ধতি ইত্যাদি। যেমন আইন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ, নজীরের নীতিসমূহ, আইন প্রণয়নের নীতিসমূহ, Statutory Interpretation, আইন সংস্কার, আইন সহায়তা ইত্যাদি।[৩১]

বিশিষ্ট আইনজ্ঞ গাজী শামসুর রহমান বলেনঃ "আইন হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে সময়ের জন্য যে আইন প্রণীত হয় সে কালের ধারণা অনুযায়ী শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র অনুমোদিত বা সেই সময়কার সার্বভৌম শক্তি অনুমোদিত অবশ্য পালনীয় বিধিমালা। আইন বলতে মোটামুটি ভাবে, যে সময়ে প্রণীত হয় সেই সময়ে যাকে শৃঙ্খলাজ্ঞান করা হয়, সে শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে গৃহীত আদেশ নিষেধ প্রভৃতি বুঝায়। মানুষ স্বভাবতই শৃঙ্খলাকামী। এ শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থেই মানুষ নীতি নির্ধারণ করে। আর সে আলোকেই আইনের সৃষ্টি হয়"।[৩২]

---

[৩১] মোঃ আব্দুল হালিম, *বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা;* সজনী আর্ট পাবলিকেশন্স. ২২/২ শেখ সাহেব বাজার রোড, আজিমপুর, ঢাকা ১২১৫

[৩২] গাজী শামসুর রহমান, *আইনবিদ্যা,* প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৩৩

ইসলামী আইনের সংজ্ঞা

মানবজীবনের সাথে প্রতিটি বিভাগই কোন না কোন পর্যায়ে আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট। কাজেই সাধারণ ও প্রচলিত আইন সম্পর্কে যেমন জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যক, তদ্রূপ ইসলামী আইন সম্পর্কে ধারণা লাভ করাও জরুরী। এ পর্যায়ে ইসলামী আইনের সংজ্ঞা প্রদান করা হল।

ইসলাম হল একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে একই সূত্রে গেঁথে রেখেছে। ইসলাম একদিকে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক সমুন্নত করে, অন্যদিকে সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক অটুট ও অব্যাহত রাখে। মানুষের এই বিবিধ সম্পর্কের পরিগঠন ও পরিশিলনের জন্য ইসলামী শারী‘আতে যে সকল নিয়ম কানূন ও নীতিমালা বিধৃত হয়েছে, তা- ই ইসলামী আইন।[৩৩]

ক্লাসিক্যাল মতানুযায়ী ইসলামী আইন হলো, “মহানবী (সা) এর মাধ্যমে প্রকাশিত আল্লাহর নির্দেশ। যা স্বর্গীয়ভাবে বিন্যস্ত আকারে অগ্রগামী হয়ে ইসলামী সমাজকে নিয়ন্ত্রন করে এবং কখনই ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র অগ্রগামী হয়ে উক্ত আইনকে নিয়ন্ত্রন করে না”।[৩৪]

বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ (Orientalist) ও আইন বিজ্ঞানী এন. জে. কুলসনের [১৯২৮-১৯৮৬ খৃ.] ভাষায়-

Law, in the classical Islamic theory, is the revealed will of God, a divinely ordained system preceding and not preceded by the Muslim state, controlling and not controlled by Muslim society.

অর্থাৎ “ক্লাসিক্যাল মতে, আল্লাহর ইচ্ছার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রকাশই ইসলামী আইন। যা মুসলিম সমাজের নিয়ন্ত্রক এবং ইসলামী রাষ্ট্রের দিকনির্দেশক”।[৩৫]

অতএব, ইসলামী আইন বলতে ঐসব আদেশ নিষেধ ও পথনির্দেশকে বুঝায়, যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের প্রতি জারি করেছেন। আর এ আইন বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্ণীত হতে পারে। মহান আল্লাহ সরাসরি তাঁর রাসূলের কাছে ওহী (আল কুরআন) প্রেরণ করে অথবা প্রেরিত ওহীর আলোকে মহানবী (সা) এর আইনি

---

৩৩ ইমাম আলা উদ্দিন আবূ ইবন মাসউদ আল কাসানী, *বাদাইউস সানাই ফী তারতিবিশ শারা’ঈ*, বৈরুতঃ ১৯৮৯, ষষ্ঠ খ. পৃ. ৪৮১

৩৪ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স*, পৃ. ২৩

৩৫ এন. জে. কুলসণ, *এ হিস্ট্রি অব ইসলামিক ল’*, ইডেনবার্গ: ইডেনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৪, পৃ. ২

বিশ্লেষণ (সুন্নাহ) অথবা তাঁর ইন্তিকালের পর উম্মতের আলিমগণের গবেষণা প্রসূত ফলাফলও (ইজতিহাদ) হতে পারে।

এক্ষেত্রে চৌধুরী আলিমুজ্জামান ইসলামী আইনের বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বলেনঃ "ইসলামী আইন হলো, পবিত্র কুরআনে বিধিবদ্ধ, হাদীসে নির্দেশিত, আলিমগণের ঐকমত্যের (ইজমা'র) উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তুলনামূলক অবরোহণ প্রক্রিয়ায় (কিয়াস) সুসংহত বিধানাবলী, যার ভিত্তিতে একজন মুসলিমের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সর্ববিষয়ে আবর্তিত"।[৩৬]

এক কথায় বলা যায়, ইসলামী আইন বলতে সার্বিক জীবনের ঐসব বিধি- বিধান ও নির্দেশনা বুঝায়, যা মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে বান্দাহর কল্যাণে অবশ্য পালনীয় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে নির্দেশমূলক বাক্যে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করবে না"।[৩৭]

Surely, We have sent down to you (O Muhammad sm): the book (this Qur'an) in truth that you might judge between men by that which Allah has shown you (i.e. has taught you through Divine Revelation), so be not a pleader for the treacherous. (Surah 4. An-Nisa. Part 5. Ayat 105.)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ "বল! অবশ্যই আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করছ। তোমরা যা সত্বর চাচ্ছ তা আমার নিকট নেই। কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফায়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ"।[৩৮]

"Say (O Muhammad sm): "I am on clear proof from my Lord (Islamic Monotheism), but you deny it (the truth that has come to me from Allah). I have not gotten what you are asking for impatiently (the torment). The decision is only for Allah, He declares the truth, and He is the Best of judges." (Surah 6. Al-An'am Part 7. Ayat 57.)

---

[৩৬] আলিমুজ্জামান চৌধুরী, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন*, ঢাকা: কুমিল্লা বুক হাউস, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ২৬

[৩৭] *আল কুরআন, ৪: ১০৫* - *ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما*

[৩৮] *আল কুরআন, ৬: ৫৭* - *قل انى على بينة من ربى وكذبتم به ما عندى ما تستعجلون ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين*

Dhaka University Institutional Repository

আরবি ‘ফিকহ’ শব্দের প্রায়োগিক অর্থ ‘আইন’। কাজেই ইসলামী আইন হচ্ছে মানবজাতিকে এ পৃথিবীতে সীরাতে মুসতাকীমের পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবিন্যস্ত বিধান।[৩৯]

ইসলামী আইনের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম বলেনঃ “যে আইন মানুষের পূর্ণ অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করে, তা- ই ইসলামী আইন”।[৪০]

---

৩৯ আলহাজ্ব বদিউল আলম, *‘ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ,* ঢাকা, আই এল আর এন্ড এল বাংলাদেশ, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ২০০৫, পৃষ্ঠা. ৪৯-৫

৪০ মাওলানা আব্দুর রহীম, *ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা,* ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃ. . ১৬১

ইসলামী আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে ইসলামী আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ইসলামী আইন মানুষের বিশ্বাসের রক্ষাকবচ ও সার্বজনীন কল্যাণের উৎস। সভ্য সমাজ গঠন ও উন্নততর মানব সভ্যতার উন্মেষে ইসলামী আইনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইসলামী আইন মানবজাতিকে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে এবং স্বার্থপরতা, ধ্বংস, পতন ও ক্ষতির হাত থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করে। এই আইন মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশের সহায়ক। সর্বোপরি এই আইন নৈতিক অবক্ষয় ও দেউলিয়াপনা থেকে সমাজ জীবনকে রক্ষা করে মানবীয় মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধন করে। বস্তুত ইসলামী আইনের অনুসরণ ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হওয়া সম্ভব নয়। এই আইন মেনে চলার এবং তার বিপরীত আইন বর্জন করার জন্য কুরআন মাজীদের বহু জায়গায় তাগিদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি নূহকে, আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহিম, মূসা ও ঈসা (আ) কে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ করো না"।[৪১]

"He (Allah) has ordained for you the same religion (Islamic Monotheism) which He ordained for Nuh (Noah), and that which We have revealed to you (O Muhammd sm) and that which We ordained for Ibrahim (Abraham), Musa (Moses) and Isa (Jesus) saying you should establish religion (i.e. to do what it orders you to do practically), and make no divisions in it (religion) (i.e. various sects in religion)". (Surah 42. As-Shura. Part 25. Ayat 13).

শারী'আহ পরিভাষাটি গ্রহণ করা হয়েছে মূলতঃ এই আয়াত থেকেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "অতঃপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর। সুতরাং তুমি তাঁর অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবে না"।[৪২]

"Then We have put you (O Muhammd Sm) on a (plain) way of (Our) commanded [like the one which We commanded Our Messengers before you (i.e. legal ways and laws of the Islamic Monotheism)]. So follow you that (Islamic Monotheism and its laws), and

---

[৪১] আল কুরআন, ৪২: ১৩ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه -

[৪২] আল কুরআন, ৪৫: ১৮ - ثم جعلنك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهوا الذين لا يعلمون

follow not the desires of those who know not." (Tafsir At-Tabari) (Surah 45. Al-Jathiah. Part 25. Ayat 18).

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইসলামের একটি আইন কাঠামো দান করেছেন, কেবল তারই অনুসরণ করতে হবে এবং মানব রচিত আইনের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। এর পূর্ববর্তী আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, অপর কোন সত্ত্বাকে তিনি আইন প্রণয়নের এখতিয়ার দান করেননি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে কখনো তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৪৩]

"And whoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the Hereafter he will be one of the losers." (Surah3. Al-Imran. Part 3. Ayat 85).

উপরোক্ত আয়াতসমূহে পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, মু'মিন ব্যক্তির জন্য ইসলামী আইন ব্যতীত মানব রচিত আইন কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করার সুযোগ নেই। যদি সে আল্লাহর বিধান মত ফায়সালা না করে সে কাফির (অবিশ্বাসী),[৪৪] যালিম (অত্যাচারী)[৪৫] ও ফাসিক (পাপিষ্ঠ)[৪৬] অভিধায় আখ্যায়িত হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেনঃ "তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট যা নাযিল করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা অতিশয় অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো"।[৪৭]

"[Say (O Muhammd sm) to these idolaters (pagan Arabs) of your folk:] Follow what has been sent down unto you from your Lord (the Qur'an and Prophet Muhammd's Sunnah), and follow not any Auliya' (protectors and helpers who order you to associate partners in worship with Allah), besides Him (Allah). Little do you remember!" (Surah 7. Al-A 'raf. Part 8. Ayat 3).

ইসলামী আইনের পূর্ণ অনুসরণের উপরই নির্ভর করছে পার্থিব উন্নতি, অগ্রগতি, প্রতিপত্তি অর্জন, মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠান এবং আখিরাতের মুক্তি। দীর্ঘকালব্যাপী মুসলিম অধ্যুষিত অধিকাংশ দেশ মানব রচিত আইনে শাসিত হয়ে আসছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, উক্ত আইন ব্যবস্থা তাদেরকে সর্বজনীন টেকসই, উন্নতি ও

[৪৩] আল কুরআন, ৩: ৮৫ - ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخسرين

[৪৪] আল কুরআন, ৫: ৪৪ - ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الكفرون

[৪৫] আল কুরআন, ৫: ৪৫ - ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الظلمون

[৪৬] আল কুরআন, ৫: ৪৭ - ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الفسقون

[৪৭] আল কুরআন, ৭: ৩ - اتبعوا ماانزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون

নিরাপত্তা যা মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তার কোনটারই পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করতে পারেনি। পক্ষান্তরে তারা পরিণত হয়েছে এক মূল্যহীন, পশ্চাদপদ, প্রতিপত্তিহীন, মর্যাদাহীন জাতিতে। পৃথিবীর সর্বত্রই আজ তারা লাঞ্চিত, নিগৃহীত ও পদদলিত। তাদের এ শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী মানব রচিত ভুলে ভরা আইনের অনুসরণ এবং অনেকাংশে ইসলামী আইনের অনুসরণ থেকে তাদের পিছুটান।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করো? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা ও কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।[৪৮]

"Then do you believe in a part of the Scripture and the rest"? Then what is the recompense of those who do so among you, accept disgrace in the life of this world, and on the Day of Resurrection they shall be consigned to the most grievous torment. And Allah is not unaware of what you do." (Surah 2. Al-Baqarah. Part 1. Ayat 85).

উপরোক্ত আয়াত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, ইসলামী আইনের অংশবিশেষ অনুসরণ করে এবং অংশবিশেষ ত্যাগ করে কোনভাবে মুক্তি অর্জন করা যাবে না; বরং তাতেও রয়েছে পার্থিব লাঞ্ছনা ও আখিরাতের কঠোর শাস্তিভোগ। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল (সা) মানবজাতির জন্য যা নিয়ে এসেছেন আমাদেরকে কেবল তাই অনুসরণ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো"। [৪৯]

"And whatsoever the Mesenger (Muhammad sm) gives you, take it; and whatsoever he forbids you, abstain (from it). And fear Allah; Allah is Server in punishment." (Surah 59. Ayat 7).

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে আরো উল্লেখ আছেঃ "কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদের বিচারভার আপনার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সবার্ন্তকরণে তা মেনে নেয়"।[৫০] আরো স্পষ্ট

---

[৪৮] আল কুরআন, ২: ৮৫ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذالك منكم الا خزئ فى الحيوة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب -

[৪৯] আল কুরআন, ৫৯: ৭ - وما اتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا

[৫০] আল কুরআন, 8: ৬৫ - فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

Dhaka University Institutional Repository

করে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ বা কোন মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্নতর সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে'।[৫১]

"But no, by your Lord, they can have no Faith, until they make you (O Muhammad sm) judge in all disputes between them, and find in themselves no resistance against your decisions, and accept (them) with full submission". (Surah 4. An-Nisa'. Part 5. Ayat 65).

একই সাথে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম জাতিকে অন্য কোন জাতিকে অনুসরণ করতেও নিষেধ করেছেন এবং বলে দিয়েছেন, তারা বিজাতির অনুসরণ করলে দীন থেকে, হিদায়েতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেননা"।[৫২] হাদীসেও মুসলিম জাতিকে অমুসলিম সম্প্রদায়ের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। "হযরত জাবির (রা) বলেনঃ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাওরাত কিতাবের একটি হস্ত লিখিত কপিসহ রাসূল (সা) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! এটি তাওরাত কিতাবের পাণ্ডুলিপি। তিনি নীরব থাকলেন। উমর (রা) তা পড়তে লাগলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) এর মুখ মণ্ডল ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল। আবূ বকর (রা) বলেন, তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সা) এর মুখ মণ্ডলের প্রতি লক্ষ্য করছ না? উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর মুখ মণ্ডলের দিকে তাকিয়ে বলেন, আমি আল্লাহর অসন্তোষ ও তাঁর রাসূলের অসন্তোষ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহকে প্রভূ হিসেবে, ইসলামকে দীন রূপে এবং মুহাম্মদ (সা) কে নবী রূপে পেয়ে সন্তুষ্ট। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ সে সত্বার শপথ, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! যদি মূসা (আ) তোমাদের সামনে আবির্ভূত হতেন এবং তোমরা আমাকে ত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করতে, তবে তোমরা অবশ্যই সহজ সরল পথ হারিয়ে পথভ্রষ্টতায় পতিত হতে। তিনি যদি জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুয়্যতের সন্ধান পেতেন তাহলে অবশ্যই তিনি আমার আনুগত্য করতেন"।[৫৩]

---

[৫১] আল কুরআন, 8: ৬৫ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضللا مبينا -

[৫২] আল কুরআন ৫: ৫১ يا يها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصرى اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدى القوم الظلمين

[৫৩] ইমাম দারিমী, *সুনান, মুকাদ্দমা, অনুচ্ছেদ: তা'জিলি উকুবাতি মান বালাগাহু আনিন নাবিয়্যে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।*

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন

মানুষের কর্তব্য পালন করার জন্য শারী'আতের নির্দেশ ব্যাপক ও বিশাল। এর মধ্যে পরে ঈমান, সালাত, সিয়াম, হাজ্জ ও যাকাতের আনুষ্ঠানিক নিয়মাবলী এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ। দুনিয়াবী মুয়া'মেলাত সম্পর্কে শারী'আতের নির্দেশও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়াবী মু'আমেলাত অর্থাৎ মুসলিমের পার্থিব জীবনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশিত বিধিমালা শারী'আতের অন্তর্ভুক্ত।

এ প্রসঙ্গে একটি নীতি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইসলামী আইনে কর্তব্য নির্দেশের ক্ষেত্রে নৈতিকতার উপর বেশী জোর দেয়া হয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইসলামী আইনে যে হুশিয়ারী দেখা যায়, তা কেবল দুনিয়ার শাস্তি নয়, পরকালের শাস্তিও অনিবার্য। মানুষের জীবনের একটি অখণ্ড ধারাবাহিকতা আছে, সে ধারাবাহিকতার আরম্ভ বেলাদাতে (জন্মে), আর পরিসমাপ্তি কিয়ামতে। বেলাদাত হতে কিয়ামত পর্যন্ত যে কর্তব্য পালন মানুষের জন্য আবশ্যক, শারী'আতে তারই বর্ণনা বিধুত।

ইসলামী জীবন দর্শনের মূল বক্তব্য এবং আদর্শের পরিচয় ইসলামী আইন ও ইসলামী আইনতত্ত্বে পাওয়া যায়। জীবন সম্পর্কে ইসলাম যে ধ্যান- ধারণায় আস্থাবান, ইসলামী আইনে ও ইসলামী আইনতত্ত্বে তার প্রকাশ সুস্পষ্ট, তাই ইসলামী আইনকে জানলে ইসলামকে জানতে পারা যায়। মুসলিমের দৃষ্টিতে আইনের জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞান। মুসলিমের জীবনে আরবি সাহিত্যে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল প্রকার শাখায় ইসলামী আইনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট। কিন্তু ইসলামী আইনকে কোন ভাবে ধর্মবাদের সংজ্ঞার মধ্যে ফেলা যায় না। ধর্মবাদের মধ্যে যে গোড়ামী আছে ইসলামী আইনে তা নেই। ইসলামী আইনের উপর বহু ঔদার্যের পরিচয় মিলে। ইসলামী আইনের মধ্যে যে গতিশীলতা বিদ্যমান, তর্ক- বিতর্ক ও বাক- বিতণ্ডা সেই গতিশীলতার পরিচয় বহন করে।

গতিশীলতা এবং বিবর্তনমুখীতার সাথে সাথে ইসলামী আইন এক অভিনব পরিদৃষ্ট হয়। ইসলামের আবির্ভাবের আগে প্রচলিত সব ব্যবস্থাকে যুক্তির অবদান এবং প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা যায়। তবে মুসলিমদের মধ্যে বৃহত্তর অংশ চারটি মাযহাবের নীতিগত প্রাধান্য স্বীকার করে। ইসলামী আইন যখন বিশ্বে আবির্ভূত হয় এবং তার পরবর্তীকালের আরব এবং সন্নিহিত অঞ্চলে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল।

ইসলামী আইনের বিবর্তন

রাসূলুল্লাহ (সা) এর যুগে ইসলামী আইন সংক্রান্ত যাবতীয় ফায়সালা স্বাভাবিক ভাবে নিজেই করতেন| ফাতওয়া এবং প্রয়োজন বোধে তার কারণ নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামী আইনের দৃষ্টিকোণ হতে বলতে গেলে, এ যুগটি ছিল সুন্দর জীবন গঠন এবং কল্যাণব্রতী সমাজ প্রতিষ্ঠার যুগ। সময়, কাল, অবস্থা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে তিনি তাঁর সামনে আনিত সকল উপস্থিত প্রশ্ন, সমস্যা, পরামর্শ এবং দাবির আলোকে যথাযথ জবাব, সমাধান এবং মীমাংসা দিয়েছেন। তাঁর মীমাংসার মধ্যে কখনো তিনি প্রচলিত আইন ও

ঐতিহ্যের মধ্যে পরিবর্তন ও সংশোধন করে তা প্রচলিত রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর যুগে ইসলামী আইনে কেবলমাত্র দু'টি উৎসই আমরা দেখতে পাই। প্রথমটি হল আল কুরআন ও দ্বিতীয়টি হল রাসূলুল্লাহ এর বাণী ও ব্যাখ্যা।

আল কুরআনে পাওয়া যায় আইনের মূলনীতি, পাওয়া যায় কিছু আইনগত আদেশ নির্দেশ। অন্ধ প্রথা এবং সংস্কার হতে মুক্ত হয়ে ইসলামী আইন নতুন আদর্শ স্থাপন করেছে, শুরু করেছে তার অভিনব যাত্রা। অবশ্য প্রচলিত প্রথাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে এমন কথাও সব সময় বলা যায় না। ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে সমগ্র আরব দেশে প্রথা ভিত্তিক আইনের প্রচলন ছিল। সেগুলোর প্রকৃতি ছিল বিভিন্ন, এক এলাকার আইনের সাথে অন্য এলাকার আইন খাপ খেত না। কিছু কিছু আইন ছিল নিষ্ঠুর। সংস্কার, সংশোধন এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে এই উপাদানগুলোর অনেক কিছুই ইসলামী আইন গ্রহণ করেছে। সংশোধন, সমন্বয় গ্রহণ এবং বর্জনের যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইসলামী আইন পুষ্ট ও পরিবর্ধিত হয়েছে সে প্রক্রিয়ার মূলে আছে অবিনশ্বর ঐশী নীতি। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের পার্থক্য খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু ইসলামী আইনে এ অনৈক্য অপ্রকট। বস্তুত ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র এবং ধর্ম পরস্পর বিরোধী পক্ষাশ্রীত দুই সংস্থা নয়, তারা একই আদর্শের দু'টি শাখা। ইসলামে কোন গির্জা নাই সুতরাং ধর্ম কেন্দ্রের সাথে রাষ্ট্র কেন্দ্রের বিরোধের প্রশ্ন উঠেনা। তবুও বিরোধ এক জায়গায় ছিল। বাস্তব পরিস্থিতির মোকাবেলায় ইসলামী আইনের প্রয়াস করেছে কিন্তু সে প্রয়াস সব সময় সর্বজন সমর্থিত হয়নি, এই দ্বন্দ্ব যেমন পুরাতন যুগে তেমনি বর্তমান যুগে সমভাবে উচ্চকণ্ঠ। ইসলামী আইনের ইতিহাস আলোচনা করলে দু'টি বিশেষ দিকে এ আইনের পরিবর্তনের ধারা স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ধারাটিতে নিষ্ঠা এবং রক্ষণশীলতা প্রকট। আল কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর সুন্নাহর বাইরে সব কিছুই এই ধারার মতে অগ্রহণীয়। দ্বিতীয় ধারাটি আধুনিকায়নের। বিশ্বের ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ ইসলামী আইনকে স্থান এবং কাল ভিত্তিক পরিস্থিতির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিবর্তনের প্রয়াসী। এই আধুনিকায়ন ইসলাম অনুযায়ি; ইসলাম পরিপন্থী নয়। ইসলামী আইনের স্থলে ধর্মনিরপেক্ষ আইন প্রবর্তনের কোন অভিপ্রায় এই ধারার মধ্যে নেই। এই ধারার অনুসারীদের অভিমত এই যে, দীন ইসলাম ব্যাপকভাবে হওয়া উচিত কিন্তু ইহার ঐতিহ্যবাহী আকার প্রকার নবায়নযোগ্য।

(ক) তাখাইউর

তাখাইউর শব্দটি আরবি (تخير) যার অর্থ ভাল। ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত Resardson এর পার্সিয়ান এরাবিক ইংরেজি অভিধানের তৃতীয় সংস্করণে তাখাইউর (Takkayur) এর অর্থ দেয়া হয়েছে বাছাই করে লওয়া (Selecting) অধিক পছন্দ করা (Prefering) এবং মনোনীত করা বা স্থির করা (Choosing)। এ ছাড়া লন্ডনের W.H Allen & Co হতে ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত Thomas partic

Dhaka University Institutional Repository

hugheehes এর A Dictionary of Islam এ তাখাইউর সম্পর্কে বলা হয়েছে। ‘ভাজ করে ফেলা’। আল্লাহ তা‘আলা বলেন: “সূর্য যখন নিষ্প্রভ হবে তখন সকল দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে”।[৫৪]

“When the sun is wound round and its light is lost and is overthrown.” (Surah 81. At-Takwir. Part 30. Ayat 1).

(খ) তালফীক

তালফীক শব্দটি আরবি (لفق) ‘লফিক’ হতে এসেছে এবং ইহার অর্থ হল সংগ্রহ। এগুলো মিস্র ধারণার ফল। বিভিন্ন দেশে মুসলিম আইনের সংস্কার সাধনে ব্যবহৃত তালফীক এর কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হল।

(১) ভারতীয় উপমহাদেশে কোন মুসলমানের মৃত্যুর পর ৪০ দিন অথবা ৪ দিন অতিক্রান্ত হলে চল্লিশা বা কুলখানির আয়োজন করা হয় তা ইসলাম ধর্মের মূল বিধান বহির্ভূত। এ সকল মিস্র ধারণা হতে সংগৃহীত।

(২) মিসরের কায়রোতে উমাইয়া যুগে এসে কয়েকজন খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের জাঁকজমকপূর্ণ ২৫ ডিসেম্বর বা যিশুর জন্মদিনকে বড় দিন উদযাপনের বিপরীতে অন্যরূপ অনুষ্ঠানের কথা ভাবতে থাকেন। অবশেষে তারা ঈদ- ই মিলাদুন্নবী উদযাপন অনুষ্ঠান করে। এটা আলিমদের থেকে অনুমোদন না পেলেও উদারপন্থীদের অনুমোদন পেয়েছিল। কালক্রমে ইহা একটি ধর্মীয় অনুশাসনে পরিণত হয়েছে।

(৩) ভারতের খুব জনপ্রিয় আলিম মাওলানা ইলিয়াছ এর কাছে এক ব্যক্তি নালিশ করেন যে, তার কাছে নিয়মিত যাতায়াতকারী একজন মুসলমান নিজের বাড়িতে খুব ঢোল বাজায়। এজন্য উক্ত লোকটি তার নিকট আসা উচিত নয়। মাওলানা ইলিয়াসের নিকট উক্ত লোকটি ব্যাখ্যা করেন যে, তার বাড়ি গ্রামে এবং গ্রামের বাকী সকলেই হিন্দু। ফলে হিন্দুদের কাছে নিজেকে গুরুত্বহীন মনে হয়। তাদের কার্যক্রমের মধ্যে একাকী হারিয়ে না গিয়ে সেগুলোর বিপরীতে অস্তিত্ব প্রকাশের জন্য নিশান উড়িয়ে ঢোল বাজিয়ে জিকির বা আল্লাহর নাম স্মরণ করে অসচেতন মুসলমানদের উৎসাহ প্রদান করার জন্য উক্ত ব্যক্তি এ কাজটি করেন। মাওলানা ইলিয়াছ পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিষয়টিতে মৌন সমর্থন করেন এবং কালক্রমে ইহা ভারতীয় রেওয়াজ বা রীতিতে পরিণত হয়েছে।

(গ) ইজতিহাদ

মুসলিম আইন বিজ্ঞানে ইজতিহাদ বলতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে বুঝায়। অর্থাৎ আইনের উৎস সমূহ বিবেচনা করে আইনটি তার মূলতত্ত্ব খুঁজে বের করার ব্যাপারে আইনবিদগণ কর্তৃক তার সকল জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করার নামই হল ইজতিহাদ। ইজতিহাদ একমাত্র মুজতাহিদগণই সৃষ্টি করার অধিকারী। মুজতাহিদগণ এক পর্যায়ে ইজতিহাদকে অযৌক্তিক ফাতওয়া দানের মাধ্যমে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে। ফলে সচেতন সুন্নী আলিমগণ ইজতিহাদের দ্বার রুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। আব্বাসী শাসনামলে তারা ঘোষণা করেন যে,

---

[৫৪] আল কুরআন , ৮১: ১ - اذا الشمس كورت

পরবর্তী আলিমগণ এ শারী'আতের নির্দিষ্টকৃত বিধান শুধু অন্ধ অনুকরণ করবেন, নতুন কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না। এভাবে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চলেছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিসরের বিখ্যাত মুসলিম আইন বিজ্ঞানী মোহাম্মদ আব্দুহ কুরআনের ভিত্তিতে নতুন ব্যাখ্যার আলোকে মুসলিম আইনের বড় রকমের পরিবর্তনের সুপারিশ করেন। তা ইজতিহাদ ছাড়া কিছুই নয়। আল্লামা ইকবাল তার ইসলামের পুনর্গঠন পুস্তকে অত্যন্ত জোড়াল ভাবে বলেন যে, ইজতিহাদ বর্তমান যুগের মুসলমানগণের শুধু অধিকারই নয় বরং কর্তব্যও বটে।

সর্বপ্রথম নব্য ইজতিহাদের বাস্তব রূপের প্রকাশ ঘটে সিরিয়ার ১৯৫৩ সনের ব্যক্তিগত পদমর্যাদা আইনে। তবে ইহার পূর্ণ প্রকাশ হয় ১৯৫৭ সনে তিউনেসিয়র ব্যক্তিগত পদমর্যাদা আইনে। মিসরের মোহাম্মদ আব্দুহ এর সুপারিশ অনুযায়ী তিউনিসিয়গণ স্বীকার করে নিলেন যে, কোন ব্যক্তির শুধু আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলেই একাধিক বিবাহের যোগ্য হয় না। শর্ত হল সকল স্ত্রীর সাথে সমান ভাবে ব্যবহার করতে হবে। যদি এমন সাক্ষ্য আসে যে, একাধিক বিবাহে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে সকল স্ত্রীকে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সমানভাবে রাখা সম্ভব নয়, তবে বহুবিবাহের অনুমতি দেয়া যায় না। ফলে তিউনিসিয়গণ ১৯৫৭ সনের আইন দ্বারা বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তদানিন্তন পাকিস্তানে ১৯৫৫ সনে মুসলিম আইন সংস্কারের জন্য একটি কমিশন গঠণ করা হয়। উক্ত কমিশন মুসলিম আইনের কিছু কিছু সংস্কার ও সংশোধনীর সুপারিশ করেন। ফলে ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইন পাশ হয়।

সাংবিধানিক আইন

ইসলামী আইনসমূহের যে অধ্যায়ে সাংবিধানিক আইন আলোচিত হয় তার নাম সিয়ার। এ অধ্যায়ে সম্প্রদায়ের প্রধানের অধিকার এবং দায়িত্ব বর্ণিত হয়, ইসলামী আইন আল্লাহ কর্তৃক মানুষের প্রতি প্রেরিত সংবিধান যা মানুষের পার্থিব ও অপার্থিব জগতের মধ্যে যোগসূত্র তৈরী করে। এ সাংবিধানিক আইন পরিবর্তনীয় নয়। কারণ একমাত্র আল্লাহ ইহা প্রণয়ন করেছেন। অতএব মুসলিম আইনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পার্থিব জগতে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং পারলৌকিক জগতে কাঙ্খিত জান্নাতের অধিবাসী হওয়া।

সাক্ষ্য আইন

ইসলামী সাক্ষ্য আইনের অংশ বিশেষ মূল আইনে এবং কিছু অংশ সহায়ক আইনে সংযুক্ত হয়ে মৌখিক সাক্ষ্যকে শাহাদাৎ বলে এতে যোগ্যতার প্রশ্ন সংযুক্ত। অন্য কোন ব্যক্তির উপর যে যার সৃষ্টি করতে পারে সে ব্যক্তিই সাক্ষ্য দিতে পারে। সাক্ষ্য প্রমাণকে সার্বিকভাবে ধারণা বলে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্তব্য এবং দায়িত্ব বলবৎ করার জন্য সত্য নির্ধারণে আদালতকে সাহায্য করা।

(১) প্রণয়ন

ইসলামিক আইনতত্ত্ব কোন সংসদ কিংবা সংবিধান কর্তৃক প্রণীত নয়। ইহা আল্লাহর ঐশী প্রত্যাদেশের উপর প্রণীত। কিন্তু আধুনিক আইনতত্ত্ব কোন সংবিধান কিংবা রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক প্রণীত।

(২) অনুসরণ

ইসলামিক আইনতত্ত্ব অন্য কোন আইনকে অনুসরণ করে না কিন্তু আধুনিক আইন বিজ্ঞান ইসলামিক আইনতত্ত্বকে অনুসরণ করে।

(৩) পর্যালোচনা

ইসলামিক আইনতত্ত্ব আল কুরআন, হাদীস, ইজমা' এবং কিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে সমস্ত মুসলিম সমাজের চলতি অবস্থা পর্যালোচনা করে অপর দিকে আধুনিক আইনতত্ত্ব সমগ্র আইনের বিধি পর্যালোচনা করে।

(৪) প্রযোজ্য

ইসলামিক আইনতত্ত্ব একমাত্র মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য অন্যদিকে আধুনিক আইনতত্ত্ব রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য।

(৫) মতামত

ইসলামিক আইনতত্ত্ব জনসাধারণ কিংবা রাষ্ট্র প্রধানের মতামতের উপর নির্ভর করে না।কিন্তু আধুনিক আইনতত্ত্ব জনসাধারণ কিংবা রাষ্ট্র প্রধানের উপর বর্তায়।

(৬)প্রয়োগ

ইসলামিক আইনতত্ত্ব প্রয়োগগত পালনে বাধ্য করে আখিরাতের শাস্তির ভয়ে। অপরদিকে আধুনিক আইনতত্ত্ব প্রয়োগ পালন বাধ্য করে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও বিধির ভয়ে।[৫৫]

[৫৫] এম. মনিরুজ্জামান, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন*, (ইসলামিক আইন) প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী, ২০০৪, ৮ম সংস্করণ, ২০১৩, ধানসিঁড়ি পাবলিকেশন্স, ঢাকা: পৃ. ২০- ২৫

ইসলামী আইনতত্ত্ব

ইসলামী আইনতত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা

ইসলামী আইনতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান, যা মহান স্রষ্টার হুকুম ও ঐশীবাণীতে পরিপূর্ণ। এ আইন প্রধানতঃ ধর্মীয় ও নৈতিক, যা পবিত্র কুরআনের বাণী ও শেষ নবী রাসূলের (সা) শিক্ষার দ্বারা সমুজ্জল। সর্বোপরি ইসলামী আইনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অন্য সকল আইন হতে আলাদা। আইনতত্ত্ব বলে সাধারণতঃ আচরণ বিধিকে বুঝাবে যা সার্বভৌম কর্তৃক বলবৎ করা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এর অর্থ অন্যরকম। মানুষের তৈরী আইন ইসলামী আইনতত্ত্বে স্বীকৃত নয়। ইসলামী আইনকে শারী'আত বলা হয়। শারী'আত অর্থ হচ্ছে পানির সন্ধান দানকারী। যে বিশেষ অর্থে ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশিত পথ। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমই হলো আইন। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আইন অনুসারে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর হুকুমসমূহ এবং রাসূলের নির্দেশিত পথই হলো আইন।

ইসলামী আইনের প্রকৃতি

মুসলিম আইন হলো ঐশ্বরিক আইন। এই আইন কোন অবস্থাতেই কুরআন, হাদীস, ইজমা' এবং কিয়াসের পরিপন্থী হবে না। কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত এই আইন প্রণয়নও করতে পারে না কিংবা পরিহারও করতে পারে না। মুসলিম আইন মুসলমানদের উপর কার্যকর হয়ে থাকে। মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণি রয়েছে। এক শ্রেণির মুসলমান অন্য শ্রেণিতে পরিবর্তিত হতে পারে। উল্লেখ্য যে, এরূপ পরিবর্তনের জন্য কোন বাঁধা ধরা নিয়ম পালন করার প্রয়োজন হয় না। এ কারণে একজন শিয়া মুসলমান সূন্নী মুসলমানে বা একজন সূন্নী মুসলমান একজন শিয়া মুসলমানে পরিবর্তিত হতে পারে। একইভাবে এক উপশ্রেণি হতে অন্য উপশ্রেণিতে রূপান্তরিত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি যে শ্রেণির মুসলমান, তার বেলায় সে শ্রেণির আইন বলবৎ হবে। এ সকল কারণে মুসলিম আইনকে 'ব্যক্তিগত আইন' (Personal Law) বলা হয়।

ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য

কোন মুসলমান এক রাষ্ট্র হতে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে অধিকার পেলেও তার জন্য বিবাহ, মোহরানা এবং বিবাহ বিচ্ছেদ মুসলিম আইন মোতাবেক কার্যকরি হবে। ভৌগোলিক সীমার ভিত্তিতে এ সকল বিষয় কার্যকরি না হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি একজন মুসলমান এ হিসেবে কার্যকরি হবে। অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়সমূহে রাষ্ট্রীয় আইন বলবৎ না হয়ে ব্যক্তি হিসেবে মুসলিম আইন বলবৎ বা কার্যকর হবে।

ইসলামী আইন বিজ্ঞান মোতাবেক রাষ্ট্র প্রধান বা খলিফা বলতে জনগণের প্রতিনিধিকে বুঝায়। খলিফা মহান আল্লাহ প্রদত্ত আইনসমূহ কার্যকর করবেন। মানুষ সার্বভৌম নয়, তাই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব বলতে আল্লাহ তা'আলাকে ইহার প্রকৃত অধিপতি বুঝায়। খলিফা জনগণের প্রতিনিধিই শুধু নন, তিনি ঐশ্বরিক আইনসমূহ কার্যকরি করার নিমিত্তে নিয়োজিত একজন প্রতিনিধিও বটে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুসলিম আইন প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। মুসলিম আইনের পদ্ধতিগত দিক প্রয়োগ করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন বিষয়ের উপর কিছু কিছু আইন প্রণয়ন করেছে মুসলিম আইনের মৌলিকত্বের পরিপন্থী নয় বিবেচনা করে বিভিন্ন দেশ এ আইন কার্যকর করে চলছে। বাংলাদেশেও এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামী আইনের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর আইন অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির পথ নিশ্চিত করা।

ইসলামী আইনের সঙ্গে অন্যান্য আইনের পার্থক্য

ইসলামী জুরিসপ্রুডেন্স প্রধানতঃ ঐশী প্রত্যাদেশের উপর ভিত্তিশীল। বুৎপত্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, অন্যান্য আইনতত্ত্ব যেমন রোমান ব্যবহার তত্ত্ব অত্যন্ত সুপ্রাচীন এবং এর ভিত্তি হলো পৌত্তলিকতা। কিন্তু ইসলামী আইন বিশেষ কোন দেশের সংসদ, রাজা, বাদশা বা সম্রাট কর্তৃক সৃষ্ট আইন নহে। ইহা মূলতঃ ধর্মীয় এবং নৈতিক, যা কুরআনের বাণী বা রাসূলের শিক্ষার দ্বারা সমুজ্জল। তাই এদের সহিত ইসলামী আইনের সাদৃশ্যের পরিবর্তে বৈসাদৃশ্যই বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

ইসলামী আইন মানুষের মুক্তির সনদ ও আলোর দিশারী। তাই রোমান আইনের ক্রীতদাস, সম্পত্তি ইত্যাদি ইসলামে বর্ণিত সম্পত্তির ধারণার চেয়ে ব্যাপকভাবে ভিন্ন। রোমক ক্রীতদাসরূপী মানুষগণ ইসলামী আইনে ভোগ্য সামগ্রীর উর্ধ্বে স্থান পেয়েছে। ধর্মীয় এবং নৈতিকতাবোধের ভিত্তি হিসেবেই ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত এবং যা কুরআনের বাণী এবং রাসূলের শিক্ষার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত বা উৎসারিত। কিন্তু অন্যান্য আইনে মানবতার মুক্তির এমন ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায় না।

অন্য কথায়, অন্যান্য আইনের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যে সমস্ত আদেশ মানুষ পালন করতে বাধ্য এবং না করলে তাকে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখী হতে হয় এবং যেগুলো প্রধানতঃ আদালত কর্তৃক কার্যকর হয়ে থাকে সে সমস্ত আদেশই আইন। কিন্তু ইসলামী আইনতত্ত্বে আইনের ধারণা এরূপ সংকীর্ণ নয়। ইসলামী আইনতত্ত্বে আইনদাতার সমগ্র অভিপ্রায়ের প্রকাশকে আইন বলা হয়ে থাকে। ইসলামী আইনতত্ত্বে আদেশ নির্দেশকে কার্যকরি করার জন্য আদালতে ব্যবস্থা না থাকলেও ঐগুলো আইন রূপে গণ্য হবার অধিকার রাখে। ইসলামী আইনে আদালতে কার্যকরি করা যায় এমন আদেশ নির্দেশের সংখ্যা স্বভাবতই স্বল্প। তাই বলা যায়, ইসলামী আইনের প্রয়োগ করা হয় সাধারণতঃ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে। যে ব্যক্তি মুসলিম বা যার ধর্ম ইসলাম তার উপর

ইসলামী আইন প্রযোজ্য। দেশ বা রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য কোন মুসলিমের উপর আইন প্রয়োগ ব্যবহৃত করা হয় না। ইসলামে আইনের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর আদেশ তথা নির্দেশ তথা ধর্মবোধ এবং বিবেক, রাষ্ট্রীয় শক্তি নয়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তা বলবৎ করার দায়িত্ব ইহার প্রশাসনিক শাখার।

ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য

(১) মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল প্রকার কর্মকাণ্ডে আল্লাহর নির্দেশকে এবং রাসূলের আদর্শকে বাস্তবায়নই ইসলামী আইনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। এ আইন ধর্ম নির্ভরশীল এবং নৈতিকতা ভিত্তিক।

(২) আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারের পর কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশাবলী পালনে মানুষকে বাধ্য করে ইসলামী আইন।

(৩) কুরআন এবং সুন্নাহর পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ইসলামী আইনে নেই।

(৪) ইহা ঐশী আইন বিধায় নির্দেশ পালনের জন্য পুরস্কার এবং অমান্যকারীদের জন্য শাস্তির ইঙ্গিত আছে যা পরলোকে বাস্তবায়িত হবে বলে বিশ্বাস করা হয়। তাই বিশ্বাসীদেরকে গোপনে অপরাধ করতে নিরুৎসাহিত করে এবং সৎ ও ভাল কাজ করতে উৎসাহিত করে।

(৫) মানুষের সার্বিক আচরণবিধি এ আইনে নির্দেশিত রয়েছে। তাই একে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধি বলা হয়।

ইসলামী আইনতত্ত্বের প্রতিশব্দ ফিকহ। ফিকহ শব্দটির আসল অর্থ উপলব্ধি বা কোন কিছুর ধারণা। হিজরী পঞ্চম শতকের গোড়ার দিকে ছা'লাবী রচিত একটি গ্রন্থের নাম 'ফিকহ' যা মূলতঃ ভাষা বিজ্ঞানের অভিধান। আইনের কোন শব্দই যে গ্রন্থে নাই বরং তা আরবি ভাষার পারদর্শিতা অর্জনের সহায়ক কতগুলো নিয়ম বিধির সমারোহ। মুসলিম আইন বিজ্ঞান বা আইনতত্ত্ব মহান আল্লাহর ইশারা বা নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানব জাতিকে আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল রাখা পার্থিব জগতে সংসার ভালভাবে পরিচালনা করা এবং সমাজের মধ্যে মানুষের মূল সম্পর্ক গড়ে তোলার মহান উদ্দেশ্যে আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূল (সা) এর প্রতি যে ঐশীবাণী বা প্রত্যাদেশ প্রেরিত হয়েছে ইহাই ইসলামী আইনের মূল অবলম্বন।

এই পবিত্র ঐশী গ্রন্থকেই সর্বপ্রধান এবং মূল হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং যার উপর ভিত্তি করে অন্যান্য আইন প্রণয়ন ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ইহা একটি বিধিবদ্ধ গ্রন্থ। বিশ্বমানবতার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির

সুমহান উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ তা'আলা এ পবিত্র গ্রন্থ নাযিল করেন। ফলে ইহার অন্তর্ভুক্ত আইনের সম্পূর্ণ অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য তাফসির, হাদীস ও সুন্নাহর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।[৫৬]

[৫৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ ১- ৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী আইনের উৎস
ইসলামী আইনের মূলনীতি
ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য
ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী আইনের উৎস
(Source of Islamic Law)

আইনের উৎস বলতে ঐসব মৌলিক বিষয়কে বুঝায়, যা থেকে কোন নীতি বা বিধান নির্গত হয়। অতএব ইসলামী আইনের উৎস বলতে ঐসব মৌলিক বিষয়কে বুঝায়, যা থেকে বা যার ভিত্তিতে ইসলামী বিধি- বিধান নির্ণীত হয়। ইসলামী আইনের উৎস কয়টি তা নিয়ে ইসলামী আইন বিশারদগণ মতভেদ করেছেন। তাঁরা কিছু উৎসের ব্যাপারে একমত হয়েছেন আবার কিছু উৎসের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। আল্লামা নাজমুদ্দিন আত- তুফি [৬৫৭-৭১৬ হি.] তাঁর 'রিসালাতুন ফী রি'আয়াতিল মাসলেহা' গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামী বিধান নির্ণয়ের ১৯টি উৎসের উল্লেখ করেছেন। উক্ত গ্রন্থের ভাষ্যকার ড. আহমাদ আবদুর রহীম আস- সায়িহ [মৃ. ২০১১ খৃ.] এ ছাড়া আরো ২৬টি অর্থাৎ মোট ৪৫টি উৎসের বর্ণনা দিয়েছেন।[১] সেগুলো হলোঃ

(১) আল কুরআন, (২) আস- সুন্নাহ, (৩) ইজমা' উম্মাত, (৪) মদিনাবাসীর ইজমা,' (৫) কিয়াস, (৬) সাহাবীর অভিমত, (৭) জনকল্যাণ বিবেচনা, (৮) পূর্বের বিধান স্থায়ী রাখা, (৯) দায়মুক্ত হওয়ার মূলনীতি গ্রহণ, (১০) প্রথা, (১১) অবরোহণ পদ্ধতি, (১২) অন্যায়ের উপলক্ষ রুদ্ধকরণ, (১৩) দলিল পেশ, (১৪) উত্তম বিধান নির্ধারণ, (১৫) সহজতর পদ্ধতি গ্রহণ, (১৬) পাপ মুক্ত হওয়া, (১৭) কুফাবাসীর ইজমা', (১৮) শি'আগণের দৃষ্টিতে আহলে বাইতের ইজমা', (১৯) চার খলিফার ইজমা', (২০) পূর্ববর্তী শারী'আতের আহরিত বিধি- বিধান, (২১) দলিল অনুসন্ধান, (২২) সামাজিক আচার-আচরণ, (২৩) প্রকাশ্য বা অধিকতর প্রকাশ্য মত অনুযায়ী কাজ করা, (২৪) সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহন, (২৫) লটারীর মাধ্যমে নির্ধারিত বিষয়, (২৬) বড় বড় তাবিঈ'র অভিমত, (২৭) মূলনীতি অনুসরণ, (২৮) নাসের মর্মার্থ, (২৯) বিবেকের সাক্ষ্য, (৩০) অবস্থা অনুযায়ী মীমাংসা, (৩১) সমস্যার ব্যাপকতা, (৩২) দুটি সন্দেহযুক্ত বিষয়ের একটি গ্রহণ, (৩৩) অন্য বিধানের সাথে সম্পৃক্ত থাকার নির্দেশনা, (৩৪) ইলহামের নির্দেশনা, (৩৫) মহানবী (সা) এর স্বপ্ন, (৩৬) অধিকতর সহজ বিষয় গ্রহণ, (৩৭) সর্বাধিক বলা মন্তব্য গ্রহণ, (৩৮) দলিল অনুসন্ধানের পর না পাওয়া, (৩৯) শুধু সাহাবীদের ইজমা', (৪০) আবূ বকর ও উমর (রা) এর ইজমা', (৪১) চার খলিফার সর্বসম্মত অভিমত, (৪২) সাহাবীর কিয়াস বিরোধী অভিমত, (৪৩) কল্যাণ ও অকল্যাণ বিবেচনা, (৪৪) নাস ভিত্তিক উক্তি, (৪৫) 'ইবাদাত ও নির্ধারিত বিষয়ে ইজমা'।

---

[১] ইমাম আত- তুফি, রিসালাতুন ফী রি'আয়াতিল মাসলেহা, বিশ্লেষণ: ড. আবদুর রহীম আস- সায়িহ, লেবানন: দারুল মিসরিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ- ১৪১৩ হি, পৃ. ১৩- ২১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ এসব উৎসকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

প্রথমতঃ

যেসব উৎসের ব্যাপারে আলিমগণের ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে কুরআন ও সুন্নার ব্যাপারে সকলেই একমত। জমহুর ফকিহগণ ইজমা' ও কিয়াস শারী'আতের উৎস হওয়ার ব্যাপারে একমত। মু'তাযিলা মতাদর্শী আবূ ইসহাক আন-নাযযাম [মৃ. ২৩১ হি.] ও খারিজিগণ ইজমা' এবং জা'ফারী ও যাহিরী সম্প্রদায় কিয়াসের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।[২]

দ্বিতীয়তঃ

যেসব উৎসের ভিত্তিতে বিধান নির্ণয়ের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। উপর্যুক্ত চারটি উৎস ব্যতীত অন্যান্য উৎস এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম ভাগ

মৌলিক উৎস

মৌলিক উৎস বলতে যেসব উৎসের ব্যাপারে বিশেষ কোন মতপার্থক্য নেই। এর সংখ্যা চারটি-

১। কুরআন ২। সূন্নাহ ৩। ইজমা' ৪। কিয়াস।

দ্বিতীয় ভাগ

সম্পূরক উৎস

ইসলামী আইনের সম্পূরক উৎসগুলো মূলতঃ আইনের কোন স্বতন্ত্র উৎস নয়; বরং এগুলো আইনের একেকটি রোডম্যাপ। একজন মুজতাহিদ যখন নস, ইজমা' ও কিয়াসের মধ্যে নতুন বিষয়ের কোন বিধান না পান, তখন এর মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবন করতে পারেন।

আল কুরআন (القران) (Quran: the core source)

মহানবী (সা) এর সময়ে কোন সমস্যা দেখা দিলে কিংবা কোন ঘটনা সংঘটিত হলে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর অপেক্ষায় থাকতেন এবং ওহী নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তিনি তা বাস্তবায়ন শুরু করতেন।

আল কুরআনে এ বিষয়ে উল্লেখ আছেঃ "আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর। অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তাঁর দিকে মুখ ফিরাও এবং যাদেরকে কিতাব

---

[২] মুহাম্মদ ইবন হাসান আল-হুজুরি, *আল ফিকরুস সামী ফী তারীখিল ফিকহিল ইসলামী,* বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি, খ. ৩, পৃ. ৩০

দেওয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে মানে যে, উহা তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অবহিত নন”।[৩]

“Verily! We have seen the turning of your (Muhammad’s sm) face towards the heaven. Surely, We shall turn you to a Qiblah (prayer direction) that shall please you, so turn your face in the direction of Al-Masjid-Al-Haram (at Makkah). And wheresover you people are, turn your faces (in prayer) in that direction. Certainly, the people who were given the scripture (i.e.jews and the Christians) know well that, that (your turning towards the direction of the Ka‘bah at Makkah in prayers) in the truth from their Lord. And Allah is not unaware of what the do.” (Surah 2. Al-Baqarah. Part 2. Ayat 144).

আল কুরআনের শাব্দিক বিশ্লেষণ

কুরআন (قران) শব্দটি আরবি কারউন (قرء) শব্দ থেকে নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কারউন শব্দের অর্থ, পাঠ করা। সে হিসেবে কুরআন শব্দটির অর্থ পঠিত (مقروء) । যেহেতু কুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ, এ জন্য কুরআনকে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবার কারও কারও মতে, কুরআন শব্দটি কারনুন (قرن) থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ, জমা করা, একত্রিত করা, সম্মিলন করা সংযুক্ত করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন অর্থ সংযুক্ত (مقرون)।[৪]

কুরআনকে এ অর্থে কুরআন বলার কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। যেমন

ক. কুরআনের আয়াতগুলো একটির সাথে অন্যটি যুক্ত।

খ. কুরআন পূর্ববর্তী সব আসমানী কিতাব, শারী‘আত ও নবী রাসূলের শিক্ষার সারসংক্ষেপ একত্রিত করেছে।

গ. পৃথিবীর সব ধরনের জ্ঞান বিজ্ঞান এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থ

কুরআন এমন এক পরিচিত নাম যার গ্রন্থবদ্ধ কোন সংজ্ঞার প্রয়োজন হয় না। শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে এর দ্বারা সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থের প্রতি মনোনিবেশ হয়। তবুও ইসলামী আইনের নীতিমালাশাস্ত্র তথা উসূল ফিকহে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ এর আইনি সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদের প্রদত্ত সংজ্ঞার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলোঃ

---

[৩] আল কুরআন, *২: ১৪৪* قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون

[৪] ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব,* খ. ১১, পৃ. ৭১; *আল কামূসুল মুহীত,* খ. ১, পৃ. ২৪; *আল-জাওহারী, আস-সিহাহ,* খ. ১, পৃ. ৬৫

هو كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربى المنقول الينا بالتواتر المكتوب بالمصاحف المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس –

"কুরআন আল্লাহর বাণী, যা আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা) এর উপর আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণনাধারায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ এবং তাঁর তিলাওয়াত ইবাদাত হিসেবে গণ্য; সূরা আল ফাতিহা শুরু হয়ে সূরা আন- নাস দ্বারা যা সমাপ্ত"।[৫]

উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে কুরআনের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা হলো-

ক. কুরআন আল্লাহর বাণী।

খ. কুরআন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর উপর অবতীর্ণ। অতএব অন্য নবীর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর বাণী কুরআন নয়।

গ. কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ। কুরআনের অনারব যে সব শব্দ ও নাম রয়েছে সেগুলো আরবি ভাষায় পরিচিত থাকায় আরবি হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণাঃ "আরবি ভাষায় এই কুরআন, আমিই অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো"।[৬]

"Verily, We have sent it down as an Arabic Qur'an in order that you may understand." (Surah 12. Yusuf. Part 12. Ayat 2).

ঘ. কুরআন আমাদের কাছে নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণনাধারার মাধ্যমে পৌঁছেছে। আলিমগণ একমত যে, কোন শব্দ বা পাঠ পদ্ধতি নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণনাধারার ভিত্তিতে বর্ণিত না হলে তা কুরআন হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি।[৭]

ঙ. কুরআন তিলাওয়াত 'ইবাদাত হিসেবে গণ্য। এটি কুরআন কারীমের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, এর পাঠক সাওয়াবের অধিকারী হন।

চ. কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ। অতএব গ্রন্থবদ্ধ কুরআনে নেই এমন কোন কিছুকে কুরআন হিসেবে গণ্য করা হয় না।

ছ. কুরআন সূরা আল ফাতিহার মাধ্যমে শুরু হয়ে সূরা আন- নাসের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। কুরআনের সূরা ও আয়াতের এ ধারাবাহিকতা মহানবী (সা) এর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়েছে।

---

[৫] ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আয-যুহাইলী, *আল ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী,* দামেশক: দারুল খাইর, ১ম প্রকাশ, ২০০৩ ইং, পৃ. ১৩৯

[৬] আল কুরআন ১২: ২ - انا انزلنه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون

[৭] আল-আমিদি, *আল-ইহকাম,* খ. ১, পৃ. ২১৫

এক নজরে কুরআনে বর্ণিত আইন

কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত আইনসমূহ তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ[৮]

১. আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কিত আইন

যা বান্দার বিশ্বাস তথা আল্লাহ, ফিরিশতা, কিতাব, নবী- রাসূল, আখিরাত ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

২. নৈতিক আইন

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কথা, কাজ ও আচরণ সংশ্লিষ্ট। একইভাবে এর মধ্যে ব্যক্তির সামাজিক আচরণও অন্তর্ভুক্ত।

৩. ব্যবহারিক আইন

একে বান্দার কর্মসূচক আইনও বলা যেতে পারে। আইনের এ ভাগকেই আলিমগণ ফিকহ নামে অভিহিত করেন। এ আইন আবার দু'শ্রেণিতে বিভক্তঃ

ক. 'ইবাদাত সংক্রান্ত আইন

যা বান্দার সাথে তার প্রভূর সম্পর্ক বিষয়ক। যেমন, সালাত, যাকাত, সাওম, হাজ্জ ইত্যাদি।

খ. 'ইবাদাত ছাড়া অন্য আইন

যাকে ফকিহগণ মু'আমালাত বা লেনদেন সংশ্লিষ্ট আইন নামে অভিহিত করেছেন। এ শ্রেণির আইন নিম্নোক্ত আটটি শাখাভুক্ত।

১. পারিবারিক আইন

যা পরিবার গঠন, স্বামী- স্ত্রীর সম্পর্ক, মহর, তালাক, সন্তান প্রতিপালন, খোরপোষ নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে। এর মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের ও নিকটাত্নীয়দের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি করাই উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনে এ সংক্রান্ত প্রায় ৭০টি আয়াত রয়েছে।

২. দেওয়ানী আইন

মানুষের পারস্পরিক আর্থিক লেনদেন, চুক্তি, কোম্পানি ইত্যাদি বিষয় এ আইনের অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে পারস্পরিক আর্থিক সম্পর্ক ও স্ব- স্ব অধিকার রক্ষা উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কেও প্রায় ৭০টি আয়াত রয়েছে।

৩. ফৌজদারী আইন

বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও তার শাস্তিবিধান সংক্রান্ত আইন এর অন্তর্ভুক্ত। এ আইনের উদ্দেশ্য মানুষের মান সম্মান, সম্পদ, জীবন ও অধিকার সংরক্ষণ এবং অপরাধীর শাস্তি বিধান করা। কুরআনে এ সংক্রান্ত আয়াতের সংখ্যা প্রায় ৩০টি।

---

[৮] ড. যায়দান, *আল-ওয়াজিয ফী উসূলিল ফিকহ,* পৃ. ১৫৬; ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলি, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী,* খ. ১, পৃ. ৪২০-৪২১; ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আয- যুহাইলি, *আল-ওয়াজিয ফী উসূলিল ফিকহিল ইসলামী,* পৃ. ১৬৪-১৬৫

৪. বিচার আইন

বিচার, সাক্ষ্য, শপথ ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। যা দ্বারা মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে কুরআনে ১৩টি আয়াত রয়েছে।

৫. সাংবিধানিক আইন

শাসনতান্ত্রিত নীতিমালা এ আইনের অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক তৈরী এবং ব্যক্তি ও সমাজের যে সব অধিকার রয়েছে তা বাস্তবায়ন উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কিত আয়াতের সংখ্যা ১০টি।

৬. আন্তর্জাতিক আইন

ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক, যেটি সাধারণ আন্তর্জাতিক আইন এবং ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার, যা বিশেষ আন্তর্জাতিক আইন, এ দু'টোই এর অন্তর্ভুক্ত। এ আইনের উদ্দেশ্য ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের সুসম্পর্ক, যুদ্ধের বিধান নির্ধারণ এবং ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক নির্ণয়। এ সম্পর্কে কুরআনে প্রায় ২৫টি আয়াত রয়েছে।

৭. রাষ্ট্রীয় অর্থ আইন

রাষ্ট্রের অর্থনীতি, রাজস্ব, যাকাত, ধনীর সম্পদে গরীবের অধিকার ইত্যাদি এ আইনের অন্তর্ভুক্ত। এ আইনটি পূর্বে অন্যান্য আইনের মধ্যে থাকলেও বর্তমানে এটি একটি স্বতন্ত্র আইন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ সম্পর্কে কুরআনে ১০টির মতো আয়াত রয়েছে।

৮. খাদ্য আইন

খাদ্য, পানীয় ও পোশাক সম্পর্কে ইসলাম কী কী বিষয় নিষেধ এবং বৈধ করেছে তার বর্ণনা।

আস- সুন্নাহ (السنة) (Sunnah: the second source)

ইসলামে আল কুরআনের পরেই আল হাদীস ইসলামী আইনের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। আল কুরআনের কোন বিধি বিধান সংক্ষিপ্ত হলে মহানবী (সা) তার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতেন। আল কুরআনে কোন প্রসঙ্গে বিধি-বিধান পাওয়া না গেলে মহানবী (সা) ওহী প্রাপ্তির অপেক্ষায় থাকতেন। কারণ তিনি শারী'আতের ব্যাপারে নিজে কিছু বলতেন না। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নির্দেশ দিতেন। সে বিধি- বিধান ও এই ধরনের বহু ঘটনা হাদীসের গ্রন্থাবলীতে সংকলিত হয়েছে। এর অধিকাংশ মহানবী (সা) এর জীবদ্দশায় সাহাবাগণ কর্তৃক মৌখিকভাবে, লিখিতভাবে ও বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে প্রচলিত ছিল। সে বিধ- বিধান মেনে নেয়ার জন্য মুসলমানগণকে আল্লাহ নির্দেশ নিয়াছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আল কুরআনে বলা হয়েছে, “রাসূল (সা) তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর”।[৯]

“And whatsoever the Messenger (Muhammad sm) gives you, take it; and whatsoever he forbids you, abstain (from it) And fear Allah; verily, Allah is Serve is punishment.” (Surah 59. Al-Hasar. Part 28. Ayat 7).

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা সকল ব্যাপারে মহানবী (সা) কে অনুসরণ করার জন্য আহবান জানিয়ে বলা হয়েছেঃ “বল! তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”।[১০]

“Say (O Muhammad sm) to mankind): “If you (really) love Allah then follow me (i.e.accept Islamic Monotheism, follow the Qur‘an and the Sunnah), Allah will love you and forgive you your sins. And Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.” (Surah 3. Al-Imran. Part 3. Ayat 31).

এ ছাড়া মহানবী (সা) স্বয়ং তাঁকে অনুসরণ করার জন্য আহবান জানান। যেমন তিনি বলেছেন, “আমাকে যেরূপ নামায পড়তে দেখেছো, তোমরাও ঠিক সেভাবে নামায পড়বে”।[১১] মহানবী (সা) আরো বলেছেন, “তোমরা আমার নিকট থেকে তোমাদের হাজ্জের নিয়ম কানূন গ্রহণ করো”।[১২]

এভাবে মহানবী (সা) নিজের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতির মাধ্যমে অসংখ্য বিধি নিষেধ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কার্যকর করেছিলেন। কিছু কিছু কাজ এমন ছিল যা শুধু তাঁর নিজের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, উম্মতের জন্য নয়। যেমন সাওমে বিসাল (বিরতিহীন রোযা), একত্রে চার এর অধিক বিবাহ এবং বিনা দেনমোহরে বিবাহ করার বিষয়। আল্লাহ বলেনঃ “এ বিধান বিশেষ করে তোমারই জন্য”।[১৩]

“And the prophet wishes to marry her- a privilege for you only, not for the (rest of) the believers.” (Surah 33. Al-Ahzab. Part 22. Ayat 50.)

---

[৯] *আল কুরআন, ৫৯: ৭* - *ما اتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا والتقوا الله ان الله شديد العقاب*

[১০] আল কুরআন, ৩: ৩১ - *قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم والله غفور رحيم*

[১১] ইমাম বুখারী, *সুনান, অধ্যায়: মানাসিকুল হাজ্জ, অনুচ্ছেদ: আল আযান লিল মুসাফিরীণ, হা. নং- ৬৩১ পৃ. ৫১*

[১২] ইমাম নাসায়ী, *সুনান, অধ্যায়: মানাসিকুল হাজ্জ, অনুচ্ছেদ: আর রুকুর ইলাল সিমারী ওয়া ইসতিজলামুন মুহরিম, আল কুতুবুস সিত্তাহ,* রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০ হা. নং- ৩০৬৪ পৃ. ২২৮৪

[১৩] আল কুরআন, ৩৩: ৫০ - *ان اراد النبى ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين*

Dhaka University Institutional Repository

সূন্নাহ এর শাব্দিক বিশ্লেষণ

আরবি সূন্নাহ (سنة) শব্দটির অর্থঃ পথ, পদ্ধতি, পন্থা , নিয়ম ইত্যাদি।[১৪] শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি ভাল-মন্দ উভয় পথ পদ্ধতি বুঝায়। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমার পূর্বে আমি যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তাঁদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবে না"।[১৫]

"(This was Our) Sunnah (rule or way) with the Messengers We sent before you (O Muhammd sm), and you will not find any alteration in Our Sunnah (rule or way)". (Surah 17. Al-Isra'. Part 15. Ayar 77).

একইভাবে মহানবী (সা) এর বাণীঃ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল রীতি চালু করল এবং পরবর্তীতে অন্যরা উক্ত রীতির অনুসরণ করল, তাঁকে অনুসরণকারীদের সমান প্রতিফল প্রদান করা হবে। তবে অনুসরণকারীদের প্রতিফলে কোন কমতি করা হবে না। একইভাবে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ রীতি চালু করল এবং পরবর্তীতে অন্যরা উক্ত রীতির অনুসরণ করল, তাকে অনুসরণকারীদের সমান প্রতিফল প্রদান করা হবে। তবে অনুসরণকারীদের প্রতিফলে কোন কমতি করা হবে না"।[১৬]

পারিভাষিক অর্থ

ফকিহগণ সূন্নাহ বলতে আইনের ঐ ধরণকে বুঝিয়ে থাকেন, যা ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত নয়, কিন্তু তা পালন করার জন্য বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং যা বিদ'আতের বিপরীত।[১৭]

উসূলবিদগণের পরিভাষায় সূন্নাহ বলা হয়ঃ "মহানবী (সা) এর বাণী, কর্ম ও মৌনসম্মতিকে"।[১৮]

আল্লাহর কিতাব আল কুরআন এবং রাসূল (সা) এর আস- সূন্নাহ এ দু'টির মধ্যে প্রথমোক্ত উৎসে কোন বিষয়ের সমাধান না পাওয়া গেলে দ্বিতীয় উৎসে তা অনুসন্ধান করতে হবে। এ উৎসেও যদি কোন রকম সমাধান পাওয়া না যায় তাহলে ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পরবর্তীকালে আল ইজমা', আল কিয়াস, আল ইসতিহসান, মাসালিহ, মুরসালাহ, উরফ (প্রথা), ইজতিহাদ, ইসতিদলাল প্রভৃতি শারী'আহ আইনের মর্যাদা লাভ করে।

---

[১৪] ফিরোযাবাদী, *আল-কামুসুল মুহীত,* খ. ৪, পৃ. ২৩৭

[১৫] আল কুরআন, ১৭: ৭৭ - سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا

[১৬] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী, *আস-সাহীহ, বৈরুত: দারুল জীল ও দারুল আফাকিল জাদীদাহ,* তারিখ বিহীন, *কিতাবুল ইলম, বাবু মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আও সাইয়িয়াতান ওয়া মান দাআ ইলা হুদা আও দালালাহ,* খ. ৮, পৃ. ৬১, হাদিস নং ৬৯৭৫ من سن فى الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل احر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شئ ومن سن فى الاسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شئ -

[১৭] ড. ওয়াহাবা আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী খ. ১, পৃ. ৪৩২*

[১৮] মুহাম্মদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ইরশাদু ফুহুল ইলা তাহকীকিল হাক্কি মিন ইলমিল উসূল, বিশ্লেষণঃ আবু হাফস শামী ইবন আরাবী, রিয়াদঃ দারুল ফাদীলাহ, ১ম প্রকাশ ২০০০ ইং, খ. ১, পৃ. ১৮৬* - قول النبى صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره

ইজমা' (الاجماع) (The Consensus of Islamic Scholars)

শাব্দিক অর্থ

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইজমা' শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১৯]

প্রথমত

কোন কিছুর জন্য দৃঢ় সংকল্প করা বা দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করা। এ অর্থে মহান আল্লাহর বাণীঃ "তোমরা যাদের শরীক করেছ তাদেরসহ তোমাদের কর্তব্য স্থির করে নাও"।[২০]

"So devise your plot, you and your partners". (Surah 10. Yunus. Part 11. Ayat 71).

একইভাবে মহানবী (সা) এর বাণীঃ "যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়ত নিশ্চিত করল না, তার রোযা হল না"।[২১]

দ্বিতীয়ত

একমত হওয়া বা ঐকমত্য পোষণ করা। কোন বিষয়ে একমত হওয়ার জন্যও দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে হয়। অতএব একক ব্যক্তির দৃঢ় প্রত্যয় সামষ্টিক রূপ নিয়ে ঐকমত্য সম্পন্ন হয়।

পারিভাষিক অর্থ

উসূলবিদগণ ইজমা'র বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ উসূলবিদদের মতে- "মহানবী (সা) এর ইন্তিকাল পরবর্তী যুগে শারী'আতের কোন বিধানের ব্যাপারে তাঁর উম্মতের মুজতাহিদগণের ঐকমত্য"।[২২]

ইজমা' (اجماع) সনাতন মতবাদ অনুযায়ী ইসলামী শারী'আতের চারটি মূল উৎসের মধ্যে তৃতীয় এবং কার্যতঃ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সুনির্ধারিত কোন 'হুকুম' এর বৈধতা প্রমাণের জন্য আইনের উৎস হিসেবে ইজমা' এর ধারণাটি ছিল আল কুরআন প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (সা) সমর্থিত কোন সত্যকে চিরস্থায়ী করবার প্রয়োজনীয়তার ফলশ্রুতি। রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবদ্দশায় বিধান সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনিই ছিলেন 'প্রমাণ'

---

[১৯] আল-আমিদি, *আল-ইহকাম,* খ. ১, পৃ. ২৬১; আদুদুদ্দীন, *শারহে আল-'আদুদ,* খ. ২, পৃ. ২৯; আশ-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল,* খ. ১, পৃ. ৩৪৭; আল-গাযালী, *আল মুসতাসফা,* খ. ১, পৃ. ১১০

[২০] আল কুরআন, ১০: ৭১ - فاجمعوا امركم وشركاءكم

[২১] ইমাম আন-নাসাঈ, *আস সুনান, কিতাবুস সাওম, বাবু যিকরু ইখতিলাফিন নাকিলি লিখাবারি হাফসাহ,* খ. ২, পৃ. ১১৭, হা. নং ২৬৪৬

[২২] ড। ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলিল ফিকহিল ইসলামী,* খ. ১, পৃ. ৪৬৯ انه من اتفاق المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فى عصر من العصور على حكم شرعى -

(হুজ্জাহ) এবং সকল বিষয়ের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর ইন্তিকালের পর নতুন উদ্ভূত সমস্যা সমূহের কোন একটির সমাধানের ব্যাপারে মু'মিনদের মতভেদ হয়। ইসলামের ব্যাপক প্রসারের ফলে কালক্রমে বহু নতুন সমস্যা, পরিস্থিতি ও বিভিন্ন দলের উদ্ভব হলে এই সব সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি অবশ্য পালনীয় নীতিনির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। "উসূলুল ফিকহ" এর উদ্ভব ও সম্প্রসারণের সাথে সাথে অর্থাৎ ২য় থেকে ৮ম শতাব্দী কালে এই নীতির তত্ত্বগত রূপ চূড়ান্ত হয় এবং আইনের উৎস হিসেবে ইজমা' এর "হুজ্জিয়াত" বৈধ প্রামাণিকতা স্বীকৃত হয়।[২৩]

খারিজিগণ কর্তৃক অস্বীকৃত এই বৈধতা "উসূলুল ফিকহ" সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ নিবন্ধাদির দীর্ঘ আলোচনার বিষয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। হানাফি ইজমায়ে' উম্মতের ঐকমত্য সকল মু'মিনগণ পর্যন্ত প্রসারিত। আর 'ইবন হাযম' এর ইজমা' ইহা কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাহাবীগণের মধ্যে সীমিত। তবে উভয়ে একই পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছেঃ ইজমা' হুজ্জিয়াত (প্রামাণিকতা) নির্ভর করে আল কুরআনের একটি আয়াত অথবা এর হাদীসের উপর। এই প্রক্রিয়া পরিষ্কারভাবে ইসলামী আইন শাস্ত্রে ইজমা'র প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে।[২৪] তর্কশাস্ত্রের তুলনায় নীতিশাস্ত্রের প্রতি অধিকতর ঝোঁক বিশিষ্ট মু'তাযিলি যুক্তিবাদে ইজমা' হলো নৈতিক কর্তব্যের আলোকে ব্যক্তিগত প্রত্যয়ের প্রয়োজন। আল গাযালী (র) রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীস "আমার উম্মত কোন ভুলের উপর কখনও একমত হবে না" এর উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তার আলোকে হুজ্জিয়াতুল ইজমা' সম্পর্কে মু'তাযিলি দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। আল গাযালী (র) একটি ন্যায়শাস্ত্রীয় যুক্তির সাহায্যে এই হাদীস সমর্থন করেন।[২৫]

এরিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা হতে অনুপ্রেরণা লাভ করে আল গাযালী (র) সুন্নাহ হতে গৃহীত শাস্ত্রীয় যুক্তিটির ক্ষেত্রে ন্যায়শাস্ত্রের (Syllogsim) যুক্তি ধারার প্রয়োগ করেন, যাতে দু'টি প্রতিজ্ঞা হতে স্থিরীকৃত একটি সিদ্ধান্ত থাকে। এতদসম্পর্কে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা হল ইজমা' ও তাওয়াতুর এর মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ক, তাওয়াতুরের হুজ্জিয়াত হল বস্তুনিষ্ঠ; কেননা ইহা হিসসিয়্যাত সংক্রান্ত এবং হাদীস সমূহের সমমর্মীতা ও রাবীগণের ক্রমসূত্রতার বিশুদ্ধতার মধ্যে নিহিত। এই কারণেই উদাহরণত আল গাযালীর মতে "হিসসিয়্যাত" ও "আকলিয়্যাত" এর ন্যায় নির্ভরযোগ্য তাওয়াতুর নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে, এইভাবে ইজমা'র হুজ্জিয়াত অতিরিক্ত এক বিশ্বাস (তাসদিক) সহ ঐকমত্যের মধ্যে নিহিত। এই তাসদিক বৈষয়িকতার উর্ধ্বে এবং প্রত্যেক বিশ্বাসীর (মু'মিন) গভীর বিশ্বাসের সমান। ইহা হতে বুঝা যাবে যে, আল গাযালী (র) এর নিকট ইজমা' "ধর্মীয় বিধানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস"।[২৬]

---

২৩ *W.M. watt, Islam and the integration of society,* লন্ডন ১৯৬১ খৃ. পৃ. ২০৩

২৪ *আল বাগদাদী, উসূল,* ১৯ ও *আন নাজ জাম,* পৃ. ১৯-২০

২৫ *মুসতাসফা খ ১, পৃ. ১১০*

২৬ *মুসতাসফা খ. ১, পৃ. ১১২,* আল আমিদী, *ইহকাম, খ. ১, পৃ. ৩১৬*

আধুনিককালে আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাফ বর্ণিত সনাতন ও রক্ষণশীল প্রবণতার অনুরূপ মুহাম্মদ 'আব্দুহু এর সংস্কারবাদ হতে পাকিস্তানি কামাল ফারুকী কর্তৃক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একটি আধুনিকতম প্রবণতা ক্রমশ বিকাশ লাভ করছে। কামাল ফারুকী তাঁর সাম্প্রতিককালীন গ্রন্থে সেই সব প্রমাণসমূহের তাত্ত্বিক সমস্যাটি পুণরায় পরীক্ষা করেননি যেগুলোর উপর ইজমা'র বৈধতার ভিত্তি স্থাপিত।[২৭]

মুহাম্মদ 'আব্দুহু'র ন্যায় তিনিও মনে করেন যে, সীমিত অর্থে হলেও ধর্মগ্রন্থীয় প্রমাণ সমূহ "উম্মতের" ঐকমত্যের জন্য আইনগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে। এতদব্যতীত তিনি ইজমা'র ধারণাটিকে 'ইসমাতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ত্রুটি পরিণতিরূপে পূর্ণবিবেচনা করতে প্রয়াস পান। "উম্মতের 'ইসমাত (অভ্রান্ততা) খোদায়ী অভ্রান্ততা দ্বারা নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ" ইহা দেখাতে গিয়ে কামাল ফারুকী প্রথমটির আপেক্ষিক প্রকৃতি চিত্রিত করেন এবং আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজন ও সেই সামাজিক, রাজনৈতিক পদ্ধতির মু'মিনও একটি অংশ, উহার জরুরী অবস্থায় ইজমা'র আইনগত বৈধতার ধারণাটি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হন।

ইজমা'র ক্রমবিকাশ

ইজমা'র বিকাশ লাভ করলে, মদিনা হতে মু'মিনগণ অধিক সংখ্যায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন এবং মুসলিম বিশ্বের প্রসার ঘটতে লাগল, সমস্যার সমাধানও বিভিন্নমুখি হতে লাগল। "অনুকূল সমর্থন" এর মতবাদটি ব্যাপকভাবে অনুশিলন করা হয় এবং একটি বিশেষ বাস্তব (Defecto) ঐকমত্যের ধারণা ইজমা'র একটি তাত্ত্বিক সংজ্ঞা নিরূপণের পথ সুগম করে। বিভিন্ন মতবাদীদের সংজ্ঞা বিভিন্নরূপ হলেও এই ক্রমবিকাশে ভিন্নমত সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা রয়েছে কিতাবু ইখতিলাফী মালিক ওয়াশ শাফি'ঈতে।[২৮]

ইমাম শাফি'ঈ (র) "মদীনার রীতির ধারণাটিরও অসম্পূর্ণ স্বরূপ প্রদর্শন করে মদীনার ঐকমত্যের ধারণাকে বিতর্কের মধ্যে নিয়ে আসেন। তিনি বিদ্যমান ঘটনাও অবস্থার সমর্থক মালিকি ইজমা'র পরিবর্তে এমন একটি মৌল সত্যের সুদৃঢ় সমর্থনকে স্থাপিত করেন, যার উপর যতদূর পর্যন্ত আইন সংশ্লিষ্ট ছিল উম্মতের সর্বসম্মত মতামতের অভ্রান্ততা নির্ভর করে। আইন ভিত্তিক না হলেও নীতিটি আইনের পরিভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইমাম শাফি'ঈর একমাত্র গ্রন্থ "আর রিসালা" কে মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে বিকশিত চিন্তাধারার সার সংকলনরূপে বিবেচনা করা উচিত। ইহাই প্রাচীন ধর্মীয় আইনের বৈশিষ্ট্য, যা ছিল আবশ্যিক ও অপরিহার্যভাবে মৌখিক প্রেরণা ও সম্প্রসারণের একটি মতবাদ। আল গাযালীর "মুসতাসফা" অর্জিত প্রণালীবদ্ধতা ও নিয়মাবদ্ধতার স্তরে উপনীত হতে আমাদিগকে অবশ্যই এক লাফে তিন শতাব্দীকাল ডিঙ্গাতে হবে।

---

২৭ *Islamic jurisprudence,* করাচী, ১৯৬২ খৃ.

২৮ *কিতাবুল উম্ম, খৃ.* ৭, পৃ. ১৭৭-৮৩

ইবন হাযম এর "আল ইহকাম ফি উসূলিল আহকাম" গ্রন্থটিতে আমরা উসূলুল ফিকহের উপর এমন একটি রচনার মুখোমুখী হই, যেখানে ইজমা' একটি আইনগত উৎস হিসেবে বিবেচিত, তবে এই উৎসটির একটি ভিত্তি প্রয়োজন এবং উহাতে কতিপয় প্রয়োগগত সমস্যা রয়েছে যেগুলোর সমাধান আবশ্যক। ইবন হাযমের মতে ইজমা' রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাহাবীদের ইজমা'র মধ্যেই সীমিত। সাদৃশ্যপূর্ণ যুক্তির (কিয়াস) ব্যবহার প্রত্যাখ্যানকারী ও প্রমাণিত মূল উদ্ধৃতিসমূহের একচেটিয়া ব্যবহারের উপর জোর প্রদানকারী এই রীতি কেবল সেই ইজমা' অনুমোদন করতে পারে যা রাসূলুল্লাহ (সা) এর কোন প্রত্যাদিষ্ট উদ্ধৃতি হতে উদ্ভূত হয়েছে। এইক্ষেত্রে মনে হয় ইজমা' যেন কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক পুনঃনিবিষ্ট। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইজমা' গঠন সম্পর্কিত প্রায়োগিক সমস্যাবলী অনেকটা কমে যায়। সাহাবীদের ইজমা' পর্যন্ত পৌঁছার জন্য একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রের প্রয়োজনীয়তা, ইহা গঠনকারীদের সমস্যাটি, যা এক যুগের লোকদের মধ্যে মতের বিভিন্নমুখিতার কারণে উদ্ভূত হয় সমাধান করে দেয়। "উলুল আমর" কথাটি যা ইবন হাযম প্রায়ই ব্যবহার করেছেন, প্রমাণ করে যে, উমারা ও উলামার উচিত আমাদের উপর শুধুমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত কাজগুলো আরোপ করে আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করা। পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকারের সমস্যাটির এইভাবে নিস্পত্তি হয়ে যায় এবং একইভাবে প্রত্যেক যুগে গোটা উম্মতের মতামত যাচাই করার প্রয়োজনে উদ্ভূত জটিলতাও আর দেখা যায় না।

আল কিয়াস (القياس) (Analogy)

কিয়াস ইজতিহাদের অন্তর্ভুক্ত এবং ইসলামী আইনের ব্যাপকতর ও গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে স্বীকৃত। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'র পরে কিয়াস হলো ইসলামী আইনের অন্যতম একটি উৎস। উদ্ভূত কোন বিষয়ের সমাধান কুরআন, সুন্নাহ কিংবা ইজমা'য় পাওয়া না গেলে সেই বিষয়ে কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পরে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত তিনটি উৎসে উদ্ভূত বিষয় সম্পর্কিত বিধান পাওয়া না গেলে কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করে তৎসম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করা হয়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ

আরবি কিয়াস (قياس) যা দু'টি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়-

প্রথমত

পরিমাপ ও পরিমাণ নির্ধারণ। একটি দিয়ে অন্যটির পরিমাপ করা। যেমন বলা হয়,

قست الارض بالمتر (আমি মিটারের মাধ্যমে ভূমির পরিমাপ করেছি)।[২৯]

দ্বিতীয়ত

তুলনা করা, একটির সাথে অন্যটির সাদৃশ্য নির্ধারণ করা। যেমন বলা হয়, قايست بين العمودين (স্তম্ভ দু'টির পরিমাপ নির্ধারণের জন্য আমি পরস্পরের মধ্যে তুলনা করেছি)।[৩০]

পারিভাষিক অর্থ

ড. আবদুল করিম যায়দান [জন্ম ১৯১৭ খৃ.] এর উক্তি গ্রহণ করা যায়। তিনি বলেনঃ "যে বিষয়ের বিধানে কোন নস বর্ণিত হয়নি, উক্ত বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের জন্য তাকে যে বিষয়ের বিধানে নস বর্ণিত হয়েছে তার সাথে এ ভিত্তিতে মিলানো যে, উক্ত বিধানের ইল্লতের (কার্যকারণ) ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান"।[৩১]

আল্লামা ইবনুল হাজিব [৫৭০-৬৪৬ হি.] সংক্ষেপে বলেছেনঃ "বিধানের ইল্লতের দিক থেকে শাখা প্রশাখা মূলের অনুরূপ হওয়া" ।[৩২]

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রে হুকুমকে মূল হতে শাখার দিকে স্থানান্তরিত করাকে কিয়াস বলা হয়। যেমন, এমন কতগুলো বিষয় উদ্ভূত হয়েছে যেগুলো সম্পর্কিত বিধান শারী'আতের উপর্যুক্ত উৎস সমূহে বিদ্যমান নেই বটে, কিন্তু উক্ত বিষয়গুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কতগুলো বিষয় সম্পর্কিত আইন আছে। এরূপ অবস্থায় প্রথমে বিদ্যমান বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলীর কারণসমূহ উদ্ভূত বিষয় সমূহের মধ্যেও বিদ্যমান পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে ঐ একই বিধান প্রযোজ্য হবে।[৩৩]

বিচারপতি শহীদ আবদুল কাদির আওদাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে বিষয় সম্পর্কে শারী'আতের নস (نص) বিদ্যমান নেই সেই বিষয়কে কারণ সমূহের অভিন্নতার ভিত্তিতে এমন একটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা যায়, যার সম্পর্কে শারী'আতের নস ভিত্তিক বিধান বিদ্যমান আছে, তাকে কিয়াস বলা হয়।[৩৪]

---

[২৯] ড. যায়দান, ***আল-ওয়াজিয ফী উসূলিল ফিকহ,*** পৃ. ১৯৪

[৩০] ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলিল ফিকহিল ইসলামী,* খ. ১, পৃ. ৫৭২

[৩১] ড. যায়দান, *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহ,* পৃ. ১৯৪ الحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيد نص على حكمه فى الحكم لا شتر اكهما فى علة ذالك الحكم -

[৩২] শামসুদ্দিন মাহমুদ ইবন আবদুর রহমান ইবন আহমদ আল-ইস্পাহানী, ***বায়ানুল মুখতাসার শারহে মুখতাসারি ইবনুল হাজিব,*** বিশ্লেষণঃ ড মুহাম্মদ মুজহার বাকা, মক্কাঃ উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, খ. ৩, পৃ. ৫

[৩৩] মুল্লা জিউন, প্রাগুক্ত, *পৃ. ৩২৩-৩২৫*

[৩৪] বিচারপতি আবদুল কাদির আওদাহ, *আত তাশরীউল জিনাইল ইসলামী,* বৈরুত: মুয়াসসাআনতুর রিসালাহ, ১৯৮৬, ১ম খণ্ড, পৃ ১৮২, ধারা, ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

মালিকি মাযহাবের ফিকহবিদগণ বলেন, কারণ সমূহ বিবেচনা পূর্বক নির্গত বিধানকে মূল বিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ করার প্রক্রিয়াকে কিয়াস বলা হয়।[৩৫]

কিয়াসের উদাহরণ

(১) মদ্যপান একটি সামাজিক সমস্যা। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়-

"হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না"?[৩৬]

"O you who believe! Intoxicants (all kinds of alchoholic drinks), and gambling, and Al-Ansab, and Al-Azlam (arrows for seeking luck or decision) are an abomination of Shaitan's (Satan) handiwork. So avoid (strictly all) that (abomination) in order that you may be successful.

Shaitan (Satan) wants only to excite enmity and hatred between you with intoxicants (alcoholic drinks) and gambling, and hinder you from the remembrance of Allah and from As-salat (the prayer). So will you not then abstain?" (Surah 5. Al-Ma'idah. Part 7. Ayat 90-91.)

আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে মদ্যপান হারাম ঘোষণা করেছেন। কারণ এতে রয়েছে নানা ধরনের অনিষ্টকারী উপাদান, যেমন মাদকতা। আয়াতে খামর শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো, আঙ্গুরের রস থেকে তৈরী করা মদ। এ মদ পান করার ফলে পানকারীর মাঝে মাদকতা আসে। ফলে সে মাতাল হয়ে পড়ে। উপরে বর্ণিত 'খামর' ছাড়াও বর্তমানে আরও এমন অনেক বস্তু রয়েছে যা পানকারীকে মাতাল বানায়। এমতাবস্থায় মুজতাহিদগণ অন্যান্য মাদকতা সৃষ্টিকারী বস্তুগুলোকেও 'খামর' এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এই হুকুমের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিদ্যমানঃ

---

৩৫ ইমাম আবূ আহমাদ আল-কুদুরী, *আল-মুখতাসার ফিল-ফিকহ*, ঢাকা. তা. বি. ২য় খণ্ড. পৃ. ২০৪

৩৬ আল কুরআন, ৫: ৯০-৯১ -يا يها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلواة فهل انتم منتهون

-

Dhaka University Institutional Repository

(ক) খামর কে এখানে উসূল শাস্ত্রের পরিভাষায় 'আল মুকিস আলাইহি' (المقيس عليه) বলা হয়।

(খ) অন্যান্য মাদকতা আনয়নকারী বস্তুগুলো হলো فروع (শাখা) যাকে উসূলশাস্ত্রের পরিভাষায় আল-মুকিস (المقيس) বলা হয়।

(গ) মাদকতা হলো কারণ, যাকে উসূল শাস্ত্রের ভাষায় علت (ইল্লাত) বলা হয়।

(ঘ) এর হুকুম হলো হারাম, যাকে 'আল হুরমাহ' (الحرمة) বলা হয়।

অনুরূপভাবে জুয়াকেও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে উপরোক্ত শারী'আতের দলিল দ্বারা। হারাম ঘোষিত হওয়ার কারণ হলো, ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ কেড়ে নেয়া। ঠিক একই কারণ লটারির মধ্যেও বিদ্যমান। কাজেই জুয়ার উপর কিয়াস করে একেও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

(২) জুম'আর দিন আযানের পর বেচাকেনা করা কুরআনের আয়াত দ্বারা মাকরূহ প্রমাণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে মু'মিনগণ! জুম'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয় বিক্রয় ত্যাগ করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা উপলব্ধি করো"।[৩৭]

"O you who believe (Muslims)! When the call is proclaimed for the Salat (prayer) on Friday (jumu'ah prayer), come to the remembrance of Allah [jumu'ah religious talk (Khutbah) and Salat (prayer)] and leave off business (and every other thing). That is better for you did but know!" (Surah 62. Al-Jumu'ah. Part 28. Ayat 9).

আযানের পর বেচাকেনা মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো, সালাত ব্যতিত অন্য কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়া। কাজেই ইজারা, ধার কর্জ সহ যত কাজ মানুষকে সালাত থেকে বিরত রাখবে, সব কাজই আযানের পর মাকরূহ বলে একই কারণে গণ্য হবে অন্যান্য প্রকার লেনদেনও একই কারণে বেচাকেনার সাথে কিয়াস করে মাকরূহ ঘোষণা করা হবে।

উপরোক্ত উদাহরণ দু'টিতে যে মাস'আলার হুকুমের ব্যাপারে নস নেই, তাকে যে মাসআলার হুকুমের ব্যাপারে নস আছে তার সাথে কিয়াস করা হয়েছে। উভয় মাসআলায় ইল্লাত বা কারণ এক ও অভিন্ন। আর

---

[৩৭] আল কুরআন, ৬২: ৯ يا يما الذين امنوا اذا نودى للصلواة من يوم الجمعة فا سعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذالكم خيرلكم ان كنتم تعلمون -

Dhaka University Institutional Repository

ইল্লাত অভিন্ন হওয়ার কারণে উভয় মাস'আলার হুকুমকে একই ধরনের সাব্যস্ত করাকে উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায় কিয়াস বলা হয়।[৩৮]

শারী'আতের দলিল হিসেবে কিয়াস

কিয়াস মান্যকারীগণ তাদের অভিমত প্রমাণ করার জন্য কুরআন, হাদীস, ইজমা' ও যুক্তি পেশ করেন কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছেঃ "হে মু'মিনগণ! যদি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করো, তবে তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তাঁদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতারঅধিকারী। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত করো আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর"।[৩৯]

"O you who believe! Obey Allah and obey the Messenger (Muhammad sm) and those of you (Mslims) who are in authority. (And) if you differ in anything amongst yourselves, refer it to Allah and His Messenger sm, if you believe in Allah and in the Last Day. That is better and more suitable for final determination." (Surah 4. An-Nisa'. Part 5. Ayat 59).

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তারা কোন বিষয়ে দ্বিধা- দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের মধ্যকার জ্ঞানী গুণীদের কোন নির্দেশনা না থাকলে এমতাবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন, যে সব ক্ষেত্রে নস নেই বা যে সব ক্ষেত্রে নস আছে তার সাথে সম্পৃক্ত করার বিষয়ও শামিল করে। কারণ উভয় বিষয়ে ইল্লাত বা কারণ এক ও অভিন্ন। কাজেই হুকুমও এক ও অভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর এটাই হচ্ছে কিয়াস। সুতরাং কিয়াস মান্য করা আল কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের দাবি।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তিনিই কিতাবিদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে প্রথমবার সমবেতভাবে তাদের আবাসভূমি হতে বিতাড়িত করেছিলেন। তোমরা কল্পনাও করনি যে, তারা নির্বাসিত হবে। অথচ তারা মনে করেছিল তাদের দুর্গগুলো তাদের রক্ষা করবে আল্লাহ হতে; কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এমন এক দিক থেকে এলো যা ছিল তাদের ধারণাতীত এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সৃষ্টি করলো। তারা ধ্বংস

---

৩৮ আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ, *ইলমুল উসূল, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

৩৯ আল কুরআন। 4: ৫৯ يا يها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شيئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذالك خير واحسن تاويلا-

করে ফেলল নিজেদের ঘর বাড়ি নিজেদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও। অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো"।[৪০]

"He it is Who drove out the disbelievers among the people of the Scripture (i.e the Jews of the tribe of Banu An-Nadir) frome their homes at the first gathering. You did not think that they would get out. And they thought that their fortresses would defend them from Allah! But Alla's (Torment) reached them from a place whereof they expected it not, and He cast terror into their hearts so that they destroyed their own dwelling with their own hands and the hands of the believers. Then take admonition, O you with eyes" (to see). (Surah 59. Al-Hasar. Part 28. Ayat 2).

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিতাবীদের (বনূ নাযীর) উপর তাদের কল্পনার বাইরে যে শাস্তি চাপিয়ে দিয়েছিলেন তার বর্ণনা প্রদান করার পর বললেন, "হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো"। অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে তাদের সাথে কিয়াস করে দেখ। কারণ তোমরাও তাদের ন্যায় মানুষ, তারা যে অপরাধ করেছে অনুরূপ অপরাধ যদি তোমরাও কর, তবে তোমাদের উপরও অনুরূপ শাস্তি নেমে আসবে। এটাই হচ্ছে আল্লাহর সাধারণ বিধান। তাঁর নি'আমত ও শাস্তি এবং তাঁর সমস্ত বিধান কিন্তু কার্যকরণের উপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে। যেখানে কার্যকরণ পাওয়া যাবে, সেখানেই ফলাফলও পাওয়া যাবে। কিয়াস হচ্ছে, আল্লাহর বিধান মত চলার অপর নাম। যেখানে কার্যকরণ পাওয়া যাবে সেখানে হুকুম পাওয়া যাওয়াই তার উদ্দেশ্য।

সুন্নাহ'র দলিল

কিয়াস যে ইসলামী শারী'আতের অন্যতম প্রধান উৎস এ ব্যাপারে হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা) এর হাদীসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহানবী (সা) তাঁকে ইয়ামানের প্রশাসক নিযুক্তির প্রাক্কালে বলেছিলেন, "তোমার কাছে কোন বিষয়ে ফায়সালা জানতে চাওয়া হলে তুমি তা কিভাবে ফায়সালা করবে? তিনি

[৪০] আল কুরআন, ৫৯: ২ هوالذى اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم نم الله فاتاهم الللہ من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدى المؤمنين فاعتبروا ياولى الابصار

বললেলঃ আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করব। আর যদি তাতে ফায়সালা করার মত কিছু না পাই তাহলে সুন্নাহ দ্বারা ফায়সালা করব। আর যদি তাতেও কিছু না পাই তাহলে আমি ইজতিহাদ করব এবং এ ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করব না। রাসূল (সা) এ কথা শুনে তার বুকের উপর হাত রেখে বললেন, আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা, যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে সে কাজ করতে তাওফিক দিয়েছেন যা তিনি (রাসূল) পছন্দ করেন"।[৪১]

এ হাদীসে দেখা যায় যে, রাসূল (সা) মু'আয (রা) কে কোন বিষয়ে ফায়সালা করার নিমিত্তে কুরআন ও হাদীসে কোন সমাধান না পাওয়ার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করার অনুমতি ও অনুমোদন দিয়াছেন। ইজতিহাদ এর মর্ম যেহেতু শারী'আতের কোন বিধান প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টার নাম আর কিয়াসও যেহেতু এই ইজতিহাদের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই কিয়াস যে শারী'আতের দলিল তা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

অপর এক হাদীসে আছে, "আমার পিতার উপর হাজ্জ ফরয হয়েছে কিন্তু তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ, তাঁর পক্ষে হাজ্জব্রত পালন করা সম্ভব নয়। কাজেই আমি যদি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ আদায় করি তবে কি তাতে তার লাভ হবে? তখন রাসূল (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মনে কর যে, তোমার পিতার যদি ঋণ থাকে আর তা যদি তুমি পরিশোধ করে দাও, তাতে কি তার লাভ হবে? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে বললেন, তাহলে আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করা আরো অধিক আবশ্যক"।[৪২]

এ হাদীস থেকে স্পষ্টতই জানা যায় যে, মহানবী (সা) ঋণ আদায় করা যেমন অত্যাবশ্যক মনে করেন তদ্রূপ মনে করেন তার সাথে কিয়াস করে অনাদায়ী হাজ্জ আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ প্রদান করেছেন। এ হাদীস দ্বারাও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কিয়াস শারী'আতের অন্যতম দলিল।

সাহাবা কিরামের কথা ও আমল

কিয়াস ইসলামী শারী'আতের উৎস হওয়ার পক্ষে সাহাবা কিরামের কথা এবং আমল থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সব ব্যাপারে নস (কুরআন সুন্নাহর দলিল) নেই, সে সব ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের নস আছে তার উপর কিয়াস করে সাহাবা কিরাম অসংখ্য মাসআলা বের করেন। যেমন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর ইন্তিকালের পর খলিফা নিযুক্তির ব্যাপারে তাঁর জীবদ্দশায় আবূ বকর (রা) কে নামাযে ইমামতি করার জন্য অনুমতি দানের উপর কিয়াস করে তাঁর হাতে সর্বসম্মতভাবে বায়'আত হন। এ প্রসঙ্গে তাঁদের কিয়াসের

---

[৪১] ইবন আবদুল বার, *জামিউ ইলম ওয়া ফাদলিহি, বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা,* ১৯৭৮, ২য় খ. পৃ. ৫৫

[৪২] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী, অধ্যায়: আল মানাসিক, অনুচ্ছেদ: উজুবুল হাজ্জ ওয়া ফাদলিহি*

ভিত্তি সম্পর্কে তাঁরা বলেনঃ "আমাদের দীনের ব্যাপারে রাসূল (সা) তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, আমরা কি আমাদের দুনিয়াবী ব্যাপারে তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারি না?[৪৩]

মহানবী (সা) এর আমলের উপর কিয়াস করে তাঁরা যাকাতদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁদের কিয়াসের ভিত্তি হলো, রাসূল (সা) যাদের নিকট থেকে যাকাত উশুল করতেন। আর রাসূল (সা) এর খলিফা বা প্রতিনিধি তাদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করবেন এটাই স্বাভাবিক। হযরত আলী (রা) বলেন, "জ্ঞানীগণ কিয়াসের মাধ্যমে সত্য বিষয়ে জানতে পারেন" [৪৪]। কিয়াস মান্যকারীগণ, কিয়াস ইসলামী আইনের দলিল হওয়ার পক্ষে যে সব যুক্তি উপস্থাপন করেন এখানে তা পেশ করা হলো-

(ক) ইসলামের সকল বিধানই মানবকল্যাণে প্রণীত। যদি কখনও এমন অবস্থা হয় যে, এমন কোন মাস'আলা যার ব্যাপারে নস (কুরআন হাদীস) নেই, সে মাস'আলাটি যদি যে মাস'আলার ব্যাপারে নস আছে তার সমকক্ষ হয় এবং উভয় মাস'আলায় একই কার্যকরণ বিদ্যমান থাকে, এমতাবস্থায় ইনসাফের দাবি হচ্ছে, মানবকল্যাণের স্বার্থে উভয় মাস'আলার একই হুকুম হওয়া, যা ইসলামী শারী'আতের মূল লক্ষ্য।

(খ) কুরআন ও হাদীসে ইসলামের মূলনীতি আলোচিত হয়েছে, কিন্তু মানুষের সার্বিক সমস্যার বিস্তারিত আলোচনা স্থান পায়নি। অথচ মানুষের সকল সমস্যার বিস্তারিত সমাধান একান্ত আবশ্যক। এ কারণে অসংখ্য সমস্যার সমাধানের উৎস হিসেবে কিয়াসকে গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে, যাতে ভবিষ্যতে যত সমস্যাই মানুষের সামনে আসবে সব সময়ই শারী'আতসম্মত সমাধান দেয়া অনায়াসে সম্ভব হয়। আর তখনই ইসলামী শারী'আত সর্বকালের সর্বস্তরের মানুষের জন্য সর্বজনীন আদর্শ হিসেবে গণ্য হবে।[৪৫]

কিয়াসের রুকনসমূহ

কিয়াসের রুকন হচ্ছে সেই বস্তু, যাকে নসের হুকুমের আলামত সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই অর্থ যা আসল ও শাখা উভয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। উসূলুল ফিকহের পরিভাষায় তা ইল্লাত নামে পরিচিত। একে রুকন সাব্যস্ত করার কারণ এই যে, এর উপরই কিয়াসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। একে বাদ দিয়ে কিয়াসের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। কিয়াসের রুকন চারটি।[৪৬]

---

[৪৩] খতীব আল বাগদাদী, *আল ফিকহ ওয়াল মুতাকাফফি, বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইসলামিয়্যা,* তা. বি. ১ম খণ্ড. পৃ. ২০০

[৪৪] মাওলানা মুহিউদ্দিন খান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,* প্রাগুক্ত পৃ.২৬৫

[৪৫] *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৬৬

[৪৬] আল-হামিদি, *আল-ইহকাম,* খ. ৩, পৃ. ২৩৭; 'আদ্দুদ্দিন, *শারহে আল-'আদুদ,* খ. ২, পৃ. ২০৮; আল-গাযালী, ***আল-মুস্তাফা আয-যুহাইলী,*** খ. ২, পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

(১) اصل (মূল) বলা হয় সেই বিষয়কে যার হুকুম সম্পর্কে নস আছে। আসলকে مقيس عليه বলা হয়। اصل আসল এর শর্ত হল, আল কুরআন অথবা হাদীসে অবশ্যই আসলের হুকুম থাকতে হবে। আসলের হুকুম যদি ইজমা'র মাধ্যমে প্রাপ্ত হয় তবে সে আসলের উপর কিয়াস করে তার হুকুম কি কোন فروع (শাখা) এর উপর জারি করা যাবে কিনা এ প্রসঙ্গে উসূল ফিকহবিদগণের দু'টি অভিমত রয়েছে।

(ক) ইজমা'র মাধ্যমে প্রাপ্ত আসলের হুকুম শাখা এর উপর প্রয়োগ করা যাবে না।

(খ) ইজমা'র মাধ্যমে প্রাপ্ত আসলের হুকুম শাখা এর মধ্যেও জারি করা যাবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাওকানী (র) বলেন- هذا اصح القولين "এতদুভয় অভিমতের মধ্যে এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত"।[৪৭]

(২) فروع (শাখা) বলা হয় সেই বিষয়কে যার হুকুম সম্পর্কে نص (নস) বিদ্যমান নেই এবং যাকে আসলের হুকুমের সাথে সম্পর্কিত করে একই হুকুম প্রদানের প্রয়াস চালান হয়। শাখাকে মুকিস (مقيس) এবং মুশাব্বাহও (مشبه) বলা হয়।

(ক) এর হুকুম কিয়াস পরিপন্থী হবে না। যদি তা হয় তবে কিয়াস নস বা ইজমা'র সাথে সাংঘর্সিক হবে। উল্লেখ্য যে, নস বা ইজমা'র সাথে কিয়াস সাংঘর্সিক হলে তা শুদ্ধ হবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ভুলক্রমে হত্যার কাফফারার উপর শপথের কাফফারাকে কিয়াস করে তাতেও মু'মিন গোলাম মুক্ত করতে হবে এমন কথা বলা যাবে না। কারণ উভয় বিষয়ের কাফফারা স্বরূপ কি মুক্ত করতে হবে তা কুরআন মাজীদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমাদের বৃথা শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদের দায়ী করবেন না কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে কর সে সবের জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন। অতঃপর এর কাফফারা দশ জন দরিদ্রকে মধ্যম মানের আহারদান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদের খেতে দাও অথবা তাদের বস্ত্রদান কিংবা একজন দাস মুক্তি এবং যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন। তোমরা শপথ করলে এটাই হবে তোমাদের শপথের কাফফারা। তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো"।[৪৮]

[৪৭] আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ, *ইলমুল উসূল*, পৃ. ৬২

[৪৮] আল কুরআন, ৫: ৮৯ *لا يواخذكم الله باللغو فى ايمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذالك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذالك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون* -

"Allah will not punish you for what is unintentional in your oaths, but He will punish you for your deliberate oaths; for its expiation feed ten Masakin (poor person), on a scale of the average of that with which you feed your own families, or clothe them or manumit a slave. But whosoever cannot afford (that), then he should fast for three days. That is the expiation for the oaths when you have swron. And protect your oaths (i.e. do not swear much). Thus Allah make clear to you His Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs,revelations, etc.) that you may be grateful." (Surah 5. Al-Ma'idah. Part 7. Ayat 89).

(খ) فرع (শাখা) এর মধ্যে হুকুমের ইল্লাত বা কার্যকারণ বিদ্যমান থাকতে হবে এমনকি তা সন্দেহজনক ভাবে হলেও।

(গ) ইল্লাত বা কার্যকারণের ক্ষেত فروع টি আসলের সমপর্যায়ের হতে হবে। কারণ সমপর্যায়ের হলেই তাতেও আসলের হুকুম জারি হবে। আর যদি সমপর্যায়ের না হয় তবে আসলের হুকুম তাতে জারি হবে না। ফলে কিয়াসও শুদ্ধ হবে না।

(৩) علت (কারণ) অর্থাৎ সেই কার্যকারণ যার কারণে মূলের হুকুম প্রদত্ত হয়েছে। উসূলবিদগণ ইল্লাতের মাঝে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী বিদ্যমান থাকা অত্যাবশ্যক মনে করেনঃ

(ক) ইল্লাত বা কার্যকারণ সুস্পষ্ট হতে হবে। যেমন বেচাকেনা সম্পন্ন হলে মালিকানা পরিবর্তন হয়। এর জন্য ইল্লাত হল ইজাব ও কবুল।

(খ) ইল্লাত সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যেমন রমযানের রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে কেবল মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য। এ অনুমতির ইল্লাত সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ সফর, অসুস্থতা ও কষ্ট দূরিকরণের লক্ষ্যে অন্য কোন কারণে নয়। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি সফরের সময় রোযা রাখার ক্ষমতা রাখে কিংবা অসুস্থতা সত্ত্বেও যদি রোযা রাখতে পারে এমন হয়, তাদের ক্ষেত্রে রোযা না রাখার বিধান রহিত হবে না।

(গ) ইল্লাতটি যুক্তিসংগত হবে এবং হুকুমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

(ঘ) ইল্লাতটি আসলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে পারবে না। অর্থাৎ ইল্লাতটি এমন ধরনের হতে হবে যাতে তা আসলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে শাখা এর মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যেমন সফরের কারণে রোযা না রাখার অনুমতি এটি একটি সীমাবদ্ধ ইল্লাত। এ ইল্লাত কঠোর পরিশ্রমকারীর ক্ষেত্রে নেই। কাজেই তার উপর কিয়াস করে কঠোর পরিশ্রমকারীর জন্য রোযা না রাখার অনুমতি দেয়া যাবে না। তবে خمر বা আঙ্গুরের তৈরী মদ

Dhaka University Institutional Repository

হারাম হওয়ার ইল্লাত হচ্ছে মাদকতা, যা অন্যান্য মদের মাঝেও বিদ্যমান। সুতরাং অন্যান্য মাদকদ্রব্যকেও খামর এর হুকুমের সাথে কিয়াস করে হারাম সাব্যস্ত করা যাবে।[৪৯]

(৪) حكم الاصل (মূলের হুকুম) অর্থাৎ শারী‘আতের সে হুকুম যা আসল বা মূল সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে এবং শাখাতেও সে একই হুকুম অভিন্ন হওয়ার কারণ কামনা করা। এ সম্পর্কে উসূলবিদগণ চারটি শর্তারোপ করেছেন। যেমনঃ

(ক) আসল এর হুকুমটি শারী‘আতের হুকুম হতে হবে। আর যদি শারী‘আতের হুকুম না হয়ে عقلى বা ইন্দ্রিয়গাহ্য হুকুম হয়, তাহলে তার ক্ষেত্রে কিয়াস করা চলে না। কারণ এখানে আমরা শারী‘আতের হুকুম নিয়েই আলোচনা করছি।

(খ) আসলের হুকুমটি (نص) দ্বারা কিংবা ইজমা’ দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে।

(গ) আসলের হুকুমটি (معقول المعنى) বা যুক্তিগ্রাহ্য হতে হবে। আর যদি তা যুক্তিগ্রাহ্য না হয় তবে কিয়াস কার্যকর হয় না। কারণ কিয়াস ‘ইল্লাত’ এর উপর নির্ভরশীল।

(ঘ) আসলের হুকুমটি আসলের জন্য নির্দিষ্ট নয় এমন হতে হবে। এটা দু’ভাবে হতে পারে।

কুরআন ও হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাবে যে, আসলের হুকুমটি তার জন্য নির্দিষ্ট। যেমন চার জনের অধিক মহিলাকে একত্রে এবং দেনমোহর বিহীন বিয়ে করা কেবল রাসূল (সা) এর জন্যই নির্দিষ্ট।

কেননা কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছেঃ “হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাদের দেনমোহর তুমি প্রদান করেছ এবং বৈধ করেছি ফায় হিসেবে আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তন্মধ্য হতে যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে তাদের এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যারা তোমার সাথে দেশ ত্যাগ করেছে এবং কোন মু’মিন নারি নিজেকে নবীর নিকট নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও বৈধ এতো বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য মু’মিনদের জন্য নয়”।[৫০]

---

[৪৯] মাওলানা মুহিউদ্দিন খান ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০*

[৫০] আল কুরআন, ৩৩: ৫০ *يا يها النبى انا احلنالك ازوازك اللتى اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاءالله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التى هاجرن معك وامراءة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى ان اراد النبى ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين* -

"O Prophet (Muhammad sm) Verily, We have made lawful to you your wives, to whom you have paid their Mahr (bridal money given by the husband to his wife at the time of marriage), and those (slaves) whom your right hand prossesses—whom Allah has given to you, and the daughters of your 'Amma (paternal uncles) and the daughters of your 'Ammat (paternl aunts) and the daughters of your Khal (maternal uncles) and the daughters of your Khalat (maternal aunts) who migrated (from Makkah) with you, and a believing women if she offers herself to the prophet." (Surah 33. Al-Ahzab. Part 22. Ayat 50).

কাজেই নবী (সা) এর জন্য একত্রে চার জনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ ও দেনমোহর বিহীন বিয়ে করা বৈধ হওয়াকে আসল গণ্য করে সে হুকুমের উপর কিয়াস করে فرع তথা নবী (সা) এর উম্মতের জন্য উপরোক্ত হুকুম জারি করা যাবে না। আসলের হুকুমের ইল্লাত বা কার্যকারণটি কখনো সীমাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ তা কেবল আসলের মধ্যেই পাওয়া যায়, অন্যত্র পাওয়া যায় না। যেমন সফরের ক্ষেত্রে নামাযকে কসর করার হুকুম। এ হুকুমের ইল্লাত হচ্ছে সফর। এই ইল্লাত সফর ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না বিধায় এর উপর কিয়াস করে অন্য কোথাও নামাযকে কসর করা যাবে না।

যে সব ক্ষেত্রে কিয়াস করা যায়

ইসলাম মূলতঃ আকীদা বিশ্বাস, 'ইবাদাত বন্দেগী, আমল আখলাক ইত্যাদি সমষ্টির নাম। এসবের মধ্যে আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কিয়াস করার অবকাশ নেই। অর্থাৎ কোন আকীদা কিয়াস করে প্রমাণ করার বিষয় নয়। আকীদা প্রমাণের জন্য দ্ব্যর্থহীণ ও শারী'আতের অকাট্য দলিল প্রয়োজন। কিয়াস যেহেতু যান্নি বা অনুমান নির্ভর শারী'আতের দলিল, কাজেই কিয়াস দ্বারা আকীদা সংক্রান্ত বিষয় প্রমাণ করা যাবে না। অনুরূপভাবে 'ইবাদাতও কিয়াস দ্বারা প্রমাণ করা যাবে না। 'ইবাদাত প্রমাণের নির্ভরযোগ্য দলিলের প্রয়োজন। এখানে 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় প্রধানঃ

(১) আল্লাহ ছাড়া অপর কারো 'ইবাদাত করা যাবে না এবং

(২) রাসূল (সা) প্রদর্শিত আদর্শ ছাড়াও আল্লাহর 'ইবাদাত করা যাবে না। কাজেই কেউ নিজ থেকে 'ইবাদাত আবিস্কার করলে সে যে মানের ব্যক্তি সত্ত্বাই হোক, তার সেই 'নবসৃষ্ট' 'ইবাদাত গ্রহণ করা যাবে না। কেননা 'ইবাদাতের বিষয়টি ওহী দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহর নৈকট্যলাভের জন্য মনগড়া কোন 'ইবাদাতের উদ্ভাবন করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সালাত একটি 'ইবাদাত। এই সালাতের প্রতি রাক'আতে একটি করে রুকু', দু'টি করে সিজদা করার নিয়ম স্বয়ং রাসূল (সা) প্রবর্তন করে গেছেন। কাজেই

কেউ সিজদার উপর কিয়াস করে যদি বলে, সিজদা যেমন আল্লাহর ‘ইবাদাত তদ্রূপ রুকু’ও আল্লাহর ‘ইবাদাত, সিজদা যেমন সালাতের রুকন তেমনি রুকু’ও সালাতের রুকন। সুতরাং সিজদা যেমন দু’টি তদ্রূপ রুকু’ও দু’টি হোক এমন কথা বলতে পারে না। অনুরূপভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুম‘আর জন্য আযানের বিষয়টি স্বয়ং নবী (সা) অনুমোদন দিয়েছেন। কাজেই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুম‘আর নামাযের উপর কিয়াস করে দুই ঈদ ও জানাযার সালাতের জন্য আযানের ব্যবস্থা করতে পারে না। কারণ ‘ইবাদাত প্রমাণের ক্ষেত্রে কিয়াস অকার্যকর। তবে মু‘আমালা, ‘আদত, আখলাক ইত্যাদির ক্ষেত্রে কিয়াসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে।

খবরে ওয়াহিদ বিরোধী কিয়াস

কিয়াস যদি খবরে ওয়াহিদ বিরোধী হয় তবে সে ক্ষেত্রে কিয়াস বর্জন করে খবরে ওয়াহিদ এর উপর আমল করতে হবে। ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম শাফি‘ঈ এবং ইমাম আহমাদ (র) প্রমুখ এই অভিমত পোষণ করেন। বিশেষত ইমাম আবূ হানিফা (র) সালাতে অট্ট হাসি দিলে কিয়াস অনুযায়ী সালাত কেবলমাত্র নষ্ট না হয়ে অযুও ভঙ্গ হয়ে যাবে বলে অভিমত দিয়েছেন। এমনকি তিনি সাহাবীর ফাতওয়া কিয়াস বিরোধী হলে সে ক্ষেত্রে কিয়াস বর্জন করে সাহাবীর ফাতওয়া গ্রহণ করতেন।

কিয়াসের হুকুম

কিয়াসের মাধ্যমে প্রত্যয়ের কাছাকাছি জ্ঞান অর্জিত হয়। যে সব ক্ষেত্রে কিয়াসের চেয়ে বড় দলিল না থাকে, সে সব ক্ষেত্রে এর উপর আমল করা অপরিহার্য।

ইসতিহসান (الاستحسان) Juristic Preference

ইসলামী আইনের যেসব উৎসের ব্যাপারে আলিমগণের মতপার্থক্য রয়েছে, তন্মধ্যে ইসতিহসান অন্যতম। কোন বিষয়ের বিধান গ্রহণ না করে বিশেষ বিবেচনায় ভিন্ন বিধান গ্রহণই ইসতিহসানের মূল প্রতিপাদ্য। হানাফি মাযহাবে এ উৎসের অধিক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। ইসতিহসানের কয়েকটি দৃষ্টিকোণ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভিন্নতা থাকলেও কম বেশী সকলেই এ পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন।

ইসতিহসানের শাব্দিক বিশ্লেষণ

ইসতিহসান (استحسان) আরবি হুসনুন (حسن) শব্দ থেকে উৎপন্ন। হুসনুন শব্দের অর্থ উত্তম, ভালো, সুন্দর, যা খারাপের বিপরীত। সে হিসেবে ইসতিহসান অর্থ ভালো মনে করা, উত্তম বিবেচনা করা।[৫১]

কোন কিছু উত্তম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়াকেও ইসতিহসান বলা হয়।[৫২]

আবার বিশেষ কোন অর্থ বা আকৃতি, যার প্রতি কেউ আকৃষ্ট হয় বা পছন্দ করে, তাকেও ইসতিহসান বলে, যদিও তা অন্যের কাছে অপছন্দনীয় হয়।[৫৩] আল্লামা আস-সারাখসী [মৃ ৪৮৩ হি.] বলেন, আদিষ্ট বিষয় অনুসরণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বনই ইসতিহসান।[৫৪] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণীঃ "যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শোনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তার অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান"।[৫৫]

"Those who listen to the Word [good advice La ilaha illallah-(none has the right to be worshipped but Allah) and Islamic Monotheism] and follow the best thereof (i.e. worship Allah Alone, repent to Him and avoid Tagut) those are (the ones) whom Allah has guide and those are men of understanding". (Surah 39. Az-Zumar. Part 23. Ayat 18).

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ "নিজ জাতিকে এর কল্যাণকর বিষয় সমূহ গ্রহণের নির্দেশ দাও"।[৫৬]

"And enjoin your people to take the better therein". (Surah 7. Al-A'raf. Part 9. Ayat 145).

কোন বস্তুকে উত্তম ও ভাল মনে করা। যেমন বলা হয়েছে عد الشئ حسنا কোন জিনিসকে উত্তম ও ভাল গণ্য করা।[৫৭]

---

[৫১] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী- বাংলা অভিধান, পৃ. ৮০

[৫২] আলাউদ্দিন আবূ বকর আল-কাসানী, *বাদয়িউস সানয়ে ফী তারতীবিশ শারাঈ*, বৈরুত: *দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ*, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৬ ইং/১৪০৬ হি. খ. ৫, পৃ. ১১৮

[৫৩] আল-হামিদি, *আল ইহকাম*, খ. ৪, পৃ. ১৯১

[৫৪] আস-সারাখসী, *উসূল আস-সারাখসী*, খ. ২, পৃ. ১৯০

[৫৫] আল কুরআন, ৩৯: ১৮ - الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اؤلئك الذين هداهم الله واؤلئك هم اؤلوا الالباب

[৫৬] আল কুরআন, ৭: ১৪৫ - وامر قومك ياخذوا باحسنها

[৫৭] মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯*

Dhaka University Institutional Repository

পারিভাষিক অর্থ

উসূল ফিকহের গ্রন্থে ইসতিহসানের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন সংজ্ঞায় বলা হয়েছেঃ "ইসতিহসান শারী'আতের এমন এক দলিল, যা মুজতাহিদের অন্তরে প্রকাশ পায়, কিন্তু তা ভাষায় বিশ্লেষণ জটিল হয়"।[৫৮]

ফকিহগণের পরিভাষায় কোন বিষয়ের দু'টো দিকের মধ্য থেকে কোন একটি দিককে দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেয়ার নাম 'ইসতিহসান'। কারো কারো মতে, "কোন বিষয়ের হুকুমকে তার নযির সমূহ থেকে অধিকতর শক্তিশালী যুক্তির কারণে পৃথক করে নেয়া।[৫৯]

এক কিয়াস পরিত্যাগ করে তার চেয়ে বেশী যুক্তিযুক্ত কিয়াস অবলম্বন করা। কোন প্রশ্নের নযিরসমূহের ব্যাপারে যে হুকুম দেয়া হয়েছে, অধিকতর যৌক্তিক কারণে তাকে বাদ দিয়ে বিপরীত হুকুম দেয়া।[৬০]

"একটি সামগ্রিক হুকুম বাদ দিয়ে এমন কোন দলিলের ভিত্তিতে কোন ব্যতিক্রমধর্মী হুকুমের দিকে মুজতাহিদের প্রত্যাবর্তন করা যা এই প্রত্যাবর্তনকে তার নিকট অগ্রাধিকার বানিয়ে দিয়েছে তাকে ইসতিহসান বলা হয়।[৬১]

নূরুল আনোয়ার প্রণেতা বলেন, "যদি প্রকাশ্য কিয়াস একটি হুকুম কামনা করে আর হাদীস বা ইজমা' অথবা গোপন কিয়াস এই কথার বিপরীত কামনা করে, এমতাবস্থায় কিয়াস ত্যাগ করে বিপরীত হুকুমের উপর আমল করাকে ইসতিহসান বলা হয়"।[৬২]

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

স্থান কাল পরিস্থিতি ও ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে নিত্যনতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। এর সমাধান যদি প্রধান চারটি উৎসে পাওয়া যায় তবে উত্তম; অন্যথায় এর সমাধান দেয়া নিঃসন্দেহে কঠিন। এই জটিলতার সুরাহা গ্রহণ করে শারী'আতের এমন বিধান উপস্থাপন করা যা সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণকর সাব্যস্ত হয়েছে। ইসতিহসান এই প্রকার দলিলের অন্তর্ভুক্ত। হানাফি ফকিহগণের মতে, এটা যদিও কিয়াসের একটি প্রকরণ قياس خفى তথাপি কিয়াসে জলির নীতিমালা অনুযায়ী কোন কোন বিষয়ের সমাধান মানুষের

---

৫৮ আল-আমিদী, *আল-ইহকাম,* খ ৪, পৃ ১৯২; আল ইনসাভী, *নিহায়াতুস সূল,* খ ৩, পৃ ১৬৬; 'আদ্দুদ্দীন, *শারহে আল-'আদুদ,* খ ২, পৃ ২৮৮; আল-গাযালী, *আল-মুসতাসফা,* খ ১, পৃ ১৭৩; আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন মূসা আল-লাখমী আশ-শাতিবী, *আল-ই'তিসাম,* মিসর।

دليل ينفدح فى نفس المجتهد وتعسر عبارته عنه -

৫৯ *প্রাগুক্ত,*

৬০ *প্রাগুক্ত,*

৬১ মাওলানা আব্দুর রহীম, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৩১

৬২ মুল্লা জিউন, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৫২-৩৫৪

জন্য অকল্যাণকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই সামগ্রিক কল্যাণ, রেওয়াজ ও প্রথার কথা বিবেচনা করে এর অকল্যাণকর থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ইসতিহসানের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। তাই ইসতিহসান সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "কিয়াস বর্জন করে জনগণের কল্যাণের সাথে সামঞ্জস্যশীল পন্থা গ্রহণ করাই হচ্ছে ইসতিহসান"। আরো বলা হয়েছে, "আইন বিধানের ক্ষেত্রে নির্বিশেষে সব মানুষ যাতে জড়িত তাতে সহজতা গ্রহণ করাই হল ইসতিহসান"।[৬৩]

মোটকথা বলা হয়েছে, কঠোরতা পরিহার করে সহজ পন্থা গ্রহণ করাই হচ্ছে ইসলামী শারী'আতের প্রধান লক্ষ্য। কেননা কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছেঃ "আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না"।[৬৪]

"Allah intends for you ease, and He dose not want to make things difficult for you." (Surah 2. Al-Baqarah. Part 2. Ayat 185).

মহানাবী (সা) হযরত আলী (রা) ও মু'আয ইবন জাবাল (রা) কে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "তুমি লোকদের সহজতার ব্যবস্থা করবে, তাদের কঠিন ও দুর্বিষহ অবস্থায় ফেলবে না। লোকদের কাছে টেনে নিবে, তাদের বীতশ্রদ্ধ ও আস্থাহীন বানাবে না"। এরূপ সহজতা বিধান প্রত্যেক আইনের ধর্ম। গ্রীক আইনে Epic Keia ও রোমান আইনে Aequeta নামে যে নীতির সন্ধান পাওয়া যায়, তা এ পর্যায়েরই ব্যবস্থা। আধুনিক ইউরোপীয় আইন দর্শনে Natural Justice বলতে যা বুঝায়, মোটামুটিভাবে তাও এই বিষয়ই।

শারী'আতের দলিল হিসেবে ইসতিহসান

ইমাম আবূ হানিফা, মালিক ও আহমাদ ইবন হাম্বল (র) কোন বিধান প্রণয়নের জন্য ইসতিহসানকে শারী'আতের দলিল মনে করেন। ইমাম মালিক (র) বলেনঃ ইসতিহসান হচ্ছে জ্ঞানের উনিশ ভাগের একভাগ"।[৬৫] ইসতিহসানের সমর্থনে অথবা এর প্রতি ইঙ্গিতবাহি অনেক আয়াত কুরআন মাজীদে বিদ্যমান আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদের, যারা মনোযোগ সহকারে শুনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ কর। ওদের সৎপথে পরিচালিত করবেন এবং এরাই বোধশক্তি সম্পন্ন"।[৬৬]

"So announce the good news to My slaves—

---

[৬৩] ইমাম আস সারাখসী, *মাবসুত,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫

[৬৪] আল কুরআন, ২: ১৮৫ *يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر -*

[৬৫] ইমাম শাতিবী, *আল ইতিসাম, প্রাগুক্ত,* ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৮

[৬৬] আল কুরআন, ৩৯: ১৭-১৮ *فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب -*

Dhaka University Institutional Repository

Those who listen to the Word [good advice La ilaha illallah—(and Islamic Monotheism] and follow the best therefore (i.e. worship Allah Alone, repent to Him and avoid Tagut) those are (the ones) whom Allah has guided and those are men of understanding.” (Surah 39. Az-Zumar. Part 23. Ayat 17-18).

অপর এক আয়াতে বর্ণিত আছে “এবং তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন প্রকার কঠোরতা আরোপ করেননি”।[৬৭]

“And has not laid upon you in religion any hardship.” (Surah 22. Al-Hajj. Part 17. Ayat 78).

কুরআন মাজীদের উপরোক্ত আয়াত থেকে ইসতিহসান শারী‘আতের দলিল হওয়ার বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়।

সূন্নাহ থেকে দলিল

সূন্নাহ থেকে ইসতিহসানের দলিল হওয়ার বিষয়ে সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে এক হাদীসে আছেঃ “মু’মিনগণ যা উত্তম বিবেচনা করে তা আল্লাহর নিকটও উত্তম আর মু’মিনগণ যা মন্দ বিবেচনা করে তা আল্লাহ’র নিকটও মন্দ”।[৬৮] হানাফি ফকিহগণের মতে, ইসতিহসান ইসলামের সাধারণ নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত এর বিপরীত কিছু নয়। যেমন ইসতিহসানের সাধারণ মূলনীতি হলঃ ‘ক্ষতিগ্রস্থ হইওনা এবং ক্ষতি করোনা’ ‘অনিবার্য পরিস্থিতি নিষিদ্ধ বিষয়কে জায়িজ করে’ ‘কষ্ট কাঠিন্য সহজতার প্রসূতি’।[৬৯]

ইমাম আবূ বকর আল জাসসাস (র) বলেনঃ যে সব বিষয়ে আমাদের হানাফি ফকিহগণ ইসতিহসানের সমর্থক, তার সবই যুক্তি ও মূলনীতির উপর ভিত্তিশীল। এর কোনটির মধ্যে তাঁদের ব্যক্তিগত ঝোঁক প্রবণতা ও লালসার লেশমাত্র নেই।

ইমাম শাফি‘ঈ (র) ইসতিহসানকে শারী‘আতের উৎস হিসেবে স্বীকার করেন না। তিনি বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি ইসতিহসানকে শারী‘আতের দলিল হিসেবে গ্রহণ করবে, সে নিজে অপরাধ করলো”। ইমাম শাফি‘ঈ (র) এর এই কথার মূলে রয়েছে তাঁর এই ধারণা, ইসতিহসান মুজতাহিদগণের নিজস্ব বিবেক বুদ্ধি ও কল্পনার ফসল

---

[৬৭] আল কুরআন, ২২: ৭৮ - وما جعل عليكم في الدين من حرج

[৬৮] আল মুসনাদ, হা. নং- ৩৬০০, পৃ. ৩০৯

[৬৯] মুল্লা জিউন, পৃ. ৩৫৩

Dhaka University Institutional Repository

এবং তার পিছনে শারী'আতের কোন দলিল নেই। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি তা নয়। আসল কথা হচ্ছে ইসতিহসান তো তাই যা কোন দলিলের উপর নির্ভরশীল, যদিও তা এমন কিয়াসের বিপরীত যার কারণটি প্রকাশমান, এরূপ ইসতিহসানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যে জায়িয, সে ব্যাপারে নবী (সা) এর নিম্নোক্ত বাণী উল্লেখ করা যায়ঃ "জেনে রাখ, এই দীন (ইসলাম) অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সুসংবদ্ধ। অতএব তোমরা তাতে বিশেষ নম্রতা ও সহজতা সহকারে প্রবেশ করো। আর আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর 'ইবাদাতের ব্যাপারে বিদ্বেষী বানিয়ে দিওনা"।

এক হাদীসে আছে, "তোমাদের দীনের কল্যাণকর দিক হচ্ছে এর সহজতা"। নবী (সা) দীনকে সহজ করা সম্পর্কে আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা) কে যে হিদায়াত দেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। অনুরূপভাবে এ সম্পর্কে নবী (সা) এর যতগুলো উক্তি আছে, তা সবই ইসতিহসানের অনুকূল।

ইসতিহসান এর শ্রেণিবিভাগ

যে দলিলের ভিত্তিতে ইসতিহসানকে শারী'আতের একটি উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, তা বিভিন্ন। এ কারণে মূল ইসতিহসানও নিম্নবর্ণিতরূপে বিভক্তঃ

(১) এমন ইসতিহসান যা শারী'আতের অকাট্য দলিলের উপর নির্ভরশীল। যেমন শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি। বলা বাহুল্য, কিয়াস এটির যথার্থতা স্বীকার করে না। এর কারণ হচ্ছে, মুনাফা নিত্যনতুন রূপ ধারণ করে থাকে। কিন্তু ইসতিহসানের ভিত্তিতে এ ধরনের কাজকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। নবী (সা) বলেছেনঃ "চুক্তি সম্পন্ন শ্রমিককে তার চুক্তিভিত্তিক মজুরি তার গায়ের ঘাম শুকাবার পূর্বেই পরিশোধ করে দাও"।[৭০]

(২) যে ইসতিহসান কোন ইজমা'র ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছে। যেমন, কোন কাজ করার পূর্বে কারো সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া, যদিও মূল চুক্তিটা হচ্ছে যে কাজের উপর, সেই কাজটি চুক্তির মুহূর্তে অনুপস্থিত, এতদসত্ত্বেও ফিকাহবিদগণ এই চুক্তি জায়িয বলেছেন।

(৩) প্রয়োজনের তাগিদে গৃহীত ইসতিহসান। যেমন যেসব জীব জন্তু নখর দিয়ে ছিঁড়ে খায় তার অবশিষ্ট খাদ্যকে পবিত্র মনে করা। যদিও সে পাখি অপবিত্র বস্তু আহার করে থাকে।

(৪) প্রচলনের ভিত্তিতে গৃহীত ইসতিহসান। যেমন প্রকৃত বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সেই বিষয়ে পারস্পরিক চুক্তি করা।

[৭০] শায়খ ওয়ালী উদ্দিন, *মিশকাত*

Dhaka University Institutional Repository

(৫) কেবল কল্যাণ বিবেচনায় গৃহীত ইসতিহসান। যেমন কারিগরকে জিনিসপত্রের জন্য দায়ী করা। শারী‘আতের মূলনীতি হচ্ছেঃ “আমানতদারকে আমানতি জিনিসের ব্যাপারে দায়ী করা যায় না”।

কারীগরও আমানতদার- ই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে সমর্পিত জিনিসপত্র যদি তা তার কাছে থাকতেই খোয়া যায় তাকে ইসতিহসানের ভিত্তিতে দায়ী করা যাবে। কেননা কারিগররা প্রায়শই দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে থাকে। এ কারণেই এ মত গ্রহণ করা হয়েছে।

সাহাবা কিরামের কার্যধারায় ইসতিহসান

উত্তরাধিকারের একটি প্রশ্নের মীমাংসায় সাহাবা কিরামের কার্যধারায় ইসতিহসান প্রয়োগের প্রমাণ মিলে। যেমন, এক মহিলা মৃত্যুবরণ করে এবং সে তার স্বামী, মা, দুই সহোদর ভাই ও দুই বৈপিত্রেয় ভাই উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে যায় উত্তরাধিকার আইনে সহোদর ভাই ‘আসাবা’ এর অন্তর্ভুক্ত এবং বৈপিত্রেয় ভাই ‘আসহাবুল ফুরুয’ এর মধ্যে শামিল। আসহাবুল ফুরুয হচ্ছে তারা যাদের প্রাপ্য অংশ কুরআন মাজীদে নির্ধারিত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন, ৬/২, ৩/১, ৪/১, ২/১ ইত্যাদি। অপরদিকে আসাবার জন্য নির্দিষ্ট কোন অংশ নেই বরং আসহাবুল ফুরুযকে অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা-ই তাদের অংশ।

উপরোল্লিখিত ক্ষেত্রে স্বামী অর্ধেক, মা এক ষষ্ঠাংশ এবং বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা পাবে এক তৃতীয়াংশ। এতে পরিত্যক্ত সম্পদের প্রায় সবটুকু বন্টিত হয়ে যায়, সহোদর ভাইদের জন্য তেমন কিছুই থাকে না অথচ মৃতের সাথে তাদের সম্পর্ক পিতা মাতা উভয় দিক থেকে নিকটর।

উমর (রা) এর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে তিনি সহোদর ভাইয়েরা যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে লক্ষ্যে ইসতিহসানের পথ অবলম্বন করেন। তিনি সহোদর ও বৈপিত্রেয় ভাইদের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। আসহাবুল ফুরুযকে আসাবার সাথে সংযুক্ত করা কুরআনি বিধানের বিপরীত, তবুও ইসতিহসানের আশ্রয় নিয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

অনুরূপভাবে উত্তরাধিকার প্রশ্নে নাতির বিষয়টিও উল্লেখ করা যায়। দাদার জীবদ্দশায় যদি পিতা মারা যায় এমতাবস্থায় নাতি দাদার সম্পদে মিরাস পাবে না, যদি দাদার অপর কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকে। আক্ষরিক ভাবে মিরাসের আইনের এই হচ্ছে বিধান, যদি দাদা নাতির জন্য কোন ব্যবস্থা করে যান অথবা নাতির জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। যদি চাচারা তাদের ভাতিজা ভাতিজিকে জীবিকার ব্যবস্থা না করে, তবে ইসতিহসানের আওতায় বিচারক কর্তৃক তাদের উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করা ইসলামী আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

ইসতিদলাল (الاستدلال)

ইসতিদলাল শব্দটির মূল শব্দ হচ্ছে দলিল। এর অর্থ হল তলব করা, তালাশ করা, খোঁজ করা বা দলিলের সাহায্যে কোন কিছু প্রমাণ করা। ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায় এটি হচ্ছে এমন একটি পরিভাষা যার সাহায্যে কোন কিছু প্রমাণ করা যায়।[৭১] কখনো কখনো একে ইসতিহসানের চেয়েও ব্যাপক ও শক্তিশালী মনে করা হয়। তবে ইজতিহাদ ও সমস্যা সমাধান নির্ণয়ের কোন বিশেষ পদ্ধতির সাথে এর সম্পর্ক সীমাবদ্ধ নয়; বরং ফিকাহবিদগণ ইজতিহাদ করার জন্য যে সব পদ্ধতি ব্যবহার করেন তার প্রায় সবই তার অন্তর্ভুক্ত।

ইসতিদলাল এর কয়েকটি পর্যায়

ফিকাহবিদগণ ইসতিদলাল এর কয়েকটি পর্যায় বর্ণনা করেছেন যা নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

(১) কল্যাণকর বস্তু মূলতঃ মুবাহ আর ক্ষতিকর বস্তু মূলতঃ হারাম। ইসলাম মানব কল্যাণের জীবনদর্শন। মানুষের ক্ষতি হোক, এটা ইসলাম কোন অবস্থায় চায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে"।[৭২]

"He allows them as lawful At-Tayybat (i.e. all good and lawful as regards things, deeds, beliefs, persons, foods), and prohibits them as unlawful Al-Khaba'ith (i.e. all evil and unlawful as regards things, deeds, beliefs, persons and foods)." (Surah 7. Al-A'raf. Part 9. Ayat 157).

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "বল! আল্লাহ স্বীয় বান্দাহদের জন্য যে সব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে"।[৭৩] যখন কুরআন, হাদীস ও ইজমা'য় কোন বিষয়ের সমাধান না পাওয়া যাবে অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নীরব থাকে, তখন উপরোক্ত নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে।

(২) দু'টি হুকুমের মধ্যে সম্পর্ক অটুট থাকাঃ কোন বিশেষ 'ইল্লাত' ছাড়াই একটি হুকুমকে অন্য হুকুমের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা। যেমনঃ (ক) যে ব্যক্তি তালাকদানের অধিকার রাখে সে ঈলা (শপথ করে স্ত্রী সঙ্গ ত্যাগ করা) করার অধিকারী। তালাক এবং ঈলা উভয় কাজের পরিণাম হচ্ছে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অথবা সম্পর্ক পুনঃস্থাপন। এদিক থেকে এ দু'টো ইতিবাচক হুকুমের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। নিয়ত ব্যতীত তায়াম্মুম শুদ্ধ হয় না। কাজেই অযুও নিয়ত ব্যতীত শুদ্ধ না হওয়া উচিত। এ দু'টো নেতিবাচক হুকুমের মধ্যে

---

[৭১] মুফতী আমীমুল ইহসান, *আল- কাওয়াইদুল ফিকহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২

[৭২] আল কুরআন, ৭: ১৫৭ *ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث -*

[৭৩] আল কুরআন, ৭: ৩২ *قل من حرم زينة الله التى اخرج لعبادة والطيبات من الرزق -*

সম্পর্ক হচ্ছে, দু'টোই পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তে করা হয় এবং কখনো কখনো তায়াম্মুম অযুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। ইতিবাচক প্রথম বাক্যটির সাথে নেতিবাচক দ্বিতীয় বাক্যটির تلازم সম্পর্ক অর্থাৎ বরাবরের। এর মর্ম হল যে বিষয়টি জায়িয তা নিষিদ্ধ ও হারাম হতে পারে না। প্রথমটি নেতিবাচক এবং দ্বিতীয়টি ইতিবাচক বাক্যের মধ্যে হবে। যেমন যা জায়িয নয় তা নিষিদ্ধ।

(৩) ইসতিসহাব (استصحاب الحال) ফিকাহবিদগণের পরিভাষায় এর মর্ম হচ্ছে নিম্নরূপঃ "অতিতে যা প্রমাণিত হয়েছিল, ভবিষ্যতে তাকে স্থিত রাখাই নীতি"।[৭৪]

ইমাম শাফি'ঈ (রহ) বলেনঃ মূত্রনালী ও মলদ্বার ছাড়া অপর কোন পথে যা কিছু বের হয় তাতে অযু ভঙ্গ হয় না। ধরা যাক এক ব্যক্তি উধাও হয়ে গেছে এবং সে নিখোঁজ। ইমাম শাফি'ঈ (রহ) এর মতে তার মৃত্যুর ব্যাপারটি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তার সমস্ত শারয়ী দায় দায়িত্বের ব্যাপারে তাকে জীবিতরূপে গণ্য করা হবে। এ কারণে তার বিষয় সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মাঝে বন্টন করা যাবে না। উপরন্তু সে যার উত্তরাধিকারী, সে মারা গেলে নিখোঁজ ব্যক্তিকে তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানিফা (রহ) বলেনঃ তার সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মঝে বন্টন করা যাবে না ঠিকই কিন্তু অপরের পরিত্যক্ত সম্পদ তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাঁর মতে, তাকে জীবিত হিসেবে গণ্য করার যুক্তি তার বর্তমান অধিকারসমূহের সংরক্ষণের সীমা পর্যন্ত কার্যকর হবে, তবে নতুন অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকর হবে না। ফিকাহবিদগণের পরিভাষায় প্রথমটিকে বলা হয় حجة موجبة বা সংরক্ষণমূলক যুক্তি আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে حجة رافعة অর্থাৎ নতুন অধিকার সৃষ্টিমূলক যুক্তি।

ইসতিদলালের রূপসমূহ

ইসতিদলালের ৪টি রূপ রয়েছে। যথা-

(১) এটি এমন একটি দলিল যা মূল টেক্সট থেকেই বুঝা যায়;

(২) এটি হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা দলিল প্রমাণদানে ইঙ্গিতবাহী;

(৩) এর রূপ হচ্ছে এমন, যা মর্মদ্বারা সহজে বুঝা যায়;

(৪) এর রূপ হচ্ছে এমন, অবস্থার দাবি হিসেবে দলিলরূপে যা প্রতিভাত হয়।[৭৫]

---

৭৪ মুহাম্মদ তকী আমীনী, পৃ. ১৭০

৭৫ গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন,* ঢাকা. ই. ফা. বা. ১৯৯৬, ২য় ভাগ, পৃ. ৩০

মাসালিহ মুরসালাহ (مصالح مرسلة) Consideration of Public Interest

মাসালিহ মুরসালা (مصالح مرسلة) বলতে বুঝায় এমন প্রত্যেকটি কল্যাণকে, যে বিষয়ে শারী'আত দাতার পক্ষ থেকে এমন কোন অকাট্য ও স্পষ্ট দলিল এসে পৌঁছায়নি, যা তাকে গণ্য করার আহবান জানায় এবং যার কোন মূল নেই যার উপর ভিত্তি করে কিয়াস করা যেতে পারে। তবে তা গ্রহণে কল্যাণ নিহিত রয়েছে, ক্ষতির কোন আশংকা থাকবে না। ফিকাহবিদগণ এমন মুসলিহাত গ্রহণের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এটি অকাট্য ও স্পষ্ট দলিলের বিরোধী হবে না অথবা ইজমা'রও বিরোধী হবে না।

শাব্দিক বিশ্লেষণ

মাসালিহ মুরসালাহ (مصالح مرسلة) পরিভাষাটি মাসালিহ (مصالح) ও মুরসালাহ (مرسلة) দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। মাসালিহ শব্দটি মাসলাহা (مصلحة) শব্দের বহুবচন, যার অর্থ কল্যাণ, মঙ্গল, স্বার্থ।[৭৬] আর মুরসালাহ অর্থ (مطلقة) মুক্ত, বন্ধনহীন।[৭৭] অতএব মাসালিহ মুরসালার অর্থ সাধারণ কল্যাণ, কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে পরিভাষাটি জনকল্যাণ, জনস্বার্থ, জনকল্যাণচিন্তা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পারিভাষিক অর্থ

পরিভাষায় মাসালিহ মুরসালাহ বলা হয়ঃ "কোন বিধানের ঐ কল্যাণচিন্তা যা বাস্তবায়নের ব্যাপারে শারী'আত প্রণেতার পক্ষ থেকে কোন বর্ণনা আসেনি এবং যা গ্রহণ বা পরিত্যাগ করার ব্যাপারেও কোন শার'ঈ দলিল বিধৃত হয়নি"।[৭৮] ইসলামী শারী'আতের যাবতীয় বিধি বিধান মানবকল্যাণের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী আইনবিদগণ এই সাধারণ কল্যাণকে আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, যেখানে কল্যাণের পরিবর্তন ঘটেছে, সেখানে আইনেও অনিবার্যভাবে সেই পরিবর্তনকে গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিবর্তন আইন যদি কোন অকাট্য দলিল কিংবা ইজমা' থেকে গৃহীত হয়ে থাকে, তাহলে কল্যাণের পরিবর্তনের কারণে কি অবস্থা দেখা দিবে, সে বিষয়ে আইনবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হলঃ

---

[৭৬] ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলিল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ৩৫

[৭৭] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবি-বাংলা অভিধান*, পৃ. ৯৫৬

[৭৮] খাল্লাফ, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ৯৪

ইসলামী শারী'আতে কল্যাণ (মুসলিহাত) একটি বিশেষ পরিভাষা। শব্দটি দ্বারা বুঝায়, "শারী'আতের লক্ষ্য সংরক্ষণের সীমার মধ্যে থেকে উপকারিতা লাভ এবং ক্ষতির প্রতিরোধ"।[৭৯] এ কাজ কেবল সেখানে হতে পারে, যেখানে শারী'আতকে বাস্তবায়িত করার জন্য চেষ্টা নেয়া হবে। শারী'আতের বিধান কার্যকর করার প্রচেষ্টায় রত থেকে মানবকল্যাণ উপযোগী আইন প্রণয়ন সম্ভব। কোন অবস্থায় শারী'আতের কোন বিধান কতখানি কার্যকর করা মানব কল্যাণের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে তা অনুধাবন করা কেবল সেখানেই সম্ভব। ফিকাহবিদগণ ইসলামী শারী'আতের ব্যাপক ও গভীর তত্ত্বানুসন্ধান করেছেন। তাঁরা এ কথা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছেন যে, বিশ্ব মানবতারকল্যাণ সাধনই হচ্ছে শারী'আতের প্রধান লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই শারী'আত বিরচিত। কুরআন মাজিদেও শারী'আতের এ লক্ষ্যের কথাই বিঘোষিত হয়েছে। ইসলামী শারী'আতের উপস্থাপক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি"।[৮০]

"And We have sent you (O Muhammad sm) not but as a mercy for the 'Alamin (mankind, jinn and all that exists)." (Surah 21. Al-Anbiya'. Part 17. Ayat 107).

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া ও অনুকম্পার পরিণতিরূপেই তাঁর নবী রাসূলগণকে বিশেষত সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আয়াতের 'রহমত' শব্দটির ভিত্তি হল 'কল্যাণ অর্জন ও ক্ষতির প্রতিরোধ'। আর তা একটি বিশাল ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্র এতটাই বিস্তীর্ণ, যতটা বিস্তীর্ণ মানুষের জীবন। কুরআন মাজীদে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে কোনরকম কষ্ট বা দুর্ভোগ পোহাতে বাধ্য করতে চান না। তিনি তাদেরকে সাধ্যাতীত কোন কাজ করতে করতে নির্দেশ দেননি, এমন কোন কাজের বিধান দেননি, যা সম্পাদন করা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য।

কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছেঃ "আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না; বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো"।[৮১]

"Allah dose not want to place you in difficulty, but He wants to purify you, and to complete His favour to you that you may be thankful." (Surah 5. Al-Maidah. Part 6. Ayat 6).

---

৭৯ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭

৮০ আল কুরআন, ২১: ১০৭ - *وما ارسلناك الا رحمة للعلمين*

৮১ আল কুরআন, ৫: ৬ - *ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون*

এ আয়াতে মোটামুটি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। (ক) মানুষকে কোন প্রকার কষ্টের সম্মুখীন না করা, (খ) মানুষকে পবিত্র করা এবং (গ) আল্লাহ কর্তৃক বান্দাদের নি'আমত সম্পূর্ণ করে দেয়া। এর সর্বশেষ লক্ষ্য হল, বান্দাহ যেন আল্লাহর এসব নি'আমত পেয়ে যথাযথভাবে শোকর আদায় করে। মানবতার কল্যাণে ও আল্লাহর সাথে মানুষের প্রকৃত যে সম্পর্ক তা রক্ষা করাই হল শারি'আতের মূল লক্ষ্য। যেমন কুরআন মাজীদে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় নামায আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এ নির্দেশের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছেঃ 'নিশ্চয়ই সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে"।[৮২]

"Verily, As-Salat (the prayer) prevents from Al-Fahsha (i.e. great sins of every kind, unlawful sexual intercourse) and Al-Munkar (i.e.disbelief, polytheism, and every kind of evil wicked deed)." (Surah 29. Al-'Ankabut. Part 20. Ayat 45).

রোযা ফরয করে তার কারণ বলা হয়েছে এ ভাষায় "যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার"।[৮৩]

"It was prescribed for those before you, that you may become Al-Muttaqun" (the pious See V. 2:2). (Surah 2. Al-Baqarah. Part 2. Ayat 183).

যাকাতও ইসলামের একটি মৌলিক বিধান। তাতে মানবতার প্রকৃত কল্যাণ, মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতা কার্যকরণই হল মুখ্য উদ্দেশ্য। এ থেকে স্পষ্ট ভাবে জানা যায় যে, মানবতার কল্যাণ সাধনই হচ্ছে শারী'আতের প্রধান লক্ষ্য। এ কারণেই যেসব বিষয়ে কুরআনে ও হাদীসে স্পষ্টত কোন বিধান দেয়া হয়নি, সেখানে কিয়াস ও ইজতিহাদ করে শারী'আতের বিধান নির্দিষ্ট করার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং এভাবেও শারী'আতের সেই মূল লক্ষ্য মানবতার কল্যাণ অর্জন করা হচ্ছে।

---

[৮২] আল কুরআন, ২৯: ৪৫ - ان الصلواة تنهى عن الفحشاء والمنكر

[৮৩] আল কুরআন, ২: ১৮৩ - لعلكم تتقون

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী আইনের মূলনীতি

শারী‘আতের মূল লক্ষ্য

ইসলামী জীবন বিধানে শারী‘আতের লক্ষ্য তিন প্রকারেরঃ (১) জরুরী (২)আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ এবং (৩) শোভাবর্ধক বিষয়সমূহ।

১. জরুরী

এটি হচ্ছে দীন ও দুনিয়ার যে সকল জরুরী ও একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় যার অভাবে দুনিয়ার কল্যাণের পথ ও গতিধারা ব্যাহত হয়, এক্ষেত্রে বিপর্যয়, সীমাহীন ক্ষতি ও প্রাণ বিপন্ন হওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে আখিরাতে মুক্তি লাভেরপথ সুদূর পরাহত হয়ে পড়ে এবং স্পষ্ট ও অপূরণীয় ক্ষতিসাধন অপরিহার্য ও অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়।[৮৪] সংক্ষেপে বলা যায়, ইহা পারলৌকিক জীবনে সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে এটি একান্তভাবে অপরিহার্য। কারণ জরুরী জিনিস রক্ষা করা না হলে কিংবা রক্ষা করা না গেলে দুনিয়ায় কোন প্রকার কল্যাণ সাধিত হতে পারে না; বরং এর অভাবে সামগ্রিক বিপর্যয় ঘটা অবধারিত হয়ে পড়ে।

২. ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণের মতে অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ পাঁচ প্রকার। যেমনঃ

(ক) জীবনের নিরাপত্তা; (খ) সম্পদের নিরাপত্তা; (গ) মান সম্মানের নিরাপত্তা; (ঘ) বিবেক বিশ্বাসের নিরাপত্তা; (ঙ) বংশধারার নিরাপত্তা।

(ক) জীবনের নিরাপত্তা

ইসলাম মানবজীবনকে একান্তভাবে সামনের বস্তু হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং একজন মানুষের জীবন সংহারকে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর হত্যার সমতুল্য (অপরাধ) সাব্যস্ত করে জীবনের নিরাপত্তার প্রতি যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, মানবজাতির ইতিহাসে কোন ধর্মীয়, নৈতিক কিংবা আইন শাস্ত্রীয় সাহিত্যে তার তুলনা মিলে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে প্রাণরক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করলো, আর কেউ কারো প্রাণরক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা”।[৮৫]

---

[৮৪] ইমাম শাতিবী, *আল মুয়াফফাত*, তা. বি. ২য় খ. পৃ. ৮

[৮৫] আল কুরআন, ৫: ৩২ - من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا

"If anyone killed a person not in retaliation of murder, or (and) to spread mischief in the land—it would be as if he killed all mankind, and if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind." (Surah 5. Al-Maidah. Part 6.Ayat 32).

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আল্লাহ যে প্রাণহত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করোনা"।[৮৬]

"And do not kill anyone whose killing Allah has forbidden, except for a just cause." (Surah 17. Al-Isra. Part 15. Ayat 33).

ইসলাম আইনসঙ্গত কারণে হত্যাকে ছয়টি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেঃ

- ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার অপরাধীকে তার অপরাধের শাস্তি স্বরূপ হত্যা করা।
- যুদ্ধের ময়দানে সত্য দীনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীকে হত্যা করা।
- ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধ্বংসের অপচেষ্টায় লিপ্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অপরাধের কর্মকাণ্ড স্বরূপ হত্যা করা।
- বিবাহিত নারী পুরুষকে ব্যভিচারের অপরাধে হত্যা করা।
- দীন ত্যাগের অপরাধে হত্যা করা।
- রাজপথে রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধের শাস্তি স্বরূপ হত্যা করা। এই ছয়টি কারণ ব্যতিরেকে অপর কোন কারণে মানুষের প্রাণের মর্যাদা বিনষ্ট হয় না।

কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন সূরায় এতদসম্পর্কিত বিষয় নির্দেশ রয়েছে। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছেঃ "হে মু'মিনগণ! নিহতের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালঙ্ঘন করে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। হে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো"।[৮৭]

---

[৮৬] আল কুরআন, ১৭: ৩৩ *ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق -*

[৮৭] আল কুরআন, ২: ১৭৮-১৭৯ *يا يها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى- فمن عفى له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان- ذالك تخفيف من ربكم ورحمة-ى فمن اعتدى بعد ذالك فله عذاب اليم- ولكم فى القصاص حيوة ياولى الباب لعلكم تتقون-*

"O you who believe! Al-Qisas (the Law of equality in punishment) is prescribed for you in case of murder: the free fir the free, the slave for the slave, and the female for the female. But if the killer is forgiven by the brother (for the relatives, etc.) of the killed against blood-mony, then adhering to it with fairness and payment of the blood-money to the heir should be made in fairness. This is an alleviation and a mercy from your Lord. So after this whoever transgresses the limits (i.e. kills the killer after taking the blood-money), he shall have a painful torment. And there is (a saving of) life for you in Al-Qisas (the law of quality in punishment), O men of understanding, that you may become Al-Muttaqun" (the pious—see V.2:2). (Surah 2. Al-Baqarah. Part 2. Ayat 178-179).

আল্লাহ তা'আলা হত্যাকে এমন গরুতর ও জঘন্য অপরাধ সাব্যস্ত করেছেন যে, এই অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি দুনিয়ার কিসাসের শাস্তিভোগ করা সত্ত্বেও আখিরাতে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

"এবং কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন"।[৮৮]

"And whoever kills a believer intentionally, his recompense is Hell to abide therein; and the Wrath and the curse of Allah are upon him, and a great punishment is prepared for him." (Surah 4. An-Nisa. Part 5. Ayat 93).

আল্লাহ তা'আলা কেবল অপরকে হত্যা করাই নিষিদ্ধ করেননি, বরং তিনি মানুষকে নিজের জীবন ধ্বংস না করারও নির্দেশ দিয়াছেন এবং এভাবে আত্মহত্যার পথও বন্ধ করা দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "তোমরা আত্মহত্যা করো না"।[৮৯]

"And do not kill yourselves (nor kill one another)." (Surah 4. An-Nisa. Part 5. Ayat 29).

জীবনের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন মাজীদের উপরোক্ত সুস্পষ্ট বিধানের পর এখন নবী কারীম (সা) এর বাণীসমূহ ও তাঁর কল্যাণময় যুগের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদায় হাজ্জের ভাষণে তিনি বলেছেনঃ "হে লোক সকল! তোমাদের জান মাল ইজ্জত আবরুর উপর হস্তক্ষেপ তোমাদের উপর হারাম করা হলো। তোমাদের আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই শহর যেমন পবিত্র ও সম্মানিত, অনুরূপভাবে উপরোক্ত জিনিসগুলোও সম্মানিত ও পবিত্র। সাবধান! আমার পরে তোমরা পরস্পরের হত্যাকারী হয়ে কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে যেওনা"।[৯০]

---

৮৮ আল কুরআন, 8: ৯৩ *ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنمرخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما-*

৮৯ আল কুরআন, 8: ২৯ *ولا تقتلوا انفسكم-*

৯০ ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর তিনি তার এই নসিহত কার্যকর করতে গিয়ে সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেনঃ "জাহিলি যুগের যাবতীয় হত্যা রহিত করা হলো। প্রথম যে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ আমি রহিত করলাম তা হচ্ছে আমার বংশের রবী'আ ইবনুল হারিস এর দুগ্ধপোষ্য শিশু হত্যার প্রতিশোধ, যাকে হুযায়ল গোত্রের লোকেরা হত্যা করেছিল। আজ আমি তা ক্ষমা করে দিলাম"।[৯১] নবী (সা) আরো বলেছেনঃ "কোন মুসলিম ব্যক্তির নিহত হওয়ার তুলনায় সমগ্র পৃথিবীর পতন আল্লাহর দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ ব্যাপার"।[৯২] কেবল মুসলমানের জীবনই সম্মানিত নয়, আল্লাহর প্রত্যেক বান্দার জীবনই সম্মানিত। কোন মুসলমানের হাতে অন্যায়ভাবে কোন বিধর্মী নিহত হলে সেই মুসলমানের জন্য জান্নাত হারাম। নবী (সা) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কোন বিধর্মীকে হত্যা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন"।[৯৩]

মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার নজিরবিহীন ঘটনা থেকে আমরা যথার্থই অনুমান করতে পারি যে, মানুষের প্রাণের মূল্য এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামের অনুসৃত কর্মপন্থা কত উন্নত ছিল। অথচ তখনও কাফিররা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল, মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রাণভিক্ষা দেয়ার জন্য সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে নিম্মোক্ত ফরমান জারি করেনঃ

(ক) যারা অস্ত্র সমর্পণ করবে তাদের হত্যা করবে না;

(খ) যে ব্যক্তি কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিবে তাকে হত্যা করবে না;

(গ) যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নেবে তাকে হত্যা করবে না;

(ঘ) যে ব্যক্তি নিজের বাড়িতে বসে থাকবে তাকে হত্যা করবে না;

(ঙ) যে ব্যক্তি হাকীম ইবন হিযামের বাড়িতে আশ্রয় নেবে তাকে হত্যা করবে না;

(চ) আহত ব্যক্তিকে হত্যা করবে না;

(ছ) পলায়ণকারীদের পিছু ধাওয়া করবে না।

মক্কা বিজয়ের পর কা'বার প্রাঙ্গণে অপেক্ষমাণ জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেনঃ "তোমরা কী জান আজ আমি তোমাদের সাথে কিরূপ আচরণ করব?" জনসমুদ্র থেকে সমস্বরে জবাব এলো, "আপনি একজন সম্ভ্রান্ত ভাই এবং সম্ভ্রান্ত ভাইয়ের সন্তান"। মহানবী (সা) জবাবে বললেন, আজ তোমাদের উপর আমার কোন প্রতিশোধ স্পৃহা নেই, যাও তোমরা সবাই মুক্ত স্বাধীন"।[৯৪]

---

[৯১] *প্রাগুক্ত,*

[৯২] ইমাম মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*

[৯৩] ইমাম নাসাঈ, *সুনান*

[৯৪] কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান মানসুরপুরী, *রহমাতুল্লিল আলামীন,* ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৮

জীবনের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, কখন থেকে এর প্রয়োগ হবে? পৃথিবীর সাধারণ আইনে মানব সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে প্রাণের নিরাপত্তার অধিকার কার্যকর হয়। কিন্তু ইসলামী আইনে মাতৃ উদরে গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর থেকেই প্রাণের মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ কারণে মহানবী (সা) গামিদ গোত্রের এক নারীকে ব্যভিচারের সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও হত্যার নির্দেশ দেননি। কেননা সে তার জবানবন্দীতে নিজেকে গর্ভবতী ব্যক্ত করে। অতঃপর সন্তান প্রসব ও দুধপানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেয়া হয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি কার্যকর করলে অন্যায়ভাবে সন্তানটির প্রাণনাশের আশংকা ছিল। ইসলামী আইন বিশারদগণ সন্তান গর্ভধারণের ১২০দিনের মাথায় প্রাণের নিরাপত্তার অধিকার ধার্য করেছেন। কেননা এই সময়সীমায় গর্ভসঞ্চার গোশতপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে মানুষের আকৃতি ধারণ করতে শুরু করে এবং তার উপর 'মানুষ' পরিভাষা প্রযোজ্য হয়। আমাদের ফকিহগণের এই অভিমত শত সহস্র বছর পর আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও স্বীকার করে নিয়েছে"।[৯৫]

(খ) সম্পদের নিরাপত্তা

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বৈধ উপায়ে উপার্জিত ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা স্বীকৃত। তবে এক্ষেত্রে শারী'আত নির্ধারিত সমস্ত অধিকার ও কর্তব্য যেমন যাকাত, দান খয়রাত, মাতাপিতা, স্ত্রী, পুত্র পরিজন ভাই বোন ও অপরাপর নিকটাত্মীয় স্বজনের ব্যয়ভার ও দায়িত্ব বহন করতে হবে, উত্তরাধিকার স্বত্ব, ক্রয় বিক্রয়ের অধিকার ইত্যাদি খাতের ব্যয়ভার এবং রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্যকৃত স্থায়ী ও সাময়িক প্রকৃতির কর পরিশোধ করতে হবে। অধিকন্তু এ সম্পদ হারাম ও অবৈধ খাতে ব্যয় করা যাবে না। এ সব শর্তাধীনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে সম্পদের মালিকানা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে এবং সম্পদের সংশ্লিষ্ট মালিক নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ ভোগ করবেঃ (ক) ভোগ ব্যবহারের অধিকার; (খ) অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যে বিনিয়োগ করার অধিকার; (গ) সম্পদের মালিকানা হস্তান্তরের অধিকার এবং (ঘ) মালিকানাস্বত্ব রক্ষার অধিকার। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের স্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছেঃ "তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা"।[৯৬] সরকার কারো ব্যক্তিগত সম্পদ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে হুকুম দখলের প্রয়োজন মনে করলে মালিকের সম্মতিক্রমে উপযুক্ত মূল্য আদায় সাপেক্ষে তা গ্রহণ করতে পারবে। মদীনায় মসজীদে নববী নির্মাণের জন্য মহানবী (সা) যে স্থানটি নির্বাচন করলেন তা ছিল দু'জন ইয়াতিম বালকের মালিকানাধীন ভূমি খণ্ডটি বিনামূল্যে

---

[৯৫] *যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন, অক্টোবর ১৯৭২, নিউইয়র্ক, পৃ. ১৪৭*

[৯৬] আল কুরআন, ২: ১৮৮ –*ولا تاءكلوا اموالكم بينكم بالباطل*

Dhaka University Institutional Repository

মসজীদের জন্য দান করতে চেয়েছিল। কিন্তু মহানবী (সা) অনুমান করে মূল্য নির্ধারণ করলেন এবং তৎকালীন বাজার দর অনুযায়ী তা পরিশোধ করে ভূমি খণ্ডটি গ্রহণ করেন।[৯৭]

মহানবী (সা) হুনায়ন যুদ্ধের প্রাক্কালে সাফয়ান ইবন উমাইয়ার নিকট থেকে কয়েকটি বর্ম গ্রহণ করেন। সে বলল, "হে মুহাম্মদ (সা)! এটা কি বলপূর্বক নেয়া হলো? " তিনি বললেন, "না বরং ধার স্বরূপ গ্রহণ করলাম। এর কোন একটি নষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।[৯৮] মহানবী (সা) বিদায় হাজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে প্রাণের মর্যাদার সাথে সাথে ধন সম্পদের মর্যাদা সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তা ইতোপূর্বে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। মালিকানাস্বত্ব রক্ষার অধিকারের গুরুত্ব এ হাদীস থেকে অনুমান করা যায়।

(গ) মান সম্মানের নিরাপত্তা

প্রত্যেক নাগরিকের মান সম্মানের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে ইসলাম। বিদায় হাজ্জের ভাষণে মহানবী (সা) জানমালের নিরাপত্তার সাথে সাথে মান সম্মানের মর্যাদা রক্ষারও নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছেঃ "হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করোনা এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না"।[৯৯]

"O you who believe! Let not a group scoff at another group, it may be that the latter are better than the former. Not let (some) women scoff at other women, it may be that the latter are better than the former. Nor defame one another, nor insult one another by nicknames." (Surah 49. Al-Hujurat. Part 26. Ayat 11).

অপর এক আয়াতে উল্লেখ আছেঃ "তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করোনা"।[১০০]

And spy not, neither backbite one another. (Surah 49. Al-Hujurat. Part 26. Ayat 12).

এই আয়াতে আরো বলা হয়েছেঃ "হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাক, কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ"। উপরোক্ত আয়াত সমূহে সরাসরি মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে কিছু বলা হয়নি,

---

[৯৭] নঈম সিদ্দিকী, *মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,* তা বি. পৃ. ২২৪

[৯৮] আমীন আহসান ইসলাহী, *ইসলামী রিয়াসাত,* ১৯৫০, পৃ. ১৩

[৯৯] আল কুরআন, ৪৯: ১১ *ياايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساءلمن نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب* -

[১০০] আল কুরআন, ৪৯: ১২ *ولا يغتب بعضكم بعضا* -

Dhaka University Institutional Repository

বরং মহানবী (সা) এর মাধ্যমে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে, যেখানে মুসলিমগণ ব্যক্তিগতভেবে এগুলোর উপর আমল করবে, সেখানে ইসলামী রাষ্ট্রও এসবের পৃষ্ঠপোষকতা করবে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নাগরিকদের মান মর্যাদা রক্ষার পরিপূর্ণ সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং অশ্লীলতার বিস্তার রোধ করাও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

মহানবী (সা) তাঁর অসংখ্য হাদীসে মানুষকে অহেতুক মারপিট করতে নিষেধ করেছেন। একবার তিনি বলেনঃ "মুসলমানদের পৃষ্ঠদেশ সম্মানিত। তবে সে যদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে, তাকে শাস্তি দেয়া যাবে। বিনা কারণে কোন মুসলমানকে প্রহার করলে আল্লাহ তার (প্রহারকারীর) উপর ভীষণ ক্ষুদ্ধ হন"।

"কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অপমানিত লাঞ্চিত অথবা সম্মানহানি হতে দেখেও যদি তার সাহায্য না করে, তাহলে আল্লাহ এমন স্থানে তার সাহায্য ত্যাগ করবেন যেখনে সে নিজে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থী হবে। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে অপমানিত অথবা অপদস্থ হতে দেখে এবং লাঞ্চিত ও হেয় হতে দেখে এগিয়ে আসবে, আল্লাহ তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন, যেখানে সে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে"।[১০১]

হযরত উমর (রা) প্রশাসকদের বিদায়কালে নিম্মোক্ত উপদেশ দিতেনঃ "আমি তোমাদেরকে যালিম ও অত্যাচারী হিসেবে নয়, বরং ইমাম ও সত্য পথের দিশারী হিসেবে নিয়োগ করে পাঠাচ্ছি। সাবধান! মুসলিমদের মারধোর করে অপমানিত করবে না"।[১০২] মান সম্মান সংরক্ষণের ব্যাপারে ইসলামের দর্শন কি তা নিম্মের আয়াত থেকে অনুমান করা যায়। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছেঃ "নিশ্চয়ই যারা সাধী, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানবে আল্লাহই সত্য স্পষ্ট প্রকাশক"।[১০৩]

"Verily, those who accuse chaste women, who never even think of anything touching their chastity and are good beleivers —are cursed in this life and in the Hearafter, and for them will be a great torment— On the day when their tongues, their hands, and their legs, (or feet) will bear witness against them as to what they used to do. On that day Allah will pay them the recompense of their deeds in full, and they will know that Allah, He is the Manifest Truth." (Surah 24. An-Nur. Part 18. Ayat 23-25).

---

১০১ ইমাম আবূ দাউদ, *সুনান*

১০২ ইমাম আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ (উর্দু অনু)* তা. বি. ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৭

১০৩ আল কুরআন, ২৪: ২৩-২৫ *ان الذين يرمون المحصنت الغفلت المؤمنت لعنوا فى الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم- يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون- يومئذ يؤفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين-*

এটা অনিবার্য সত্য যে, ইসলামের ইতিহাসে অত্যাচার, যুলম, নির্যাতন, বলপ্রয়োগ ও কঠোরতা প্রদর্শনের বহু সংখ্যক উপাখ্যান ও কাহিনী গ্রন্থের কোনটিতে এমন কোন ঘটনা পরিদৃষ্ট হয় না যে, কোন শাসক তার প্রতিপক্ষকে স্তব্দ করার জন্য তাদের কন্যা, জায়া, জননী, বোনদের ইযযত, আব্রু লুণ্ঠন করেছে।

(ঘ) বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা

ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের বিবেক ও ধর্ম বিশ্বাসের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছেঃ "দীন সম্পর্কে জোর জবরদস্তি নেই; সত্যপথ ভ্রান্তপথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে"।[১০৪]

"There is no compulsion in religion. Verily, the Right Path has become distinct from the wromg path." (Surah 2. Al-Baqarah. Part 3. Ayat 256).

অর্থাৎ সত্যপথ তো তা-ই যার দিকে ইসলাম মানবজাতিকে আহবান জানাচ্ছে এবং সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নিরূপণের জন্য ভ্রান্ত ধারণাসমূহকে ছাঁটাই করে পৃথক করে দিয়েছে। এখন আল্লাহর অভিপ্রায় ও মুসলমানদের প্রচেষ্টা তো এটাই যে, সারা বিশ্ব যেন ইসলামের সত্যের আহবানকে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কারো উপর বল প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই। যার মনে চায় তা যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে গ্রহণ করবে এবং যার মন চাইবে না তাকে তা গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা যাবে না।
কুরআন মাজীদে অন্যত্র উল্লেখ আছেঃ "তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলে অবশ্যই ঈমান আনতো, তবে কি তুমি মু'মিন হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে?"[১০৫]
"And had your Lord willed, those on earth would have believed, all of them together. So, will you (O Muhammad sm) then compel mankind, until they become believers." (Surah 10. Yunus. Part 11. Ayat 99).
আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ নেই"।[১০৬]
"Allah is our Lord and your Lord. For us our deeds and for you your deeds. There is no dispute between us and you." (Surah 42. Ash-Shura. Part 25).
উল্লেখ্য যে, হযরত উমর (রা) এর গোলাম ওসাক রুমীর ঘটনাটি সহিষ্ণুতার অনুপম দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। সে নিজেই বর্ণনা করেছে যে, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এর গোলাম ছিলাম। তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন,

---

১০৪ আল কুরআন, ২: ২৫৬ –لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي

১০৫ আল কুরআন ১০: ৯৯ - ولو شاء ربك لامن من فى الارض كلهم جميعا افاءت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين

১০৬ আল কুরআন ৪২: ১৫ –الله ربنا وربكم لنا اعملنا ولكم اعملكم لا حجة بيننا وبينكم

Dhaka University Institutional Repository

"মুসলমান হয়ে যাও। যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, তবে আমি তোমার উপর মুসলমানদের আমানতের কোন দায়িত্ব অর্পণ করব। কেননা কোন অমুসলিমকে মুসলমানদের আমানতের কাজে নিয়োগ দেয়া আমার জন্য সমীচীন নয়"। কিন্তু আমি ইসলাম গ্রহণ করিনি। এরপর তিনি বলতেনঃ দীন সম্পর্কে জবরদস্তি নেই। পরিশেষে তিনি তাঁর শাহাদাতের পূর্বাহ্ণে আমাকে মুক্ত করে দেন। এ সময় তিনি আমাকে বললেনঃ যেখানে মন চায় চলে যেতে পার"।[১০৭] ধর্মীয় বিষয়ে স্বাধীনতার ব্যাপারে ইসলাম শুধু এতটুকু কথা বলেই শেষ করেনি যে, তোমরা কারো উপর বল প্রয়োগ করবে না, বরং এ নির্দেশও দিয়েছে যে, কারো মনে কষ্ট দিওনা এবং তাদের উপাস্য দেব দেবীকে গালমন্দ করোনা।

কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছেঃ "আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তারা ডাকে তাদের তোমরা গালি দিওনা, কেননা তারা (শত্রুতা করে) অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে"।[১০৮]

"And insult not those whom they (disbelievers) worship besides Allah, lest they insult Allah wrongfully without knowledge. Thus we have made fair-seming to each people its own doings; then to their Lord is their return and He shall then inform them of all that they used to do." (Surah 6. Al-An'am. Part 7. Ayat 108).

(ঙ) বংশধারার নিরাপত্তা

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ) এর মাধ্যমে বিশ্বময় অসংখ্য নর- নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং পরবর্তীকালে মানব চরিত্র সুরক্ষা ও মানব বংশধারা চলমান রাখার লক্ষ্যে বিবাহ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে ও হাদীস শরীফে বিবাহ করার প্রতি অনুপ্রেরণাদায়ক বহু বাণী বিধৃত হয়েছে এবং অপরদিকে বিবাহের বিপরীতে ব্যভিচারের ভয়াবহ পরিণামের কথা বলা হয়েছে। কেননা কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছেঃ "আর যেনার নিকটবর্তীও হয়োনা, এতো অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ"।[১০৯]

"And come not near to the unlawful sexual intercourse. Verily, it is a fahishah (i.e. anything that transgresses its limits: a great sin), and an evil way (that leads one to Hell unless Allah forgives him)." (Surah 17. Al-Isra'. Part 15. Ayat 32).

---

১০৭ ইমাম আবু ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, তা. বি. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪

১০৮ আল কুরআন ৬: ১০৮ – *ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم*

১০৯ আল কুরআন ১৭: ৩২ – *ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا*

Dhaka University Institutional Repository

তাই ইসলাম সন্তান জন্মদানে সক্ষম নারীকে বিবাহ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে এবং যিনা ব্যভিচারের সকল পথ বন্ধের সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সুতরাং ইসলাম মানব বংশধারার নিরাপত্তা ঘোষণা করেছে যাতে সন্তান অবৈধভাবে জন্মগ্রহণ করে তার সামাজিক মর্যাদা না হারায়।

মুসলিম ফকিহ ও মুজতাহিদগণের রায় বা অভিমত

ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস হচ্ছে মুসলিম ফকিহ ও মুজতাহিদগণের রায় বা অভিমত। উক্তি, ফাতওয়া, সালিশি মীমাংসা, আদালতের সিদ্ধান্ত, সরকারি ও বেসরকারি নির্দেশ ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে সাহাবা কিরামের রায় বা অভিমত সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী।

হাদীসে উল্লেখ আছেঃ "হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আমার ইন্তিকালের পর আমার সাহাবীদের মতভেদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ওহীর মাধ্যমে আমাকে জানালেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আমার নিকট তোমার সাহাবীর মর্যাদা হল, আকাশের তারকারাজির ন্যায় আর এগুলোর একটি অপরটি অপেক্ষা উজ্জলতর। অথচ প্রত্যেকটির নিজস্ব আলো রয়েছে। সুতরাং তাদের মতভেদ হতে যে কোন ব্যক্তি কোন একটি অভিমত গ্রহণ করবে, সে আমার কাছে হিদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ণনাকারী আরো বলেন; রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন, আমার সাহাবীগণ হল তারকা সদৃশ। অতএব যে কাউকে অনুসরণ করবে হিদায়াত পাবে"।[১১০]

অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছেঃ "হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমার (ইন্তিকালের) পরে তাদের সমালোচনার পাত্র বানিওনা। যে ব্যক্তি তাদের ভালবাসল, সে প্রকৃতপক্ষে আমাকে ভালবাসল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাদের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ রাখল, সে প্রকৃতপক্ষে আমার প্রতিই হিংসা বিদ্বেষ রাখল। আর যে ব্যক্তি তাদের কষ্ট দিল, সে প্রকৃতপক্ষে আমাকেই কষ্ট দিলো। যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই কষ্ট দিলো। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহকে কষ্ট দিবে, আল্লাহ অচিরেই তাকে পাকড়াও করবেন"।[১১১]

ইসলামী আইনবিদগণ উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেনঃ "তাঁদের (সাহাবায়ে কিরাম) অধিকাংশ উক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট থেকে শোনা। যদি তাঁরা ইজতিহাদ করে থাকেন, তবে তাঁদের অভিমত হবে

[১১০] রাযীন

[১১১] ইমাম তিরমিযী, *সুনান*

সবচেয়ে যথার্থ; কারণ তাঁরা কুরআন মাজীদের নাযিলকাল প্রত্যক্ষ করেছেন, ইসলাম গ্রহণে তাঁরা ছিলেন অগ্রণী। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাহচর্যের বরকতপ্রাপ্ত। তাঁদের যুগ ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ"।[১১২]

ইসলামী আইনবিদগণের আরো একটি অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হলঃ "কারণ তাঁরা কুরআন মাজীদ নাযিলের অবস্থাদি শারী'আতের গুঢ় তাৎপর্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন"।[১১৩]

উপরোক্ত হাদীস ও ইসলামী আইনবিদগণের অভিমতের আলোকে বলা যায় যে, অন্যান্যদের মোকাবিলায় সাহাবা কিরামের অভিমত বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। উল্লেখ্য যে সৃষ্টিগতভাবে সকল মানুষ সমান হলেও পদমর্যাদার দিক থেকে সবাই সমান নয়। তাই আইনের দিক থেকে কাদের অভিমত অধিক গুরুত্বপূর্ণ তা নিম্নোক্ত বাণী থেকে উপলব্ধি করা যায়, "যে সব সাহাবা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাহচর্যে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেন এবং যারা রাসূল (সা) এর পবিত্র চরিত্রের রঙ্গে নিজেদের রঞ্জিত করেন যেমন, খুলাফায়ে রাশেদীন, নবী (সা) এর পবিত্র সহধর্মিণীগণ, চার আব্দুল্লাহ [আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবন উমর, আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়ের ও আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)] আনাস ও হুযায়ফা (রা) এবং যারা এই শ্রেণিভুক্ত"।[১১৪] যার মধ্যে কিয়াস ও রায়ের অবকাশ রয়েছে এমন সব বিষয়ে কোন সাহাবার উক্তি সাহাবী নন এমন ব্যক্তিদের জন্য সূন্নাতের পর্যায়ভুক্ত হবে"।[১১৫]

অন্যভাবে বলা যায়, যে সব ক্ষেত্রে কিয়াস বা রায়ের অবকাশ নেই, রাসূলুল্লাহ (সা) এর মুখ থেকে না শুনলে কিছু বলার উপায় নেই, সে ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসরণ করা ওয়াজিব।

তাবে'ঈগণের অবস্থান

সাহাবা কিরামের পরে তাবেঈগণের মর্যাদা। নিম্নবর্ণিত হাদীস তার প্রমাণ, "আমার যুগ সর্বোত্তম যুগ। তার পরবর্তীগণের যুগ শ্রেষ্ঠ, তারপর যারা আসবে তাদের (তাবেঈ) যুগ শ্রেষ্ঠ"।[১১৬] এ কারণে ইসলামী আইনবিদ তাবে'ঈগণের অভিমতসমূহ গ্রহণ করেছেন। যে সব তাবে'ঈর অভিমতসমূহ (রায়) সাহাবা কিরামের যুগে খ্যাতি লাভ করে এবং মুসলিম সমাজে স্বীকৃতি অর্জন করে, যেমন বিচারপতি শুরায়হ, মাসরুক (রহ) প্রমুখ তাবে'ঈ, তাদেরকে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাহাবা কিরামের সমপর্যায়ের গণ্য করা হয়। অন্যান্য তাবে'ঈর উক্তির মোকাবিলায় ইসলামী আইনবিদগণ নিজেদের কিয়াসকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং 'আমরা যেমন

---

১১২ মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪

১১৩ মুল্লা জিউন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭

১১৪ শাব্বির আহমাদ উসমানী, *ফাতহুল মুলহিম*, তা. বি. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭

১১৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭১

১১৬ শায়খ ওয়ালী উদ্দীন, *আল মিশকাতুল মাসাবীহ*, অধ্যায়ঃ মানাকিবে সাহাবা

Dhaka University Institutional Repository

তারাও তেমন পুরুষ' এ ধরণের মন্তব্য করতে দ্বিধাবোধ করেননি। উল্লেখ্য যে, এ অধ্যায়ের শিরোনামে স্বীকৃত ব্যক্তিগণের অভিমত বলতে কিয়াস, ইসতিহসান, ইসতিসলাহ এবং সামরিক ও জরুরী অবস্থায় প্রদত্ত অভিমত ইত্যাদি সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত বুঝানো হয়েছে।

তা'আমুল

ইসলামী আইনের নবম উৎস হচ্ছে তা'আমুল। তা'আমুল এর মর্ম হচ্ছে মহানবী (সা) এর সাহাবীগণের আমলের অনুসরণ করা। তাঁদের আমল শারী'আতের দলিল হিসেবে স্বীকৃত। ইসলামী আইনবিদগণ ইসলামী আইন ও বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাহাবা কিরামের আমল থেকে উপাদান গ্রহণ করে থাকেন।

সাহাবা কিরামের মর্যাদা

সাহাবা কিরাম হলেন রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা। তাঁরা তাঁর চিন্তা চেতনা ও আমল আখলাক দ্বারা তাঁদের জীবন চরিত্রকে ষোলআনায় সাজিয়েছিলেন। কোন বিষয়ে সন্দেহ কিংবা সমস্যা দেখা দিলে তাঁরা তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করে সমস্যার সমাধান করতেন। তাঁদের মাঝে বিপুল সংখ্যক সাহাবী আইন বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। মহানবী (সা) তাঁদের পারদর্শিতার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে গেছেন। নবুয়্যতের আলোকবর্তিকা ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁরা সর্বাধিক অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁদের রায় ও অভিমত অপর কোন সম্প্রদায় কিংবা গোষ্ঠীর সমতুল্য কিংবা তুলনীয় হতে পারে না। সামগ্রিকভাবে তাঁদের কথা ও আমল দীনি কাজের ব্যাপারে ও ইসলামী আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। কারণ তাঁরা এমন একটি সত্যনিষ্ঠ দল যারা নবী (সা) এর তিরোধানের পর তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ পরিপূর্ণভাবে পরিপালনের যিম্মাদার। একথা সুস্পষ্ট যে, কোন নবী কিংবা রাসূলের মাধ্যমে তাঁর অনুসারীগণ দীনের সঠিক নির্দেশনা জীবদ্দশায় লাভ করেন এ কথা সত্য কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পর ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক বিধান তাঁরা রেখে যেতে পারেন না। তবে তাঁদের বাণী ও কর্মের মাঝে এমন সব সাধারণ ও ব্যাপক আইন বিধান নিহিত থাকে যার সাহায্যে পরবর্তীগণ নতুন নতুন সমস্যার সমাধান দিতে পারেন। নবী রাসূলের ইন্তিকালের পর এই জামা'আতই সেই আইন বিধান তাঁদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করে নবীর রেখে যাওয়া দায়িত্বই পালন করে থাকেন। তাই এক পর্যায়ে তাঁদের সর্বসম্মত অভিমত (ইজমা') উম্মতের জন্য শারী'আতের দলিল হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। এ কারণে ইসলামী আইনবিদগণ সাহাব কিরামের তা'আমুলকে শারী'আতের দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছেঃ "মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট"।[১১৭]

"And the Foremost to embrace Islam of the Muhajirin (those who migrated from Makka to Al-Madina) and the Ansar (the citizens of Al-Madina who helped and gave aid to the Muhajirin) and also those who followed them exactly (in faith). Allah is well-pleased with them as they are well-pleased with Him." (Surah 9. At-Taubah. Part 11. Ayat 100).

উপরে বর্ণিত আয়াতে رضى الله عنهم ورضوا عنه সাহাবা কিরামের কর্মকাণ্ডকে শারী'আতের দলিল হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দেয়। বিশেষত আল্লাহর সাথে তাঁদের জীবনধারার একাত্মতা প্রমাণ করে।

'উরফ (عرف) বা সামাজিক প্রথা ও রেওয়াজ (Customary Law)

ইসলামী আইনের বিকাশে 'উরফ এর বিশেষ অবদান রয়েছে। আরব ও অনারবের অনেক প্রচলিত রীতি নীতি ও রেওয়াজ যেগুলো ইসলামের মৌলিক আদর্শের পরিপন্থী ছিল না এবং কুরআন সূন্নাহর সুস্পষ্ট বর্ণনা যে সব ব্যাপারে নীরব ছিল, সেগুলোকে সাহাবা কিরাম, তাবে'ঈগণ এবং তাঁদের পরে ইসলামী আইনবিদগণ অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। ইসলামী আইনের পুস্তকাদি রচনার যুগে সেগুলো ইসলামী আইনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দিয়াত (রক্তপণ) প্রচলিত ছিল ১০০টি উট। মহানবী (সা) এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিব জনৈক মহিলার প্রস্তাব অনুযায়ী রক্তপণের এই সংখ্যা গ্রহণ করেছিলেন। সাহাবা কিরাম ও তাবেঈগণের যুগেও এই আইন প্রচলিত ছিল।[১১৮] হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহ) জাহিলী যুগে আরব জাহানে প্রচলিত ভাল রসম রেওয়াজগুলোকে ইসলামী আইনের উপকরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১১৯]

'উরফ এর শাব্দিক বিশ্লেষণ

অভিধানে 'উরফ (العرف) শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. কল্যাণ, উত্তম, খারাপের বিপরীত। এ অর্থে আল্লাহ বলেনঃ "আর ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করো, 'উরফের (সৎকাজের) নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চলো" ।[১২০]

---

[১১৭] আল কুরআন, ৯: ১০০ – *والسبقون الاولون من المهجرين والانصار والذين اتبعوهمؤباحسانررضىاللهرعنهمرورضوارعنه*

[১১৮] মুহাম্মদ তকী আমীনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬

[১১৯] শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ,* তা. বি ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৩

[১২০] আল কুরআন, ৭: ১৯৯- خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين

Dhaka University Institutional Repository

২. ধারাবাহিকতা। আল্লাহর বাণীঃ "কল্যাণস্বরূপ ধারাবাহিক ভাবে প্রেরিত বায়ুর শপথ"।[১২১]

"By the winds (for angels or the Messengers of Allah) sent forth one after another". (Surah 77. Al-Mursalat. Part29. Ayat 1).

৩. স্বীকৃতি বা (اعتراف) অনুমোদন, সমর্থন। যেমন বলা হয়, له على ماة عرفا

৪. ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদি।[১২২]

এর আভিধানিক অর্থ জনসাধারণের মাঝে প্রচলিত রীতি। এটি রেওয়াজ এর অভিন্ন অর্থবোধক শব্দ।

পারিভাষিক অর্থ

পরিভাষায় উরফ বলা হয়ঃ "যেসব বিষয় মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে বা তাদের মধ্যে প্রচলিত কর্মকাণ্ড যাতে তারা অভ্যস্ত হয়েছে, অথবা যেসব শব্দ প্রকৃত অর্থের বিপরীতে বিশেষ অর্থ প্রদানের জন্য তারা ব্যবহার করে, যা অন্যরা শ্রবণ করলে সহজবোধ্য হয় না"।[১২৩]

"কথা অথবা কাজে বিপুল সংখ্যক মানুষের অভ্যাস এর নাম উরফ"।[১২৪] উরফ ও আদতের সাথে সামঞ্জস্যশীল আর একটি শব্দ হচ্ছে 'ইসতিমাল'। শব্দটি তার আসল অর্থ থেকে বিচ্যুত হয়ে শারী'আতের একটি পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইসলামী আইনবিদগণের নিম্নোক্ত উক্তিতে এর ইঙ্গিত রয়েছেঃ "লোকদের ব্যবহারিক রীতি (ইসতি'মাল) শারী'আতের দলিল। এর উপর আমল করা ওয়াজিব"।[১২৫]

'আদত এর সংজ্ঞা নিম্নরূপঃ "পৌনঃপুনিক ব্যাপারগুলোর মধ্যে যা মানুষের মনে ঠাই করে নেয় এবং সুস্থ প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল তা- ই হচ্ছে 'আদত"।[১২৬]

---

১২১ আল কুরআন, ৭৭: ১ - والمرسلات غرقا

১২২ ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, খ. ২, পৃ. ১০৪

১২৩ *প্রাগুক্ত*, هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم او لفظ تعارفو اطلاقه على معنى خاص لا تالف اللغة ولا يتبادر غيره عند سماعه -

১২৪ মুহাম্দ কী আমীনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭

১২৫ *প্রাগুক্ত*, - *استعمال الناس حجة يجب العمل بها*

১২৬ আল্লামা যায়নুল আবেদীন আল মিসরী , *আল আশবাহ অয়ান-নাযাইর*, তা. বি. পৃ. ৬৪ *العادة عبارة عما يستقر بالنفوس من الامور المتكررة المقبولة عند الطباع السلمية*–

কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি এর বুনিয়াদ হতে পারেঃ "তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকাজের আদেশ দাও এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চলো"।[১২৭]

"Show forgiveness, enjoin what is good, and turn away from the foolish (i.e. don't punish them)." Surah 7. Al-A'raf. Part 9. Ayat 199).

মুফাসসিরগণের মতে সমস্ত যৌক্তিক ও প্রচলিত ভাল কথা ও কাজ 'উরফ এর অন্তর্ভুক্ত। নবী (সা) বলেছেনঃ "হযরত রাফে' ইবন খাদিজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; নবী (সা) যখন মদিনায় আসলেন তখন মদীনার লোকেরা খেজুর গাছে তা'বীর করছিলো, তখন নবী (সা) তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন এরূপ করছ? তারা বললেন, আমরা তো এরূপই করে আসছি। তিনি বললেন, তোমরা এরূপ না করলে সম্ভবতঃ ভালো হতো। সে মতে তারা তা'বীর করা ছেড়ে দেয়। ফলে (পরের বছর) ফলন কমে যায়। বিষয়টি তারা তাঁর নিকট আলোচনা করলো। তখন তিনি বললেন, আমি একজন মানুষ মাত্র। কাজেই আমি যখন দীনি কোন ব্যাপারে নির্দেশ দিই, তখন তোমরা তা অবলম্বন করো। আর আমার নিজের পক্ষ থেকে যখন কোন বিষয়ের নির্দেশ দিই, তবে আমি একজন মানুষ মাত্র"।[১২৮]

অপর এক হাদীসে আছেঃ "মুসলিমগণ যে বিষয়কে ভালো মনে করে আল্লাহর কাছেও তা ভালো। আর মুসলিমগণ যা মন্দ মনে করে আল্লাহর কাছেও তা মন্দ"।[১২৯]

দেশজ আইন

ইসলামী আইনের আর একটি উৎস হচ্ছে দেশজ আইন। উরফ এর আলচনায় কুরআন হাদীসের যে সব বরাত দেয়া হয়েছে, দেশজ আইনের সমর্থনেও তা উপস্থাপন করা যেতে পারে। দীনি দাওয়াতি কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে (সৎকাজের আদেশ দান) মারুফ এ ব্যাপক পরিধিতে এমন সব দেশজ আইনও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যা ইসলামী আইনের সাথে পূর্ণ সাজুয্যপূর্ণ এবং শারী'আত ও আকল বুদ্ধি বিবেচনা পরিপন্থী নয়। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছেঃ "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখবে"।[১৩০]

---

১২৭ আল কুরআন, ৭: ১৯৯ –*خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجهلين*

১২৮ ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*

১২৯ ইবন তাইমিয়া, *মাজমুআয়ে রাসাইল,* তা. বি. পৃ. ১২০

১৩০ আল কুরআন, ৩: ১১০ –*كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله*

"You [true believers in Islamic Monotheism, and real followers of prophet Muhammad sm and his Sunnah] are the best of peoples ever raised up for mankind; you enjioin Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam has ordained) and forbid Al-Munkar (polytheism, disbelief and all that Islam has forbidden), And you believe in Allah." (Surah 3. Al-Imran. Part 4. Ayat 110).

উম্মতে মুহাম্মদী পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছে সেখানে ভালো রসম রেওয়াজ ও আইনকে উৎসাহিত করেছে। উপরোক্ত আয়াতের আলোকে এবং প্রেরণায় এগুলো পূর্ববর্তী শারী'আতেরে অবশিষ্টাংশ, এমন ঢালাও দাবি ভিত্তিহীন ও অমূলক। পৃথিবীর সকল সভ্যতায় তদানিন্তন যুগের মানুষের নিজ নিজ কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে কতিপয় আইন রচনা করেছিল, তবে তাতে পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের আনিত শারী'আতের যে সম্পর্ক ছিল তা দৃঢ়তর সাথেই বলা যায়। তাই তা আংশিক হোক কি সামগ্রিক, যদিও যথাযথ রেকর্ডের অভাবে প্রামাণ্যভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

মহানবী (সা) এর কর্মপন্থা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) তদানিন্তন আরবে প্রচলিত বহু আইন বিধান প্রয়োজনে সংশোধন ও পরিবর্তন আনয়ন পূর্বক গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে এই আইনগুলো ইসলামী আইনের গ্রন্থরাজিতে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। তদানিন্তন আরবে প্রচলিত অনেক আইন রাসূল (সা) গ্রহণ করেন। যেমনঃ "মামলা মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রমাণ উপস্থাপন করার দায়িত্ব বাদির। আর যে ব্যক্তি দাবি অস্বীকার করবে (বিবাদী) তার উপর শপথ করবে"। বিয়ের ব্যাপারে কয়েকটি শব্দ। যথা ইজাব, কবুল, দেনমোহর ইত্যাদি। সম্পত্তি ব্যবহার ও হস্তান্তরের কয়েকটি পদ্ধতি যথা, ক্রয় বিক্রয়, হিবা, (هبه) রেহেন, (رحن) ইজারা (اجارة) ইত্যাদি। ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি, যাতে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল তা বাদ দেয়া বা তাতে শর্তারোপ করা হয়েছে। অসিয়তের নিয়ম ও আইন প্রয়োগ এবং বলবৎ রাখার কতিপয় পদ্ধতি বিভিন্ন ভূখণ্ডের মুসলিমগণের প্রতি মুসলিম জনসাধারণের আচরণ মহানবী (সা) এর পর তাঁর সাহাবীগণ এবং তাঁদের পরবর্তী মুসলিমগণ বহু দেশ ও জাতির সংস্পর্শে এসেছিলেন প্রধানত ব্যবসায় উপলক্ষে এবং সামরিক অভিযান পরিচালনারসূত্রে। সিরিয়া ও মিসরে তাঁরা রোমীয় এবং ইরাকে ইরানী আইন, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির মুখোমুখী হতে। ইয়ামানেও ইয়াহুদী, রোমীয় ও ইরাণী প্রভাব ছিল। হযরত উসমান (রা) এর খিলাফত আমলে ইসলামের বিজয় অভিযান পশ্চিম চীন থেকে স্পেনের কিছু অংশ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এই বিস্তৃত এলাকার দেশগুলোতে প্রাচীন কয়েকটি সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বিভিন্ন প্রকার আইনেরও প্রচলন ছিল। মুসলিম শাসকগণ বিজিত দেশগুলোর ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি সংরক্ষণে তাদের বৈষয়িক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ, তাদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব দেশজ ও ধর্মীয় আইনে হস্তক্ষেপ করতেন না।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শাসকগণ তাদের বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থাও অক্ষুণ্ন রাখেন। সাক্ষ্যদান, বিয়ে সাদি, উত্তরাধিকার ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে তারা স্বাধীন ছিলেন।[১৩১] মহানবী (সা) বলেছেনঃ "জ্ঞানগর্ভ কথা মু'মিনের হারানো সম্পদ। যেখানেই সে তা পাবে, সে- ই তা গ্রহণ করার ব্যাপারে সর্বাধিক হকদার"।[১৩২]

পূর্ববর্তী নবীগণের শারী'আত

ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস হচ্ছে পূর্ববর্তী নবীগণের শারী'আত। আল্লাহর নাযিলকৃত যে সমস্ত পথ ও পদ্ধতি অন্যান্য উম্মতের কাছে সংরক্ষিত ছিল বা কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে, রাসূল (সা) তাঁর উপর আমল করেছিলেন, প্রকৃত বিষয় হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম এক ও অভিন্ন। আদর্শ ও মৌলনীতির ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। ব্যবহারিক জীবনে স্থান কাল পাত্রের ভিন্নতার কারণে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী নবীগণের শারী'আতে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক এবং আল্লাহর হিকমতের স্পষ্ট দলিল। আর পূর্ববর্তী উম্মত অনেক ক্ষেত্রে তাদের নবীর শিক্ষা অবিকৃত রাখতে পারেননি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটিয়েছে। পক্ষান্তরে যা অবিকৃত রয়েছে, যার স্পষ্ট বিবরণ কুরআন, হাদীস এবং পূর্ববর্তী উম্মতের জীবনে পাওয়া যায়, তা অনুসরণ করতে আমরা আদিষ্ট। এ কারণে পূর্ববর্তী নবীগণের শারী'আত ইসলামের আইনের অন্যতম উৎস।

আল কুরআনের দলিল

পূর্ববর্তী নবীগণের আনিত জীবন বিধান অনুরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আল্লাহ তাদের সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তুমি তাদের পথের অনুসরণ করো"।[১৩৩]

"They are those whom Allah had guided. So follow their guidance." (Surah 6. Al-Anam. Part 7. Ayat 90).

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো"।[১৩৪]

---

১৩১ মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৯২

১৩২ ইমাম তিরমিযী, *সুনান*

১৩৩ আল কুরআন, ৬: ৯০ *اولاءك الذين هدى الله فبهدهم اقتده*-

১৩৪ আল কুরআন, ২: ১৮৩ *يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون*-

"O you who believe Observing As-Saum (the fasting) is prescribed for you as it was prescribed for those before you, that you may become Muttaqun" (the pious — See V. 2:2). (Surah 2. Al-Baqarah. Part 2. Ayat 183).

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের পরিবর্তে অনুরূপ যখম"।[১৩৫]

"And we ordained therein them: "Life life for life, eye for eye, nose for nose,ear for ear, tooth for tooth, and wounds equal for equal." (Surah 5. Al-Maidah. Part 6. Ayat 45).

এ ধরনের বিধান সম্পর্কে হানাফি, মালিক ও শাফি'ঈ মাযহাবের আলিমগণ বলেনঃ এ ধরনের বিধান আমাদের উপরও কর্তব্য যতক্ষণে তা আমাদের শারী'আত রহিত হওয়ার কোন বিধান পাওয়া না যায়। কারণ এ বিধানও আল্লাহ তাঁর কোন না কোন নবী রাসূলের উপর নাযিল করেছিলেন। কাজেই তা সকলের পালন করা আবশ্যক হবে।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমি ওহি করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ করোনা"।[১৩৬]

"He (Allah) has ordained for you the same religion (Islamic Monotheism) which He ordained for Nuh (Noah), and that which We have revealed to you (O Muhammad sm), and that which We ordained for Ibrahim (Abraham), Musa (Moses) and 'Isa (jesus) saying you should establish religion (i.e. to do what it orders you to do practically), and make no divisions in it (religion)." (Surah 42. Ash-Shura. part 25. Ayat 13).

---

১৩৫ আল কুরআন, ৫: ৪৫ *وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص-*

১৩৬ আল কুরআন, ৪২: ১৩ *شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه-*

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমি আদর্শ অনুসণের নির্দেশ দিয়েছেনঃ "এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা"।[১৩৭]

"Then, We have sent the revelation to you (O Muhammad sm saying): "Follow the religion of Ibrahim (Abraham) Hanif (Islamic monotheism – to worship none but Allah) and he was not of of the Mushrikin (polytheists, idolaters and disbelievers)." (Surah 16. An-Nahl. part 14. Ayat 123).

মোটকথা কুরআন মাজীদে পূর্ববর্তী শারী'আতের বহু আহকামের উল্লেখ আছে, যা মুহাম্মদ (সা) আনিত শারী'আতেও বিধিবদ্ধ রয়েছে এবং তা পালন করা আমাদের জন্য কর্তব্যও বটে।

হদীসের দলিল

যদি কোন বিষয়ে সরাসরি ওহী নাযিল না হতো তবে মহানবী (সা) আহলে কিতাবের প্রতি নাযিলকৃত আইন বিধান অনুসরণ পছন্দ করতেন। মুসনাদে আহমাদে নিম্নোক্ত হাদীসে যা বলা হয়েছে তা থেকে বুঝা যায়, কেবল আহলে কিতাব- ই নয়, বরং জাহিলী যুগের যে কোন ভালো তথা জনহিতকর ও জনকল্যাণকর কার্যক্রম ইসলামে আমল করা যায়"।[১৩৮] এ হাদীসের আলোকে হাদীস বিশারদগণ বলেন; পূর্ববর্তী শারী'আতের উপর আমল করা আবশ্যক, যদি আল্লাহ সে বিষয় বাতিল করে না থাকেন। ইসলামী আইনবিদগণের মন্তব্যের সারসংক্ষেপ হচ্ছে, যাতে আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা এক প্রকার যেমন হতে পারে, ভিন্নতরও হতে পারে। সুতরাং তাদের শারী'আতের ঐক্য এবং পার্থক্য থাকতে পারে। মূলকথা হচ্ছে মানবকল্যাণ, যুগ চাহিদা অনুসারে পরিবর্তন আসতে পারে।

ইসলামী আইন কি অন্যান্য ধর্মীয় আইন থেকে গৃহীত?

কখনো কখনো কিছু কিছু সাদৃশ্য এমন পর্যায়ে পাওয়া যায় যা থেকে সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, ইসলামী আইনবিদগণ আল্লাহর হিকমত ও মূলনীতির আওতাধীনে কোথাও কোথাও আংশিক ফায়দা হাসিল করেছেন। তবে মনে রাখতে হবে এ ধরনের হালকা সাদৃশ্য নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। কাজেই এই প্রসঙ্গে সাধারণভাবে তিনটি ধর্মের আইনশাস্ত্রের প্রভাব আলোচনা করা যেতে পারে। (ক) পার্সী ধর্ম, (খ) খৃষ্ট ধর্ম এবং (গ) ইয়াহুদী ধর্ম।

---

১৩৭ আল কুরআন, *১৬: ১২৩* - *ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين*

১৩৮ ইমাম আহমাদ, *আল মুসনাদ*

(ক) পার্সী আইনশাস্ত্রে ও ইসলামী আইনের মাঝে কোন প্রকার সাদৃশ্য ও সাজুয্য এখনো প্রমাণিত হয়নি। দু'চারটি কথা উভয়ের মধ্যে একই রকম (যেমন নামায, মিসওয়াক ইত্যাদি) পাওয়া কোন প্রভাবের প্রমাণ হতে পারে না, বরং গবেষকদের মতে ইসলামী আইন প্রণয়নের যুগে পার্সীদের ধর্মীয় আইনের কোন বিন্যস্তরূপই বর্তমান ছিল না।

(খ) খৃষ্ট ধর্মে দীন ও দুনিয়ার পৃথক অবস্থানের কারণে ইসলামের সাথে তার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। খৃষ্ট ধর্মে ধর্মীয় বিধান ও আইনের পরিমাণ হাতেগোনা কয়েকটি মাত্র। জীবনের অতি সাধারণ অংশেও তার বিচরণ নেই। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পোপের ঘোষিত বিধানের ভিত্তিতে তা রচিত। বল প্রয়োগ ইত্যাদি সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে তার সাথে সাদৃশ্য ইসলামী আইনের প্রভাব গ্রহণের কথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। তবে সিরিয়া ইত্যাদি দেশে (যেখানে খৃষ্টীয় রাজত্ব ছিল) গির্জার আইন যে ইসলামী আইন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, এ কথার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

(গ) ইয়াহুদী ধর্মের বিভিন্ন বিধান ও আইনের সাথে ইসলামী আইনের সাদৃশ্যের কথা বলা হয়ে থাকে। যেমন তালমূদে (ইয়াহুদী আইন গ্রন্থ) খৃষ্ট ধর্মের ন্যায় 'ইবাদাত ও আইনের পার্থক্য করা হয়নি; বরং ধর্মীয় আইন উভয়ের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর ওহি এসবের উৎস। তাছাড়া ইসলামী আইনের ন্যায় বিভিন্ন বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণের দৃষ্টান্তও সেখানে পরিদৃষ্ট হয়। নতুন নতুন সমস্যা উত্তরণের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের ভূমিকাও স্বীকৃত। এছাড়া আরো বিভিন্ন খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য বর্ণনা করা হয়। যেমন তালমূদের কতিপয় বিধান ইসলামী আইনের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। যেমনঃ

(১) যদি কোন ব্যক্তি পথচলার সময় রুটি ইত্যাদি খাদ্যবস্তুর টুকরা রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে তাহলে তা যেন পায়ের তলায় পিষ্ট না করে রাস্তার এক পাশে সরিয়ে রাখে।[১৩৯]

(২) তালমূদের বিভিন্ন স্থানে অর্ধ স্বাধীন ও দাসদের তালাকের কথা বলা হয়েছে।

(৩) কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর বিধান।[১৪০]

(৪) যারা সুদের ভিত্তিতে টাকা ঋণ দেয়, পাশা খেলে এবং বাজি রেখে কবুতর উড়ায়, তারা বিচারক মনোনীত হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।[১৪১]

---

[১৩৯] তালমূদ, খ. ২, পৃ. ১৬০

[১৪০] তালমূদ, খ. ১, পৃ. ৮৫

[১৪১] তালমূদ, খ. ১, পৃ. ৫ ৫

Dhaka University Institutional Repository

(৫) তালমূদ অর্থ সম্পদের বিনিময়ে তালাকের কথা বলা হয়েছে।[১৪২]

(৬) মহিলাদের অধিকার ও খোরপোষের বিধান বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

সকল শারী'আতের মাঝে আংশিক সাদৃশ্য থাকা বাঞ্ছনীয়

ওহীর মাধ্যমে প্রবর্তিত শারী'আত সমূহের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। কারণ প্রত্যাদিষ্ট শারী'আতসমূহ একই বৃক্ষের শাখা প্রশাখার সাথে তুলনীয়। একই উৎস মূল থেকে উৎসারিত। এগুলো মূলতঃ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আগত এবং প্রবর্তকগণ হচ্ছেন তাঁরই মনোনীত আম্বিয়া কিরাম, সুতরাং পূর্ববর্তী শারী'আতের সাথে সাদৃশ্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কালের পরিক্রমায় পূর্ববর্তী শারী'আতগুলো আজ বিলুপ্ত ও বিকৃত। সুতরাং বাছ বিচার না করে অনুকরণ নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য যে, ইসলাম মূলতঃ এক ও অভিন্ন এবং মানব সভ্যতার শুরু থেকেই জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান। কেননা কুরআন মাজীদে আছেঃ "নিঃসন্দেহে ইসলাম- ই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন"।[১৪৩]

"Truly, the religion with Allah is Islam." (Surah 3. Al-Imran. Part 3. Ayat 19).

সুতরাং ইসলামপূর্ব বা ইসলামের কথা দু'টো প্রকৃতপক্ষে Common mistake এ পরিণত হয়েছে। সব নবী রাসূল দীনের প্রচারক, মুহাম্মদ (সা) ইসলামের আদি প্রচারক নন। কুরআন মাজীদে এর সমর্থন পাওয়া যায়: "বল! আমি কোন নতুন রাসূল নই"।[১৪৪]

"Say (O Muhammad sm): "I am not a new thin among the messengers (of Allah i.e. I am not the first messenger)." (Surah 46. Al-Ahqaf. Part 26. Ayat 9).

তবে ইসলাম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নবী প্রচার করেছিলেন তাতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়া অস্বাভাবিক বিষয় ছিল না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শারী'আত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি"।[১৪৫]

"To each among you, we have prescribed a law and a clear way." (Surah 5. Al-Maidah. Part 6. Ayat 48).

---

[১৪২] তালমূদ, খ. ৯, পৃ. ৫৪

[১৪৩] আল কুরআন, ৩: ১৯ - ان الدين عند الله الاسلام

[১৪৪] আল কুরআন, ৪৬: ৯ - قل ما كنت بدعا من الرسول

[১৪৫] আল কুরআন, ৫: ৪৮ - لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

ইসতিসহাবে হাল (استصحاب الحال) Presumtion of continuity

বর্ণনা বা বুদ্ধিভিত্তিক দলিলের ভিত্তিতে কোন বিষয়ের বিধান নির্ধারিত হওয়ার পর উক্ত বিষয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটলেও তার বিধানে পরিবর্তন না এনে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পূর্বের বিধান বর্তমান রাখাই ইসতিসহাব। শাফি‘ঈ ফিকহে ইসতিসহাবের প্রয়োগ অধিক হারে পরিলক্ষিত হয়। ইসলামী আইনের এ উৎস নিয়ে হানাফি মাযহাবের আলিমগণ দ্বিধা বিভক্ত হয়েছেন।

ইসতিসহাব এর শাব্দিক বিশ্লেষণ

ইসতিসহাব (استصحاب) শব্দটি সাহবুন (صحب) থেকে নির্গত। এ শব্দটি استفعال এর ওযনে ব্যবহৃত হয়। আরবি শব্দতত্ত্ব অনুযায়ী এ ওযনের বিশেষত্ব হল কোন কিছু অন্বেষণ করা।[১৪৬] সাহবুন শব্দটি আরবি ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১ নিকটবর্তিতা, সংযোগ। এ কারণে নিকটতম ব্যক্তিকে সাহিব (صاحب) বা সাথী বলা হয়। আল্লাহ বলেনঃ “যখন তিনি তাঁর সাথীকে বলেছিলেন”।[১৪৭]

২. নিরবিচ্ছিন্ন বা সার্বক্ষণিক সঙ্গ। এ কারণেই স্ত্রীকে সাহিবাহ (صاحبه) বলা হয়। কারণ স্ত্রী স্বামীকে দীর্ঘ সময়ব্যাপী নিরবিচ্ছিন্ন সঙ্গ প্রদান করে। আল্লাহ বলেনঃ “তার সঙ্গিনী (স্ত্রী) ও ভাই”।[১৪৮]

৩. রক্ষা করা। আল্লাহর বাণীঃ “আমার বিপক্ষে তাদের কোন রক্ষাকারীও থাকবে না”।[১৪৯]

অতএব ‘ইসতিসহাব’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ কোন কিছু বা অবস্থা স্থায়ী করতে চাওয়া, সঙ্গী মনোনীত করা, সঙ্গে থাকা, সঙ্গী হওয়া ইত্যাদি।[১৫০] এ থেকেই মুলতঃ استصحاب الحال বা ‘বর্তমান আঁকড়ে রাখা’ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। [১৫১]

---

১৪৬ ইবন ‘উসফুর আল-ইশবিলী, *আল-মুমাত্তা ফীত তাসরীফ,* বিশ্লেষণঃ ফখরুদ্দীন কাবাওয়াহ, বৈরুত: দারুল আফাকিল জাদীদ, ৩য় সংস্করণ ১৯৭৮ ইং, খ. ১, পৃ. ১৯৫

১৪৭ আল কুরআন, ৯: ৪০ - اذ يقول لصاحبه

১৪৮ আল কুরআন, ৭০: ১২ - وصحبته واخيه

১৪৯ আল কুরআন, ২১: ৪৩ _ ولا هم منا يصحبون

১৫০ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবি-বাংলা অভিধান,* পৃ. ৮৫

১৫১ আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী আল-মুকরী আল-ফাইয়্যুমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর ফী গারীবিশ শাহরিল কাবীর লির-রাফিঈ,* বৈরুতঃ আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, তারিখ বিহীন, খ. ১, পৃ. ৩৩৩

পারিভাষিক অর্থ

উসূলবিদগণ ইসতিসহাবের বিভিন্ন পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

ইবন হাযম [৩৮৪-৪৫৬ হি.] বলেনঃ "নাসসের ভিত্তিতে সাব্যস্ত মূল বিধান ততক্ষণ স্থায়ী রাখা, যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত বিধান পরিবর্তন হওয়ার নাস ভিত্তিক কোন প্রমাণ পাওয়া না যায়"।[১৫২]

ইবন কায়্যিম আল-জাওয়াযিয়্যাহ [৬৯১-৭৫১হি.] বলেনঃ "পূর্বে যা প্রতিষ্ঠিত ছিল তা বহাল রাখা এবং যা অননুমোদিত ছিল তার প্রত্যাখ্যান স্থায়িকরণই ইসতিসহাব"।[১৫৩]

"অতীত যা প্রমাণিত হয়েছিল, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে তাকে স্থিত রাখার নীতি"।[১৫৪]

"বাস্তবে প্রমাণিত ও স্বীকৃত ব্যাপারের স্থিতির হুকুম দেয়া যতদিন পর্যন্ত তার অস্তিত্বহীনতার ধারণা পাওয়া না যায়, তাকে ইসতিসহাবে হাল বলা হয়"।[১৫৫]

যেমন ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি ঋণ হিসাবে নেয়া অর্থ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে যতক্ষণ না তার ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার অকাট্য প্রমাণ বা সাক্ষ্য পেশ করা সম্ভব হবে।

এক ব্যক্তি কোন যুবতী মেয়েকে একথা জেনে বিয়ে করল যে সে কুমারী, পরে যৌন মিলন কালে যদি সে দাবি করে যে, মেয়েটি কুমারী নয়, তবে তার দাবি এ ক্ষেত্রে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবেনা যতক্ষণ না সে তার পক্ষে অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করবে। কেননা মেয়েটি মূলতঃ কুমারী- ই ছিল বলে পূর্ব থেকে তার জানা ছিল। এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ইসলামী আইনের ভাষায় ইসতিসহাবে হাল বলা হয়"।[১৫৬]

ইমাম শাফি'ঈ (রহ) বলেনঃ মূত্রনালী ও মলদ্বার ছাড়া অন্য কোন পথে যদি কিছু বের হয় তাতে অযু নষ্ট হয় না। পূর্ববর্তী শারী'আতেও একই অবস্থা ছিল। ধরা যাক এক ব্যক্তি উধাও হয়ে গেছে এবং সে নিখোঁজ। ইমাম শাফি'ঈ (রহ) বলেনঃ তার মৃত্যুর ব্যাপারটি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তার সমস্ত শারয়ী দায় দায়িত্বের ব্যাপারে তাকে জীবিতরূপে গণ্য করতে হবে। এ কারণে তার বিষয় সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মাঝে বন্টন করা জায়িয হবে না। সুতরাং সে যার উত্তরাধিকারী হতে পারে এমন ব্যক্তি যদি মারা যায়, তবে সে উত্তরাধিকারস্বত্ব লাভ থেকে বঞ্চিত হবে না।

---

১৫২ ইবন হাযম, *আল-ইহকাম,* খ. ৫, পৃ. ৩ - الاستصحاب هو بقاء حكم الاصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل منها على التغيير

১৫৩ ইবন কায়্যিম আল-জাওয়াযিয়্যাহ, *আ'লামুল মুআক্কিঈন,* খ. ১, পৃ. ৩৩৯ - استدامة اثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان منفيا

১৫৪ ইমাম তাকী আমীনী, *প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০*

১৫৫ আল্লামা যায়নুল আবেদীন আল মিসরী, *আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৬৬

১৫৬ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম। *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৩৭

অপরদিকে ইমাম আবূ হানিফা (রহ) বলেনঃ তার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মাঝে বন্টন করা যাবে না এ কথা সঠিক, তবে অপরের পরিত্যক্ত সম্পদে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাঁর যুক্তি হচ্ছে তাকে জীবিত হিসাবে গণ্য করার যুক্তি তার বর্তমান অধিকারসমূহের সংরক্ষণের সীমা পর্যন্ত কার্যকর হবে কিন্তু নতুন অধিকার সৃষ্টির ব্যাপারে কার্যকর হবে না। ইসলামী আইনবিদদের পরিভাষায় প্রথমটিতে সংরক্ষণমূলক যুক্তি এবং দ্বিতীয়টিতে নতুন অধিকার সৃষ্টিমূলক যুক্তি বলা হয়।

ইসতিসহাবে হাল নিম্নরূপে বিভক্ত

(১) বস্তুসমূহের জন্য মূলতঃ যে হুকুম তাই অপরিবর্তিত থাকবে, যতক্ষণ না তার বিপরীত কোন অকাট্য দলিল পাওয়া যাবে। একে ইসলামী আইনের পরিভাষায় ‘ইসতিসহাবুল হুকুম আল আসলী’ (استصحاب الحكم الاصلى) বলা হয়।

(২) মূলতঃ প্রত্যেকটি মানুষ- ই ঋণগ্রস্থ। কেউ যদি কারো কাছে ঋণ আছে বলে দাবি করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি তা অস্বীকার করে, তবে সে ব্যক্তিকে ঋণমুক্ত- ই ধরে নিতে হবে। কেননা ইসতিসহাব নীতিতে প্রত্যেকটি মানুষ তার আসল অবস্থায়ই স্বীকৃতি পাওয়ার দাবি রাখে। তবে দাবি কারীর দাবি যদি সঠিক প্রমাণিত হয় তবে ভিন্ন কথা। অন্যথায় সে দাবি প্রত্যাখ্যাত হবে। একে ‘ইসতিসহাবুল বারা’আত আল আসলিয়া’ (استصحاب البراة الاصلية) বলা হয়।

(৩) যে জিনিসের স্থিতি কোন দলিল দ্বারা প্রমাণিত, তা- ই অপরিবর্তিত থাকবে, যতক্ষণ না তার বিপরীত কথা প্রমাণিত হবে। যেমন কেউ যদি একটা ঘর ক্রয় করে কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করে, তখন তার দখল ও স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে বসবাস তার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। এ সাক্ষ্য দৃঢ় প্রত্যয়ের সাক্ষ্য। কেননা এর বিষয় তো সামনেই উপস্থিত। এ প্রমাণ ইসতিসহাব পদ্ধতির। যদিও এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু “যা দৃঢ় প্রত্যয় দ্বারা প্রমাণিত তা সন্দেহ সংশয়ে দূরিভূত হয় না”।

ইমাম মালিক (রহ), ইমাম শাফি‘ঈ (রহ) ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ) একে শারী‘আতের অকাট্য দলিল হিসাবে গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে হানাফি মাযহাবের অধিকাংশ ফিকহবিদগণ এ অভিমত পোষণ করেন যে, কোন সিদ্ধান্তের স্থিতির জন্য এটি দলিল যথেষ্ট হতে পারে না। এটাকে দলিল হিসাবে গণ্য করার জন্য কতিপয় নিয়ম নীতি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তার মধ্যে আসল নিয়মটি হল, “যা যে অবস্থায় আছে, তা সে অবস্থায়ই অপরিবর্তিত থাকবে, যতক্ষণ না তাকে পরিবর্তন করে দেয় এমন কোন জিনিস প্রমাণিত হবে”। আর “সমস্ত বস্তু ও জিনিসের ব্যাপারে মূলকথা হল, তা মুবাহ ও অনিষিদ্ধ”। অনুরূপভাবে দায়িত্বের ব্যাপারে

Dhaka University Institutional Repository

মূল কথা হল (الاصل في الذمة البراة) "মানুষ মাত্রই ঋণমুক্ত" এবং (اليقين لايذول بالشك) "দৃঢ় প্রত্যয় সন্দেহ ও সংশয় দ্বারা অবমিত হতে পারেনা"।

মোটকথা অতীতকালে শারী'আতের যে হুকুম যেরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই হুকুমকে সে ভাবে অপরিবর্তিত রাখাকেই মূলতঃ ইসতিসহাব বলা হয়।

অতীত মুসলিম বিচারকদের রায়

পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে বিভিন্ন নবী, রাসূল, সাহাবী ও পরবর্তী মুসলিম বিচারকদের বিচার ও তার রায় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। নিম্নে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তৎপরবর্তী কতিপয় মুসলিম বিচারকের রায় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর বিচারের কতিপয় রায়

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ কর্তৃক যা আদিষ্ট হন তা- ই কার্যকর করেন। সেই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় তিনি মানবসমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কয়েকটি রায় নিম্নে পেশ করা হলঃ

১। একবার ইরাশা গোত্রের এক ব্যক্তি কয়েকটি উট নিয়ে মক্কায় আসে। আবূ জাহল তার উটগুলো ক্রয় করে কিন্তু মূল্য পরিশোধে টালবাহানা করে। নিরূপায় হয়ে সে কুরায়েশদের একটি সভাস্থলে উপস্থিত হয়। উল্লেখ্য যে, এ সময় মহানবী (সা) মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। লোকটি বলল, হে কুরায়েশগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি, যে আবুল হাকাম (আবূ জাহালের উপাধী) ইবন হিশামের নিকট থেকে আমার বিক্রিত উটের মূল্য আদায় করে দিবে? আমি একজন বিদেশী মুসাফির। সে আমার অধিকার আদায়ে টালবাহানা করছে। বর্ণনাকারী বলেনঃ তখন মজলিসের এক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি কি (মসজিদের কোণে) বসা লোকটিকে দেখতে পাচ্ছ না, তুমি তাঁর কাছে যাও, তিনি তার নিকট থেকে তোমার পাওনা আদায় করে দিবেন। উল্লেখ্য যে মহানবী (সা) ও আবূ জাহলের বৈরিতা জানত বিধায় তারা এহেন কৌশল অবলম্বন করে। লোকটি মহানবী (সা) এর কাছে গিয়ে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আবুল হাকাম ইবন হিশামের নিকট আমার কিছু পাওনা আছে, আমাকে দুর্বল পেয়ে সে তা আদায়ে গড়িমসি করছে। আর আমি একজন বিদেশি মুসাফির। আমি ঐ মজলিসের লোকদের কাছে তার নিকট থেকে আমার পাওনা আদায়ের ব্যাপারে সহযোগিতা কামনা করছিলাম কিন্তু তারা আমাকে সহযোগিতা না করে আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছে। সুতরাং আপনি তার নিকট থেকে আমার পাওনা আদায় করে দিন। আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। মহানবী (সা) বললেন, চলো তার কাছে যাই। অতঃপর লোকটিকে নিয়ে আবূ জাহলের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। এদিকে আবূ জাহলের অনুসারীরা তাদের একজনকে বলল, তুমি তাঁর পশ্চাদ্বাবন করবে এবং দেখবে

তিনি কি করেন? বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বের হয়ে সোজা আবূ জাহলের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর দরজায় করাঘাত করলেন। সে জিজ্ঞেস করল কে? মহানবী (সা) বললেন; আমি মুহাম্মদ। তিনি তাকে বললেন, তুমি (ঘর থেকে) বেরিয়ে এসো। আবূ জাহল বেরিয়ে এলো। মহানবী (সা) কে দেখে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল এবং তার প্রাণ যেন বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। মহানবী (সা) তাকে বললেন, তুমি এই লোকটির পাওনা পরিশোধ করে দাও। সে বলল, একটু সময় দিন, আমি এখনই পাওনা পরিশোধ করে দিচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা বলে সে ঘরে চলে গেল এবং পাওনাসহ এসে তাকে তা বুঝিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ (সা) ফিরে এসে ইরাশীকে বললেন, তুমি তোমার নিজ কাজে চলে যাও। ইরাশী পুণরায় সেই মজলিসে গিয়ে উপস্থিত হল এবং বলল, আল্লাহ তাঁকে প্রতিদান দিন। আল্লাহর শপথ তিনি আমার পাওনা আদায় করে দিয়েছেন।[১৫৭]

২। হযরত আনাস (রা) বলেনঃ এক ইয়াহুদী পাথর দিয়ে একটি মেয়ের মাথা থেতলিয়ে দেয়। অপর এক বর্ণনায় আছে, একটি মেয়ে অলংকার সজ্জিত হয়ে শহরের বাইরে বের হলে পথিমধ্যে এক ইয়াহুদী তাকে পাথর নিক্ষেপ করে। মুমূর্ষু অবস্থায় মেয়েটিকে নবী (সা) এর নিকট আনা হল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কি তোমাকে আহত করেছে? সে মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানাল। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কি তোমাকে আহত করেছে? এবারও সে অস্বীকৃতি জানাল। তৃতীয়বার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কি তোমাকে আহত করেছে? মেয়েটি ইশারায় বলল, হ্যাঁ। অতঃপর ইয়াহুদীকে জিজ্ঞেস করা হলে সে তার অপরাধ স্বীকার করে। তখন মহানবী (সা) তার মাথা দু'টি পাথরের মাঝে রেখে তাকে (অনুরূপ) শাস্তির আদেশ দিলেন।[১৫৮]

৩। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেনঃ নবী (সা) ইবন মালিক আস আসলামী (রা) কে বললেন, আমি তোমার ব্যাপারে যা জানতে পেরেছি তা কি সত্য? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার বিরুদ্ধে কি সংবাদ পেয়েছেন? তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি তুমি অমুকের বাঁদির সাথে ব্যভিচার করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি চারবার স্বীকারোক্তি করলেন। নবী (সা) তার ব্যাপারে রায় ঘোষণা করলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়।[১৫৯]

---

[১৫৭] ইবন হিশাম, *আস-সীরাতুন্নাবিয়্যাহ,* তা. বি. ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩-৪৪

[১৫৮] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী,* অধ্যায়: আদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ, ইযা কাতাবা বি-হাজারিন আও বি-আসা

[১৫৯] ইমাম তিরমিযী, *সুনান অধ্যায়: আল হুদূদ, অনুচ্ছেদ মা জাআ ফী তালকীনিল হাদ্দ*

খুলাফায়ে রাশেদীন

খুলাফায়ে রাশেদীন নিজেদেরকে আইনের উর্ধ্বে মনে করতেন না; বরং আইনের দৃষ্টিতে তাঁরা নিজেদেরকে দেশের একজন সাধারণ নাগরিকের সমান মনে করতেন। রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে তাঁরা নিজেরা বিচারপতি নিয়োগ করলেও খলিফাদের রায়দানের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন স্বভাবগতভাবে কোমলপ্রাণ (তবে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ছিলেন ইস্পাত কঠিন)। কথিত আছে যে, আবূ বকর (রা) হযরত খালিদ (রা) কে মালিক ইবন নুওয়াইবার নিকট যাকাত আদায়ের ব্যাপারে প্রেরণ করেন। মালিক নামায পড়ার কথা স্বীকার করলেও যাকাত দিতে অস্বীকার করে। সে মতে খালিদ (রা) তাকে হত্যা করে তার স্ত্রীকে বিয়ে করেন। বিষয়টি সাহাবীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে, বিশেষতঃ হযরত উমর ও আবূ কাতাদাহ বিষয়টিকে অত্যন্ত আপত্তিকর মনে করে আবূ বকর (রা) এর গোচরে নিয়ে আসেন। সে মতে খলিফা আবূ বকর (রা) খালিদ (রা) কে মদীনায় তলব করলেন। খলিদ (রা) তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হন। এভাবে ইসলামের একজন মহান বীরের অপরাধকেও তিনি উপেক্ষা করেননি, বরং আইনের আওতায় নিয়ে আসেন। এ ঘটনা থেকে খলিফা আবূ বকর (রা) এর ন্যায়বিচারের চিত্র ফুটে উঠে।

হযরত উমর (রা) খলিফা হিসাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। এ সবের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একবার হযরত উমর (রা) এবং উবাই ইবন কা‘আব (রা) এর মধ্যে একটি ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়। তারা উভয়ে যায়েদ ইবন সাবিত (রা) কে সালিশ নিযুক্ত করেন এবং বাদী বিবাদী উভয়ে যায়েদ (রা) এর এজলাসে উপস্থিত হন। যায়েদ (রা) দাঁড়িয়ে উমর (রা) কে তাঁর আসনে বসতে অনুরোধ জানান, কিন্তু তিনি তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে উবাই (রা) এর পাশে বসেন। অতঃপর উবাই (রা) তার আরজি পেশ করেন। আর উমর (রা) তার অভিযোগ অস্বীকার করেন। নিয়ম অনুযায়ী যায়েদ (রা) এর উচিত ছিল উমর (রা) এর নিকট থেকে শপথ আদায় করা। কিন্তু তিনি তা করতে সংকোচবোধ করেন। উমর (রা) নিজে শপথ করে মজলিস শেষে বললেন, যতক্ষণ যায়েদের কাছে একজন সাধারণ মুসলিম এবং উমর সমান নাহয়, ততক্ষণ যায়েদ বিচারক হতে পারে না”।[১৬০]

একবার কবি হুতিয়া, যবরকান ইবন বদর নামক এক ব্যক্তিকে উদ্দ্যেশ্য করে একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে। কবিতার ভাষায় যবরকান ইবন বদর অপমানবোধ করেন। বিষয়টি খলিফা উমর (রা) এর গোচরে আনা হলে বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার লক্ষ্যে কবি হাসসান ইবন সাবিত (রা) কে তদন্ত করার নির্দেশ দেন। তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে মোকদ্দমার রায় প্রদান করেন।[১৬১]

---

১৬০ ইমাম বায়হাকী, *আস সুনানুল কুবরা,* তা. বি. ১০ম খ, পৃ. ১৩৬

১৬১ আল্লামা শিবলী নুমানী, *আল ফারুক, ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০২, পৃ. ১৪৯*

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উসমান (রা) এর খিলাফাতকালের শেষ বছরসমূহ প্রচণ্ড অশান্তি ও অসন্তোষের মাঝে অতিবাহিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অমূলক অভিযোগ উত্থাপিত হতে থাকে। এতদসত্বেও তিনি সুবিচার প্রতিষ্ঠায় ছিলেন অনঢ় অবিচল।

ওয়ালিদ ইবন উকবা (রা) তিনি ছিলেন মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। নবী (সা) তাকে বনুল মুস্তালিক যুদ্ধে যাকাত উসূলের জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি তাদের এলাকায় পৌঁছে কোন কারণে ভীত বিহবল হয়ে ফিরে আসেন এবং মদীনায় এসে এ মর্মে রিপোর্ট দেন যে, বনুল মুস্তালিক যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং তাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়েছে। এ সংবাদ শুনে নবী (সা) ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং তাদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। এতে একটি বড় ধরনের অঘটন ঘটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু বনুল মুস্তালিক এ সম্পর্কে যথাসময় অবহিত হয়। তারা মদীনায় গিয়ে জানায় যে, তিনি তো আমাদের কাছেই আসেননি। আমরা প্রতীক্ষা করছিলাম, কেউ আমাদের নিকট এসে যাকাত উসূল করে নিয়ে যাবে। এ ঘটনাকে উপলক্ষ করে কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়ঃ "হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্থ করে বস এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়"।[১৬২]

"O you who believe! If a Fasiq (Lair — evil person) comes to you with any news, verify it, lest you should harm people in ignorance, and afterwards you become regretful for what you have done." (Surah 49. Al-Hujurat. Part 26. Ayat 6).

এ ঘটনার কয়েক বছর পর হযরত আবূ বকর (রা) এবং উমর (রা) তাকে রাষ্ট্রীয় কাজে সম্পৃক্ত করেন। উমর (রা) এর খিলাফাতের শেষদিকে তাকে আল জাসিয়ার আরব এলাকায় আমীর নিযুক্ত করেন।[১৬৩]

তিনি ফজরের নামায ৪ রাকাআত আদায় করে মুসল্লীদের জিজ্ঞেস করেন, আরো আদায় করবো?[১৬৪]

এ সংবাদ মদীনায় পৌঁছে যায় এবং মানুষের মাঝে ব্যাপক চর্চা হতে থাকে। অবশেষে মিসওয়ার ইবন মাখরামা ও আবদুর ইবন আসওয়াদ (রা) উসমান (রা) এর ভাগ্নে উবায়দুল্লাহ ইবন সা'দী ইবন খিয়ারকে বললেন, তুমি গিয়ে তোমার মামার সাথে কথা বল যে, ওয়ালিদ ইবন উকবার ব্যাপারে লোকেরা আপত্তি তুলেছে। তিনি এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরও বলেন, ওয়ালিদের উপর হাদ্দ (শারী'আতের বিধান অনুযায়ী দণ্ড দান) জারি করা আপনার উপর কর্তব্য। এ কথা শুনে উসমান (রা) প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি এ ব্যাপারে ফায়সালা

---

[১৬২] আল কুরআন, ৪৯: ৬ – *يايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين*

[১৬৩] আল্লাম বদরুদ্দীন আঈনী, *উমদাতুল কারী,* তা. বি. ১৬ খ. পৃ. ২০৩

[১৬৪] ইবন কাসির, *আল বিদায়া ওয়াআন নিহায়া,* তা. বি. ৭ম খ. পৃ. ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

দিবেন। সে মতে তিনি হাদ্দ জারি করার জন্য আলী (রা) কে নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রা) ইবন জাফরকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেন এবং তিনি ওয়ালিদকে ৪০টি বেত্রাঘাত করেন।[১৬৫] উপরোক্ত ঘটনা থেকে হযরত উসমান (রা) এর সুবিচার সম্পর্কে জানা যায়।

একদিনের ঘটনা। হযরত আলী (রা) কুফার বাজারে দেখতে পেলেন, জনৈক খ্রিস্টান তার হারানো লৌহবর্মটি বিক্রি করছে। আমিরুল মু'মিনুন হিসাবে তিনি তার নিকট থেকে বর্মটি ছিনিয়ে নেননি, বরং কাযীর নিকট অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে না পারায় কাযী তাঁর বিরুদ্ধে রায় দেন।[১৬৬] ঐতিহাসিক ইবন খাল্লিকান বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত আলী (রা) এবং জনৈক যিম্মী বাদী বিবাদী হিসাবে বিচারপতি শুরায়হ (রহ) এর আদালতে উপস্থিত হন। বিচারপতি দাঁড়িয়ে আলী (রা) কে অভ্যর্থনা জানান। এ দৃশ্য দেখে আলী (রা) বললেন, এটা আপনার প্রথম অবিচার।[167] হযরত আলী (রা) বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বিচারিক ক্ষমতায় সন্তুষ্ট হয়ে রাসূল (সা) বলতেন, "বিচার জ্ঞানে আলী তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম"।[১৬৮]

হযরত উমর (রা), আলী (রা) এর বিচারিক দক্ষতা ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "আলী না হলে উমর ধ্বংস হয়ে যেত"।[১৬৯]

ইসলামী আইন বিজ্ঞান ও রোমান আইনের মধ্যে পার্থক্য

(১) ইসলামী আইন বিজ্ঞানে ক্রীতদাস প্রথার কোন অস্তিত্ব নেই। বিশ্বব্যাপী ক্রীতদাস প্রথা রহিতকরণের প্রথম উদ্যোক্তা হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। ক্রীতদাস মুক্তিদানের ব্যাপারে কুরআন এবং হাদীসে বিশেষভাবে তাকিদ দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে রোমান আইনে ক্রীতদাসরাই হল রোমান প্রভূদের প্রধান সম্পদ। রোমান আইনে ক্রীতদাসকে গরু ছাগলের ন্যায় ব্যবহার করা হত। একজন রোমান প্রভূ তার ক্রীতদাসদের উপর যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতো।

(২) ইসলামী আইন বিজ্ঞানমতে কেবল দাতাই তার মৃত্যুকালীন অবস্থায় দানপত্র রচনা করতে পারে কিন্তু রোমান আইনে গ্রহীতা কিংবা অপর কারো দ্বারাও এরূপ দানপত্র রচিত হয়ে থাকে।

(৩) ইসলামী আইন বিজ্ঞানে উইল প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় না। দাতা লিখিতভাবে কিংবা মুখের কথার দ্বারাই তা প্রণয়ন করতে পারে। কিন্তু রোমান আইনে উইল প্রণয়নের ক্ষেত্রে

---

[১৬৫] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী,* অধ্যায়: আল মানাকিব, অনুচ্ছেদ: মানাকিবে উসমান ইবন আফফান

[১৬৬] ইমাম বায়হাকী, *আস সুনানুল কুবরা,* তা. বি. ১০ম খ. পৃ ১৩৬

[১৬৭] ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফাতুল আইয়ান,* আল কাহেরা, ১৯৪৮, ২য় খ. পৃ. ১৬৮

[১৬৮] ইবন আবদুল বার, *আল ইসতীআব,* তা. বি. পৃ. ১৫

[১৬৯] সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *হযরত আলী (রা) জীবন ও খিলাফত,* ঢাকা ইফাবা, ২০০৪, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

কতিপয় আনুষ্ঠানিকতার সম্মুখীন হতে হয়। এরূপ উইলের জন্য উত্তরাধিকারীদের পূর্বসম্মতি নিতে হয় এবং তাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। ব্যাপক প্রচার রোমান উইলের প্রধান শর্ত।

প্রাচ্যবিদদের দাবি ও দলিল প্রমাণ

রোমান আইন প্রাচীন। এর বয়স আড়াইহাজার বছরের চেয়েও বেশী। এ আইনকে স্বর্গীয় আইন মনে করা হয়। রোমানদের ধারণা অনুযায়ী এ আইন রচনা করে তাদের দেবী ইজেরিয়া। এ আইন তাদের নিকট পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন। অপরদিকে মানব সৃষ্টির সূচনা থেকে আইন কাঠামো পরিপূর্ণতা লাভ করে মহানবী মুহাম্মদ (সা) এর উপর কুরআন নাযিল ও তা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। এর আগে ইসলামী আইন ততটা সমৃদ্ধ ছিল না বলে প্রাচ্যবিদদের ধারণা ও দাবি। তাদের দাবির কোন অংশ সঠিক মনে না হলেও বেশীরভাগ সঠিক নয়। তাদের দাবির মূলে রয়েছে রোমান আইনের প্রাচীনতা। এ ছাড়া তাদের কোন প্রামাণ্য দলিল প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আল ইবাহাত (الاباحة)

আল ইবাহাত শব্দটি কুরআন মাজীদে নেই। সর্বপ্রথম ইমাম শাফি‘ঈ (রহ) এর সময় থেকে পরিভাষারূপে এ শব্দটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, “সকল মুসলিমের তিনটি জিনিসে সমান অধিকার রয়েছেঃ পানি, ঘাস এবং আগুন।[১৭০]

অতঃপর এটি ইসলামী আইনের একটি পরিভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর সমর্থনে কুরআন মাজীদে বর্ণিত নিম্নের আয়াতটি উল্লেখ করা যায়। যেমনঃ “হে নবী! বলুন, আমার নিকট যা নাযিল হয়েছে তাতে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাইনি, তবে যদি মৃত প্রাণী হয়” ।[১৭১]

“Say (O Muhammad Sm): I find not that which has been revealed to me anything forbidden to be eaten by one who wishes to eat it, unless it be Maitah (a dead animal).” (Surah 6. Al-An‘am. Part 8. Ayat 145).

এ ছাড়াও অপর একটি আয়াতে আছেঃ “তোমরা আহার কর এবং পান কর”।[১৭২]

“And eat and drink.” (Surah 7. Al-A‘raf. Part 8. Ayat 31).

পরোক্ষ অর্থে, যে সব খাদ্য এবং পানীয় পরিষ্কারভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়নি তা বৈধ বা হালালরূপে গণ্য হয়। হাদীসে আছে, “নবী (সা) যা নিষেধ করেছেন তাকে অবৈধ গণ্য করতে হবে, যতক্ষণ না তার মুবাহ প্রমাণ পাওয়া যাবে”।[১৭৩]

---

[১৭০] ইমাম ইবন মাজাহ, *সুনান*

[১৭১] আল কুরআন, ৬: ১৪৫ - *قل لا اجد ما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة*

[১৭২] আল কুরআন, ৭: ৩১ - *كلوا واشربوا*

[১৭৩] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী,* অধ্যায়: আল ইতিসাম

‘ইবাহাত এর শাব্দিক বিশ্লেষণ

ইবাহাত (الإباحة) শব্দটি ক্রিয়ামূল। এর অর্থ কোন বস্তুকে দৃশ্যমান বা প্রতিভাত করা। এর মর্ম হচ্ছে এরূপ, দর্শনকারী একে গ্রহণ কিংবা বর্জন করতে পারে। এর অর্থ কোন বস্তুকে কারো জন্য অনুমতিযোগ্য করা বা গ্রহণযোগ্য করা বুঝায় যদি সে চায়। ইসলামী আইনে ইবাহাত শব্দটি অনেকটা পরস্পর সম্পর্কিত অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এটি একটি পরিভাষায় পরিণত হয়েছে। যেমন ইসতেবাহা কোন বস্তুকে অনুমোদিত, মুক্ত বা আইনানুগ বলে বিবেচনা বা গ্রহণ করাকে বুঝায়। এটি মাহযুর শব্দের বিপরীতও বটে। প্রকৃত অর্থে ইবাহাত এমন একটি বিষয় যা কারো জন্য যেমন বাধ্যতামূলক বা সুপারিশকৃত নয়, আবার নিষিদ্ধ বা দূষণীয় নয়। মুবাহ এর সমার্থবোধক অথবা কাছাকাছি শব্দ হচ্ছে জায়িয অর্থাৎ আপত্তিমুক্ত, বৈধ, অনুমতিপ্রাপ্ত হতে খানিকটা ভিন্নতর। ‘যা নিষিদ্ধ নয়’ এ অর্থে হালাল এর ধারণাটি ব্যাপকতর।[১৭৪]

পারিভাষিক অর্থ

উসূলবিদদের পরিভাষায় আল্লাহর পক্ষ থেকে শারী‘আতের বিধান অর্পিত হয় এমন ব্যক্তিদের তা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ইখতিয়ার থাকে এরূপ কাজকে বুঝায়।[১৭৫]

আল ইবাহাত এর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি পরিভাষা হল আল জিওয়ায। ইসলামী আইনবিদগণ আল ইবাহাত এর সাথে আল জিওয়ায এর সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে একাধিক অভিমত দিয়েছেন। তাদের কেউ কেউ বলেনঃ ‘ জায়িয’ পরিভাষাটি পাঁচটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

(১) আল মুবাহ;

(২) এমন একটি বিষয় যা সম্পাদনের ক্ষেত্রে শারী‘আত নিষেধ করে না;

(৩) বুদ্ধিমত্তাও নিষেধ করে না;

(৪) এমন একটি বিষয় যা মর্যাদার ক্ষেত্রে সমমানের এবং

(৫) হুকুম আরোপের বিষয়টি সন্দেহযুক্ত।

যেমন গাধার উচ্ছিষ্ট। অনেকে আবার মুবাহ এর চেয়ে জিওয়ায কে ব্যাপক অর্থবোধক বলেছেন। অনেকে আবার সীমিত অর্থবোধক বলেছেন। কাজেই বলা যায়, জিওয়ায শব্দটি মুবাহ এর সমার্থবোধক।

ইসলামী আইনবিদগণের নিকট আল জিওয়ায (الجواز) শব্দটি মূলতঃ আল হারাম (حرام) এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। অবশ্যই হারামের সাথে মাকরূহও শামিল হবে। এখানে ইসলামী আইনবিদগণের নিকট আল

---

১৭৪ আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬২-৪৬৩

১৭৫ আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা, *কুয়েত: ওয়ারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ুনিল ইসলামিয়্যাহ,* ১৪২৫/ ২০০৪, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৬-১২৭

Dhaka University Institutional Repository

জিওয়ায শব্দটি 'বিশুদ্ধ ও অনুমোদিত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল ইবাহাতের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা হল (الحل) আল হিল্লু অর্থ হালাল। শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং তা হারাম এর বিপরীত অর্থদানের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। কুরআন ও হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আর আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন"।[১৭৬]

Whereas Allah has permitted trading and forbidden Riba (usury). (Surah 2. Al-Baqarah. Part 3. Ayat 275).

[১৭৬] আল কুরআন, ২: ২৭৫– *واحل الله البيع وحرم الربوا*

ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য

(مقاصد الشرعية)

মহান স্রষ্টা আল্লাহর অসংখ্য অগণিত সৃষ্টির মাঝে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই সে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। আল্লাহ বলেনঃ "তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন"।[১৭৭]

"He it is Who has made you successors generations after generations in the earth." (Surah 35. Fatir. Part 22. Ayat 39).

মহান আল্লাহ কর্তৃক এ স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে মানবজাতির জন্য এক পরম সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নেই। মূলতঃ এ স্বীকৃতি তখনই কার্যকর হবে যখন মানুষ তাকে যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তা বাস্তবায়নে তৎপর হবে। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেনঃ "আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই 'ইবাদত করবে"।[১৭৮]

"And I (Allah) created not the jinn and mankind except that they should worship Me (Alone)." (Surah 51. Adh-Dhariyat. Part 27. Ayat 56).

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সফল করলে মানুষ যেমন শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে, তেমনি এর ব্যত্যয় ঘটলে মানুষ জীব জন্তুর চেয়েও অধম হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেনঃ "বরং তারা পশুর চেয়েও অধম" ।[১৭৯]

"Nay even more astray." (Surah 7. Al-A'raf. Part 9. Ayat 179).

সুন্দর, সুষ্ঠু ও পরিমার্জিত জীবন পরিচালনার জন্য ইসলাম মানবজাতিকে উপহার দিয়েছে এক উন্নততর শারী'আহ বা জীবন দর্শন। এই জীবন দর্শনের মূল উৎস হচ্ছে কুরআন ও হাদীস। কুরআন মানুষকে যুগ যুগ ধরে হিদায়াতের পথ দেখিয়ে আসছে। এর মাধ্যমে মানুষ যেমন আল্লাহ পাককে জানতে ও চিনতে পারে, তেমনি ভাল মন্দ অবগত হয়ে নিজেদেরকে সতর্কও করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেনঃ "এটা মানুষের জন্য

---

[১৭৭] আল কুরআন, ৩৫: ৩৯ -هو الذى جعلكم خلائف فى الارض

[১৭৮] আল কুরআন, ৫১: ৫৬ -وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

[১৭৯] আল কুরআন, ৭: ১৭৯ - بل هم اضل

এক বার্তা, যাতে এর দ্বারা তারা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে, তিনি একমাত্র ইলাহ এবং যাতে বোধশক্তিসম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে"।[১৮০]

"This (Qur'an) is a Message for mankind (a clear proof against them), in order that they may be warned thereby, and that they may know that He is the only one llah (God-Allah) – (none has the right to be worshipped but Allah- and that men of understanding may take heed." (Surah 14. Ibrahim. Part 13. Ayat 52).

হাদীস হচ্ছে ইসলামী জীবন দর্শনের দ্বিতীয় উৎস। এর মাধ্যমেই কুরআনের প্রতিটি বিষয় বিস্তারিত জানা যায়। কুরআনকে বৃক্ষের মূলের সাথে তুলনা করলে হাদীসকে তুলনা করা যায় তার শাখা প্রশাখার সাথে। জীবন থেকে সত্যিকার অর্থে উপকার লাভ করা, ইচ্ছা মত স্বাদ আস্বাদন করা আর সফল জীবন যাপন নিঃসন্দেহে মানুষের মৌলিক অধিকার। জীবন চলার পথে প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তিকে সতর্ক পদক্ষেপের মাধ্যমেই পৌঁছতে হবে তার মানযিলে মাকসুদে। পরিপূর্ণ মু'মিন হতে হলে দীনকে রক্ষা করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি বাস্তব জীবনে ইসলাম নির্দেশিত বিধানাবলী বা মাকাসেদুশ শারী'আহ বা শারী'আহর উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন একান্ত জরুরী। নিম্নে শারী'আহ আইনের উদ্দেশ্যের গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলঃ

(১) দীন রক্ষা করা;

(২) জীবন রক্ষা করা;

(৩) বংশ রক্ষা করা;

(৪) সম্পদ রক্ষা করা;

(৫) মান সম্মান, ইযযত আব্রু রক্ষা করা;

(৬) মানব জীবনকে দুর্বিষহ হওয়া থেকে রক্ষা করা;

(৭) মানুষের পরস্পরের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করা;

(৮) মানব জীবনকে গতিশীল করা;

(৯) মানুষের মানবিক গুণাবলী বৃদ্ধি করা;

---

[১৮০] আল কুরআন, ১৪: ৫২ - *هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب*

Dhaka University Institutional Repository

(১০) মানুষের মাঝে মূল্যবোধ জাগ্রত করা;

(১১) মানুষের মাঝে সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা;

(১২) ঝগড়া বিবাদ রোধ করা;

(১৩) অকল্যাণকর পথ বন্ধ করা; এবং

(১৪) অন্যায় বন্ধ করা।

(১) দীন রক্ষা করা

মহান স্রষ্টা আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি প্রতিটি মানুষই শান্তির প্রত্যাশী।কিন্তু মানব জাতির প্রকাশ্য দুশমন ইবলিশ শয়তানের প্ররোচনায় পরে মানুষ যখন নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বকে হারিয়ে ফেলে হক বাতিল, ন্যায় অন্যায় ও সত্য মিথ্যার পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়; ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবোধ যখন সর্বত্র উপেক্ষিত হয়; ধর্ম অধর্মে পার্থক্য নিরূপণে মানুষ যখন দ্বিধান্বিত হয়ে হতাশায় ভুগতে থাকে, এমনই এক আপোষহীন প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নির্যাতিত মানবতার বুকফাটা আর্তনাদ দূর করতে মহান আল্লাহ পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে অগণিত নবী পয়গাম্বরকে যে বাণী এবং পথ নির্দেশ নিয়ে প্রেরণ করেছেন তাই দীন ইসলাম হিসেবে পরিচিত। মানব সভ্যতার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। বর্তমান সভ্যতায় রয়েছে অসংখ্য জাতির অবদান। দীন ইসলাম ছাড়াও প্রত্যেক জাতিরই রয়েছে নিজস্ব একটি দীন বা ধর্ম। আর প্রতিটি দীন বা ধর্মেরই মূলমন্ত্র হচ্ছে শান্তি। আদিকাল থেকেই ধর্ম পালন করে আসছে মানবসমাজ। শয়তানের প্ররোচনায় কিছু পথভ্রষ্ট লোক কর্তৃক অসংখ্য ঘাত প্রতিঘাতে দীন বা ধর্ম জর্জরিত হলেও একে রক্ষার জন্য যুগে যুগে বহু মানুষ যথাসম্ভব চেষ্টা চালিয়েছে। এমনকি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে নিঃসংকোচে। পৃথিবীর বুকে অসংখ্য ধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও মহান আল্লাহর নিকট দীন ইসলাম বা ইসলাম ধর্মই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন"।[১৮১]

"Truly, the religion with Allah is Islam." (Surah 3. Al-Imran. Part 3. Ayat 19).

এ দীনকে জেনে বুঝে গ্রহণ করতে হবে। গ্রহণ করার পর এর অমর্যাদা, বিশোদগার করা কিংবা ত্যাগ করার কারো অধিকার নেই; আইনের দৃষ্টিতে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। নিম্নে ধর্ম ত্যাগীদের পরিচয় ও পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

---

[১৮১] আল কুরআন, ৩: ১৯ - ان الدين عند الله الاسلام

ধর্ম ত্যাগের সংজ্ঞা

আরবি শব্দ ‘রিদ্দা’ (ردة) এর শাব্দিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে যাওয়া। কুফরীতে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।[১৮২] প্রত্যাবর্তন ও ফিরে যাওয়ার অর্থের সাক্ষ্য পবিত্র কুরআনে এসেছে। মহান আল্লাহ বলেছেনঃ “হে মু’মিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দীন হতে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে”।[১৮৩]

“You who believe! Whoever from among you turns back from his religion (Islam), Allah will bring a people whom He will love and they will love Him.” (Surah 5. Al-Maidah. Part 6. Ayat 54).

আর ইসলাম থেকে কুফরিতে ফিরে যাওয়া ও প্রত্যাবর্তন করাকে রিদ্দা বলে।[১৮৪] মহান আল্লাহ অন্যত্র বর্ণনা করেছেনঃ “আমরা আমাদের পায়ের গোড়ালিতে ফিরে যাব”।[১৮৫]

“And shall we turn back on our heels.” (Surah 6. Al-An‘am. Part 7. Ayat 71).

পারিভাষিক অর্থ

স্বেচ্ছায় প্রাপ্তবয়স্ক বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মুসলিম ব্যক্তির ঈমান ও ইসলাম থেকে কুফরিতে প্রত্যাবর্তনকে রিদ্দা বা ধর্ম ত্যাগ বলে”।[১৮৬] আল্লামা আল কাসানী বলেনঃ “রিদ্দা হল ঈমান থেকে ফিরে আসা”।[১৮৭] আল নাফরাভী বলেনঃ “ইসলামকে কেটে দেয়াই হল রিদ্দা”।[১৮৮]

---

[১৮২] আল সাইয়্যেদ মুরতাজা আল হুসায়নী আল জুবায়দী, তাজ আল আরুস, *২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, মিসর, আল খায়রিয়া প্রেস, ১৩০৬ হিজরী, পৃ. ৩৫১*

[১৮৩] আল কুরআন, ৫: ৫৪ – *ياايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه*

[১৮৪] আবূ যাকারিয়া শরফউদ্দিন ইয়াহইয়া ইবন শরফ আল নববী, *আল মাজমু’ শারহ আল মুহাজ্জাব,* বৈরুত, দার আল ফিকর, ১৪০৩, হিজরী, ১৯ তম. পৃ ২২৩

[১৮৫] আল কুরআন, ৬: ৭১ –*و نرد على اعقابنا*

[১৮৬] ড. ফকরী আহমদ ওকাজ, *ফালসাফাতু আল উকুবাত ফী আল শারী‘আহ আল ইসলামিয়া ওয়া আল কানূন,* রিয়াদ, মাকতাবাতু ওকাজ, ১৪০৩ হিজরী, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৪৩

[১৮৭] আল্লাম আল কাসানী, বাদায়ে আল সানায়ে, *বৈরুত, দার আল কিতাব আল আরাবী,* ১৪০২ হিজরী, ৭ম খ. পৃ. ১৩৪

[১৮৮] আল নাফরাভী, *আল ফাওয়াকিহী আল দাওয়ানী আলা রিসালাতি ইবন যায়দ আল কায়রাওয়ানী,* বৈরুত, দার আল ফিকর ১৪১২ হিজরী, ২য় খ. পৃ. ৩৮১

Dhaka University Institutional Repository

ইবন কুদামা বলেনঃ "যে দীন ইসলাম থেকে কুফরির প্রত্যাবর্তন করে তাঁকে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী বলে"।[১৮৯] ইংরেজীতে ধর্মকে ঘৃণা, তুচ্ছ ও অবজ্ঞাভরে ছেড়ে দেয়াকে ধর্মত্যাগ বা Blashphemy বলা হয়।

New Encyclopedia Britannica তে Blasphemy এর বিস্তারিত সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে।

"In the Christian religion: Blasphemy has been regarded as sin by moral theologians. It is a sin against faith. For the Muslim. It is Blasphemy to speak contemptuously not only of God but also of Mohammad."[১৯০]

"Blasphemy considered as a religious offence consists of scornful, disrespectful on insulting word of actions God. In this gravest form, blasphemy is a deliberate intentional attack on the honour or holiness of God.[১৯১]

(২) জীবন রক্ষা করা

মহান স্রষ্টার সৃষ্টি সুন্দর এ পৃথিবী পরিচালিত হচ্ছে মানুষকে কেন্দ্র করেই। মানুষই এখানকার নেতৃত্বদানকারী। মানুষের কর্মক্ষেত্র বানিয়ে দেয়া হয়েছে এই বিশাল ভূ- পৃষ্ঠকে। আর ভূ- পৃষ্ঠকে করে দেয়া হয়েছে মানুষের জন্য আবাসস্থল। আল্লাহ বলেনঃ "তিনিই তো আমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তাঁর দিগদিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট"।[১৯২]

"He is Who has made the earth subservient to you (i.e. easy for you to walk, to live and to do agriculture on it); so walk in the path thereof and eat of His provision. And to Him will be the Resurrection." (surah 67. Al-Mulk. Part 29. Ayat 15).

এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই মানুষের জন্যে। মানুষ তার উপর নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করে। মূলতঃ পৃথিবীর সব কিছুই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ "আমি

---

১৮৯ ইবন কুদামা, *আল মুগনি,* মিসর আলমানার প্রেস, ১৩৪৮ হিজরী, ১ম সংস্করণ, ৮ম খ. পৃ. ১২৩

১৯০ S T. Jhomas Aquinas: *New Encyclopedia Britannica.* Vol-2, 15th edition. P 276

১৯১ *L. Encyclopedia American.* Vol-4, U.S.A 1986, p.62.

১৯২ আল কুরআন, ৬৭: ১৫ – *هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور*

তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি”।[১৯৩]

“And indeed We have honoured the Children of Adam, and We have carried them on land and sea, and have provided them with At-Tayyibat (Lawful good things), and have perferred them above many of those whom We have created with a marked preferment.” (Surah 17. Al-Isra’. part 15. Ayat 70).

মহান আল্লাহ বলেনঃ “তোমরা কি দেখনা, আল্লাহর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন”।[১৯৪]

“See you not (O men) that Allah has subjected for you whatsoever is in the heavens and whasoever is in the earth, and has completed and perfected his Graces upon you.” (Surah 31. Luqman. Part 21. Ayat 20).

মহান স্রষ্টার এতসব সুন্দর সৃষ্টির সার্থকতা তখনই কার্যকর হবে যখন মানুষ স্বীয় জীবন এবং অন্যের জীবন বাঁচাতে সক্ষম হবে। জীবন রক্ষা ব্যতীত মহান স্রষ্টা যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। কেননা ইসলাম মানব জীবনকে যেমন সর্বাধিক মূল্যবান ও সম্মানের বস্তু হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, তেমনি তা রক্ষার জন্য জোর নির্দেশও দিয়েছে। তাই ইসলাম মহান আল্লাহ বলেনঃ “নর হত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্য করা ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল”।[১৯৫]

“If anyone killed a person not in retaliation of murder, or (and) to spread mischief in the land – it would be as if he killed all mankind, and if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind.” (Surah 5. Al-Maidah. Part 6. Ayat 32).

[১৯৩] আল কুরআন, ১৭: ৭০ ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفصلناهم على كثير ممن خلقنا تفصيلا

-

[১৯৪] আল কুরআন, ৩১: ২০ – الم تر ان الله سخر لكم ما فى السما وات وما فى الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

[১৯৫] আল কুরআন, ৫: ৩২– من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেনঃ “আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না”।[১৯৬]

“And do not kill anyone whose killing Allah has forbidden, except for a just cause.” (Surah 17. Al-Isra’. Part 15. Ayat 33).

মানবহত্যা মানবতা বিধ্বংসী অপরাধগুলোর মধ্যে অন্যতম। ইসলামী শারী‘আহ মানব হত্যার বৈধ ও অবৈধতা সুনির্দিষ্ট করার সাথে সাথে এর শাস্তিও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

(৩) বংশ রক্ষা করা

পিতা মাতার সাথে সন্তানের জন্মগত সম্পর্ককেই বংশ পরিচয় বলে। দাম্পত্য বন্ধনের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ সত্বেও নসব বা বংশ পরিচয় প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ বিবাহ অনুষ্ঠান (আকদ) এবং সহবাসের ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হলেও তার কারণে বংশ পরিচয়ের উপর কোন প্রভাব পড়বে না। এতে দাম্পত্য সম্পর্কে বিপর্যয় সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু এইভাবে যে সন্তান জন্মলাভ করে তার বংশ পরিচয় বিশুদ্ধ ও বৈধ হবে।[197] বংশ রক্ষা করা প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। অবৈধ পন্থায় যৌনকার্য পরিহারের মাধ্যমে বংশ রক্ষা করা মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে অন্যতম। কেননা অবৈধ পন্থায় যৌনকার্য সমাধা করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। বংশকে পুতঃ পবিত্র রাখার জন্য প্রত্যেক জাতি ও দেশে রাষ্ট্রীয় আইনে তথা ধর্মীয় বিধানে তার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান ও আইন কানূন রয়েছে। মানবজাতির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য সুসন্তান একান্তভাবে কাম্য। আর সন্তান জন্ম নেয় যৌনকার্য সম্পন্নের মাধ্যমে। ইসলাম সহ অন্যান্য সকল ধর্মেই জোর পূর্বক কিংবা অবৈধ পন্থায় যৌনকার্য সম্পাদনে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।

অধুনা বিশ্বের অনেক স্থানে এ যৌনকার্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ব্যতিরেকে সম্পন্ন হচ্ছে বিধায় এইডস নামক মারাত্নক ব্যাধির জন্ম নিয়েছে, যা একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। সে জন্য বিশ্বের প্রচার মাধ্যমগুলো ব্যভিচার বাদ দিয়ে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বিবাহ কার্যের মাধ্যমে যৌনকার্য সমাধানের জন্য প্রতিনিয়ত আহবান জানাচ্ছে এ বলে যে, ধর্মীয় অনুশাসনের দিকে ফিরে আস।

(8) সম্পদ রক্ষা করা

অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত মানবজীবন। জন্মের পর হতেই মানুষকে বিভিন্ন অভাবের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু অভাব পূরণের উপকরণ সমূহ সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ উপকরণের সাহায্যে অগণিত অভাব পূরণ করতে যেয়ে

---

১৯৬ আল কুরআন, ১৭: ৩৩ – *ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق*

১৯৭ সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন,* প্রথম খ. ১ম ভাগ, এপ্রিল ১৫৯৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৫৫২- ৫৩

প্রায়শই মানুষকে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখী হতে হয়। তবে অনেক সময় পার্থিব লোভ, ধনলিপ্সা ও উচ্চাভিলাসী জীবনের মোহ- ই মানুষকে চরম অভাবের মুখোমুখী করে থাকে। অভাবমুক্ত হতে চেয়ে অনেক মানুষ মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে দুনিয়াকে বসবাসের স্থায়ী জায়গা মনে করে দুর্নীতির মাধ্যমে অগাধ সম্পদ উপার্জন করে ভোগ বিলাসের সাগরে গা ভাসিয়ে দেয়। অথচ ইসলাম এ ধনলিপ্সাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। পার্থিব জীবনকে অনেকটা মূল্যহীন স্মরণ করিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ বলেনঃ "বল! পার্থিব ভোগ সামান্য, আর যে সাবধানি তার জন্য পরকালই উত্তম ও স্থায়ী"।[১৯৮]

"Say: "Short is the enjoyment of this world. The Hereafter is (far) better for him who fears Allah." (Surah 4. An-Nisa'. Part 5. Ayat 77).

মহানবী (সা) বলেছেনঃ "তুমি পৃথিবীতে এমন অবস্থায় থাক যেন তুমি মুসাফির বা পথিক"।[১৯৯] সম্পদ উৎপাদন, সংগ্রহ, বন্টন, ব্যয় ব্যবহার এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ইসলামের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও বিধিমালা রয়েছে। সমাজ ও সমাজভুক্ত প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপর অর্থের প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য জরুরী প্রয়োজন পূরণে সম্পদ বা অর্থ মানুষের জীবনে মুখ্য ভূমিকা রাখে। তাই ইসলাম বৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন এবং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৈধভাবে নিশ্চিতকরণে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেছে। ইসলামে সম্পদ অবৈধভাবে পুঞ্জিভূত করে রাখাকে শুধু নিরুৎসাহিত- ই করা হয়নি, তা নিষিদ্ধও করা হয়েছে। সম্পদ সঞ্চালনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেনঃ "সম্পদ যেন শুধু তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়" ।[২০০]

"In order that it may not become a fortune used by the rich among you." (Surah 59. Al-Hashr. Part 28. Ayat 7).

বৈধভাবে উপার্জিত ধন ও সম্পদের অধিকারি হবে উপার্জনকারী ব্যক্তিই। কোন ব্যক্তি যদি অধিক পরিশ্রম দ্বারা যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করে এবং তা কাজে লাগিয়ে হালাল উপায়ে অধিক উপার্জন করে, সে তার অধিকারী হবে। একের উপার্জিত ধন অন্যায়ভাবে অন্য কেউ নিতে পারবে না। আল্লাহ বলেনঃ "তোমরা একে অন্যের ধন বাতিল উপায়ে ভক্ষণ করো না"।[২০১]

---

[১৯৮] আল কুরআন, ৪: ৭৭ - *قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن التقى*

[১৯৯] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* কিতাবুর রিকাক, হা. নং- ৫৯৩৭

[২০০] আল কুরআন, ৫৯: ৭ - *كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم*

[২০১] আল কুরআন, ৪: ২৯ - *لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل*

Dhaka University Institutional Repository

"Eat not up your property among yourselves unjustly." (Surah 4. an-Nisa'. Part 5. Ayat 29).

(৫) মান সম্মান, ইযযত আব্রু রক্ষা করা

মানুষের নিকট অত্যধিক প্রিয় তার জীবন ও সম্পদ। আবার সম্পদের চেয়ে মান সম্মানের গুরুত্ব অনেক বেশী। সম্পদের ক্ষতি হলে তা পুষিয়ে নেয়া যায়, কিন্তু সম্মানের হানি ঘটলে তা কখনো পুষিয়ে নেয়া যায় না। তাই ইসলামী শারী'আহ মানুষের মান সম্মান, ইযযত আব্রুর নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মানুষ সামজিক জীব। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে যে সকল কর্মকাণ্ড মানুষের মান সম্মান ক্ষুণ্ন করে এবং সমাজে দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ ও অশান্তি সৃষ্টি করে, সে সকল কর্মকাণ্ড ইসলামী শারী'আহ নিষিদ্ধ করেছে। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে যেয়ে মানুষ অনেক সময় নানা ভুল ভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়ে কিংবা অজ্ঞাতে অনেক অন্যায় কাজ করে ফেলে। কোন অবস্থাতেই অন্যায়ভাবে কোন নাগরিকের মান সম্পদ নষ্ট করা যাবে না কিংবা তাকে লাঞ্চিত করা যাবে না।

এতদসংক্রান্ত মহান আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা হলঃ "হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী হতে উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ থেকে নিবৃত্ত না হয় (তাওবা না করে) তারাই যালিম। হে মু'মিনগ! তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে দূরে থাক। কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করোনা এবং একে অপরের পশচাতে নিন্দা করোনা। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো এটা ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু"।[২০২]

"O you who believe! Let not a group scoff at another group, it may be that the latter than the former. Nor let (some) women scoff at other women, it may be that the latter are better than the former, Nor defame one another by nicknames. How bad is it to insult one's brother after having faith [i.e. to call your Muslim brother (a faithful believer) as:

---

[২০২] আল কুরআন, ৪৯: ১১-১২ يايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون- يايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم

Dhaka University Institutional Repository

"O sinner", or "O wicked"]. And whosever dose not repent, then such are indeed Zalimun (wrong - doers, etc.). O you who believe! Avoid much suspicion; indeed some suspicions are sins. And spy not, nither backbite one another. Would one of you like to eat the flesh of his dead brother? You would hate it (so hate backbiting. And fear Allah. verily, Allah is the One Who forgives and accepts repentance, Most Merciful." (Surah 49. Al-Hujurat. Part 26. Ayat 11-12).

আল কুরআনের সূরা আল হুজরাতের উপরোক্ত দু'টি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের মান সম্মান ইযযত আব্রু রক্ষার জন্য ছয়টি বিষয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। বিষয়গুলো হলঃ

(১) উপহাস না করা;

(২) দোষারোপ না করা;

(৩) মন্দ নামে না ডাকা;

(৪) অমূলক ধারণা বর্জন করা;

(৫) গোপন দোষ প্রকাশ না করা; এবং

(৬) গীবত বর্জন করা।

(৬) মানব জীবনকে দুর্বিষহ হওয়া থেকে রক্ষা করা

ইসলাম মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। পার্থিব জীবনে সমগ্র মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং পরকালীন মুক্তির একমাত্র নিশ্চয়তা প্রদান করে ইসলাম। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ধর্মগুলোর মধ্যে একমাত্র ইসলামই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা সংস্কৃতি, বিচার ব্যবস্থাসহ জীবনের সকল দিক ও বিভাগে উদ্ভূত সমস্যাদি সমাধানে যথাযথ ভূমিকা পালন করছে। সুন্দর এ বিশ্ব যখন মনুষ্যসৃষ্ট হাজারো সমস্যার তাপদাহে দগ্ধিত হয়ে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল, মানবজীবন হয়ে পড়েছিল দুর্বিষহ তখনই শান্তির প্রস্রবণ বইয়ে দিতে ইসলামের সুমহান বার্তা নিয়ে আগমন করেছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। সেই মহামানব সম্পর্কে কুরআনে এসেছেঃ "আমি (আল্লাহ) তো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি"।[২০৩]

[২০৩] আল কুরআন, ২১: ১০৭ -وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

"And We have sent you (O Muhammad Sm) not but as a mercy for the 'Alamin (mankind, jinn and all that exists)." Surah 21. Al-Anbiya'. Part 17. Ayat 107).

মহানবী (সা) পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর বাণী তুলে ধরে মানব জীবনকে দুর্বিষহ অবস্থা হতে পরিত্রাণ দেয়ার জন্যে সম্ভাব্য সকল সমাধান দিয়ে গেছেন যা আজকের এ চরম উৎকর্ষতার যুগেও যথার্থ শাশ্বত দিক নির্দেশনারূপে কাজ করে যাচ্ছে। মানবজীবনকে দুর্বিষহ অবস্থা হতে পরিত্রাণ দিতে যেয়ে তিনি যে ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরেছেন তার সফলতা দেখে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে বলা হয়েছে-

"Of all the religious personalities of the world Muhammad (sm) was the most successful.[২০৪]

বর্তমান বিশ্বে যে সকল সমস্যা মানব জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে, সে সমস্যাগুলোকে আমরা প্রধানত নিম্নোক্ত শিরোনামভূক্ত করতে পারিঃ (১) মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত, (২) শিশুদের অধিকার লঙ্ঘিত, (৩) নারী সমাজের মর্যাদাহীনতা, (৪) শিক্ষাক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা, (৫) নানাবিধ সমস্যা।

মূলতঃ শান্তিময় জীবন লাভ এবং দুর্বিষহ অবস্থা থেকে জীবনকে রক্ষা করার বিকল্পহীন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলামী আমল তথা কুরআন সুন্নাহর আদর্শের বাস্তবায়ন।

(৭) মানুষের পরস্পরের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করা

পৃথিবীর সকল মানুষ এক আল্লাহর সৃষ্টি। একটিমাত্র পৃথিবীতে তাদের বসবাস। মাঝখানে শুধু রাষ্ট্রীয় সীমারেখা দিয়ে পৃথিবীকে বিভক্ত করা হয়েছে। অথবা জাতি, ধর্ম বিশ্বাস, বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায় ইত্যাদি বিষয় দ্বারা মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছে। পারস্পরিক বিশ্বাস, চিন্তা ও মূল্যবোধের কারণেও মানুষের মধ্যে সুসম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য ইসলামের রয়েছে বিশ্বজনীন নীতিমালা। যার আলোকে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) মদীনায় বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করে একটি গতিশীল রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

(৮) মানব জীবনকে গতিশীল করা

মানুষ আশরাফুল মাখলূকাত মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সমগ্র প্রাণী জগতের মানুষের অবস্থান সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। তার আকার আকৃতি যেমন অনন্য, তেমনি তার বিচারশক্তিও অতুলনীয়। তাই গোটা প্রাণী

[২০৪] Encyclopedia Britannica.

Dhaka University Institutional Repository

জগতে একমাত্র মানুষই আল্লাহর খলিফা তাঁর প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃত। খিলাফাতের অর্পিত দায়িত্বের কারণেই মানুষকে তার সকল কর্মের জন্য জওয়াবদিহী করতে হবে। মানব জাতি কোনক্রমেই এর থেকে রেহাই পাবে না। কুরআন পাকে যথার্থই ইরশাদ হয়েছেঃ "প্রত্যেককে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না"।[২০৫]

আল্লাহ আরো বলেনঃ "কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না; কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাকেও তা বহন করতে আহবান করে তবে তার কিছুই বহন করা হবে না নিকটাত্নীয় হলেও"।[২০৬]

"And no bearer of burdens shall bear another's burden; and if one heavily laden calls another to (bear) his Load, nothing of it will be lifted even though he be near of kin." (Surah 35. Fatir. Part 22. Ayat 18).

বর্ণিত আয়াতদ্বয় পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, নারি পুরুষ প্রত্যেককেই অত্যন্ত সচেতন হতে হবে এবং তাদের জীবনকে করতে হবে গতিশীল। কারণ জীবনকে সচেতন ও গতশীল করা ব্যতীত কারো পক্ষেই পার্থিব সাফল্য ও পরকালীন মুক্তি লাভ সম্ভব নয়।

স্রষ্টার এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই মানবের সৃষ্টি। তাই মানব জীবন এত মূল্যবান। এর প্রতিটি মুহূর্তের পরিপূর্ণতা দান করতে যে সাধ্য সাধনা এবং গতিশীলতার প্রয়োজন তা পালন করার মধ্যেই এ জীবনের সার্থকতা। কর্মবিমুখতা, গতিহীনতা বা বিলাসীতা কোনটাই মানব জীবনে পূর্ণতা আনতে পারে না। তাই মহান আল্লাহ মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "তোমরা কি ভেবেছ আমি তোমাদের অযথা সৃষ্টি করেছি?"[২০৭]

"Did you think that We had created you in play (without any purpose). (Surah 23. Al-Mu'minun." Part 18. Ayat 115).

(৯) মানুষের মানবিক গুণাবলী বৃদ্ধি করা

ইসলাম মহান আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠতম জীবন বিধান। যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসূল পৃথিবীতে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার পাশাপাশি মানুষকে উন্নত চরিত্র শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা। মানবিক গুণাবলী মানুষকে মহৎ করে, উন্নত করে এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে। তাই তো ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ

---

[২০৫] আল কুরআন, ৪:১৬৪ - ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى

[২০৬] আল কুরআন, ৩৫:১৮ - ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى

[২০৭] আল কুরআন, ২৩:১১৫ - افحسبتم انما خلقناكم عبثا

Dhaka University Institutional Repository

(সা) ঘোষণা করেছেন, "আমি উত্তম চরিত্র শিক্ষাদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি"[২০৮] ইসলামে মানুষের মানবিকগুণাবলী বলতে যেসব গুণকে বুঝায় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাকওয়া, সততা, বিনয় নম্রতা, সহিষ্ণুতা, দানশীলতা, আমানতদারী, ন্যায়পরায়ণতা, কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি।

(১০) মানুষের মাঝে মূল্যবোধ জাগ্রত করা

আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য সৃষ্টির সাথে মানুষের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল মানুষ নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ধারক বাহক। মূল্যবোধ বলতে বুঝায় এমন কিছু মৌলিক আদর্শ, বিশ্বাস, রীতি নীতি বা দৃষ্টিভঙ্গি যা মানুষকে কোন কাজ করতে নিয়োজিত বা উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামে মানবিকমূল্যবোধের গুরুত্ব অত্যধিক। যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে অগণিত নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন যারা মানুষের মাঝে মূল্যবোধ জাগ্রত করার কাজটি নিরলসভাবে করে গেছেন। মূল্যবোধহীন কোন সমাজ মানুষের সমাজ হতে পারে না। তাই মানুষের মাঝে মূল্যবোধ জাগ্রত করার কাজটি ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল হিসাবে স্বীকৃত। ইসলামে মানবিক মূল্যবোধের মূলকথা হল ঈমান এবং আমলে সালেহ। ঈমান এবং আমলে সালেহ ব্যতীত মূল্যবোধ অর্জন সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেনঃ "মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ, কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে" ।[২০৯]

"By Al-Asr (the time) Verily, man is in loss, Except those who believe (Islamic Monotheism) and to righteous good deeds, and recommend one another to the truth." (Surah 103. Al-'Asr. Part 30 Ayat 1-3).

একজন প্রকৃত মু'মিনের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই মানবিক মূল্যবোধ বিদ্যমান আছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে একজন মু'মিনের যে পরিচয় উপস্থাপন করা হয়েছে তার সারাংশ হল, মু'মিন ব্যক্তি মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত একজন আদর্শ মানুষ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ "মু'মিন তো ঐ ব্যক্তি যাকে তার ভালকাজ আনন্দ দেয় এবং তার মন্দকাজ কষ্ট দেয়"।[২১০] এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, সমাজ জীবনের সকল ভালকাজ আনন্দচিত্তে গ্রহণ এবং মন্দকাজ বর্জন করা ঈমানের বড় পরিচয়। মানুষের মনে এ মানসিকতা তৈরী করতে পারলে সমাজ হবে মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ। আর একটি হাদীসে রাসূল (সা) বলেনঃ "মুসলিম সেই ব্যক্তি যার হাত থেকে মানুষের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকে"।[২১১] সুতরাং মু'মিন

---

২০৮ ইমাম মালিক ইবন আনাস, *মুয়াত্তা,* কায়রো: ১৩৭০ হি. কিতাবুল হুসনিল খুলক, হা. নং- ৮

২০৯ আল কুরআন, ১০৩: ১-৩ - *والعصر- ان الانسان لفى خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات*

২১০ ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল, *আল মুসনাদ,* কায়রো মাতবা'আ আশরাফিল ইসলামিয়া, ১৩১৩ হি. খ. ১, পৃ. ২৬

২১১ ইমাম নাসাঈ, *সুনানে নাসাঈ,* লাহোর: মাকতাবা' সালফিয়া ১৯৮২, কিতাবুল ঈমান, বাব নং- ৮

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি সকলের জন্য সবচেয়ে বেশী নিরাপদ একজন ব্যক্তি। তার দ্বারা সমাজের কোন মানুষের কোন ক্ষতি হতে পারে না। তাই আমরা বলতে পারি, মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হলে সে সমাজের জন্য সম্পদে পরিণত হয়।

ইসলামে মূল্যবোধের মূলনীতি হলঃ আল্লাহ বলেনঃ "সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না"।[২১২]

"Help you one another in Al-Birr and At-Taqwa (virtue, righteousness and piety); but do not help one another in sin and transgression." (Surah 5. Al-Maidah. Part 6. Ayat 2).

মানুষের মনে যদি আল্লাহভীতি তথা আল্লাহর ভয়, ভালাবাসা ও আনুগত্য সৃষ্টি হয় তাহলে সে মানুষ কখনো অন্যায় ও অশ্লীল তথা অমানবিক কর্মকাণ্ড করতে পারে না। আর মানুষ যখন পাপাচার ও অশ্লীলতা বর্জন করে তখন স্বাভাবিকভাবেই সে মানুষ হয় সৎ, আদর্শবান ও সুশীল। তার মধ্যে তখন সৃষ্টি হয় মানবিক মূল্যবোধের ধারণা। অনেক সময় ভাল মানুষের মধ্যেও মূল্যবোধের অবক্ষয় সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নির্দেশ হলঃ "মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর"।[২১৩]

"The believers are nothing else than brothers (In Islamic religion). So make reconciliation between your brothers." (Surah 49. AlHujurat. Part 26. Ayat 10).

মূল্যবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ "এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর অন্যায় করতে পারে না এবং তাকে লজ্জায় ফেলতে পারে না"।[২১৪] "মু'মিন কখনো অপবিত্র হতে পারে না"।[২১৫] "কেউ মু'মিন থাকাবস্থায় ছিনতাই করতে পারে না"।[২১৬] "তোমাদের কেউ যখন প্রতারণা করে

---

[২১২] আল কুরআন, ৫: ২ -وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

[২১৩] আল কুরআন, ৪৯: ১০ - انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم

[২১৪] ইমাম মুসলিম, *সহীহ লি মুসলিম,* দিল্লী আল মাকতাবা' রশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. কিতাবুল বির, হা. নং- ৬০ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله -

[২১৫] ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান,* হা. নং- ১৪৭ - ان المؤمن لا ينجس

[২১৬] ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান,* হা. নং- ১০০ - ولا ينتهب نهبة وهو مؤمن

তখন সে মু'মিন থাকে না"।[217] "যখন কেউ মদপান করে তখন সে মু'মিন থাকে না"।[২১৮] "কেউ চুরি করা কালে সে মু'মিন থাকে না"।[২১৯]

উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম সর্বদা অসুন্দর, অমানবিক ও অকল্যাণকর কাজ পরিহারের নির্দেশ দিয়েছে। যাতে মানুষ সুন্দরের দিকে, কল্যাণের দিকে আসার সুযোগ পায়। রাসূলুল্লাহ (সা) ইসলামের সামগ্রিক সৌন্দর্য তথা দয়া, মায়া মমতা, প্রেম ভালবাসা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারী, পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন। ইসলাম প্রদত্ত উক্ত বিধান পরিত্যাগ করার কারণে আজ সমগ্র বিশ্বে চরম মানবিক বিপর্যয় নেমে এসেছে। অন্যায় অবিচার, অশ্লীলতা, হিংসা বিদ্বেষ, ঘৃণা প্রতারণা, ইত্যাদি অমানবিক কর্মকাণ্ড দ্বারা সুন্দর পৃথিবী অশান্তিময় হয়ে উঠেছে। মানুষের মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এর প্রধান কারণ। তাই পৃথিবীকে একটি সুখী, সুন্দর ও শান্তিময় আবাস হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা আজ সময়ের অপরিহার্য দাবি যা দিন দিন জোরদার হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইসলাম প্রদত্ত মানবিক মূল্যবোধের প্রয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজন, যার কোন বিকল্প নেই।

(১১) মানুষের মাঝে সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে সাম্য ও সমতা সম্পর্কীয় যে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়, মানবজাতির অতীত কিংবা বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোথাও তা দেখা যায় না। ইসলাম সকলকে অন্যায় অবিচার, খুনখারাবী, সন্ত্রাস ইত্যাদি পরিত্যাগ করে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবার নির্দেশ দিয়েছে। কুরআনুল কারীম মানবগোষ্ঠীকে জন্মগতভাবে সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। আল্লাহ বলেনঃ "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। আর তোমাদের মধ্যে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী"।[২২০]

"O mankind! We have created you from a male and a female, aand made you into nations and tribes, that you may know one another. Verily, the most honourable of you with

---

[২১৭] *প্রাগুক্ত*, হা. নং- ১০৩ – *لا يغل احدكم حين يغل وهو مؤمن*

[২১৮] *প্রাগুক্ত*, – *لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن*

[২১৯] *প্রাগুক্ত*, – *لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن*

[২২০] আল কুরআন, ৪৯: ১৩ *يايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم الله عليم خبير* –

Dhaka University Institutional Repository

Allah is that (believer who has A-Taqwa [i.e. he is one of the Muttaqun (the pious. See V.2:2)]. Verily, Allah is All-Knowing, All-Aware." (Surah 49. Al-Hujurat. Part 26. Ayat 13).

এ কথাটিই বিদায় হাজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে মহানবী (সা) ঘোষণা করেছেনঃ "কোন অনারবের উপর কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না আছে কোন আরবের উপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব। কোন কালোর উপর কোন সাদার শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না কোন সাদার উপর কোন কালোর শ্রেষ্ঠত্ব, তবে তাকওয়া ছাড়া"।[২২১] (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া)। "সব মানুষই আদমের সন্তান এবং আদম মাটির সৃষ্টি। হে আদম সন্তান, আজকের এই দিন, এই মাস, এই নগরী যেমন তোমাদের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধনসম্পত্তিও মর্যাদা সম্পন্ন। মনে রেখো, আঁধার যুগের সকল নীতি, সকল আচরণ আজ আমি পদতলে দলিত করছি। অজ্ঞতার যুগের রক্তপাত এবং তার প্রতিশোধের সকল ঘটনা আজ থেকে বিস্মৃত হয়ে যাও। সর্বপ্রথম আমি আমার পিতৃব্য ভ্রাতা ইবন রাবি'আ ইবন হারিসের খুনের দাবি প্রত্যাহার করছি"।[২২২] কুরআন ও মহানবী (সা) এর বাণীর আলোকে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল মানুষ আইনের চোখে সমান মর্যাদার অধিকারী। সামাজিক জীবনেও তাদের মধ্যে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ব্যতিরেকে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের কোন মানদণ্ড নেই। রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে ইসলাম সমগ্র মানব জাতিকে এক সূতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। আর ঈমান ও ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে মুসলমানদেরকে পরস্পর ভাই ভাই হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছে। আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ "নিশ্চয়ই মু'মিনগণ! পরস্পর ভাই ভাই"।[২২৩]

"The believers are nothing else than brothers." (Surah 49. Al-Hujurat. Part 26. Ayat 10).

(১২) ঝগড়া বিবাদ রোধ করা

মহান স্রষ্টা আল্লাহর এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এ বিশ্ববুকে মানবের সৃষ্টি। তাই মানব জীবন এত মূল্যবান। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের পরিপূর্ণতা দান করতে যেয়ে যে সাধ্য সাধনার প্রয়োজন, তা পালন করার মধ্যেই এ জীবনের সার্থকতা। কর্মবিমুখতা বা বিলাসীতা কোনটাই মানব জীবনে পূর্ণতা দান করতে পারে না।

---

২২১ ইমাম তাবারানী, *মু'জামুল কাবীর,* চতুর্থ অধ্যায়, শুয়ায়ব ইবন আমর থেকে বর্ণিত হা. নং- ১৪৪৪৪ *فليس لعربى على عجمى فضل- ولا لعجمى على عربى فضل- ولا لاسود على ابيض ولا لابيض على اسود فضل الا بالتقوى-*

২২২ মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *ইসলামী আদর্শ ও বাস্তবায়ন,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫, পৃ. ৪৫

২২৩ আল কুরআন, ৪৯: ১০ - *انما المؤمنون اخوة*

তাই মহান আল্লাহ মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেনঃ "তোমরা কি ভেবেছ আমি তোমাদের অযথা সৃষ্টি করেছি"?[২২৪]

"Did you think that We had created you in play (without any purpose). (Surah 23. Al-Mu'minun." Part 18. Ayat 115).

তিনি আরও বলেছেনঃ "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফিরদাউসের উদ্যান, সেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং সেখান থেকে স্থানান্তর কামনা করবে না"।[২২৫]

"Verily thode who believe (in the oneness of Allah – Islamic Monotheism) and do righteous deeds, shall have the Gardens of Al-Firdaus (paradise) for their entertainment. "Wherein they shall dwell (forever). No desire will they have for removel therefrom." (Surah 18. Al-Kahf. Part 16. Ayat 107-108).

মহান আল্লাহ এ ঘোষণার মাধ্যমে মানবজাতিকে সচেতন থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সত্য, সাম্য ও ন্যায়ের ধর্ম ইসলাম ঝগড়া বিবাদ রোধের মাধ্যমে এ পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একের প্রতি অপরের আচার আচরণ ও অধিকারে দিয়েছে সুশৃঙ্খল ও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। ইসলামের দৃষ্টিতে একটা অবিচ্ছিন্ন কর্তব্য বা দায়িত্ব পালনের নামই জীবন। আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, নিজের প্রতি, পিতা মাতা ও আত্নীয় স্বজনের প্রতি, নিজ সমাজ তথা সমগ্র সৃষ্টির প্রতি প্রত্যেক মানুষের রয়েছে দায়িত্ব কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের নিষ্ঠাযুক্ত সংকল্প গ্রহণের মধ্যেই তা যথাযথ সম্পাদনের জন্য মানুষের প্রতি ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে।

ইসলাম প্রতিটি মানুষকে ঝগড়া বিবাদমুক্ত একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের প্রতি জোর দিয়েছে সর্বদা। ঝগড়া বিবাদের মাধ্যমে অশান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টাকারীকে কিংবা অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে ইসলাম। ঝগড়া বিবাদকারীকে প্রশ্রয় না দেয়া, অত্যাচারীর সামনে মাথানত না করার এবং তার অত্যাচারকে ঠাণ্ডা মাথায় বরদাশত না করাই ইসলামের শিক্ষা। ঝগড়া বিবাদ মূলত অশ্লীল কথার ছড়াছড়ি। অশ্লীল কথাবার্তাই এর মূল উপজীবিকা। অশ্লীলভাসী আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় ব্যক্তি।

আল্লাহ বলেনঃ "যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন তোমরা জান না"।[২২৬]

---

[২২৪] আল কুআন, ২৩: ১১৫ - افحسبتم انما خلقنا کم عبثا

[২২৫] আল কুরআন, ১৮: ১০৭-১০৮ - ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا- خالدين فيها لا يبغون عنها حولا

[২২৬] আল কুরআন, ২৪: ১৯ – ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين امنوا لهم عذاب اليم فى الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون

"Verily, those who like that (the crime of) illegal intercourse should be propagated among those who believe, they will have a painful torment in this world and in the Hereafter. And Allah knows and you know not." (Surah 24. An-Nur. Part 18. Ayat 19).

মহানবী (সা) বলেছেনঃ "চারটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর এর একটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে, তার মধ্যে মুনাফিকির একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা পরিত্যাগ না করে। উক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য হলঃ

(১) যখন তার নিকট কোন কিছু আমানত রাখা হয়, সে তার খিয়ানত করে,

(২) সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে,

(৩) আর যখন প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ভঙ্গ করে এবং

(৪) যখন কারো সাথে ঝগড়া বিবাদ করে, তখন অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়"।[২২৭]

অর্থাৎ অশ্লীলতা ও মন্দ কথা এক কথায় ঝগড়া বিবাদ অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এ গর্হিত কাজটি সাধারণত মানুষ রাগেরবশবর্তী হয়ে করে থাকে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার এক মোক্ষম সুযোগ নিয়ে ব্যক্তি একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্রোধেরবশবর্তী হয়ে মূলতঃ এ কাজটি করা হয়। ক্রোধ সংবরণের নির্দেশ দিয়ে মহানবী (সা) বলেছেনঃ " যে ব্যক্তি লোককে কুস্তিতে হারায় সে বাহাদুর নয়; বরং প্রকৃত বাহাদুর সেই ব্যক্তি যে রাগের মুহূর্তে ধৈর্যের সাথে নিজেকে সামলাতে পারে"।[২২৮] শারীরিক শক্তিমত্তাই মানুষের মূলশক্তি নয়। ব্যক্তি মল্লযুদ্ধে দৈহিক ক্ষমতা দিয়ে প্রতিপক্ষকে সহজেই পরাজিত করতে পারে। এ পারা তেমন কঠিন কাজ নয়। কেননা, কায়িক শক্তির প্রদর্শনী ছাড়া ব্যক্তিকে এখানে কিছুই করতে হয় না। আসল শক্তিমান সেই ব্যক্তি যে ঝগড়া বিবাদের বা ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে। ক্রোধ একটি রিপু। এর ফলে ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে উঠে, যথাযথ আচরণ করতে পারে না। নিজের উপর ও নিজের কাজের উপর নিয়ন্ত্রন রাখতে ব্যর্থ হয়ে অন্যকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করতে থাকে। প্রতিপক্ষও জড়িয়ে পড়ে ঝগড়া বিবাদে। কঠিন এ মুহূর্তে প্রবৃত্তির সাথে বিজয়ী হবার জন্যে দৈহিক শক্তি যথেষ্ট নয়। এ জন্য প্রয়োজন আত্নশুদ্ধির ও

---

[২২৭] আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* আল মযালিম ওয়াল গাসাব, অধ্যায়: হা. নং- ২২৭৯ *اربع من كن فيه كان منافقا او كانت فيه خصلة من اربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خصم فجر -*

[২২৮] আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহীহ বুখারী,* শিষ্টাচার, অধ্যায়: বাবু আল হাযরী মিনাল গাযাব, হা. নং- ৫৬৪৯

ليس الشديد با الصرعة انما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب -

আত্নসংশোধনের। বস্তুত এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। মহানবী (সা) একে 'আল জিহাদুল আকবর' বা বৃহত্তম জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(১৩) অকল্যাণের পথ বন্ধ করা

ইসলাম কল্যাণের ধর্ম। ইসলাম অকল্যাণের পথ বন্ধ করে মানব সমাজে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ, মর্যাদাবোধ, নিষ্ঠা, সততা, সুবিচার, সহানুভূতি, কল্যাণ কামনা, দয়া মায়া এবং দরদ ভালাবাসার শিক্ষা দেয়। সেই সাথে দায়িত্বহীনতা, অশ্রদ্ধা, কপটতা, অন্যায় যুলম, নিপীড়ন, অবিচার, স্বার্থপরতা, অসততা, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতাকে পদদলিত করে অকল্যাণের পথ চিরতরে বন্ধ করে কল্যাণময় বিশ্ব উপহার দেয়াই ইসলামের মূল শিক্ষা।

কল্যাণ কামনাই ইসলাম। অন্ধকার যুগের ইতিহাসকে মুছে দিয়ে পৃথিবীর বুকে কল্যাণ, শান্তি ও নিরাপত্তার যে অধ্যায় প্রায় ১৫শ বছর আগে ইসলাম রচনা করেছে, আজকের পৃথিবীতে তার আবেদন এখনো ফুরিয়ে যায়নি। নিঃশেষ হয়নি তার বিমল আদর্শের প্রয়োজনীয়তা। কিয়ামত সংঘটিত হবার পূর্বে তা কখনও হবেনা। সে জন্যই ইসলাম স্বীকৃতি পেয়েছে একটি সর্বকালীন ও সার্বজনীন ধর্ম বা বিধান হিসাবে। ইসলামের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে সে সত্যই উজ্জল ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তাই সময়ের চাহিদা মিটাতে ও যুগ সমস্যার সমাধানের বিধান হিসাবে ইসলামের কোন বিকল্প নাই। ইসলামের মর্মবাণী হল অকল্যাণের পথ বন্ধ করে শান্তি, সাম্য ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, এবং মানুষে মানুষে, শান্তি স্থাপন ইসলামের মূল লক্ষ্য। ইহজাগতিক শান্তির মধ্য দিয়ে পরকালীন শান্তি তথা মুক্তির লক্ষ্যে উপনিত হবার চেষ্টার মধ্যেই ইসলামের সুর ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত।

ইসলাম শব্দটি উদ্ভব হয়েছে 'সলম' থেকে। সে হিসাবে ইসলাম বলতে বুঝায় উচ্চতম আদর্শের কাছে আত্নসমর্পণ। শান্তি কথাটিকে বুঝতে হবে প্রচলিত অর্থের চেয়ে ব্যাপকতর অর্থে। শান্তি বলতে বুঝায় আদর্শের প্রতি পরিপূর্ণ অনুরাগ ও আনুগত্য। ব্যক্তি মানুষের বিভিন্ন বিরোধি প্রবণতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং এভাবে মানসিক শান্তি অর্জনই জীবনের লক্ষ্য। ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি অর্জন ইসলামের একমাত্র লক্ষ্য নয়।

ব্যক্তি জীবনে শান্তি অর্জনের পাশাপাশি জনগণের সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের অভিষ্ট লক্ষ্য। ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন বিবদমান শক্তির মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে এবং ব্যক্তি সত্ত্বাকে তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার সাহায্যে আত্নশৃঙ্খলা অর্জনই ইসলাম।[২২৯]

---

[২২৯] বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ Syedur Rahman, *An Introduction to Islamic Culture and Philosophy*, (Dacca, 1963) p. 24

(১৪) অন্যায় বন্ধ করা

ন্যায়ের বিপরীত শব্দ অন্যায়। অন্যায় বলতে বুঝায় এমন কর্ম চিন্তা বা অনুভূতি যা মানুষের অধিকার হরণ করে। অন্যভাবে বলতে গেলে অন্যায় হল এমন কর্মকাণ্ড যা বিবেক সমর্থন করে না। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে জীবনের প্রত্যেকটি মৌলিক সমস্যার সমাধান দিয়েছে। ইসলাম সুস্পষ্টভাষায় সকল প্রকার অন্যায় অবিচার, সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। অন্যায় বন্ধ করার ক্ষেত্রে ইসলাম যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা নিম্নে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলঃ

অন্যায় প্রতিরোধ

একটি সমাজে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বসবাস করে। তাই সেখানে কোন অন্যায় কর্ম সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে সমাজে যে কোন অন্যায়, অবিচার ও অশ্লীল কর্মকাণ্ড হতে দেখলে তা প্রতিরোধ করতে হবে এটাই ইসলামের বিধান। অন্যায় অবিচারের পথ বন্ধ করে দেয়া মুসলিম উম্মাহর উপর অর্পিত একটি অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ বলেনঃ "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজের নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর"।[২৩০]

"You [true believers in Islamic Monotheism, and real followers of Prophet Muhammad sm and his Sunnah] are the best of peoples ever raisd up for mankind; you enjioin Al-Ma'ruf (i.e. Islamik Monotheism and all that Islam has ordained) and forbid Al-Munkar (polytheism, disbelief and all that Islam has forbidden), and you believe in Allah." (Surah 3. Al-imran. Part 4. Ayat 110).

রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ গ্রহণ

অন্যায় প্রতিরোধে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সব সময় সম্ভব নয়। অন্যায় প্রতিরোধের সামস্টিক পদক্ষেপ দরকার। আর সামস্টিক পদক্ষেপ তখনই সফল হয় যখন রাষ্ট্রীয় সম্মতি থাকে। তাই উম্মাহ যাতে মানবসমাজে অন্যায় বন্ধ করার মত একটি কাজ সুন্দরভাবে করতে পারে, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা হলঃ "তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্মের নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম"।[২৩১]

---

২৩০ আল কুরআন, ৩: ১১০ - كنتم خير امة اخرجت للناس تا مرون بالمعروف وتنهون عن المنكر و تؤمنون بالله

২৩১ আল কুরআন, ৩: ১০৪ - ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعرون وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون

“Let there araise out of you a group of people inviting to all that is good (islam), enjoining A-Ma‘ruf (i.e. Islamic monotheism and all that islam orders one to do) and disbeliefe and all that islam has forbidden). And it is trhey who are the successful.” (Surah 3. Al-‘Imran. part 4. ayat 104).

বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ

সমাজ থেকে অন্যায় অবিচার বন্ধ করার জন্য একদল ভাল মানুষ দরকার যারা কোন মানুষের ভয়ে নয়; বরং আল্লাহর ভয় ও ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর বিধান সমাজের সর্বস্তরে কার্যকর করবে। সমাজের অন্যায় কর্মকাণ্ড বন্ধ করার জন্য ইসলাম নিম্নোক্ত বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেঃ

* ফরয ইবাদাত পালন,

* চুরি ডাকাতির শাস্তি,

* যিনা ব্যভিচারের শাস্তি,

* মদ্যপান ও জুয়া,

* সুদ ঘুষ-নিষিদ্ধ,

* অন্যায় হত্যা নিষিদ্ধ,

* ফিতনা ফাসাদ ও সন্ত্রাস নিষিদ্ধ।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, ইসলাম মানব সমাজে ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, মৈত্রী, মানবপ্রেম, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারী, ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজকে আলোকিত করার রূপরেখা পেশ করেছে। পাশাপাশি চুরি ছিনতাই, ডাকাতি, হত্যা, সন্ত্রাস, ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া, সুদ ঘুষ, মজুদদারী, প্রতারণা, অধিকারহরণ, দুর্নীতি ইত্যাদির শাস্তি বিধান করে মানবসমাজ থেকে অন্যায় অবিচার দূর করার দিক নির্দেশনাও পেশ করা হয়েছে। তাই নিশ্চিত করে ইসলাম নির্দেশিত বিধি- বিধান কার্যকর করার মাধ্যমে সমাজ থেকে অন্যায় বন্ধ করা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য

ইসলাম সীমাবদ্ধ অর্থে কোন ধর্মমাত্র নয়, ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। একটি অনন্য জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলাম বিশ্বকে উপহার দিয়েছে একটি দর্শন, একটি সংস্কৃতি, একটি সভ্যতা, একটি সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা, একটি নৈতিক মানদণ্ড, বৈচিত্র্যময় ইতিহাস সমৃদ্ধ একটি জাতি এবং সর্বোপরি, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধনা উজ্জল অসংখ্য মহৎ ব্যক্তিত্ব। সভ্যতার ইতিহাসে ইসলামের স্থান অসাধারণ, কারণ ইতিহাসের প্রথম মানুষই ইসলামের বিবেচনায় প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবী। এই নিরীখে ইসলামের ইতিহাস সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব মুখরিত মানব ইতিহাসের সমার্থক।জীবন ও ইতিহাসের প্রতিটি স্তরেই এবং সৃষ্টির প্রতিটি বিষয়েই ইসলামের অখণ্ড মনোযোগ রয়েছে বলে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিধি বিশাল ব্যাপক। সঙ্গত কারণেই ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান এক সীমাহীন সমুদ্রের সাথে তুলনীয়।

ইসলাম বর্তমান বিশ্বে এক নব জাগরণমুখী শক্তি হিসাবে সকল সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, ফলে ইসলামের চর্চাও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসলাম মানবজাতিকে বিনয়ী, সুশৃঙ্খল ও গতিশীল জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে পৃথিবীর সূচনা থেকেই অনুপ্রাণিত করে আসছে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হলে মানব জাতিকে অবশ্যই ইসলামী আইনের প্রতি অনুগত হতে হবে। মানব রচিত আইন মানবতাকে মুক্তি দিতে পারে না। আর আল্লাহ প্রদত্ত আইনই কেবলমাত্র মানবতার মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে। অত্র প্রবন্ধে ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলঃ

(১) ইসলামী আইন আল্লাহ প্রদত্ত আইন ব্যবস্থা

আল্লাহ তা'আলা প্রথম মানব হযরত আদম ও হাওয়া (আ) কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় বলেনঃ "আমি বললাম, তোমরা সকলেই এই স্থান হতে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ থেকে সঠিক পথনির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না"।[২৩২]

"We said: "Get down all of you from this place (the paradise), then whenever threre comes to you Guidance from Me, and whoever follows My Guidance, there shall be no fear on them, nor shall they grieve." (Surah 2. Al-Baqarah. Part 1. Ayat 38).

একথা সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) থেকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত নবী রাসূলগণের মাধ্যমে যুগে যুগে মানব জাতির জন্য পথনির্দেশ (কিতাব) পাঠিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন

---

[২৩২] আল কুরআন, ২: ৩৮ –*قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم منى هدا فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون*

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। আজ বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেসব আইন কার্যকর রয়েছে, তাঁর কল্যাণকর অংশ ঐ পথনির্দেশেরই অংশ এবং অকল্যাণকর অংশ পথভ্রষ্ট মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত সংযোজন। এ আইনে মানবীয় হস্তক্ষেপের অবকাশ নেই, এ আইনে সবোর্তভাবে আল্লাহ প্রদত্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না অগ্র থেকেও নয়, পশ্চাৎ থেকেও নয়, এতো প্রজ্ঞাময়, প্রসংসার্হ আল্লাহর নিকট থেকে নাযিল হয়েছে"।[২৩৩]

"Falsehood cannot come to it from before it or behind it: (it is) send down by the All-Wise, Worthy of all prise (Allah-Azza-wazalla)." (Surah 41. Fussulat. Part 24. ayat 42).

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ "সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"।[২৩৪]

"And thye Word of Your Lord has been fulfilled in the truth and in justice. None can change His Words. And He is the All-Hear, the All-Knower." (Surah 6. Al-An 'am. Part 8. Ayat 115).

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ "আর যে ব্যক্তি তোমাদের দীনের অনুসরণ করে, তাদের ব্যতীত আর কাউকে বিশ্বাস করোনা। বল, আল্লাহর নির্দেশিত পথই একমাত্র পথ"।[২৩৫]

"And believe no one except the one who follows your religion. Say (O Muhammad sm): "Verily! Right guidance is the Guidance of Allah". (Surah 3. Al-Imran. Part 3. Ayat 73).

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "এ তো মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ"।[২৩৬]

"This (the Qur'an) is a plain statement for mankind, a guidance and instruction to those who are Al-Muttaqun" (the pious - See V.2:2). (Surah 3. Al-Imran. Part 4. Ayat 138).

---

[২৩৩] আল কুরআন, ৪১: ৪২ – لا ياتيه الباطل من بين يديهولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

[২৩৪] আল কুরআন, ৬: ১১৫ – وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السمسع العليم

[২৩৫] আল কুরআন, ৩: ৭৩ – ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله

[২৩৬] আল কুরআন, ৩: ১৩৮ – هذا بيان للناس هدى وموعظة للمتقين

Dhaka University Institutional Repository

"কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতিত অন্যপথ অনুসরণ করে, তবে সে যেদিকে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে আগুনে দগ্ধ করবো। আর তা কত মন্দ আবাস"।[২৩৭]

"And whoever contradicts and opposes the Messenger (Muhammad sm) after the right path has been shown clearly to him, and follows other than the believers' way, We shall keep him in the path he has chosen, and burn him in Hell – what am evil destination!" (Surah 4. An-Nisa'. Part 5. Ayat 115).

"আমি আত্নসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি"।[২৩৮]

"And We sall bring you (O Muhammad sm) as a witness against these. And We have sent down to you the Book (the Qur'an) as an exposition of everything, a guidance, a mercy, and glad things for those who have submitted themselves (to allah as Muslims)." Surah 16. An-Nahl. Part 14. Ayat 89).

"পরে আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসলে যে আমার অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখকষ্ট পাবে না"।[২৩৯]

"Then if there comes to you guidance from Me, then whoever follows My Guidance he shall nrither go astray, nor shsll be distressed." (Surah 20. Ta-Ha. Part 16. Ayat 123).

"আল্লাহর পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে, তা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে?"[২৪০]

"And who is more astray than one who follows his own lusts, without guidance from Allah?" (Surah 28. Al-Qasas. Part 20. Ayat 50).

---

২৩৭ আল কুরআন, 8: ১১৫ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصيله جهنم وساءت مصيرا

২৩৮ আল কুরআন, ১৬: ৮৯ – ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين

২৩৯ আল কুরআন, ২০: ১২৩ –فاما ياتينكم من هدى فمن تبع هداى فلا يضل ولا يشقى

২৪০ আল কুরআন, ২৮: ৫০ – ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله

(২) ইসলামী আইন আল্লাহমুখী আইন

ইসলামী আইন কাঠামো গোটা বিশ্বের যে কোন দেশের, যে কোন পরিবেশের, যে কোন অবস্থার এবং যে কোন কালের সাথে সামঞ্জস্যশীল অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোন জনপদের মানুষের জন্য ইসলামী আইনের অনুসরণ একান্তভাবে সম্ভব। কেননা আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সা) কে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন। তাই তাঁর আনিত বিধানও বিশ্ববাসীর জন্য অনুসরণযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ "বলুন হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল"।[২৪১]

"Say (O Muhammad sm): "O mankind! Verily, I am sent to you all as the Messenger of Allah." (Surah Al-A'raf. Part 9. Ayat 158).

অপর এক আয়াতে আছেঃ "আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্কবাণীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না"।[২৪২]

"And We have not sent you (O Muhammad sm) except as a giver of glad tidings and a warner to all mankind, but most of men know not." (Surah 34. Saba. Part 22. Ayat 28).

হাদীস শরীফে এসেছেঃ "আমি সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি"।[২৪৩] হাদীস শরীফে এসেছেঃ "আমি সাদা কালো সকলের নিকট প্রেরিত হয়েছি"।[২৪৪]

উপরে প্রদত্ত দলিলগুলো এদিকে ইঙ্গিত করে যে, মহানবী (সা) এর নবুয়্যত সাধারণভাবে সবার জন্য, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের জন্য নয়। কারণ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের জন্য হলে আর সমগ্র মানবজাতির জন্য তাঁর প্রেরিত হবার কথা বলা হতো না। আল্লাহর বাণী থেকেও এ ব্যাপকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছেঃ "হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন, যদি না করেন, তবে আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না"।[২৪৫]

---

[২৪১] আল কুরআন, ৭: ১৫৮ - *قل يايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا*

[২৪২] আল কুরআন, ৩৪: ২৮ - *وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون*

[২৪৩] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী,* অধ্যায়: আত তাইয়াম্মুম, অনুচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী: ফালাম তাজিদু মাআন ফা তাইয়াম্মামু সায়ীদান তায়্যিবা..., প্রাগুক্ত, হা. নং- ৩৩৫, পৃ. ২৯

[২৪৪] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায়: আল নাসাজিদ, অনুচ্ছেদ: আল মাসাজিদু ওয়া মাওয়াদিউস সালাহ, প্রাগুক্ত, হা. নং- ১১৬৩, পৃ. ৭৫৯

[২৪৫] আল কুরআন, ৫: ৬৭ - *يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته*

"O Messenger (Muhammad sm)! Proclaim (the Messege) which has been sent down to you from your Lord. And if you do not, then you have not conveyed His messege." (Surah 5. Al-Maida. Part 6. Ayat 67).

এই আয়াতটি ইঙ্গিত করে যে মহানবী (সা) এর উপর নাযিলকৃত সমগ্র শারী'আত সকল মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া ওয়াজিব ছিল। উপরে বর্ণিত আয়াত ও হাদীস এ কথাই প্রমাণ করে যে, মহানবী (সা) এর আগমন সমগ্র মানব জাতির জন্য এবং দাওয়াতও সমগ্র মানব জাতির জন্য।

আল্লাহর আইনসমূহ যেহেতু মানবজাতির কল্যাণে রচিত হয়েছে, কাজেই কল্যাণের চাহিদার দিক থেকে সকল মানুষ সমান। কারণ মানব জাতির প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যে অভিন্নতা রয়েছে, সে অনুযায়ী সেগুলো তৈরী করা হয়েছে। সেগুলো যদি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তৈরী করা হতো, তাহলে সাধারণভাবে তা মানবকল্যাণের নিমিত্তে ব্যবহৃত হতো না। মহানবী (সা) যদি কোন বিষয়কে বিশিষ্টতা দিয়ে থাকেন, তাহলে তারই ভিত্তিতে কোন বিষয়কে বিশিষ্ট করা ব্যতীত আর কোন কিছুই এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না অথবা তাঁর কোন সাহাবাকে যদি কোন বিষয়ে বিশিষ্টতা দান করা হয়ে থাকে, যেমন খুযায়মা (রা) এর সাক্ষী এবং আবূ বুরদার যবেহকৃত বকরীর অঙ্গসমূহ। ইমামুল হারামাইন (রহ) বলেন, "বিশেষ বিধান সাধারণ বিধানের সাথে সম্পর্কিত। এগুলো বিপুলের মধ্যে সামান্য। তারপর প্রত্যেক প্রকার মানুষের মধ্যে বিশিষ্টতার ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে মহিলারা পুরুষের বিধান থেকে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে, মুসাফিররা মুকীমদের বিধান থেকে বিশেষত্ব লাভ করেছে। কাজেই যিনি সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য প্রেরিত হয়েছেন, তাঁর আনিত বিধানাবলী সার্বজনীন হবে এটাই স্বাভাবিক।

(৩) ইসলামী আইন মানবপ্রকৃতির সাথে সংগতিশীল আইন

ইসলামী আইনে অসঙ্গতি ও সামঞ্জস্যহীনতা বলতে কিছু নাই, এর গোটা ব্যবস্থাপনাই মানবজাতির জন্য কল্যাণকর ও সঙ্গতিপূর্ণ। উক্ত আইন ব্যবস্থা মানব সমাজের দীর্ঘকালের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে পরীক্ষিত। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের পরও উমাইয়া যুগ, উসমানী ও মোগল শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে এ আইন দ্বারা শত শত বছর ধরে। এমনকি মোগল আমলের পূর্বেও ইউরোপ মহাদেশের স্পেনীয় জনগণ দীর্ঘ আটশত বছর ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত হয়েছে। আরো জোর দিয়ে বলা যায়, উপমহাদেশে বৃটিশ আইন কাঠামো গড়ে তোলার ভিত্তি ছিল ইসলামী আইন, যদিও বাস্তবে তা স্বীকার করা হয় না।

ইসলামী আইনে পবিত্রতার ভাবধারা বিদ্যমান। এই আইনের অনুসারী কোন কারণে দৈহিকভাবে অপবিত্র হলে তার অপবিত্রতার মাত্রা অনুযাইয়ী তাকে বিভিন্ন পন্থায় পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। যেমন, নামায পড়ার জন্য

অযূ করতে হয় এবং স্বামী স্ত্রীর মিলনের পর গোসল করতে হয় ইত্যাদি। মোট কথা হচ্ছে ইসলামী আইনের আরো বহু বৈশিষ্ট্য আছে। মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি, মানবজাতির উন্নতি, অগ্রগতি ও আখিরাতের মুক্তি নির্ভর করছে ইসলামী আইন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের উপর। ইসলামী আইনের বিধানসমূহ একাধিক ভাগে বিভক্ত। একধরনের আইনে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন বা সংকোচন নেই, এগুলো স্থির ও দৃঢ়বদ্ধ। স্থান কালের পরিবর্তন তার মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটায় না। আরেক ধরনের বিধান আছে যেগুলো স্থান, কাল, অবস্থা, পরিস্থিতি, পরিবেশের প্রভাবাধীন। প্রচলন ও অভ্যাসের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানব জাতির কল্যাণের প্রেক্ষিতে শারী'আতের মূলনীতি ও মৌলিক বিধানকে অটুট রেখে তার মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়। ইমাম ইবন কায়্যিম (রহ) বলেন, শারী'আতের বিধান দুই প্রকারেরঃ এক প্রকারের বিধান সবসময় একই অবস্থায় থাকে। স্থান ও কালের পরিবর্তনে তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে না, ইমামগণের ইজতিহাদও তার মধ্যে পরিবর্তন সাধনে ক্ষমতা রাখে না। যেমনঃ ফরয, ওয়াজিব, হারাম,শারী'আত নির্ধারিত অপরাধের দণ্ডবিধি এবং এ ধরণের আরো বিভিন্ন বিষয়। দ্বিতীয় ধরনের বিধান স্থান, কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে মানবজাতির কল্যাণের স্বার্থে পরিবর্তিত হয়। যেমন অনুমান ভিত্তিক পরিমাপ ও তার গুণাবলী। এই বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ইসলামী শারী'আত প্রত্যেকটি নতুন ঘটনাকে এবং প্রত্যেকটি ঘটনা যার প্রচলনেও সত্যনিষ্ঠদের রীতি রেওয়াজে পরিবর্তন সূচিত করে, তাকে শারী'আতের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই শারী'আতকে কেউ স্থবির বা ত্রুটিপূর্ণ বলতে পারবে না, তবে আল্লাহ যাদের চোখ ও দৃষ্টিকে মূর্খতার অন্ধকারে বা বক্রতায় আচ্ছন্ন রেখেছেন, একমাত্র তারাই এ ধারণা পোষণ করতে পারে।

(৩) ক. সহজতা প্রতিষ্ঠা ও কঠোরতার বিলোপ সাধন

মানুষ যাতে ইসলামী আইন অত্যন্ত সহজে পালন করতে পারে, আল্লাহ তা'আলা সেভাবেই তা প্রণয়ন করেছেন। তদুপরি পালন করতে গিয়ে কেউ কোন যৌক্তিক সমস্যার সম্মুখীন হলে তার উপর থেকে হুকুমের ভার হালকা ও সহজ করে দেয়া হয়। আল্লাহ বলেনঃ "আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না"।[২৪৬]

"Allah intends for you ease, and He dose not want to make things difficult for you." (Surah 2. Al-Baqarah. Part 2. Ayat 185).

---

২৪৬ আল কুরআন, ২: ১৮৫ - يريد الله بكم اليسر ولا يرد بكم العسر

Dhaka University Institutional Repository

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ “আল্লাহ দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি”।[২৪৭]

“And has not laid upon you in religion any hardship.” (Surah 23. AL-Hajj. Part 18. Ayat 78).

অপর এক আয়াতে উল্লেখ আছেঃ “আল্লাহ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত”।[২৪৮]

“Allah burdens not a person beyond his scop. (Surah Al-Baqarah.” Part 3. Ayat 286).

(৩) খ. উদারতা

ইসলামী আইন উদার। ফলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নির্বিশেষে সকলের জন্য এ আইন নিরাপত্তা বিধান করে। আল্লাহ বলেনঃ “হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা; কিন্তু তোমাদের পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসায় করা বৈধ; এবং একে অপরকে হত্যা করোনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু”।[২৪৯]

“O you who believe! Eat not up your property among yourselves unjustly except it be a trade amongst you, by mutual consent. And do not kill one another). Surely, Allah is Most Merciful to you.” (Surah 4. An-Nisa’. Part 5. Ayat 29).

কুরআনের উপরোক্ত নির্দেশ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য। মহানবী (সা) বলেনঃ “আমাকে উদারতা সম্পন্ন দীন সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে”।[২৫০]

---

[২৪৭] আল কুরআন, ২২: ৭৮ - *وما جعل عليكم فى الدين م حرج*

[২৪৮] আল কুরআন, ২: ২৮৬ - *لا يكلف الله نفسا الا وسعها*

[২৪৯] *আল কুরআন, ৪: ২৯* *يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله*

كان بكم رحيما -

[২৫০] ইমাম আহমাদ, *মুসনাদ,* হা. নং- ২৩৭১০ ও ২৪৭৭১

(৪) ইসলামী আইন বাস্তবসম্মত আইন ব্যবস্থা

ইসলামী আইন নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ। মানবজীবনের সাথে একান্তভাবে ঘনিষ্ঠ ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত এমন সকল বিষয়ই ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ " আমরা কিতাবে (আল কুরআনে) কোন কিছুই বাদ রাখিনি"।[২৫১]

"We have neglected nothing in the Book." (Surah 6. Al-An'am. Part 7. Ayat 38).

মানুষের সকল সমস্যার সমাধান কুরআন মাজীদে নিহিত রয়েছে। তবে প্রয়োজনে ইসলাম ইজতিহাদেরও সুযোগ রেখেছে। কাজেই ইসলামী আইন স্থবির কিংবা সেকেলে নয়, বরং একান্তভাবে যুগোপযোগী।

(৪) ক. ইসলামী আইন বাস্তবসম্মত

মানবজাতির কল্যাণসাধন ও উত্তরণের লক্ষ্যেই মূলতঃ ইসলামী আইন প্রণীত হয়েছে। মানবজাতিকে কষ্টে কিংবা বিপদে ফেলার জন্য ইসলামী আইন প্রণীত হয়নি। এ আইন মানব প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। এটাই সরল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না"।[২৫২]

"So set you (O Muhammad sm) your face towards the religion (of pure Islamic Monotheism) Hanif (worship none but Allah Alone). Allah's Fitrah (i.e. Allah's Islamic Monotheism) with which he has created mankind. No change let there be in Khalq-illah (i.e.the religion of Allah–Islamic Monotheism): that is the straight religion, but most of men know not." [Tafsir At-Tabari] (Surah 30. Ar-Rum. Part 21. Ayat 30).

মহানবী (সা) বলেছেনঃ "প্রত্যেক মানব সন্তান সহজাত স্বভাব (ইসলাম) নিয়েই জন্মগ্রহণ করে"।[২৫৩] উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী আইন মানব কল্যাণমুখী আইন এবং প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, কোন অবস্থায় অসঙ্গতিপূর্ণ নয়।

---

২৫১ আল কুরআন, ৬: ৩৮ – *ما فرطنا فی الکتاب من شيء*

২৫২ আল কুরআন, ৩০: ৩০ *فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذالك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون* –

২৫৩ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী,* বাব মা কীলা ফী আওলাদিল মুশরিকীন, হা. নং- ১২৯৬ – *كل مولو يولد على الفطرة*

(৪) খ. ইসলামী আইন মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী আইন ব্যবস্থা

ইসলামী আইন মধ্যপন্থা অবলম্বনের দিকটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে বাড়াবাড়ির অস্তিত্ব নেই। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছেঃ "আল্লাহ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত। সে ভালো যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই এবং মন্দ যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমদেরকে ক্ষমা কর, তুমিই আমদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমদেরকে জয়যুক্ত কর"।[২৫৪]

"Allah burdens not a person beyond his scop. He gets rewards for that (good) which he has earned, and he is punished for that (evil) which he has earned. Our Lord! Punish us not if we forget or fall into error, our Lord! Lay not on us a burden like that which you did lay on those before us (Jews and Christians); our Lord! Put not on us a burden greater than we have strength to bear. Pardon us and grant us Forgiveness. Have mercy on us. You are our Maula (Patron, Supporter and protector, etc.) and give us victory over the disbelieving people." (Surah 3. Al-Imran. Part 3. Ayat 286).

অপর এক আয়াতে আছেঃ "এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতি রুপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে"।[২৫৫]

"Thus We have made you [true Muslims–real believers of Islamic Monotheism, true followers of Prophet Mohammad sm and his Sunnah (Legal ways)], a just (and the best) nation, that you be witnesses over mankind and the messenger (Muhammad sm) be a witness over you." (Surah 2. Al-Baqarah. Part 2. Ayt 143).

উপরোক্ত আয়াত দু'টো মুসলিমগণকে মধ্যপন্থী উম্মত বলা হয়েছে। কাজেই কুরআন এবং হাদিসে মধ্যপন্থী উম্মতের উপযোগী আইনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

---

২৫৪ আল কুরআন, ২: ২৮৬ لا يكلف الله نفسا الا وسعهالهاما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولنا فانصرنا على القوم الكافرين

২৫৫ আল কুরআন, ২: ১৪৩ – وكذالك جعلنكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

(৫) ইসলামী আইন ইজতিহাদের উপযোগী আইন ব্যবস্থা

ইসলামী আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো গতিশীলতা। স্থান কালের ব্যবধান এ গতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারে না। সমস্যা যতই কঠিন ও সর্বাধুনিক হোক, যতই ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হোক, সর্বক্ষেত্রেই ইসলামী আইনের একটি ব্যাপক ও সুস্পষ্ট মূলনীতি বিদ্যমান আছে, যার ভিত্তিতে মুজতাহিদগণ উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম। এখানেই রয়েছে ইসলামী আইন প্রণয়নে মানববুদ্ধি প্রয়োগের বিরাট সুযোগ। কুরআন মাজীদের পাশাপাশি আইন প্রণয়নে মানববুদ্ধির চর্চা সরাসরি মহানবী (সা) কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত। তিনি তাঁর প্রিয় সাহাবী মু'আয ইবন জাবাল (রা) কে ইয়ামানের শাসক বা বিচারক নিয়োগ করে তাকে বিদায় দেয়ার সময় বলেনঃ "তুমি কিসের ভিত্তিতে মীমাংসা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী। তিনি বললেন, তাতেও যদি সমাধান না পাও? তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী। তিনি বললেন, তাতেও যদি সমাধান না পাও? তিনি বললেন, তাহলে আমি আমার বুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত খুঁজে বের করব। তখন তিনি মু'আয (রা) কে বুকে টোকা দিয়ে বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধিকে তাঁর মনঃপুত সিদ্ধান্তে পৌঁছার তাওফিক দিয়েছে"।[২৫৬] এভাবে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মূলনীতির অধীনে বিশেষজ্ঞ মুজতাহিদগণ তাদের গবেষণার মাধ্যমে ইসলামী আইনকে সচল, গতিশীল ও সক্রিয় রাখেন।

(৬) ইসলামী আইন যুগোপযোগীকরণের উপযোগী আইন ব্যবস্থা

ইসলামী আইন যুগোপযোগী। কালের আবর্তনে উদ্ভূত সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক জ্ঞান গবেষণার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এতে রয়েছে। সুতরাং যাবতীয় নতুন অবস্থার সাথে তা খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এর কার্যকারিতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। মহানবী (সা) বলেছেনঃ "হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে গেলাম তোমরা তা ধারণ বা অনুসরণ করলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব (আল কুরআন) এবং আমার ইতরাত অর্থাৎ আহলে বায়াত"।[২৫৭]

মোটকথা, ইসলামী আইন অগণিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ আইনের সাহায্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নির্বিশেষে সকলের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব। পক্ষান্তরে মানব রচিত আইন একদিকে যেমন ত্রুটিপূর্ণ,

---

২৫৬ ইমাম আবূ দাউদ, *সুনানে আবূ দাউদ,* অধ্যায়: আল কা'যা, অনুচ্ছেদ: ইজতিহাদির রায় ফিল কা'যা, প্রাগুক্ত, হা. নং- ৩৫৯, পৃ. ১৪৮৯
قال كيف تقضى اذا عرض لك قضاء قل اقضى بكتاب الله قال فان لم تجد فى كتاب الله قال فبسنة رسول الله ص قال فان لم تجد فى سنة رسول الله ص ولا فى كتاب الله قال اجتهد راي ولا الو فضرب رسول الله ص صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله –

২৫৭ ইমাম তিরমিযী, *সুনান,* অধ্যায়: আল মানাকিব, অনুচ্ছেদ: ফী মানাকিবি আহলি বাইতিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, (আল কুতুবুস সিত্তা, রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০), হা. নং- ৩৭৮৬, পৃ. ২০৪১

অপরদিকে তা অহরহ পরিবর্তনশীল। কাজেই ইসলামের আহবান যেহেতু সার্বজনীন (কুরআন বিশ্বমানের পথনির্দেশ), তাই মানবজাতি যদি ইসলামী আইনের দিকে ফিরে আসে, তাহলে বিশ্বমানবতা ইহলৌকিক জীবনে লাভ করবে কাঙ্ক্ষিত শান্তি এবং পরকালে লাভ করবে মহামুক্তি।

(৬) ক. ইসলামী আইনে পরিবর্তনশীলতার সুযোগ

ইসলামী আইনের এমন একটি অধ্যায়ও আছে যা স্থান, কাল, পাত্র ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনযোগ্য। ইসলামী আইনের আদি ও মৌল উৎসদ্বয় যথাক্রমে কুরআন ও সুন্নাহ এর পর এতদু'ভয়ের উপর নির্ভরশীল আইনের অপরাপর উৎস, যেমন ইজমা', কিয়াস, ইসতিহসান, ইসতিদলাল, মাসালিহে মুরসালা ইত্যাদির আলোকে যেসব আইন প্রণীত হয়, সেগুলোর কোন অংশ স্থান, কাল, পরিস্থিতি ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাষ্ট্র জনগণের নিকট থেকে যাকাত ও উশর আদায় করার পরও রাষ্ট্রীয় সংগঠন পরিচালনা, জরুরী অবস্থা মোকাবিলা, প্রতীরক্ষা ও সামরিক অভিযানের ব্যয় বহন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তাদের উপর বিভিন্ন কর আরোপ করতে পারে এবং সরকার প্রয়োজন মনে না করলে, যে কোন সময় উক্ত রূপ কর মওকুফ করতে পারে। অনুরূপভাবে তা'যীরের আওতাভুক্ত কোন অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারক তার সুবিবেচনা মোতাবিক গুরুদণ্ডের পরিবর্তে লঘুদণ্ড অথবা লঘুদণ্ডের পরিবর্তে গুরুদণ্ড অনুমোদন করতে পারেন, একই অপরাধের জন্য বিভিন্ন অপরাধীকে অভিন্ন শাস্তি না দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তিও দিতে পারেন। ইসলামী আইনের এই অধ্যায়ে মানব বুদ্ধি প্রয়োগে আইন প্রণয়নের যথেষ্ট সুযোগ ও বিস্তৃত পরিধি রয়েছে এবং সরাসরি কুরআন মাজীদ তা অনুমোদন করেছে। অবশ্য এ কাজ কোন ইসলামী আইনে উচ্চতর প্রজ্ঞার অধিকারী বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই সম্পন্ন হতে হবে।

(৬) খ. ইসলামী আইনে নমনীয়তার সুযোগ

ইসলামী আইন চিরন্তন ও স্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এতে নমনীয়তারও সুযোগ রাখা হয়েছে, যাতে উদ্ভূত নতুন সমস্যার সমাধানে মানবজীবন অচল ও স্থবির হয়ে না পরে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে কোন প্রকারেই আল্লাহর সাথে শরীক করা ইসলামী আইনে চিরন্তনভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু কোন মু'মিন ব্যক্তি পৌত্তলিক বা নাস্তিকদের চরম নির্যাতনের শিকার হয়ে যদি মৃত্যুর আশংকা করে, সেই অবস্থায় সে তার ঈমান গোপন রেখে পৌত্তলিক বা নাস্তিকের উক্তি উচ্চারণ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর

Dhaka University Institutional Repository

জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয় যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় অথচ তার অন্তর ঈমানে অবিচলিত"।[২৫৮]

"Whoever disbelieved in Allah after his belief, except him who is forced thereto and whose heart is at rest with Faith; but such as open their breasts to disbelief, on them is warth from Allah, and theirs will be a great torment." (Surah 16. An-Nahl. Part 14. Ayat 106).

অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদে মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের মাংস হারাম ঘোষণা করা হয়েছেঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহর মৃত জন্তু ও শূকরের মাংস এবং যার উপর আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা তোমাদের জন্য হারাম হয়েছে"।[২৫৯]

"He has forbidden you only the Maitah (dead animals), and blood, and the flesh of swine, and that which is slaughtered as a sacrifice for others than Allah (or has been slaughtered for idols, on which Allah's name has not been mentioned while slaughtering)." (Surah 2. Al-Baqarah. Part 2. Ayat 273).

কিন্তু নিরুপায় অবস্থার ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশের পরপরই বলা হয়েছেঃ "কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় অথচ নাফরমান বা সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল দয়ালু"।[২৬০] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ "রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস (রমযান) পাবে তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে"।[২৬১]

"The month of Rahman in which was revealed the Qur'an, a guidance for mankind and clear proofs for the guidance and the criterion (between right and wrong). So whoever of you sights (the crescent on the first night of) the month (of Ramadan i.e. is present at

---

[২৫৮] আল কুরআন, ১৬:১০৬ من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم -

[২৫৯] আল কুরআন, ২:১৭৩ - انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله

[২৬০] আল কুরআন, ২:৭৩ - فمن الضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم

[২৬১] আল কুরান,২:১৮৫ - شهر رمضان الذى انزل فيه القران هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه

his home, he must observe saum (fasts) that month.” (Surah 2. Al-Baqarah. Part 2. Ayat 185).

এ লঙ্ঘনীয় ও অপরিবর্তনীয় বিধান দেয়ার পাশাপাশি বলা হয়েছেঃ “তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে দিতে হবে। আল্লহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমদের জন্য ক্লেশকর তা চান না, এ জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার”।[২৬২]

“And whoever is ill or on a journey, the same number [of days which one did not observe Saum (fasts) must be made up] form other days. Allah intends for you ease, and He dose not want to make things difficult for you (He wants that you) must complete the same number (of days), and that you must magnify Allah [i.e. to say Takbir (Allahu Akbar; Allah is the Most Great] for having guided you so that you may be greatful to Him.” (Surah 2. Al-Baqarah. Part 2. Ayat 185).

অপর এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছেঃ “তুমি ক্লেশ পাবে এজন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করিনি”।[২৬৩]

“We have not sent down the Qur’an unto you (O Muhammad sm) to cause you distress.” (Surah 20 Ta-Ha. Part 16. Ayat 2).

ইসলামী শারী‘আত এমন যে, এর অনেক বিধান অলঙ্ঘনীয় আছে কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাতে নমনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। যেমন সফরের কারণে শারী‘আতের বিধানে নমনীয়তা প্রদর্শন করা হয়েছে।

---

২৬২ আল কুরআন, ২:১৮৫ *ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون* –

২৬৩ আল কুরআন, ২০: ২ – *ما انزلنا عليك القران لتشقى*

Dhaka University Institutional Repository

শার'ঈ সফর

হাজ্জ কিংবা জিহাদের সফর। মুসাফির এই সফরে বের হবার সময় থেকে শারী'আত তাকে যেসব সুবিধা দেয়, তা হচ্ছেঃ চার রাকা'আত নামাযের স্থলে দু'রাকা'আত নামায পড়ার অনুমতি, সূন্নাতের মধ্যে বাধ্যবাধকতা না থাকা, রমযানের রোযা পরবর্তী কোন সময় রাখার অনুমতি, চামড়ার মোজার উপর তিনদিন পর্যন্ত মাসেহ করার অনুমতি ইত্যাদি।

জাগতিক ব্যাপারে সফর

এ সফর ৪৮ মাইল দূরত্বের শর্তে বাধা নয়, প্রতিদিনের কারবারের জন্য মানুষ স্বদেশ ও নিজ এলাকা থেকে খানিকটা দূরে চলে যায় আবার তাড়াতাড়ি চলে আসে। এ সফরে জুম'আর নামায, দুই ঈদের নামায ও জামা'আতে নামায বাদ দিতে বাধ্য হলে তার অনুমতি রয়েছে। এছাড়াও পানি এক মাইল দূরে থাকলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করা, পশুর পিঠে সাওয়ার থাকা অবস্থায় নফল নামায পড়া এবং কিবলার চিন্তা না করে যেদিকে চলেছে সেদিকে মুখ করে নফল নামায আদায় করা ইত্যাদির অনুমতি রয়েছে।

রুগ্ন অবস্থায় নমনীয়তার মাঝে রয়েছে, অযূ ও গোসল করলে রোগ বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করা; অসুস্থ অবস্থায় বসে, শুয়ে বা ইশারায় যেমন করে সুবিধা নামায আদায় করে নেয়ার অনুমতি, ই'তিকাফ অসম্পূর্ণ রেখে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসা; হাজ্জের জন্য প্রতিনিধি পাঠিয়ে বদলী হাজ্জ করানো, অপবিত্র বস্তু যেমন শরাব ইত্যাদির সাহায্যে চিকিৎসা করানো, কণ্ঠনালীতে কোন বস্তু আটকে গেলে হারাম হালাল যে কোন পানীয়ের সাহায্যে গলা পরিষ্কার করা এবং ডাক্তার ও ধাত্রীকে একান্ত প্রয়োজনে গোপন অঙ্গ দেখতে দেয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে শারী'আত নমনীয়তা প্রদর্শন করেছে।[২৬৪] বান্দার বিস্মৃতির ক্ষেত্রেও শারী'আত নমনীয়তা প্রদর্শন করেছে। কেননা কুরআন মাজীদে আছেঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তবে তুমি আমাদের পাকড়াও করোনা"।[২৬৫]

"Our Lord! Punish us not if we forget or faill into error." (Surah 3. Al- Imran. Part 3. Ayat 286).

ইসলামী আইনবিদগণের মতে, ভুলে যাওয়ার বিষয়টি মানবপ্রকৃতির অক্ষমতা হলেও শারী'আতের দৃষ্টিতে ভুলের পরিণামে কারো ক্ষতি হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যক্তি ফরয কিংবা ওয়াজিব নামায আদায় করতে ভুলে গেলে অথবা রমযানের রোযা রাখতে ভুলে গেলে,

---

২৬৪ মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬- ৩৮

২৬৫ আল কুরআন, ২: ২৮৬ - *ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطئنا*

Dhaka University Institutional Repository

এমতাবস্থায় কাযা ওয়াজিব হবে। শারী'আতের নমনীয়তা হচ্ছে এই, কাযা করে নিলে গুনাহ হবে না। বিস্মৃতির কারণে কেউ কোন নিষিদ্ধ কাজ করে ফেললে, যেমন কারো সম্পদ নষ্ট করলে তার প্রতিবিধান এতটুকু যে, সে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। কোন ব্যক্তি রোযা পালনরত অবস্থায় ভুলে কিছু পানাহার করে ফেললে রোযা বাতিল হয়ে যাবে না। যদি স্বেচ্ছায় দীনের অবশিষ্ট সময়ে পানাহার না করে রোযা ভঙ্গের অন্য কারণ না ঘটে। অনুরূপভাবে হালাল প্রাণী যবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে গেলে যবেহকৃত প্রাণীর গোশত আহার করা হারাম হয়ে যাবে না। প্রাণী বধের আতংক বা তৎপ্রতি প্রবৃত্তিগত অনীহাও এমন ভুলের কারণ হতে পারে। এমতাবস্থায় ইসলামী আইন ব্যক্তির প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করেছে।

(৬) গ. ইসলামী আইন বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক

ইসলামী আইনের একটি অংশ সকল মুসলিমের মান্য করা বাধ্যতামূলক এবং অপর একটি অংশ মান্য করা তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যেমন কুরআন ও সুন্নায় যে সব বিষয়ের হালাল বা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি বা কোন জিনিস হারাম হওয়ার জন্য ইসলামী আইনের যে সব মূলনীতি রয়েছে তার আওতায়ও সেগুলো পড়ে না, এ অবস্থায় মুসলিমগণ ইচ্ছা করলে গ্রহণও করতে পারে অথবা বর্জনও করতে পারে। নফল 'ইবাদত ও নফল কার্যক্রমও এই ঐচ্ছিক বিধানের আওতাভুক্ত। অন্যদিকে ফরয ও হারাম কার্যসমূহ বাধ্যতামূলক অংশের অন্তর্ভুক্ত।

(৬) ঘ. ইসলামী আইনে সমঝোতার ব্যবস্থা

বিবাদমান বিষয় আদালতে পেশ করার পূর্বে পক্ষবৃন্দের সমঝোতার ভিত্তিতে তার মীমাংসা করার সুযোগ প্রদান ইসলামী আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাদমান বিষয় আদালতে পেশ করার পরও বিচারকের সহায়তায় বা মধ্যস্থতায় পক্ষবৃন্দ সমঝোতার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। কুরআন মাজীদে আছেঃ "কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় করা বিধেয়। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালঙ্ঘন করে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে"।[২৬৬]

"But if the killer is forgiven by the brother (or the relatives, etc.) of the killed against blood-money, then adhering to it with fairness and payment of the blood-money to the heir should be made in fairness. This is an alleviation and a mercy from your Lord. So after this whoever transgresses the limits (i.e. kills the killer after taking the blood-money), he shall have a painful torment." (Surah 2. Al-Baqarah. Part 2. Ayat 178).

---

[২৬৬] আল কুরআন, ২: ১৭৮ فمن عفى له من اخيه شىء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذالك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذالك فله عذاب اليم –

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে বলা হয়েছেঃ "তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করলে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার থেকে একজন এবং এর (স্ত্রীর) পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত কর। তারা উভয়ে নিস্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন"।[২৬৭]

"If you fear a breach between them tawin (the man and his wife), appoint (two) arbitrators, one from his family and the other from her's; if they both wish for peach, Allah is Ever All-knower, Well-Acquainted with all things." (Surah 4. An-Nisa' Part 5. Ayat 35).

এই সমঝোতার সুযোগ বিশেষভাবে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত।

(৭) ইসলামী আইন অবিভাজ্য

ইসলামী আইন মানব জীবনের যাবতিয় আচরণকে নিজের আওতাভুক্ত করেছে। এখানে পার্থিব ও পারলৌকিক, 'ইবাদাত বন্দেগী, ব্যক্তিগত আচরণ, আকীদা বিশ্বাস, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয় ইসলামী আইনের আওতাভুক্ত। সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত আইনসমূহ যেমন ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্ত, তদ্রূপ নামায, রোযা, যাকাত, হাজ্জ ইত্যাদি ধর্ম সংক্রান্ত বিধি- বিধানও ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্ত। এই আইনের আওতায় মানুষের ধর্মীয় জীবন ও একান্তভাবে পার্থিব কাজকর্ম সংশ্লিষ্ট জীবন অখণ্ড ও অবিভাজ্য অর্থাৎ মানুষের গোটা জীবনই তার ধর্মীয় জীবন। এ আইনের মাধ্যমে দল, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত ও পরিচালিত হয় এবং ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে ইসলাম মসজিদ থেকে রাষ্ট্রীয় ভবন এবং ইবাদত থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নিজের গণ্ডিভুক্ত তাদের মাঝে সমতা বিধান করে এবং দীন ও দুনিয়ার পারস্পরিক পার্থক্য দূর করে দেয়। যে কোন বিচারেই ধরা হোক, প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আইন সমূহ ইহা পারলৌকিক জীবনে একমাত্র মানব কল্যাণেই রচিত। এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্টতই অনুধাবন করা যায় যে, প্রতিটি পার্থিব কার্যক্রমেরই একটি পারলৌকিক দিক রয়েছে। চাই তা কোন 'ইবাদত সংক্রান্ত কার্যক্রম হোক বা সামাজিক প্রাকৃতিক হোক, কি শাসনতান্ত্রিক অথবা রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন, কারো অধিকার আদায় করা বা না করা অথবা তা কাউকে শাস্তি দান বিষয়ক হোক, দুনিয়ার জীবনে তার উপর পড়ে। আবার এ কাজগুলোর প্রভাব পারলৌকিক জীবনের উপরেও পড়ে। একে আখিরাতের পুরস্কার বা শাস্তি বলা হয়। ইসলামী আইনের লক্ষ্যই যেহেতু মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, তাই এক্ষেত্রে এ উদ্দেশ্যকে বিভক্ত করা যায় না। কাজেই এর কিছু অংশ গ্রহণ করা এবং কিছু অংশ বর্জন করা এর মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

---

[২৬৭] আল কুরআন, ৪:৩৫ وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا -

কুরআন মাজীদের জীবন বিধান সংক্রান্ত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সেগুলোর বিরোধিতাকারীদের জন্য দু'ধরনের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি শাস্তি হচ্ছে পার্থিব এবং অপরটি পারলৌকিক। যেমন হত্যা ও দস্যুতার শাস্তি ঘোষিত করা হয়েছে প্রাণদণ্ড বা হাত পা কাটা অথবা বা শূলে চড়ানো বা দেশান্তর করা, এগুলো হচ্ছে তার পার্থিব শাস্তি। অন্যদিকে তার পারলৌকিক শাস্তি হিসাবে আখিরাতে কঠিন শাস্তির কথাও বলা হয়েছে। যেমন, কুরআনে মাজীদে উল্লেখ আছেঃ "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্নক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এ হচ্ছে তাদের লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি"।[২৬৮]

"The recompense of those who wage war against Allah and His Messenger and do mischief in the land is only that they shall be killed or crucified or their hands and their feet be cut off from opposite sides, or be exiled from the land. That is their disgrace in this world, and a great torment is theirs in the Heareafter." (Surah 5. Al-Maidah. Part 6. Ayat 33).

অনুরূপভাবে নির্লজ্জতা অশালীনতা বিরোধী কার্যকলাপের প্রচার ও সতী সাধ্বী নারীর চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ লেপনের পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় শাস্তির কথাই কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না"।[২৬৯]

"Verily, those who like that (the crime of) illegal sexual intercourse should be propagated among those who believe, they will have a painful torment in this world and in the Heareafter. And Allah knows and you know not." (Surah 24. An-Nur. Part 18. Ayat 19).

অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ "যারা সাধ্বী, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের জিহবা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে, সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানতে পারবে আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক"।[২৭০]

---

[২৬৮] আল কুরআন, ৫: ৩৩ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم او ينفوا من الارض ذالك لهم خزئ فى الدنيا ولهم فى الاخرة عذاب عظيمم-

[২৬৯] আল কুরআন, ২৪: ১৯ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين امنوا لهم عذاب اليم فى الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون -

[২৭০] আল কুরআন, ২৪: ২৩-২৫ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم- يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون- يمئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين -

"Verily, those who accuse chaste women, who never even think of anything touching their chastity and are good believers – are cursed in this life and in the Hereafter, and for them will be a great torment.
On the day when their tongues, their hands, and their legs (for feet) will bear witness against them as to what they used to do.
On that day Allah will pay them the recompense of their deeds in full, and they will know that Allah, He is the Manifest truth." (Surah 24. An-Nur. Part 18. Ayat 23-25).

সজ্ঞানে হত্যা করারও দ্বিবিধ শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। দুনিয়ায় কিসাস জারি হবে এবং আখিরাতে দেয়া হবে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ বলেনঃ "হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী"।[২৭১]
"O you believe! Al-Qisas (the Law of Equality in punishment) is prescribed for you in case of murder: the free for the free, the slave for the slsve, and female for the female." (Surah 2. Al-Baqarah. Part 2 Ayat 178).
অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন"।[২৭২]
"And whoever kills a believer intentionally, his recompense is Hell to abide therein; and the Warth and the curse of Allah are upon him, and a great punishment is prepared for him." (Surah 4. An-Nisa'. Part 5. Ayat 93).

দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য ইসলামী শারী'আতের এ বিধান অর্থহীনভাবে প্রণীত হয়নি। শারী'আতই এ চাহিদা ও আবেদন সৃষ্টি করেছে। শারী'আতের নীতি যে মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হচ্ছেঃ এ দুনিয়া পরীক্ষাগৃহ এবং একদিন এখানকার সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটবে। আর আখিরাত যা অনন্ত জীবন, সেখানে সকলের কাজের প্রতিদান দেয়া হবে। ইসলামী আইন মানুষের রচিত আইন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কারণ ইসলামী আইন দীন ও দুনিয়ার পার্থক্য বিলুপ্ত করে উভয়কে এক করে দিয়েছে এবং তা রচিত হয়েছে দীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্য। কাজেই এই বিষয়টি শারী'আত বিশ্বাসীদেরকে প্রকাশ্য ও গোপনে সর্বাবস্থায় এর আনুগত্য করতে বাধ্য করে।
ইসলামী আইন অবিভাজ্য। বিভেদ ও তারতম্যকে স্বীকৃতিদান তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বিভেদ ও তারতম্য শারী'আতের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। কেবল এ কারণে একথা সত্য নয়, বরং এর সততার মূল কারণ হচ্ছে,

[২৭১] আল কুরআন, ২: ১৭৮ – *يايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالحبد والانثى بالانثى*

[২৭২] আল কুরআন, 8: ৯৩ – *ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعدله عذابا عظيما*

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনের আয়াতে কুরআনিক বিধানের একাংশকে কার্যকর করা ও একাংশ বর্জন করার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। এ সঙ্গে একাংশের উপর বিশ্বাস ও অন্য অংশকে অস্বীকার করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বিচার করলে বলা যায়, শারী'আতের সমস্ত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা এবং তার সমস্ত বিধানকে কার্যকর করার ন্যায় একই পর্যায়ের ওয়াজিব ও অপরিহার্য। কাজেই যে ব্যক্তি শারী'আতের সমগ্র বিষয়ের প্রতি ঈমান আনবে না এবং সমগ্র শারী'আতকে কার্যকর করবে না, সে আল্লাহর নিম্নবর্ণিত আয়াতের আওতাধীনে এসে যাবেঃ

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামাতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন"।[২৭৩]

"Then do you believe in a part of the Scripture and reject the rest? Then what is the recompense of those who do so among you, except disgrace in the life of this world, and on the Day of Resurrection they shall be consigned to the most grievous torment. And Allah is not unware of what you do." (Surah 2. Al-Baqarah. Part 1. Ayat 85).

ইসলামী আইনের একাংশকে কার্যকর করে অপর অংশ বর্জন করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণাকারী কয়েকটি আয়াত নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ "নিশ্চয়ই আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ নির্দেশ মানুষের জন্য কিতাবে নাযিল করেছি, তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন করে, আল্লাহ তাদের লা'নত দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদের অভিশাপ দেয়। কিন্তু যারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরাই তারা যাদের তাওবা আমি কবূল করি, আমি অতীশয় তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু"।[২৭৪]

"Verily, those who conceal the clear proofs, evidences and the guidance, which We have sent down, after We have made it, clear for the people in the Book, they rae the one cursed by Allah and cursed by the cursers.

Except those who repent and do righteous deeds, and openly declear (the truth which they concealed), These, I will accept their repetances. And I am the one Who accepts repentance, the Most Merciful." (Surah 2. Al-Baqarah. Part 2. Ayat 159-160).

বর্ণিত আয়াতে 'গোপন করার' অর্থ হচ্ছে, কিছু বিধানকে বাদ দিয়ে কিছু বিধানকে কার্যকর করা এবং কিছু বিষয়ের স্বীকৃতির সাথে সাথে কিছু বিষয়ের অস্বীকৃতি। এদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন যারা তা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা নিজেদের জঠরে

---

[২৭৩] আল কুরআন, ২: ৮৫ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذالك منكم الا خزى فى الحيوة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون -

[২৭৪] আল কুরআন, ২: ১৫৯-১৬০ ان الذين يكتتمون ما انزلنا من البينت والهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون- الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم -

আগুন ব্যতীত কিছু পুরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। তারাই সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে। আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল" ।[২৭৫]

"Verily, those who conceal what Allah has sent down of the Book, and purchase a small again therewith (of wordly things), they eat into their bellies nothing but fire. Allah will not speak to them on the Day of Resurrection, nor purify them, and theirs will be a painful torment.

Those are they who have puechased error at the price of Guidance, and torment at price of forgiveness. So how bold they are (for evil deeds whoch will push them) to the fire." (Surah 2. Al-Baqarah. Part 2. Ayat 174-175).

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যে কেউ আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা প্রদান করে এবং তাদের বিনাস সাধনে প্রয়াসী হয়, তার অপেক্ষা বড় যালিম কে হতে পারে? অথচ ভয় বিহবল না হয়ে তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা সংগত ছিল না। পৃথিবীতে তাদের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে"।[২৭৬]

"And who are more unjust than those who forbid that Allah's Name be glorified and mentioned much (i.e. prayers and invocations, etc.) in Allah's mosques and strive for their ruin? It was not fitting that such should themselves enter them (Allah's Mosques) except in fear. For them there is disgrace in this world, and they will have a great torment in the Hereafter." (Surah 2. Al-Baqarah. Part 1. Ayat 114).

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ "যারা কুফরী করেছে আমি তাদেরকে দুনিয়ায় ও আখিরাতে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই"।[২৭৭]

"As to those who disbelieve, I will punish them with a severe torment in this world and in the Hereafter, and they will have no helpers." (Surah 3. Al-Imran. Part 3. Ayat 56).

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইসলামী আইন সর্বতোভাবে অবিভাজ্য।

---

২৭৫ আল কুরআন, ২: ১৭৪-১৭৫ *ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون فى بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم- اولئك الذين اشتروا الضللة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار-*

২৭৬ আল কুরআন, ২: ১১৪ *ومن اظلم ممن منع مسجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلواها الا خائفين لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الاخرة عذاب عظيم -*

২৭৭ আল কুরআন, ৩: ৫৬ *فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا فى الدنيا والاخرة ومالهم من نصرين-*

Dhaka University Institutional Repository

(৮) ইসলামী আইন অপরিবর্তনীয়

ইসলামী আইনের যে অংশ কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আছে, সেগুলো অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী। কোন অবস্থায় তাতে কোন কিছু সংযোজন কিংবা বিয়োজনের কোন সুযোগ নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মানুষ হত্যার শাস্তিস্বরূপ কুরআন মাজীদে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং পাশাপাশি বাদী ও বিবাদীর মধ্যে সমঝোতারও সুযোগ রাখা হয়েছে। পক্ষ দ্বয়ের মধ্যে সমঝোতা না হলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে। কোন বিচারক কর্তৃক এ বিধান রহিত করার সাধ্য ও ইখতিয়ার কোনটাই নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমার রাসূলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এইরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না"।[২৭৮]

"(This was our) Sunnah (rule or way) with the Messengers We sent before you (O Muhammad sm), and you will not find any alteration in Our Sunnah (rule or way)." (Surah 17. Al-Isra'. Part 15. Ayat 77).

অপর এক আয়াতে আছেঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ের নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা কোন মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তা স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে"।[২৭৯]

"It is not for a believer, man or woman, when Allah and His Messenger have decreed a matter that they shoul have any option in their decision. And whoever disobeys Allah and His Messenger, he has indeed strayed into a plain error." (Surah 33. Al-Ahzab. Part 22. Ayat 36).

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর উম্মতের জন্য শুধু পথ প্রদর্শকই ছিলেন না, বরং তিনি সুবিচারকও ছিলেন। তদুপরি এমন শাসকও ছিলেন যার সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ঈমান ও কুফরের মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন মুনাফিক বিশরের ঘটনা থেকে তার প্রমাণ মিলে। বর্ণিত আছে যে, কোন এক ইয়াহুদীর সাথে তার বিবাদ ঘটে যায়। ইয়াহুদী লোকটি বলল, চল মুহাম্মদ (সা) এর নিকট গিয়ে এর মীমাংসা করি। কিন্তু এ প্রস্তাবে সম্মত হল না; বরং সে কা'আব ইবন আশরাফ নামক ইয়াহুদীর নিকট গিয়ে মীমাংসা করার প্রস্তাব করল। কা'আব ইবন আশরাফ ছিল ইয়াহুদী নেতা এবং মহানবী (সা) এর ঘোরশত্রু। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিষয়টি ছিল খুবই বিস্ময়কর। কারণ ইয়াহুদী লোকটি নিজেদের সর্দারকে বাদ দিয়ে মহানবী (সা) এর মীমাংসা পছন্দ করেছিল আর মুসলিম পরিচয়দানকারী বিশর মুহাম্মদ (সা) এর স্থলে ইয়াহুদী সর্দারের মীমাংসা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এর পিছনে

---

[২৭৮] আল কুরআন, ১৭: ৭৭ - *سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا*

[২৭৯] আল কুরআন, ৩৩: ৩৬ *وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا* -

একটি রহস্য কাজ করছিল। তাদের উভয়ের মনেই এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, মহানবী (সা) যে মীমাংসা করবেন তা একান্তভাবেই ন্যায়সঙ্গত করবেন। আর তাতে কারোরই পক্ষপাতিত্বের কোন আশংকা ছিল না। ইয়াহুদী লোকটি যেহেতু ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাই তার নিজ সর্দার অপেক্ষাও অধিক বিশ্বাস ছিল মহানবী (সা) এর উপর। পক্ষান্তরে মুনাফিক বিশর ছিল অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে জন্য সে জানত যে, মহানবী (সা) এর রায় তার বিপক্ষেই যাবে, যদিও সে মুসলিম হিসেবে দাবি করত। অতপর কথা কাটাকটির পর তারা নিজেদের বিষয় মহানবী (সা) এর নিকট উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মহানবী (সা) বিষয়টি অনুসন্ধান করলেন। তাতে ইয়াহুদীর অধিকার প্রমাণিত হয় এবং তিনি তারই পক্ষে রায় দিলেন। এতে মুনাফিক বিশর অসন্তুষ্ট হয় এবং মীমাংসা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। সে বিষয়টি হযরত উমর (রা) এর গোচরে আনার ব্যাপারে তার প্রতিপক্ষকে সম্মত করায়। বিশর মনে করেছিল, উমর (রা) যেহেতু কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, কাজেই তিনি ইয়াহুদীর পক্ষে রায় দেয়ার পরিবর্তে আমারই পক্ষে রায় দিবেন। তাদের দু'জনই উমর (রা) এর নিকট উপস্থিত হল। ইয়াহুদী পুরো বিষয়টি উমর (রা) কে অবহিত করল। উমর (রা) বিশরকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা কি এরূপ? সে স্বীকার করল। এসময় উমর (রা) বললেনঃ একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই আসছি। একথা বলে তিনি ঘরে চলে গেলেন এবং একটি তরবারী এনে বিশরকে হত্যা করলেন। তিনি বললেন যে লোক রাসূল (সা) এর ফায়সালা মেনে নিতে রাযী নয়, এ হচ্ছে তার মীমাংসা। সা'লাবি (রা) ইবন হাতিম সূত্রে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত আয়াতটি নাযিল হয়ঃ "কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়"।[২৮০]

"But no, by your Lord, they can have no Faith, until they make you (O Muhammad sm) Judge in all disputes between them, and find in themselves no resistance against your decision, and accept (them) with full submission." (Surah 4. An-Nisa'. Part.5. Ayat 65).

(৯) ইসলামী আইন পূর্ণাঙ্গ

মানবজীবনের সার্বিক দিক পরিচালনার জন্য ইসলামী আইন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে মানবজাতির ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে প্রয়োজন অনুসারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মহানবী (সা) এর যুগ তথা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন মোতাবিক এতে পূর্ণাঙ্গতা ও চিরন্তনতা দান করা হয়েছে।

---

[২৮০] আল কুরআন, 8: ৬৫ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما-

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম"।[২৮১]
"This day, I have perfected your religion for you, completed My favour upon you, and have chosen for you Islam as your religion. But as for him who is forced by severe hunger, with no inclination to sin (such can eat thse above mentioned meats), then surely, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful." (Surah 5. Al-Maidah. Part 6. Ayat 3).

ইসলামী আইনে পরিপূর্ণতা ও চিরন্তনতা সম্পর্কে আয়াতটি একটি চূড়ান্ত দলিল এবং মুহাম্মদ (সা) যে শেষ নবী, এ কথাটিও শারী'আতের সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত। কুরআন মাজীদে আছেঃ "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়; বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ"।[২৮২]
"(Muhammad sm) is not the father of any of your men, but he is the Messenger of Allah and the last (end) of the prophets. And Allah is Ever All-Aware of everything." (Surah 33. Al-Ahzab. Part 22. Ayat 40).

শারী'আতের বিধান তথা ইসলামী আইন পর্যালোচনা করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ইসলামী আইন পূর্ণাঙ্গ এবং এর মধ্যে কোন ত্রুটি, বিকৃতি বা কমতির লেশমাত্র নেই। ব্যক্তিগত বা সামাজিক অবস্থা ও লেনদেন এবং রাজনৈতিক বিষয়াবলী সবকিছুর উপরই ইসলামী আইন পরিব্যাপ্ত। এ আইন একদিকে মানুষের ব্যক্তিগত অবস্থা নিয়ন্ত্রন করে এবং অন্যদিকে তার সমষ্টিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন রাষ্ট্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ও রাজনীতি সংগঠিত করে। যুদ্ধ ও সন্ধির পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কও নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রন করে। ইসলামী আইন কোন বিশেষ সময়ের জন্য আসেনি এবং সেই সময়টুকু ছাড়া অন্য কোন সময়ের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই এমন কথাও বলা যায় না। কেননা কোন বিশেষ যুগ বা কালের মধ্যে এর কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি চিরন্তন শারী'আত তথা ইসলামী আইন। মানব রচিত আইন দিনের পর দিন যেমন পরিবর্তন ও সংশোধনের শিকারে পরিণত হয়, ইসলামী আইন সে ধরনের কোন পরিবর্তন ও সংশোধন গ্রহণ করতে আদৌ প্রস্তুত নয় এবং এর প্রয়োজনও পরে না।
উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা শেষ নবীর মাধ্যমে মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ দীন বা জীবন ব্যবস্থা দান করেছেন। এই জীবন ব্যবস্থা অবশিষ্ট সকল প্রকারের জীবন ব্যবস্থা ও মতবাদকে বাতিল ঘোষণা করেছে।[২৮৩] ইসলামী আইন পরিপূর্ণ এ দৃষ্টি কোণ থেকে যে, যেমন যদি কোন ব্যক্তি ফরয নামায দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয়, তবে সে বসে আদায় করবে, আর তাতেও যদি অপারগ হয়,

---

২৮১ আল কুরআন, ৫: ৩ – *اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا*

২৮২ আল কুরআন, ৩৩: ৪০ – *ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين وكان الله بكل شيء عليما*

২৮৩ ইমাম আহমাদ, *মুসনাদ*, হা. নং-১৫২২৩, পৃ. ১০৫৮

Dhaka University Institutional Repository

তবে ইশারায় পড়বে। যদি সে বেহুঁশ হয়, তবে আদায় করতে হবে না। এ বিধান প্রমাণ করে ইসলামী আইন পূর্ণাঙ্গ, কোন অবস্থায়ই তা পথ নির্দেশনা দানে অক্ষম নয়।

(১০) ইসলামী আইনে ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারে। ইসলামী আইনের আওতায় তারা ব্যাপকভাবে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা ভোগ করে। ইসলামী আইনে জঘন্যতম যুলম ও অমার্জনীয় অপরাধ হল মূর্তিপূজা। কোন মুসলিম স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে উক্ত কার্যক্রমে লিপ্ত হলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু অমুসলিমদের বেলায় এই আইন সম্পূর্ণ উদার। তারা ইসলামী রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে মূর্তি তৈরী পারে, তার পূজা অর্চনা করতে পারে এবং ব্যবসাও করতে পারে। এমনকি ইসলামী আইনে অমুসলিমদের গালমন্দ করাও মুসলিমের জন্য নিষিদ্ধ এবং তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করা তাদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছেঃ "আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিওনা। কেননা তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকেও গালি দিবে; এভাবে আমি প্রত্যেক ব্যক্তির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি; অতপর তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন অনন্তর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকার্য সম্বন্ধে অবহিত করবেন"।[২৮৪]

"And insult not those whom they (disbelievers) worship besides Allah, lest they insult Allah wrongfully without knowledge. Thus We have made fair-something to each people its own doings; then to their Lord is their return and He shall then inform them all that they used to do." (Surah 6. Al-Baqarah. Part 7. Ayat 108).

অপর এক আয়াতে আছেঃ "দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন"।[২৮৫]

---

২৮৪ আল কুরআন, ৬:১০৮ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذالك زينا لكل امة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون -

২৮৫ আল কুরআন, ৬০: ৮ لا ينهكم الله عن الذين لم يقا تلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين -

Allah does not forbid you to deal justly and kindly with those who fought not against you on account of religion nor drove you out of your homes. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.(Surah 60. Al-Mumtahana. Part 28. Ayat 8).

(১১) ইসলামী আইন আচরণবিধি নির্ণয় করে

ইসলামী আইন আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানের প্রতিবন্ধকদের সাথে আচরণবিধি নিয়ন্ত্রন করে। মানুষের তৈরী দুনিয়ার অন্যান্য আইন ব্যবস্থার মতো ইসলামী শারী'আতের আহকামের যে বিরোধীতা করে, তাকে দমন ও তার শাস্তির ব্যবস্থা এর মাধ্যমে করা হয়। ইসলামী শারী'আত এদিক থেকে বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বাবধানকারী যিনি সর্বজ্ঞ এবং চোখের অপব্যবহার ও হৃদয়ে যা কিছু গোপন আছে সে সম্পর্কে যিনি সঠিক খবর রাখেন, উপরন্তু যিনি সকল প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়ে জানেন, তিনিই এর তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রক। কাজেই শারী'আতের বিধানের বিরোধীতা করে যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে, সে দুনিয়ার পাকড়াও থেকে তার কোন অবস্থাতেই মুক্তি নেই। সব কিছু সে সামনেই উপস্থিত পাবে, চাই তা ছোট বড় যাই হোক।[২৮৬]

আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই নেই, এদিকে ইঙ্গিত করে মহানবী (সা) বলেছেনঃ "অবশ্যই আমি একজন মানুষ। আর তোমরা অনেক সময় আমার নিকট ঝগড়া বিবাদ নিয়ে আস। তোমাদের কেউ কেউ সম্ভবত অন্যের তুলনায় সুন্দর করে গুছিয়ে যাদুকরি ভাষায় নিজেদের বক্তব্য পেশ করে থাক। আমি যেভাবে শুনি ঠিক সেভাবে ফায়সালা করে দিই। এ ক্ষেত্রে তোমাদের ভাইদের ন্যায্য পাওনার বিরুদ্ধে যদি আমি কোন ফায়সালা দিয়ে দিই তাহলে তা গ্রহণ করো না। যে তা গ্রহণ করবে সে নিজের জন্য জাহান্নামের একটি অংশ কেটে নিবে। মানুষ মানুষের পাকড়াও এড়াতে পারলেও আল্লাহর পাকড়াও এড়াতে পারবে না, এ হাদীসটি তার একটি প্রমাণ। আর যে ব্যক্তি অন্যায় বিরোধ করে বাহ্যত অন্যের কিছু অংশ বাগিয়ে নিবে, মূলতঃ পর্দার অন্তরালে তা তার জন্য হারাম হবে এবং সে শাস্তির সম্মুখীন হবে। কারণ তার অন্তর গুনাহে লিপ্ত হয়েছে। ইসলামী শারী'আতের এই বৈশিষ্ট্যই শারী'আতের আইন ও মানুষের তৈরী আইনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। শারী'আতের বিধান প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও দেখা দেয় কিন্তু সত্য দীনের দিক নির্দেশনা ছাড়া অন্য কিছুতেই তারা সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারে না। আর এই দিক নির্দেশনা একমাত্র মেনে চলারই যোগ্য। এখানে সামনে পিছনে কোথাও থেকে বাতিল ও অন্যায়ের অনুপ্রবেশের সুযোগ নেই।

---

২৮৬ *ইসলামী আইন ও বিচার,* ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০০৫, ঢাকা: ইসলামী ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

(১২) ইসলামী আইন শারী'আতের উৎসকে বিকৃতিমুক্ত রাখে

আল্লাহ তা'আলা ইসলামী আইনকে সব ধরনের বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে রক্ষা করেছেন। মহানবী (সা) এর যামানা থেকে আজ পর্যন্ত এ ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি-ই কুরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমি এর সংরক্ষক"।[২৮৭]

"Verily, We, it is We Who have sent down the Dhikr (i.e. the Qur'an) and surely, We will guard it (from corruption)." (Surah 15. Al-Hijr. Part 14. Ayat 9).

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর কুরআন তিনিই সংরক্ষণ করবেন। তিনিই সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহে যেভাবে বিকৃতি সাধিত হয়েছে, কুরআনে অনুরূপ কিংবা চুল পরিমাণও বিকৃতির সম্ভাবনা নেই। যুগশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ কুরআনের সূরার অনুরূপ একটি আয়াত কিংবা একটি সূরা রচনা করার ব্যাপারেও অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। শয়তানকে তা আড়ি পেতে শোনা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। এ সবই এর সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই একথা স্পষ্ট যে, ইসলামী আইন শারী'আতের উৎসকে সকল প্রকার বিকৃতি থেকে মুক্ত রাখে।

---

[২৮৭] আল কুরআন, ১৫: ৯ - انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে মুসলিম আইনের প্রচলন

মুসলিম আইনের ইতিহাস

মুসলিম আইনের প্রবর্তন ও বিধিসমূহ

বাংলাদেশে মুসলিম আইনের প্রচলন

মুসলিম আইন প্রচলনের বিভিন্ন সময়কাল

হিজরী প্রথম সন হতে মুসলিম আইনের ক্রমবিকাশ শুরু হয়েছে। ১৩০২ হিজরী অর্থাৎ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম আইন ক্রমবিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। এ মধ্যবর্তীকালকে ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণ মোট চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। কোন কোন আইনতত্ত্ববিদ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত সময়কে আরো একটি পর্যায়ে বিভক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। আবার কেহ শারী‘আর ক্রমবিকাশকে মোট সাতটি পর্যায়কালে বিভক্ত করেছেন, যথাঃ

(১) প্রথম পর্যায়ঃ নবী পাক (সা) এর যুগ বা আইন প্রণয়নের যুগ,

(২) দ্বিতীয় পর্যায়ঃ প্রজাতান্ত্রিক যুগ,

(৩) তৃতীয় পর্যায়ঃ রাজবংশ বনাম প্রতিনিধত্বের যুগ,

(৪) চতুর্থ পর্যায়ঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণার যুগ,

(৫) পঞ্চম পর্যায়ঃ গবেষণার স্থিরীকৃতকরণ যুগ,

(৬) ষষ্ঠ পর্যায়ঃ প্রতিলিপি গ্রহণ যুগ,

(৭) সপ্তম পর্যায়ঃ স্বেবচ্ছাচিন্তার যুগ (যাকে পতনের যুগও বলা যায়)।

প্রথম পর্যায়

আইন প্রণয়নের যুগ (৬২২- ৬৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)

হযরত মুহাম্মদ (সা) এর মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের দিবস হতে শুরু করে তাঁর ওফাত দিবস পর্যন্ত বিস্তৃতকালকে মুসলিম আইনের ইতিহাসের প্রথম পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই সময়ে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামিন পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আইন জারি করেন এবং নবী করীম (সা) সে আইন বলবৎ করেন। এ সময়ে পবিত্র কুরআন ছাড়াও ইসলামী আইনের অন্যতম প্রধান উৎস রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীস সূন্নাহ গড়ে উঠে। এজন্য এই কালকে আইন প্রণয়নের যুগ নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবনের শেষ দশ বৎসর ইসলামী আইনের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্য এবং সর্বপ্রধান পর্যায়কাল। এ সময়ই পবিত্র কুরআনের অধিকাংশ আয়াত নাযিল হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর সূন্নাহ ও হাদীসসমূহ বিধৃত হয়। আইন প্রণয়নের যুগ শারী‘আতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যাদেশসমূহ দ্বারা আল্লাহ পাক বিধান প্রদান করেন এবং নবী (সা) তাঁর পবিত্র সূন্নাহ দ্বারা সেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং বলবৎ করে দেখিয়ে দিয়ে যান। মানব জীবনে দুনিয়া ও আখিরাতে বিশ্বাস, চিন্তাভাবনা এবং বিদ্যমান প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এ সকল প্রত্যাদেশ ও সূন্নাহ পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করা হয়। এ সময় প্রশাসনিক বিচার বিভাগীয় এবং আইন প্রণয়ন যাবতীয় বিষয়াদি হযরত মূহাম্মদ (সা) এর ব্যক্তিত্বের চতুস্পার্শে আবর্তিত হত। এ অবস্থায় নবী

(সা) কখনো দেশ তথা হাদীসের বয়ান কিংবা কখনো আল্লাহ পাকের নিকট হতে হযরত জিবরাঈল (আ) এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ প্রত্যাদেশ অথবা পরোক্ষ প্রত্যাদেশের আচরণ দ্বারা সংশ্লিষ্ট অনুসরণীয় সমাধান দিতেন। আল্লাহ পাকের প্রত্যক্ষ প্রত্যাদেশসমূহ পবিত্র কুরআনে অন্তর্ভুক্ত আছে এবং পরোক্ষ প্রত্যাদেশ ও নবী (সা) এর আদর্শ আচরণের সমন্বয়ে সূন্নাহ গড়ে উঠে ইসলামী আইনের পরবর্তী সকল উৎসসমূহের মূল ভিত্তি হল পবিত্র কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর সূন্নাহ। নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত, 'ইবাদত, জিহাদ, চুক্তি, যুদ্ধবন্দী, গণিমতের মালপত্র, বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, ফৌজদারী বিধান প্রভৃতি বিষয়ে রাসূল (সা) এর সূন্নাহর মাধ্যমে ইসলামী আইনের মূল অবয়ব রচিত ও সুগঠিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়

প্রজাতান্ত্রিক যুগ (৬৩২- ৬৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)

রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইন্তেকালের সময় হতে পরবর্তী বিশ বছর প্রজাতান্ত্রিক যুগের আওতায় পড়ে। এ যুগকে খুলাফা- ই রাশেদীনের যুগও বলা হয়। দশ হিজরীতে হযরত আবূ বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার সময় হতে এ যুগের সূচনা এবং ৪০ হিজরীতে ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) আততায়ীর হাতে শহীদ হওয়ার সময় পর্যন্ত ইহার বিস্তার। হযরত আবূ বকর (রা) খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করেন এবং পারস্য ও রোমের অধীনস্থ ইরাক ও সিরিয়ায় ইসলাম প্রচারের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন, তিনি ১৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করলে হযরত ওমর (রা) দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। এ সময় মুসলিম সাম্রাজ্যের বিপুল বিস্তার ঘটে এবং বহু দেশ ও শহরে ইসলামের বিস্তৃতি ও প্রসার সম্ভব হয়। বহু অনআরবি ইসলাম গ্রহণ করে। ২৪ হিজরীতে হযরত ওমর (রা)আততায়ীর হাতে শহীদ হলে হযরত ওসমান (রা) খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর সময়ও মুসলিম সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিমে প্রসার লাভ ঘটে, কিন্তু তিনি ৩৫ হিজরীতে নিহত হন। তৎপর হযরত 'আলী (রা) খলিফা নির্বাচিত হলেও তিনিও ৪৩০ হিজরীতে শত্রুর হাতে শাহাদাত বরণ করেন। ইসলাম এই চার খলিফার 'আমলেই মুসলিম জনগণ দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং ইহার ফলে ইসলামী আইনতত্ত্বের দু'টি পৃথক বুনিয়াদ রচিত হতে থাকে। এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে, এই সময় জনগণ ভীষণ ভাবে কুরআন ও সূন্নাহর দিকে অনুরক্ত ছিল। কিন্তু অচিরেই সময়ের পরিবর্তন ঘটল এবং বর্ধিত পরিবর্তিত সামাজিক চাহিদার আলোকে মানুষের নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হল। নবী করীম (সা) অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে সাহাবাগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সমস্যার সমাধান দিতেন। কিন্তু নবী করীম (সা) এর অবর্তমানে যেরূপে সমস্যার উদ্ভব হলে যে ক্ষেত্রে কুরআন ও সূন্নাহ নীরব বলে পরিগণিত হত, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) ইজমা'- ই- উম্মাহ প্রবর্তন করেন। কঠিন আইনগত সমস্যার সমাধানে ইহা মুসলিম আইনের তৃতীয় প্রধান উৎসরূপে পরিণত হয়। সাহাবাগণ কোন বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করে যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতেন, তা- ইজমা' বলে পরিচিত। এ চার খলিফার আমলেই কুরআন ও সূন্নাহর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাদৃশ্যমূলক অবরোহণ প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি রচিত হয়। আইনের মূল উৎসের অবর্তমানে ইজমা'র পরই ব্যক্তিগত বিচার

বিবেচনার উপর জোর দেয়া হত। সাহাবা কিরামগণের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যে মতপার্থক্য দেখা দিত সেগুলোর সমাধানে ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনাকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে সময়ের প্রয়োজনে তাদের আন্তরিকতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটত। ইজমা’ সম্পূর্ণরূপে শারী‘আত সম্মত এবং ইহার ফলে ইসলামী শারী‘আর চতুর্থ উৎস হিসেবে ভিত্তি লাভ করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দু’টি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলঃ

(ক) পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ সংগ্রহকরণ ও সংকলন

(খ) সূন্নাহ সংগ্রহ ও সুবিন্যস্তকরণ।

কুরআনের আয়াতসমূহ সাহাবাগণ মুখস্ত করে অথবা হাড়, খেজুরপত্র এবং প্রস্তর খণ্ডে খোদাই করে সংরক্ষণ করতেন। তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের সময় কুরআনের আয়াতসমূহ সংগ্রহ ও একত্রিকরণের কাজ শুরু হয় এবং হযরত যাইদ (রা) কে উহার দায়িত্ব দেয়া হয়। উক্তরূপে সংকলিত কুরআনই বর্তমান কুরআন। পবিত্র কুরআনের মত রসূলুল্লাহ (সা) এর সূন্নাহ এবং হাদীসসমূহ ঐ সময় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সংগ্রহ হয়নি।

তৃতীয় পর্যায়

রাজবংশ বনাম প্রতিনিধিত্বের যুগ (৬৬২ হতে ৮২২খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)

৪১ হিজরীতে আমির মুয়াবিয়া কর্তৃক উমাইয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠার সময় হতে হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে আরব নিয়ন্ত্রন দুর্বল হওয়ার সময় পর্যন্ত ইসলামী আইনতত্ত্বের ইতিহাসের তৃতীয় পর্যায়কাল বিস্তৃত। মুয়াবিয়া মুসলিম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা সত্ত্বেও তখনকার বিদ্যমান সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ ও দলীয় মতবিরোধ নিরসন হয়নি। সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকগণ খারিজি এবং শিয়া এই দু’দলে বিভক্ত ছিল এবং তারা চলমান রাজনৈতিক অঙ্গনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সময় পারস্পরিক মতবিরোধ ক্রমান্বয়ে প্রবল হতে থাকে এবং তাদের ধারণা ও অভিমতকে পাকাপোক্ত করার জন্য তারা নবী করীম (সা) এর অনেক সাধারণ হাদীস বিধৃত করতে লাগলেন যেগুলি সাধারণ মুসলিম সমাজ কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। ঐ সময় হাদীস সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এভাবে পণ্ডিত এবং আইনবিদদের মধ্যে মতভেদ বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রদায়িক জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের ধারণার উপর আইনগত সমস্যার ক্ষেত্রে মতামত রাখতে শুরু করেন। এভাবে তখন তিনটি পৃথক মতধারা সৃষ্টি হয়। প্রথমটি হল সাধারণ মুসলিমদের, দ্বিতীয়টি শিয়াদের এবং তৃতীয়টি খারিজিদের। ঐ সময়ের দুঃখজনক বৈশিষ্ট্য হল যে, অনেকেই মিথ্যা বা বনানো হাদীস পরিবেশন করতে থাকেন এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন রকম মুনাফিকদের অনেকে এ সকল মিথ্যা হাদীস ইসলামকে অসম্মান

করার এবং অধপতিত করার অসৎ উদ্দেশ্যে বর্ণনা করত। কিছু অশিক্ষিত লোক ইহাকে ভাল ধর্মীয় কাজ মনে করে অতিরঞ্জিত হাদীস বর্ণনা করতে লাগল এবং কিছু অনভিজ্ঞ মুহাদ্দিসিন নিজেদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেও হাদীস বর্ণনা করত। সাম্প্রদায়িক জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়গত ধারণা ও বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার উদ্দ্যেশ্যেও উদ্ভাবিত হাদীস বর্ণনা করত। এ অবস্থায় মুহাদ্দিসগণকে অনেক কষ্ট স্বীকার করে নবী করীম (সা) এর প্রামান্য হাদীস ও সুন্নাহ সংগ্রহ করতে হয়। ইসলামী আইনে উমাইয়া খলিফাগণের বুৎপত্তি গভীর ছিলনা। কিন্তু তবু ইরাক এবং মেসোপটেমিয়ায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে আইন গবেষণার সূত্রপাত হয়। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইবনে 'আতা আইনকে বিষয় ভিত্তিক ভাগে ভাগ করেন এবং আইনের ভাষায় পরিভাষা প্রয়োগ করেন এবং আইনের বিভিন্ন উৎস নির্ণয় করেন।

চতুর্থ পর্যায়

বৈজ্ঞানিক গবেষণা যুগ

তৃতীয় যুগে অংকুরিত আইনের স্থায়ী মূলনীতি উন্নয়নের বর্ধনশীল যুগ চতুর্থ পর্যায় উন্মেষের ফলে ইসলামী আইনের গবেষণার দৃঢ় ভিত্তি রচিত হয়। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী হতে আরম্ভ করে এ যুগ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত বহাল থাকে। উমাইয়াদের পতন হলে আব্বাসীগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। আইনতত্ত্বের গবেষণায় তাদের প্রবল উৎসাহ ছিল। আইনতত্ত্ববিদগণকে বিশেষ ভাবে তারা উৎসাহিত করতেন। তৎকালে হিজাজ, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থান হতে মুহাদ্দিস এবং ফকিহগণ আব্বাসীয় খলিফাদের রাজধানী বাগদাদে সমবেত হতেন। এ যুগে ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতা ব্যাপকভাবে পরিব্যাপ্ত হয়। শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম বৃদ্ধির ফলে আইনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে হতে আরম্ভ করে। এ প্রয়োজন মিটাতে শারী'আতে বর্ণিত অবক্ষয়ের অবকাঠামোর ভিতর ও বাহিরে ব্যাপকভাবে আইনগত উন্নয়ন সাধিত হয়।

বুদ্ধিগত কর্মতৎপরতা

সারা মুসলিম ভূ- খণ্ডে এরূপ কর্মতৎপরতা প্রসারিত হয়। এ সময় সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন এবং প্রামাণ্য ও গৃহীত হাফিজ ও ক্বারীদের মধ্যে মদীনায় ছিলেন নাফ বিন আবূ নাঈম, মক্কায় আব্দুল বিন কাফির মোল্লা আমির বিন আল খামাহ বসরায় আবূ আমর বিন আল আ'লাহ দামেশকে আব্দুল্লাহ বিন আমির, কুফায় কুরআন মুখস্ত করা ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয় এবং উহা শিক্ষার একটি ধরণ রূপে পরিগণিত হতে থাকে। আসীম বিন আবি নজুদ এবং অন্যান্য স্থানে কুরআন তেলাওয়াত একটি বিজ্ঞানে পরিণরত হয় এবং ইহার উপর পুস্তকাদি রচিত হয়। গ্রীক এবং পারশ্য দেশীয় ধর্মীয় এবং দার্শনিক পুস্তকাদির অনুবাদ প্রাপ্তিসাধ্য হওয়ায় একদল পণ্ডিত অনুপ্রাণিত হন এবং কুরআন ও হাদীসের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদ ও গবেষণা করতে সচেষ্ট হন। ইসলামের প্রথম যুক্তিবাদী দল মু'তাযিলা এবং মুকাল্লিম সম্প্রদায়কে খলিফা মামুন রাজকীয় সমর্থন দান করেন। ইহার ফলে

কুরআন সৃষ্টি করা হয়েছিল কি সৃষ্টি করা হয় নাই এই বিষয়ে বিতর্ক আরও প্রজ্বলিত হয়। খলিফা মামুনের উৎসাহে তারা মুহাদ্দিসকে অবমিত করতে সমর্থ হয়। তবে সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায় শেষোক্তদের প্রতি সমর্থন দান করে এবং তারা অবশেষে বিজয়ী হয়। মু'তাযিলা আন্দোলন ইতিহাসের পাতা থেকে মুছিয়া যায়। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের সঙ্গে মামুনের মতবিরোধ এবং তার বিজয় মানবজাতির ইতিহাসে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের অধিকার সংরক্ষণ এবং ধর্মীয় অলঙ্ঘতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এক মহাবিজয়।

হাদীস সংকলন ও সম্পাদনা

ঐতিহ্য বিজ্ঞান উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এ পর্যায়কাল খুবই উল্লেখযোগ্য। হাদীস সংকলন করে সম্পাদনের মাধ্যমে সেগুলোকে নিয়মানুগ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। মুসলিম শাসনাধীন এবং কর্মতৎপরতামুখর স্থানসমূহে ঐতিহ্য বা হাদীসসমূহের নিয়মানুগ সুবিন্যাসের কাজ শুরু হয়। মদীনায় মালিক বিন আনাস, মক্কায় আবদুল মালিক বিন আবদুল আজিজ বিন জরীহ, কুফায় সুফাইয়ান খোরী,বসরায় হাম্মদ বিন সালমাহ, সিরিয়ায় আব্দুর রহমান আউজা'ঈ, ইয়ামেনে মামল বিন রশিদ এবং খুরাসানে আবদুল বিন মোবারক এ রূপ সংকলন ও সংগ্রহের কাজে উৎসর্গিত ছিলেন। তারা সকলে প্রথম শ্রেণির সংগ্রাহক ছিলেন। তাদের সংগ্রহের মধ্যে ছিল সাহাবাকেরাম এবং তাবে'ঈনদের বর্ণিত হাদীসসমূহ। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) এর ঐতিহ্যকে অন্যান্যদের নিকট হতে পৃথক করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং ইহার ফলে দ্বিতীয় শ্রেণির সংগ্রাহকদের উন্মেষ ঘটে। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আহমদ ইবনে হাম্বল। একদল হাদীস সংগ্রহ করতেন এবং আইনতত্ত্ববিদগণ তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন। অন্যান্যদের দ্বারা যখন সংগৃহীত হাদীসসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হত তখন নূতন আর এক শ্রেণির বিজ্ঞ ব্যক্তি একটি নির্বাচিত পদ্ধতিতে সংকলন কাজ শুরু করেন। আরও পরীক্ষার পর তারা তাদের পূর্ববর্তীদের সংগৃহীত ও সংকলিত ঐতিহ্যসমূহের একটি সংকলন তৈরী করেন। এ রূপ যাচাই ও পরীক্ষার মাধ্যমে অনেক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগনীতি গড়ে উঠতে থাকে। এভাবে নূতন সংকলন তৈরী হয় এবং তা কালক্রমে আমাদের নিকট আসে। এগুলোর মধ্যে ছয়টি হাদীস গ্রন্থ সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং উল্লখেযোগ্য।

সাহাবীদের স্থলবর্তী বা তাদের অনুসারীগণের দ্বারা বর্ণিত হাদীসসমূহের ব্যাপারে সন্দেহ নিরসনকল্পে এবং সে হাদীস বা ঐতিহ্যে প্রামাণিকতা বা নির্ভরযোগ্যতা ব্যাখ্যা করবার জন্যও সর্বাধিক চেষ্টা করা হয়। এ প্রসঙ্গে ঐতিহ্যের সংগ্রাহকগণ বিস্তারিত এবং বৈজ্ঞানিকভাবে বর্ণনাকারীদের চরিত্র ব্যক্তিগত বিবরণাদি এবং অন্যান্য মন্দ বা ভাল গুণাবলীর বর্ণনা প্রদান করতেন যাতে তাদের বর্ণিত হাদীস বা ঐতিহ্যের প্রামাণিকতা বা নির্ভরযোগ্যতা বিচার করা যায়।

ফিকাহর উন্নয়ন

ইসলামী আইনতত্ত্বের এ পর্যায়কালে উসূলুল ফিকহ নিয়মানুগ এবং সুস্থির করা হয়। বিভিন্ন মাযহাবের ইমামগণ আইনগত মতামত প্রকাশ করতে থাকেন। এ সকল ইমামগণ বিধি- বিধানসমূহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁদের নিজ নিজ অনুসারীগণও সে কাজকে পূর্ণতা দান করেন আহকামের ব্যাখ্যার আইনবিদদের বিভিন্ন মতভেদ ছিল এবং এ মতভেদের কারণে ইসলামী আইন বিজ্ঞান বা উসূলুল ফিকহ নিয়মানুগ করার বিভিন্ন মতভেদ ছিল এবং এই মতভেদের কারণে ইসলামী আইন বিজ্ঞান বা উসূলুল ফিকহ নিয়মানুগ করার বিভিন্ন পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটে। মুজতাহিদগণ তাদের নিজ নিজ মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসারে কার্যকর করতে বাধ্য ছিলেন এবং অন্য কোন বিধি গ্রহণে অনুমতি প্রাপ্ত ছিলেন না। এক একটি মাযহাবের আইনবিদগণ উসূল ফিকহ এর উপর রচনা ও সম্পাদনা করেন।

এই যুগে কিয়াস প্রদান ফিকহ এর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে এবং কিয়াস ইসলামী আইনের উৎসরূপে পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে। এই সময়ে ইজমা'র ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও মতভেদ দেখা দেয় এবং কোন কোন ইজমা' গ্রহণ করা যাবে এবং কোন কোন ইজমা' গ্রহণ করা যাবে না সে সম্পর্কে এক এক জন ইমাম এক এক রকম অভিমত প্রকাশ করেন। কোন কোন কাজ ফরয, মাকরূহ এবং হারাম সে সম্পর্কেও ইমামদের মধ্যে আলাদা ব্যাখ্যা দেখা যায়। এভাবে চিন্তা, গবেষণা এবং প্রয়োগ ও বিশ্লেষণনীতির পার্থক্যের মাধ্যমে ফিকহশাস্ত্র উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে।

পঞ্চম পর্যায়

গবেষণার স্থিরীকৃতকরণ

স্থান ও কালের প্রয়োজনে ইসলামী আইনের ইতিহাসের চতুর্থ পর্যায়কালে আইনের ব্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং বিভিন্ন মাযহাব ও মতবাদগুলির উন্মেষ ও বিকাশ সাধিত হয়। পঞ্চম যুগ বা পর্যায়ের ঊষালগ্নে আইন বিজ্ঞানের স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্বের জন্য পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে ইহাকে স্থিরীকৃত রূপদান করা হয়। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভ বা মধ্য পর্যায় হতে শুরু করে হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে মঙ্গলদের হাতে আব্বাসীদের পতন অটোম্যান তুর্কদের উত্থানকাল পর্যন্ত ইসলামী আইনের ইতিহাসের পঞ্চম পর্যায়কাল বিস্তৃত। এ সময়ে মুসলিম ভূ- খণ্ডে পৃথক পৃথক সার্বভৌম দেশের উদ্ভব হয়। স্পেনে আব্দুর রহমান নাসির খেলাফত গ্রহণ করেন, উত্তর আফ্রিকায় ইসরাইলী শিয়াগণ ওবায়দুল্লাহ মাহদীর নামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক মুসলিম শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। একইভাবে ভারতেও তখন মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। বর্বর মঙ্গলদের হাতে হালুকা খানও চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে মুসলিম ভূ- খণ্ড অধিকৃত হলে তারা ঈমানদার মুসলিমদিগকে পাইকারীভাবে হত্যা করে। তারা বাগদাদ সহ অন্যান্য স্থানের মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করে দেয়।

ষষ্ঠ পর্যায়

প্রতিলিপি গ্রহণ যুগ

১২৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কী অটোম্যান কর্তৃক তুর্কী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় হতে এবং তার পূর্বে ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে মোহাম্মদ ঘুরী কর্তৃক ভারত বিজয়ের সময় হতে ইসলামী আইনের ইতিহাসে ষষ্ঠ পর্যায় শুরু হয় এবং ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তুরস্কের আন্দোলন ও ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে মুসলিম শাসন বজায় রাখার সংগ্রাম বৃটিশদের বিজয় লাভের সময় পর্যন্ত তা বহাল থাকে। এ সময় শাসন ক্ষমতা আরব জাতির হাত হতে চলিয়া যায় এবং এ জাতি আরব জাতিকে শাসন করতে শুরু করে। এ সময় আরবগণ ভাবত যে, নবী করীম (সা) তাদের এবং ধর্মীয় আইন তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিধায় তারা এক আলাদা মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু অন্যান্য অন- আরব মুসলিম জাতি ও গোত্র আরবদের মত এভাবে চিন্তা না করে তারা সত্যিকার অর্থে আন্তরিকভাবে ইসলাম ধর্মের জন্য কাজ করতে থাকেন।

সপ্তম পর্যায়

স্বেচ্ছা চিন্তার যুগ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন মুসলিম রাজ্যগুলো ইউরোপীয় উপনিবেশিককদের আওতায় চলে আসে। উপনিবেশিক শক্তিগুলো শুধুমাত্র মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে ক্ষান্ত হয় নাই, তারা ঐ সকল দেশে প্রচলিত শারী'আতের বিধি- বিধানের উপরও থাবা বিস্তার করে। ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তি মুসলিম শাসিত দেশগুলোতে ক্রমান্বয়ে ইউরোপীয় আইন ও বিচার ব্যবস্থা চালু করে এবং সে সকল দেশে ইউরোপীয় আইন বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি পাকাপোক্ত হয়। অটোম্যানদের ক্ষেত্রে ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দের 'গুলহেন সনদ' প্রবর্তন এবং ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্যর্থ মুসলিম অভ্যুত্থানের সময় হতেই স্বেচ্ছা চিন্তার যুগ শুরু হয়েছে বলে গণ্য করা যায়। বিগত দু'টি বিশ্বযুদ্ধ এবং তাদের অব্যবহিত পড়ে মানবিক সম্পর্কের সম্মুখে ঠেলে দেয় এবং মুক্ত আইনের আন্দোলন বিস্তৃত হয়েছে। একই সময় এক একটি দেশের আঞ্চলিক সীমানার মধ্যে শারী'আতের আইনের গতি আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের মিস্ত্র ধারণা এর অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায় এবং মুসলিম জাতির জন্য ইসরাইলী আগ্রাসন একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জরূপে পরিগণিত হয়। ইসলামী আইনের ইতিহাসের এ সপ্তম পর্যায়ে ইসলামী আইন একটি চরম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করেছে।

এ যুগের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে, পশ্চিমা চিন্তার মহা প্লাবন ইসলামী দেশগুলোকে ভীষণভাবে হতবুদ্ধি করেছে। উপনিবেশবাদ, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং আধিপত্যবাদের সূত্রে পশ্চিমা সভ্যতার সাথে যে প্রত্যক্ষ সংশ্রব ঘটে, বিশেষ করে যখন বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি শিল্পনির্ভর গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা, জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং বস্তুবাদ শিক্ষায় উদারনৈতিকবাদ, লিঙ্গসমতা, এক বিবাহবাদ এবং আরও অন্যান্য জিনিষের ইউরোপীয়

ধারণাসমূহ পূর্বাঞ্চলকে পরিব্যাপ্ত করে। তার একটি সুগভীর এবং কার্যকরি ফল দেখা দেয়। অনুসন্ধানী প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসিত হতে থাকে। ধর্ম কি? সংস্কৃতি কি? ইসলামী আইন কি? আমরা এগুলো নির্মূল করে দিব না প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য রেখে এগুলির উন্নয়ন করব? একজন মুসলিম কে এবং তার জন্য কি কি প্রয়োজন? এসকল প্রশ্ন রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের ধারণার মধ্য দিয়ে গভীর হতে গভীরভাবে মৌলিক এবং জাতীয় আত্মনির্ভরতার প্রশ্নে একত্রে ঝট পাকিয়ে প্রধান রূপে দেখা দেয়।

ইসলামী আইনের প্রয়োগ ও শারী'আত আইন

বৃটিশ ভারতে বৃটিশ শাসকগণ প্রথম দিকে ইসলামী আইন মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। নীতিগত ভাবে তারা এ কাজ করেন। তারা যখন রাজ্যের দায়িত্ব হাতে নেন তখন এদেশে এ নীতি প্রচলিত ছিল। মোগল বাদশাগণ তাদের রাজত্বকালে হিন্দুদের জন্য ইসলামী আইন প্রয়োগ করতেন না। যাদের যা ধর্ম তাদের সেই ধর্মের নীতি অনুযায়ী তারা বিচার করতেন। ইংরেজরা এ নীতি মেনে নেন। তিন কারণে ইংরেজরা এ নীতি মেনে নেন। প্রথমত তারা প্রচলিত নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাননি। যেমন ছিল তেমন চলুক এটা তারা ভাল মনে করেছিলেন। দ্বিতীয়ত তারা এসেছিলেন বাণিজ্য করতে, নতুন কিছু করলে তাদের ব্যাঘাত হতে পারে এ আশঙ্কায় তারা আর নতুন কিছু করেননি। তৃতীয়ত এ দেশবাসীর ধর্মীয় বিশ্বাসে তারা আঘাত দিতে চাননি। মরলি বলেন, হিন্দু বা ইসলামী আইন পরিবর্তনের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে ইংরেজের আইন ভাল কি মন্দ সে বিবেচনা নিরর্থক। সে কথা প্রাথমিক ভাবে চিন্তার মধ্যে আনাই উচিত নয়। এ দু' আইন এ দেশের মানুষের বর্তমান সামাজিক অবস্থায় খুবই উপযোগী এবং অনুকূল। তাদের আকাঙ্খা এবং সংস্কারের প্রতিফলন এ আইনের মধ্যে পাওয়া যায়। এ আইনের সাথে তাদের ধর্ম বিশ্বাসও জড়িত। আমরা তাদের সাথে কোন চুক্তি করিনি সত্য, তবে অনেক ঘোষণার মাধ্যমে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, তাদের রীতিনীতি এবং বিশ্বাসে আমরা আঘাত করব না।

১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে রাজা দ্বিতীয় জর্জ এ নীতি অনুমোদন করে সনদ প্রদান করেন। ১৭৭২ সালে যখন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি এ দেশের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন বলা হয় যে, মৌলভী এবং পণ্ডিতগণ আদালতে বিচার কার্যে সহায়তা করবেন। অবশেষে ১৭৮০ সালের প্রখ্যাত রেগুলেশনের ২৭ ধারায় বলা হয়, উত্তরাধিকার বিবাহ, বর্ণ এবং অন্যান্য ধর্মীয় আচরণ এবং প্রতিষ্ঠানের মামলার বেলায় মুসলিমদের জন্য কুরআনের আইন প্রয়োগ এবং হিন্দুদের বেলায় শাস্ত্রের আইন প্রয়োগ করা হবে। মামলার এক পক্ষে মুসলিম এবং অপর পক্ষে হিন্দু বলে বিবাদীর ধর্মীয় আইন অনুসৃত হবে। বর্তমানে সমগ্র শারী'আতি আইন এদেশে প্রচলিত নেই। শারী'আতি আইনের কিছু বিদেশের আইন দ্বারা বলবৎ করা হয়েছে আর কিছু অংশ এদেশে সুবিচারের নীতিতে প্রয়োগ করা হয়। এদেশে অবশিষ্টাংশের কোন প্রয়োগ নেই।

মুসলিম আইন প্রয়োগের পদ্ধতি ও সীমা

বাংলাদেশে মুসলিম আইনের বিধানসমূহ দু'ভাবে প্রয়োগ করা হয়।

১। সংসদ বা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত মুসলমানদের ক্ষেত্রে বিধানসমূহ, যেমনঃ (ক)উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন,

(খ) পারিবারিক সংক্রান্ত আইন,

(গ) ওয়াকফ সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি।

২। মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা ও সুনীতিবোধ, যেমন পূর্বে সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রক্রয় অধিকার সংক্রান্ত মুসলিম আইনের বিধানসমূহ এ নীতি ভিত্তিকই ছিল। বর্তমানে অবশ্য অগ্রক্রয়ের অধিকার ১৯৫০ সনের প্রজাস্বত্ব আইনে সংরক্ষিত হয়েছে।

সীমারেখা

যে সকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ মুসলমান হলেও মুসলিম আইন প্রযোজ্য নয়। উভয় পক্ষ মুসলমান হওয়া স্বত্বেও মুসলিম আইনের কোন কোন বিধান বাংলাদেশে আদৌ প্রযোজ্য হবে না। যেমন মুসলিম ফৌজদারী আইন, মুসলিম সাক্ষ্য আইন ইত্যাদি।

যে সকল বিধানসমূহ স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নয়

মুসলিম আইনের কোন বিধান মুসলমানদের উপর কোন বিষয়ে প্রয়োগ করতেই হবে এমন কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকলে অথবা আইন সংসদ বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে অথবা অন্তর্নির্হিতভাবে পরিত্যক্ত হলে, ঐ সকল বিধান তাদের উপর প্রয়োগ করা যাবে না। বাংলাদেশে সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে, অগ্রাধিকার সম্পর্কিত মুসলিম আইনের বিধানসমূহ কোথাও স্পষ্টভাবে প্রয়োগের নির্দেশ নাই, তবে পরিত্যক্ত নয়। মুসলমানদের উপর যে সব স্থানে উক্ত বিধানসমূহ প্রযুক্ত হওয়া থাকে উহা শুধু সুনীতিবোধের উপর ভিত্তি করে, নন এস্টেট অ্যাকুইজিশন অন এগ্রিকালচারাল টেনান্সি অ্যাক্টে উহা আইন দ্বারাও প্রযুক্ত হয়ে থাকে, কারণ সেখানে সম্পত্তি ক্রয়ের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য "বিশেষ আইন" চালু রয়েছে এবং উক্ত আইন সেখানকার মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

পদ্ধতিগত প্রশ্নে বাংলাদেশের আদালতসমূহ উহাদের নিজস্ব পদ্ধতি দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে, মুসলিম আইন দ্বারা নয়। সাবির হোসেন বনাম ফর্যহান্দ হাসান। মোকদ্দমা জবাবের বাধা অথবা সম্পত্তি হস্তান্তর

Dhaka University Institutional Repository

সংক্রান্ত প্রশ্নসমূহ সাধারণ দেওয়ানী আইনের মাধ্যমেই নিস্পত্তি হয়ে থাকে, এমনকি বাদী বিবাদী উভয় পক্ষ মুসলমান হলে ঐ একই আইনে বিবাদের নিস্পত্তি হবে।

ভারতে হেবার ক্ষেত্রে মুসলিম আইনের প্রয়োগ

ভারতের প্রায় সকল রাজ্যেই আদালতে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১২৩ ধারাটি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও হেবার ক্ষেত্রে মুসলিম আইনকে মুসলিমদের ব্যক্তিগত আইনও সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা, সুনীতিবোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ করেছেন। এজন্য যে, সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১২৯ ধারা ১২৩ ধারার ব্যবস্থাকে মুসলিমদিগের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য করে দিয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে মুসলমানগণের শারী'আত আইন প্রযোজ্য হবে। কিন্তু বার্মাতে রেঙ্গুন হাই কোর্টের মতে, হেবার ক্ষেত্রে মুসলিম আইনের যে নীতিটি প্রযুক্ত হয়েছিল, তা মুসলিম আইনের বিধান হিসেবে নয় বরং সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা ও সুনীতিবোধের নিয়ম হিসেবেই হয়েছিল। অতএব, ১২৯ ধারার সুযোগ গ্রহণের কোন অবকাশ সেখানে নেই এবং তাই ১২৩ ধারাটি বার্মায় হেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর কারণ এই যে, বার্মাতে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনটি প্রয়োগের পূর্বে সেখানকার কোন এক জেলায় ১২৯ ধারাটি বাদ দিয়ে কেবল সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১২৩ ধারার প্রয়োগে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। সম্পত্তি দখল প্রদানের ক্ষেত্রে মুসলিম আইনের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রিকৃত সত্যায়িত দলিল সংক্রান্ত প্রশ্নে ১২৩ ধারার চাহিদাকে জোর দিয়ে চালু করাই ছিল উক্ত বিজ্ঞপ্তির উদ্দেশ্য। অবশ্য পরবর্তী এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পূর্বোক্ত বিজ্ঞপ্তি বিলুপ্ত করে হস্তান্তর আইনের ১২৯ ধারাসহ সমগ্র আইনটি বার্মায় কার্যকরি করা হয়।

বাংলাদেশে হেবার ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের প্রয়োগ

বাংলাদেশে হেবা ইসলামী আইনের বিধান অনুযায়ী কার্যকরি। ইসলামী আইনের বিধান অনুযায়ী হেবার বৈধতার জন্য তিনটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত এই যে, (১) দাতা কর্তৃক দানের কথা ঘোষণা করতে হবে। (২) দান গ্রহীতা কর্তৃক কিংবা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্পষ্টভাবে বা অন্তর্নিহিতভাবে উক্ত দানটি গ্রহণ করতে হবে। (৩) দাতা কর্তৃক গ্রহীতাকে দানের বিষয়বস্তুর দখল প্রদান করতে হবে। উপরোক্ত শর্তগুলি পালিত হলে মৌখিক দান হলেও বা দানের দলিলটি রেজিস্ট্রি না হলে বা সত্যায়িত না হলে দানটি সম্পূর্ণ হবে, অন্যথায় দানের দলিল সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১২৩ ধারা মতে রেজিস্ট্রি হলেও কার্যকরি হবে না। শারী'আত আইনের ২ ধারা অনুযায়ী অবশ্য কৃষি জমির ক্ষেত্রে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন অচল বলে বিধিবদ্ধ আছে। যা হউক বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগ জাবেদ আলী বনাম আবু শেখের মোকদ্দমায় মুসলিম অ-কৃষি ভূমি দানের ক্ষেত্রেও রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন নাই বলে রায় দিয়েছেন।

পশ্চিম বাংলায় ইসলামী আইন

এই রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে হাই কোর্টসমূহের আপাততঃ সাধারণ দেওয়ানী এখতিয়ার বহির্ভূত এলাকাসমূহ ব্যতীত অন্যান্য এখতিয়ারভূক্ত এলাকার ক্ষেত্রে প্রণীত আইনে বলা হয়েছে যে,উত্তরাধিকার, মিরাস, বিবাহ অথবা যে কোন ধর্মীয় প্রথা অথবা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত প্রশ্নে ঐ সকল রাজ্যের দেওয়ানী আদালতসমূহ, মুসলমান পক্ষ দ্বয়ের ক্ষেত্রে একমাত্র আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনের যতদূর ইসলামী আইনের পরিবর্তন অথবা বিলোপ সাধিত হয়েছে, ততটুকু ব্যতীত আর সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের বিরোধের সিদ্ধান্ত করবেন, উপরোল্লেখিত হয় না অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনেও কোন ব্যবস্থা নাই এমন কোন মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সুবিচার ন্যায়পরায়ণতা ও সুনীতিবোধের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।[১]

[১] এম মনিরুজ্জামান, মোঃ সাঈদুল হক সাঈদ, শাহনাজ পারভীন, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন,* পৃ. ৪৯- ৬২, ধানসিঁড়ি পাবলিকেশন, ঢাকা, (৮ম সংস্করণ)।

মুসলিম আইনের ইতিহাস

পুরাতন আরব প্রথা

মুসলিম আইনের ক্রমবিকাশ উপলব্ধি করতে হলে, পুরাতন আরব প্রথা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া একান্ত আবশ্যক। কারণ পুরাতন আরব প্রথা সূন্নাহ এবং হাদীসের মাধ্যমে গৃহীত হয়ে মুসলিম আইনে সংযোজিত হয়েছে এবং এ গ্রহণ প্রক্রিয়া এতদূর ব্যাপকভাবে কার্যকরি হয়েছে যে, যদি কোন প্রথা অনুসারে কোন মুসলিম কোন কার্য করত এবং উহা হযরতের গোচরে আনিত হত এবং হযরত উহার সম্বন্ধে নির্বাক থাকতেন তা হলেও উহা মুসলিম আইন সম্মত বলে ধার্য করা হত। সুতরাং আমরা উক্ত প্রথাগুলো মুসলিম আইনের বিধি হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছি। ইহা ব্যতীত কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, কোন কোন প্রথা হযরতের হাদীস কিংবা সূন্নাহর দ্বারা নাকচ করা হয়েছে। আবার কোন কোন প্রথা কুরআন ও হাদীস দ্বারা গৃহীত কিংবা সংশোধিতও হয়েছে। সুতরাং পুরাতন আরব প্রথা সম্বন্ধে আমাদের সাধারণভাবে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং এই জ্ঞান, ব্যক্তি সম্পর্ক সম্বন্ধীয় যে আইন (LAW OF PERSONS) বর্তমান রয়েছে, শুধু তার পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধান করতে হবে। অর্থাৎ কার্যবিধি কিংবা তদ্রূপ অন্য কোন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতন আরব প্রথার সম্বন্ধে জ্ঞানান্বেষণ সম্পূর্ণ অবান্তর হবে। কারণ আমাদের উপমহাদেশে শুধুমাত্র ব্যক্তি সম্পর্ক সম্বন্ধীয় মুসলিম আইনই প্রচলিত রয়েছে। এইক্ষণে শুধুমাত্র ব্যক্তি সম্পর্ক সম্বন্ধীয় পুরাতন আরব প্রথাগুলির উল্লেখ করা হচ্ছে। কারণ উহা ইসলাম কর্তৃক কতদূর গৃহীত, বর্জিত, কিংবা সংশোধিত হয়েছে, তা বর্তমানের মুসলিম আইন পাঠ করলে বোধগম্য হবে। পুরাতন আরব প্রথাসমূহ এরূপ ছিলঃ[২]

যৌন সম্বন্ধ স্থাপনকারী প্রথাসমূহ

যৌন সম্বন্ধ স্থাপনকারী প্রথাসমূহ বিবাহ আখ্যায় আখ্যায়িত হলেও এবং সন্তানদেরকে উহা পূর্ণমাত্রায় সর্ব প্রকার অধিকার প্রদান করলেও, যে কতিপয় বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, ইহার মধ্যে শুধুমাত্র একটি ইসলামের পক্ষে গ্রহণ যোগ্য ছিল। ইহা ছিল কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির কন্যা কিংবা আশ্রিত কোন মেয়েকে বিবাহ করার প্রস্তাব করত এবং দেনমোহর প্রদান করে উক্ত বিবাহ করত।

দ্বিতীয় প্রকার প্রথা বর্তমান ছিল তদনুসারে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলত "অমুককে আসতে বল এবং তার সঙ্গে সহবাস কর"। এই বলে স্বামী গৃহ ত্যাগ করে চলে যেত এবং গর্বের লক্ষণ দর্শন করার পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করত। ইহার উদ্দেশ্য ছিল বংশে খানদানি রক্ত আমদানি করা। আব্দুর রহিমের মতে ইহা পুরাতন হিন্দু বিবাহ 'নিয়োগ প্রথা'র অনুরূপ ছিল।

---

২ *আবদুর রহীম হতে গৃহীত*

তৃতীয় প্রকার প্রথা ছিল অনধিক দশ ব্যক্তি কোন রমণীর গৃহে গমন করত এবং তার সঙ্গে সহবাস করত। যদি উক্ত রমণী গর্ভধারণ করত এবং কোন সন্তান প্রসব করত, তখন সে যারা তার আবাসে যাতায়াত করত, তাদেরকে আহবান করত। আইন অনুসারে তারা উপস্থিত থাকতে বাধ্য হত। অতঃপর রমণীটি তাদের কোন ব্যক্তিকে বলত, আপনারা জানেন কী কাণ্ড ঘটেছে, আমি এখন একটি সন্তান প্রসব করেছি। এই যে আপনি অমুক (নাম ধরে যাকে ইচ্ছা বলত) এই আপনার সন্তান। এই সন্তান তখন তারই বলে গণ্য হত, তাকে অস্বীকার করার কোন অবকাশই প্রদান করা হত না।

চতুর্থ প্রকার প্রথা ইহা অপেক্ষা হীন ছিল, উহা বেশ্যাবৃত্তির নামান্তর ছিল বললেই হয়। যথাঃ কোন কোন রমণী তাদের তাঁবুর সম্মুখে একটি পতাকা উত্তোলন করে রাখত। ইহার অর্থ ছিল যার ইচ্ছা আগমন করতে পারে, তবে তারা সংখ্যায় অনধিক একশত হবে এবং যে সব পুরুষ উপগত হত তাদের একটি তালিকা তার নিকট রাখত। সন্তান হওয়ার পর ঐ রমণী উক্ত লোকদিগকে আহবান করত, তারা উপস্থিত হলে মুখাবয়ব দর্শন করে সাদৃশ্য নির্ণয় করতে সক্ষম এই রূপ একজন বিশারদকে আমন্ত্রণ করা হত। সে এসে স্থির করত সন্তান কার। আবদুর রহিমের মতে প্রথমোক্ত বিবাহ প্রথা অর্থাৎ যেটা ইসলাম গ্রহণ করেছে, ইহাই সম্ভবতঃ সর্বশেষ প্রথা হিসেবে পরিবর্তিত হয়েছিল। কারণ অন্যান্য প্রথাগুলিকে বিবাহ বলা যায় না। সুতরাং ইহাকে বিবাহ বলে ধার্য করা পরস্পর বিরোধী মতকে সমন্বয় করার বৃথা চেষ্টা মাত্র।[৩]

মু'তা বিবাহ

এই সব বিবাহের সঙ্গে স্বতন্ত্র ভাবে মু'তা বিবাহ প্রচলিত ছিল। এ বিবাহ ছিল সাময়িক। "যখন কোন ব্যক্তি কোন মেয়ের কাছে আগমন করত এবং তথায় তার (সংসারের ভার গ্রহণ করার জন্য) পরিচিত কেউ থাকতনা, যতদিন সেখানে অবস্থান করবে মনে করত ততদিনের জন্য একটি বিবাহ করে নিত, যাতে সে রমণী তার সংসার এবং শয্যা উভয়েরই অন্নশীদার হতে পারে"।[৪]

দেনমোহর

প্রথম প্রকারের বিবাহ যেটা নিয়মতান্ত্রিক ছিল, তাতে দেনমোহর দেয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহা বিবাহ চুক্তির অংশ ছিল, কিন্তু অধিক ক্ষেত্রেই কন্যার পিতা কিংবা অভিভাবক ইহা গ্রহণ করত। অবশ্য সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয় কন্যার পিতা কিংবা অভিভাবককেই ইহা প্রদত্ত হত কি না। ইহাও হওয়া সম্ভব যে আদিতে কন্যার পিতা কিংবা অভিভাবকেরই উহা প্রাপ্য ছিল, সুতরাং ইহা কন্যার বিক্রয়মূল্য হিসেবে তাদেরকে প্রদান করা

৩ মুসলিম আইন, *নুরুল মোমেন,* প্রথম প্রকাশ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪/জুন ১৯৭৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: পৃ. ৭

৪ ফাতহুল কাদির: *আব্দুর রহীম* কর্তৃক উল্লিখিত।

হত।[৫] কোন কোন সময়ে এমনও হত যে কোন ব্যক্তি তার কন্যা কিংবা ভগ্নীকে অন্যলোকের সঙ্গে বিবাহ দিত এবং ইহার পরিবর্তে ঐ ব্যক্তির কন্যা কিংবা ভগ্নীকে নিজে বিবাহ করত এবং ঐ এওয়াজের জন্য কেহই কোন প্রকার দেনমোহর প্রদান করত না। ইহার দ্বারা উভয় রমণীকে দেনমোহর হতে বঞ্চিত করা হত।[৬] এতেই প্রমাণ হয় যে, দেনমোহর প্রদান ও গ্রহণের অধিকারী ছিল নারীর অভিভাবক শ্রেণির ব্যক্তিগণ, যারা দেনমোহরকে নারীর মূল্য হিসেবে গ্রহণ করত।

নারী বিবাহের কর্তা ছিল না

প্রাক ইসলামী যুগে কোন নারীর স্বেচ্ছায় বিবাহ করবার ক্ষমতা ছিল না; তা সে যুবতী, কিংবা বৃদ্ধা যেই হোক না কেন; পিতা, ভ্রাতা কিংবা অন্য কোন পুরুষ অভিভাবক তাদেরকে বিবাহ দান করত এবং বল প্রয়োগেও বিবাহ বন্ধনে নারীকে আবদ্ধ করা হত। যদি কোন ব্যক্তি কোন বিধবা রেখে মৃত্যুমূখে পতিত হত, তা হলে তার পুত্র কিংবা অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ তৎক্ষণাৎ উক্ত বিধবাগণের উপর একটি চাদর সম্প্রসারণ করে ফেলে দিত, এবং যাদের উপর ঐ চাদর পতিত হত, আপন মাতা ব্যতিরেকে, তারা সকলেই তার উত্তরাধিকারভুক্ত হত এবং ঐ উত্তরাধিকারীগণ অন্যান্য সম্পত্তির মতই তাদের উপর সর্ব প্রকার অধিকার প্রাপ্ত হত। আর যারা ঐ চাদর সম্প্রসারিত হওয়ার পূর্বেই পলায়ন করে মুক্তি লাভ করত, তাদেরকে তাদের প্রাপ্য দেনমোহর প্রদান করা হত না।[৭]

স্ত্রীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল না

আরবগণ যত সংখ্যক ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করতে সক্ষম ছিল। বহু স্ত্রী গ্রহণ প্রথানুযায়ী সর্বত্র অত্যধিক প্রচলিত ছিল। এই স্ত্রীর সংখ্যার মধ্যে দাসীগণ গণনাভুক্ত হত না।

সম্পর্ক নিষিদ্ধ বিবাহ প্রথা

আরবে ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে সম্পর্ক অনুযায়ী বিবাহের প্রথা কোন কোন ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ থাকলেও ইহা অধিক ব্যাপক ছিল না। অবশ্য ইহা নিঃসন্দেহে ধরা যায় যে, আরবগণ কর্তৃক তাদের মাতা, পিতামহী, মাতামহী, ভগ্নী, কন্যা এবং পুত্রীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ ছিল। তবে হয়তো তাদের মাতৃ- পিতৃসমা কিংবা ভাইঝি ভাগিনীকে বিবাহ করতে কোন প্রকার বাধা ছিল না। ম্যাজিয়ান ধর্মাবলম্বীগণ তাদের নিজ কন্যা কিংবা

---

[৫] ফৈজী : Encyclopedia of Islam: Taybji.

[৬] এই বিবাহকে 'সিগার' (شغار) বিবাহ বলা হত।

[৭] কাশফুল গাম্মা: *আব্দুর রহীম* কর্তৃক উল্লিখিত।

ভাগিনীকে বিবাহ করতে পারত। আরবগণের মধ্যে কিন্তু তাদের সৎমাতাকে কিংবা একসঙ্গে দুই সহোদরকে বিবাহ করতে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না।

তালাক

আরবগণ ইচ্ছামত তালাক প্রদান করতে পারত। কোন প্রকার কারণ না দর্শাইয়া তারা তালাক দিতে সক্ষম ছিল এবং যতবার ইচ্ছা তালাক দিয়া উহা আবার নাকচ করে স্ত্রীকে পুণরায় গৃহে ফিরে আনতে পারত। ইহাতে স্ত্রীগণ কখনও স্বামীর কবল হতে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারত না। সাধারণ তালাকের সঙ্গে ঈলা, জিহার ও খুলা এই তিন প্রকার তালাকও প্রচলিত ছিল। ইদ্দত পালন করার প্রথাও প্রচলিত ছিল।

দত্তক গ্রহণ

দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে যে প্রথা প্রচলিত ছিল ইহা হিন্দু প্রথা হতে স্বতন্ত্র। কারণ এই দত্তক গ্রহণ কোন প্রকার পুত্রচ্ছায়ার কল্পনা অর্থাৎ Fiction এর উপর নির্ভরশীল ছিল না। সুতরাং যে কোন বয়সের লোককে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করা যেত এবং গ্রহণকারীর কোন পুত্র থাকলেও দত্তক গ্রহণে কোন বাধাবিঘ্ন ছিল না। দত্তক পুত্র দত্তক গ্রহণকারীর পরিবারের সামিল হয়ে যেত এবং তার পুত্রদের মতই অধিকার প্রাপ্ত হত এবং সর্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করত।

উইলক্রমে সম্পত্তি প্রদান

আরবগণ উইল করে তাদের সম্পূর্ণ সম্পত্তি কাউকে প্রদান করে যেতে পারত। ইহার কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না, তারা গড়- উত্তরাধিকারী (Stranger) কিংবা উত্তরাধিকারী (Heirs), যাকে যত পরিমাণ ইচ্ছা সম্পত্তি উইল দ্বারা প্রদান করতে সক্ষম ছিল।

উত্তরাধিকার প্রথা

প্রাক ইসলামী যুগে উত্তরাধিকার ছিল রক্ত ভিত্তিক, যারা স্বগোত্র অর্থাৎ রক্তের মাধ্যমে পুরুষ পরম্পরা সম্পর্কিত, তারাই শুধু উত্তরাধিকারী হতে পারত। তাদের অগ্রাধিকার এরূপ ধার্য করা হত।

(১) পুত্র, তস্যপুত্র, তস্য তস্য পুত্র- যতই নিম্নগামী হোক না কেন, প্রথমে তারাই মৃতের সম্পত্তি প্রাপ্ত হবে। উহাদের অবর্তমানে-

(২) পিতা, তস্য পিতা, তস্য তস্য পিতা- যতই ঊর্ধ্বগামী হোক না কেন তারা প্রাপ্ত হবে এবং উহদের অবর্তমানে-

(৩) পিতার পুত্র (অর্থাৎ ভ্রাতা), তস্য পুত্র (অর্থাৎ ভ্রাতার পুত্র), এবং তস্য তস্য পুত্র- যতই নিম্নগামী হোক না কেন, তারা প্রাপ্ত হবে এবং উহাদের অবর্তমানে-

(৪) পিতার পিতার পুত্র (অর্থাৎ খুল্লতাত), তস্য পুত্র, তস্য তস্য পুত্র- যতই নিম্নগামী হোক না কেন, তারা প্রাপ্ত হবে।

এরূপে ইহা ক্রমশঃই দূরে বিস্তার লাভ করতে থাকত। উহাদের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক কিংবা স্ত্রীলোকের মাধ্যমে সম্পর্কিত কোন পুরুষ থাকত না এবং স্ব- গোত্র হলেও কোন উন্মাদ, অথর্ব কিংবা কোন নাবালক উত্তরাধিকারী হতে পারত না। কারণ তারা অস্ত্রধারণ করতে সক্ষম ছিল না। এই চিন্তাধারা এবং প্রয়োগ কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হলে মুসলিম আইন যে চারটি সাময়িক পর্যায়ের মারফতে বর্তমান আইনে এসে উপনিত হয়েছে, তা জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন।[৮]

মুসলিম আইনের ক্রমোন্নতির চারটি সাময়িক পর্যায়

মুসলিম আইন আল্লাহ প্রদত্ত। সকল আইনের উৎস আল্লাহ। আল্লাহ-ই- একমাত্র আইন প্রণেতা। সুতরাং মুসলিমগণ এমন কোন আইন প্রণয়ন করতে সমর্থ নয়, যা আল্লাহ প্রদত্ত বিধির ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হতে পারে। তবে হযরত (সা) এর বাণী ও কার্যাবলী স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ আশ্রিত বলে ধার্য হয়। সুতরাং উহাকেও আইন প্রণয়নের আদি উৎস হিসেবেই গ্রহণ করা হয়। মুসলিম আইনের ক্রমোন্নতির সাময়িক পর্যায় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে পূর্বোক্ত উক্তি স্মরণ রাখতে হবে। সাময়িক পর্যায়গুলি সম্বন্ধে যদিও বিভিন্ন মতবাদের অবকাশ রয়েছে, তবুও উহার মধ্যে আবদুর রহিমের মতবাদ-ই- সর্বপ্রথমে প্রদত্ত হল। আবদুর রহিমের মতে ইসলাম প্রচার হওয়ার পরবর্তীকালের আইনের ক্রমোন্নতিকে চারটি পিরিয়ড বা সাময়িক পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে।

প্রথম পর্যায়

১- ১০ হিজরী (৬২২- ৬৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)

প্রথম পর্যায় হযরত (সা) এর হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার পর হতেই অর্থাৎ প্রথম হিজরী হতে আরম্ভ হয় এবং ইহা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ দশম হিজরীতে সমাপ্ত হয়। এই সময়ক্রমটিকে বস্তুতঃ 'লেজিসলেটিভ পিরিয়ড' অথবা 'আইন প্রণয়নকাল' বলে অভিহিত করা হয়। কারণ এই সময় আল্লাহ প্রদত্ত আইনাবলী কুরআনের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয় এবং হযরত (সা) এর সূন্নাহ ও হাদীসের মাধ্যমে উহা বর্ধিত কিংবা পরিপূর্ণ

[৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯- ১০

হতে থাকে। মুসলিম আইনের মূল উৎস হল কুরআন এবং সুন্নাহ। হযরত (সা) এর নবুয়্যত প্রাপ্তির পর তাঁর নিকট কুরআনের আয়াত ওহী অর্থাৎ আল্লাহর প্রত্যাদেশ হিসেবে অবতীর্ণ হতে থাকে। ইহাতে আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব ভাষায় তাঁর আজ্ঞাও আদেশাবলী প্রকাশিত হয়। ইহা আদি ও অনন্তকাল হতে রক্ষিত ছিল এবং হযরত (সা) এর নিকট বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হত। এই আয়াতগুলির মধ্যে আইন সংক্রান্ত আজ্ঞাও বর্তমান ছিল এবং বহু ক্ষেত্রে উহা ততকালীন আইনের উদ্ভূত প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবতীর্ণ হত। অনেক ক্ষেত্রে পূর্বের আয়াত সংক্রান্ত আজ্ঞাকে রদ করে পরবর্তীকালে নতুন আয়াত নাযিল হত।

হযরত (সা) এর জীবদ্দশায় আল্লাহ প্রদত্ত আইনের দ্বিতীয় উৎস ছিল আ' হাদীস অর্থাৎ হযরত (সা) এর বাণী। অনেক সময় এমন প্রশ্ন উত্থিত হত যার উপর কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হয়নি, কিংবা যা বিবেচনা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষায় রয়েছে, তখন উক্ত বিষয় সম্বন্ধে হযরত (সা) যে মত প্রকাশ করতেন উহা পবিত্র আল্লাহ প্রদত্ত বিধির অনুরূপ হিসেবেই গৃহীত হত। কারণ আইন ও ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর প্রদত্ত বাণী এবং কার্যাবলী আল্লাহ কর্তৃক অনুপ্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত হত। সুতরাং হাদীস ও সুন্নাহর মাধ্যমে অর্থাৎ তাঁর বাণী ও কার্যাবলীর দ্বারা ন্যায় ও সত্য নির্ধারণ কুরআনের আয়াত দ্বারা ন্যায় ও সত্য নির্ধারণের অনুরূপ ছিল এবং এই আল্লাহ প্রদত্ত আইন প্রণয়নের ত্রিবিধ উৎস ছিলঃ আদি ও প্রথম উৎস ছিল 'যাহির' অর্থাৎ প্রত্যাদিষ্ট এবং সুস্পষ্ট। ইহা হল আল্লাহর বাণী যা কুরআনের আয়াত হিসেবে জিবরাঈল (আ) হযরত (সা) এর নিকট বহন করে আনতেন।

তৃতীয় উৎস ছিল 'বাতিন' অর্থাৎ অন্তঃস্থ। কোন কোন ক্ষেত্রে জিবরাঈল (আ) কোন কোন বিষয়ের শুধুমাত্র ইঙ্গিত প্রদান করতেন এবং হযরত (সা) তাঁর নিজস্ব জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা উহা ব্যাখ্যা করে পরিবেশন করতেন। ইহা হইল প্রথম প্রকারের বাতেনী উৎস। আবার কখনো কখনো ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা দ্বারা জ্ঞান লাভ করে হযরত (সা) তাঁর মত প্রদান করতেন। ইহাকে দ্বিতীয় প্রকারের বাতেনী উৎস বলে ধার্য করা হয়। এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় উৎস হতে প্রাপ্ত মতকে মুসলিম আইনবিশারদগণ 'হাদীস' আখ্যায় আখ্যায়িত করেন। কোন বিষয়ে যুক্তি- তর্কের অবতারনার আকারে কিংবা কোন উত্থাপিত প্রশ্ন সমাধান কল্পে হযরত (সা) এই বাতেনী অনুপ্রেরণা লাভ করতেন। এই 'বাতিন' উৎস আল্লাহ প্রদত্ত হলেও উহা কুরআন হতে ভিন্ন নহে; উহা কুরআনকেই অনুসরণ করে। কারণ হযরত (সা) বলেছেন 'আমার উক্তি আল্লাহর বাণীর প্রতিকুল নহে, কিন্তু আল্লাহর বাণী আমার উক্তিকে অস্বীকার করতে পারে'।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পর্যায়

১০- ৪০ হিজরী (৬৩২- ৬৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)

১০ হিজরী হতে ৪০ হিজরী অর্থাৎ চারজন খলিফা খোলাফায়ে রাশেদীনের এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে ধার্য করা হয়। হযরত (সা) ৬৩২ খৃস্টাব্দে, হিজরীর একাদশ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 'আইন প্রণয়ন' কাল সমাপ্ত হয়; কারণ তাঁর মৃত্যুতে আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহের সমাপ্তি হয়। পরবর্তীকালের খোলাফায়ে রাশেদীন শাসনকার্য পরিচালনা করতেন, কিন্তু তাঁদের আইন প্রণয়নের কোন ক্ষমতা ছিল না তাঁরা কুরআন এবং সুন্নাহ অবলম্বন করে শাসন করতেন।

হযরত (সা) এর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করার ব্যাপারে মুসলিমগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। শিয়াগণ দাবি করে যে, হযরত (সা) এর বংশ হতে খলিফা নির্বাচিত হবেন; পক্ষান্তরে, অন্য সকল মুসলমান মত প্রকাশ করে যে, খলিফা জামা'আত অর্থাৎ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন এবং তদানুসারে হযরত আবূ বকর (রা) প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফা হিসেবে তিনি অবশ্য সর্ব প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন, কিন্তু তাঁর সার্বভৌম কোন ক্ষমতা কিংবা রাজকীয় কোন অধিকার ছিল না। তিনি কুরআন, সূন্নাহ ও হাদীস অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করতেন মাত্র, কোন নতুন আইন প্রণয়ন করে প্রয়োগ করা তাঁর ক্ষমতা বহির্ভূত ছিল। কারণ ইসলামে আল্লাহ তা'আলাই আইনের একমাত্র বিধানকর্তা।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত এবং সূরাসমূহ এবং হাদীস সংগ্রহ করে একত্রিত করার প্রয়োজন অনুভূত হল। হযরত (সা) এর সময়ে কুরআনের আয়াতসমূহ কণ্ঠে কণ্ঠে, খেজুর পত্রে এবং প্রস্তর- ফলকে রক্ষিত হয়ে আসতেছিল। হযরত উমরের প্রস্তাবক্রমে হযরত আবূ বকর উহা তিন বৎসরের মধ্যেই সংগ্রহ করে একত্রিত করান। হযরত (সা) এর একান্ত নিকটবর্তী আসহাব হযরত যায়েদ উক্ত দায়িত্ব পালন করেন। তথাপি কিয়ত পরিমাণ অননুমোদিত আয়াত দুর্ভাগ্যক্রমে উহার মধ্যে স্থান লাভ করে। পরবর্তীকালে তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা) হযরত যায়েদ (রা) কে উক্ত আয়াতগুলিকে বিচ্ছিন্ন করতে বলেন এবং সংগৃহীত আসল আয়াতসমূহ কুরআনে রক্ষা করে অন্যান্য অননুমোদিত আয়াতসমূহকে ধ্বংস করে দেন। তজ্জন্যই বর্তমানে মুসলিম জগত কুরআনকে একমাত্র প্রকৃত এবং প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছে। তৎকালে হাদীস ও সূন্নাহর অভাব সমভাবে অনুভূত হলেও উহা রাষ্ট্রের পৃষ্টপোষকতায় সংগৃহীত করার কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। হযরত (রা) যখন দেখিলেন যে, অত্যধিক আগ্রহের ফলে লোকে নানাবিধ অলিক হাদীস এবং সূন্নাহ সংগ্রহ করছে, তখন তিনি উহা হতে তাদিগকে নিবৃত্ত করার প্রচেষ্টা করলেন। এমনকি কিছু কালের জন্য সক্ষমও হলেন; কিন্তু সূন্নাহ ও হাদীস সংগ্রহকারীদিগকে শেষ পর্যন্ত নিবৃত্ত করতে সক্ষম হননি।

এই সাময়িক পর্যায়ে সুন্নাহ ও হাদীসের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হত এবং যখন কোন ব্যাপারে কুরআন হতে কোন নির্দেশ কিংবা হাদীস ও সুন্নাহ হতে কোন ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যেত না, তখন সাহাবীগণ যারা সকল সময় হযরত (সা) এর সাহচর্যে দিনযাপন করতেন তাঁরা উহার কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিতেন এবং তাঁরা হযরত (সা) এর সঙ্গে এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় ইহা ধার্য করা হত যে, তাঁরা হযরত (সা) এর মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবজাত অনুপ্রেরণা দ্বারা যে প্রথা গ্রহণযোগ্য মনে করতেন উহা সঠিক প্রথাই হবে। তাদের এই যুক্ত মতকে 'ইজমা' বলা হয় এবং অদ্যাবধি উহা ইজমা হিসেবে আইনের অন্যতম উৎস বলে পরিগণিত হয়। এমনকি তাঁদের বিচ্ছিন্ন মতকেও কম গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। মুসলিম আইনের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে এই দ্বিতীয় পর্যায়ে, আইনের তৃতীয় উৎস হিসেবে 'ইজমা'র উদ্ভব হয়েছিল তাই নহে, পরন্তু প্রথম খলিফার নির্বাচনেও এই ইজমা' স্বীকৃত হয়েছিল। জনসাধারণের ইজমা' কর্তৃক তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তৃতীয় পর্যায়

(৪০ হিজরী হতে হিজরীর তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত)

খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ খলিফা হযরত 'আলী (রা) ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে শাহাদাত বরণ করার অনতিকাল পরে দ্বিতীয় পর্যায় সমাপ্ত হয়। এই মুসলিম আইনের ক্রমোন্নতির ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সময়ে যে পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্ট হয় তার মধ্যেঃ

(১) হাদীস সংগ্রহের উৎসাহ সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন মনীষী কর্তৃক হাদীস সংগৃহীত হতে থাকে। যথাঃ মালিক ইবন আনাস এর মুয়াত্তা, ইবন হাম্বলের মসনদ, এবং এই সৃষ্ট পরিপ্রেক্ষিত পরবর্তীকালের জন্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হাদীস বিচার করে সংগ্রহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ফলে পরবর্তীকালে 'সিহাহ সিত্তাহ' আখ্যায় আখ্যায়িত ছয়খানি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। উহাদের মধ্যে সহীহ বুখারী, এবং সহীহ মুসলিম সর্ব শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়। আল কুরআনের পরেই প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে সহীহ বুখারীর স্থান এবং ইহাকে আইন বিজ্ঞানের সর্বোৎকৃষ্ট নির্ভরযোগ্য ভিত্তি বলে গ্রহণ করা হয়। বুখারী অত্যন্ত কঠিনভাবে 'ইসনাদ' বিচার করে ছয়লক্ষ হাদীসের মধ্যে মাত্র সাত হাজার সহীহ বলে গ্রহন করেন এবং বাকীগুলো 'গলত' বলে পরিত্যাগ করেন। অন্য চার খানি হাদীস গ্রন্থ আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ ও ইবন মাজা কর্তৃক সংকলিত হয়।

(২) সূন্নী সম্প্রদায়ের চারটি 'মাযহাব' এর উৎপত্তি হয়ঃ যথা হানাফি, মালিকি, শাফি'ঈ এবং হানাবলী। এই মাযহাবগুলির প্রতিষ্ঠাতাগণ, ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল এত ধী- শক্তি সম্পন্ন, বিধান এবং ধর্ম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন যে, পরবর্তীকালে তাঁদেরকে কেউ অতিক্রম

করতে সমর্থ হয়নি। সুতরাং তাঁরা মূল উৎস হতে ব্যাখ্যা দ্বারা আইনের যে সকল সূত্র স্থাপিত করে গিয়েছিলেন উহা অদ্যাবধি অবশ্য পালনীয় হয়ে রয়েছে। তজ্জন্য বর্তমানে মূল উৎসের নতুন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে।[৯] এই মাযহাবগুলোর প্রতিষ্ঠাতাগণ নানাবিধ পদ্ধতি দ্বারা আইন বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে ছিলেন। সাহাবীগণের এবং পরবর্তীকালের আইনবিদগণের সম্মিলিত ইজমা'কে স্বীকৃতি প্রদান করে কিয়াস প্রথাকে সম্মিলিত ভবে সকলে অবলম্বন করে এবং ব্যক্তিগতভাবে রায়, ইসতিহসান, ইসতিদলাল এবং ইসতিলাহ এতদ প্রকার নানাবিধ নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁরা আইন বিজ্ঞানকে কল্পনাতীত ভাবে সমৃদ্ধ সম্প্রসারিত করেন।

চতুর্থ পর্যায়

হিজরী তৃতীয় শতাব্দী হতে (অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ হতে) বর্তমানকাল পর্যন্ত

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর পর আইন বিজ্ঞানের স্বাধীন চিন্তানায়ক হিসেবে এমন কোন প্রতিভার অভ্যুদয় আর হয়নি, যারা পূর্বোক্ত মনীষীদের মত আইনবিদ হিসেবে এই সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করতে সক্ষম। সুতরাং পরবর্তীকালের আইনবিদগণ বিভিন্ন মাযহাবের কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে ঐ মাযহাবগুলোর প্রতিষ্ঠাতাগণের আইন সংক্রান্ত কার্য ও রচনাবলীর উপর গবেষণা করে উহা সম্পূর্ণ করার প্রচেষ্টা করেন। মাযহাবগুলোর প্রতিষ্ঠাতাগণ কুরআন ও হাদীসের মূলে গমন করে আইনের যে সূত্রগুলো স্থাপিত করে গিয়েছিলেন তাঁরা উহা অবলম্বন করেই তাঁদের গবেষণাকার্য পরিচালনা করতেন মূলে গমন করে নিজস্ব মত গঠন করার স্বাধীনতা তাঁদের ছিল না। ধী- শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যারা ধর্মশাস্ত্রে এবং আইনে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন তাঁদেরই শুধু এই কার্য করার ক্ষমতা ছিল। তাঁরা কঠোর প্রচেষ্টা দ্বারা তাঁদের সিদ্ধান্তে উপনিত হতেন। এই প্রচেষ্টাকে ইজতিহাদ এবং তাঁদেরকে মুজতাহিদ বলা হত। এই ইজতিহাদকে অর্থাৎ মাযহাবের প্রতিষ্ঠিত ছকের মধ্যে থেকে প্রচেষ্টা দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণকে 'ইজতিহাদ ফিল মাযহাব' বলা হত। কারণ মাযহাবগুলোর প্রতিষ্ঠাতাগণও ইজতিহাদ দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহর মূল হতে ব্যাখ্যা দ্বারা আইনের নতুন নীতি উদ্ধার করতেন এবং ঐ ইজতিহাদকে 'ইজতিহাদ ফিল মুতলাক' বলা হত।

ইহার পরবর্তীকালে আইনবিদগণের ক্ষমতা অধিকতর সীমিত হয়। ইজতিহাদের অর্থ সংকীর্ণ হয়ে যায়, স্বাধীনভাবে আইনের ব্যাখ্যার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হয় এবং তদস্থলে 'তাকলীদ' বা অনুকরণনীতি প্রবর্তিত হয়। সুতরাং এই চতুর্থ পর্যায়কে 'ফৈজি ইজতিহাদ' এবং তাকলীদের বিবর্তন পর্যায় বলে অভিহিত করেছেন।[১০] পরবর্তীকালের আইনবিদগণের পদমর্যাদা এবং ক্ষমতা ক্রমে ক্রমেই নিম্নগামী হতে থাকে

---

[৯] Aga Mahomed jaffer v Koolsoom Beebee (1897) 25 cal. 9, 18, 241. A. 196, 204

[১০] Fyzee- 35.

এবং ইমাম হতে মুফতি পর্যন্ত আইনজ্ঞদের সাতটিক্রম[১১] স্থাপিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত পরবর্তী আইনবিদগণের পূর্ববর্তী যুগের আইনবিশারদগণের মতের ব্যতিক্রমে নিজস্ব রায় প্রদান শক্তিও এমনভাবে রহিত হয়ে যায় যে বলা হয় “ইজতিহাদের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে”।

ইমাম আবূ হানিফা (৬৯৯- ৭৬৬ খৃ. ৮০- ১৫০ হি.)

ইমাম আবূ হানিফা আন নো’মান ইবন সাবিত ৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে কুফা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সুদীর্ঘ সত্তর বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁর আইন শিক্ষা লাভ হয় ইমাম জাফর আস সাদিক এর তত্ত্বাবধানে। ইমাম জাফর আস সাদিক ইমাম হোসেনের প্রপৌত্র এবং শিয়া আইনবিদগণের নেতা ছিলেন। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেকের শাসনকালে ইমাম আবূ হানিফা জন্ম গ্রহণ করেন এবং আব্বাসীয় বংশ শাসনভার লাভ করার অষ্টাদশ বৎসর পরে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বিচার বুদ্ধি ছিল অসামান্য এবং যুক্তি ছিল তিক্ষ্ণ এবং সে জন্যই তিনি অতি সহজে খুব খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ইরাকী আইনবিদগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। যে ক্ষেত্রে কুরআন, হাদীস কিংবা ইজমা’ হতে কোন প্রকার আইনের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যেত না, কিংবা হাদীস নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য হত না, সে ক্ষেত্রে তাঁরা মুক্তবুদ্ধি ব্যবহার করে নিজস্ব রায় প্রদান করতেন এবং উহা করতেন বলে তাদেরকে ‘ব্যক্তিগত রায়ের সমর্থক’ বলে অভিহিত করা হত। ইমাম আবূ হানিফা প্রকৃতপক্ষে সূন্নাহ ও হাদীসের চেয়ে নিজস্ব মুক্তবুদ্ধির বিচারের উপর এতদুর নির্ভর করতেন যে, তিনি মাত্র আঠারটি হাদীস গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই সর্ব প্রথম আইন বিধি সম্প্রসারিত করার জন্য ‘কিয়াস’ অর্থাৎ সদৃশ ঘটনা হতে অবরোহমূলক সিদ্ধান্তের প্রবর্তন করেন। এই কিয়াস- ই হানাফি আইনের বিন্যাস নীতিতে অধিকতর ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করা হয়। ইহা ব্যতীত তিনি আইনের বিচার নীতি হিসেবে ‘ইসতিহসান’ এর প্রবর্তন করেন। ইহার আক্ষরিক অর্থ হল ‘অগ্রাধিকার প্রদান’। ইহা বহুলাংশে ইংরেজী ন্যায়শাস্ত্রের ‘ইকুইটি’র অনুরূপ ছিল এবং ইহা ঐ সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল যে সব ক্ষেত্রে বিচারে ‘কিয়াস’ প্রয়োগ দ্বারা সুফল লাভ করা কঠিন হত। তখন আইনের বিধিগুলোকে ঐ বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যা ন্যায্য মনে করা হয় তদ্রূপ প্রয়োগ করে উহা সমাধান করার চেষ্টা করা হত। ইহাই হল ইসতিহসান। ইমাম আবূ হানিফা ইজমা’এর অর্থও অধিকতর ব্যাপক করেন। শুধু হযরত (সা) এর সহাবাগণের ঐক্যবদ্ধ মতের মধ্যে সীমিত না রেখে প্রতি যুগের আইনবিদগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ঐক্যবদ্ধ মতকেও ইজমা’ হিসেবে গ্রহণ করেন। বহুলোক তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করতেন। তাঁদের মধ্যে যারা পরবর্তীকালে আইনবিদ বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ইমাম জাফর। ইমাম আবূ ইউসুফ বাগদাদের প্রধান কাযী হয়েছিলেন। ইমাম আবূ হানিফাকেও কাযীর পদ প্রদান করা হয়। যখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন তখন তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং তিনি ঐ কারাগারেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মুসলমানদের মধ্যে ইমাম

---

[১১] Fyzee 35, op. *Abdur Rahim cit 182.*

Dhaka University Institutional Repository

আবূ হানিফার পন্থা অনুসরণ কারীগণই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, তুরস্ক, মিসর। আরব ও চীন দেশেই উহাদের সংখ্যা বেশী দেখা যায়।

ইমাম আবূ হানিফা সম্বন্ধে একটি কথা বিশেষ ভাবে প্রনিধানযোগ্য; তা হল এই যে, তিনি আইনের কোন পাঠ উদ্ধার করার সময় আক্ষরিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করতেন না জীবন হতে যুক্তি ও তথ্য গ্রহণ করে উহার ন্যায্য সমাধান করতে অধিকতর আগ্রহি ছিলেন। তাঁর সময় মুসলিম শাসিত সমগ্র অঞ্চলে দু'টি আইন অনুশীলনী কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। একটি ছিল ইরাকে, অন্যটি ছিল হিজাজে বা মদীনায়। ইরাকী কেন্দ্রকে বলা হত আহল আল রায়। ইরাকী দল সূন্নাহ এবং হাদীসের উপর কম জোর দিতেন বলে মদীনার দলের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ ছিল। 'মাসনাদ উল ইমাম আবূ হানিফা' আখ্যায় আখ্যায়িত তাঁর ক্ষুদ্র একখানি হাদীসের সংকলন পুস্তক মাত্র পাওয়া গিয়েছে। তাঁর উদ্যোগে একটি কমিটি কর্তৃক একখানি গুরুত্বপূর্ণ আইনের সংকলন বের করার জন্যে বহু তথ্যপূর্ণ আইনাবলী সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উহা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ইমাম আবূ হানিফাই ছিলেন আইনবিদদের মধ্যে সর্ব প্রথম, যিনি আইনের রীতিবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করে পরবর্তীকালের জন্য উহা উদাহরণ স্বরূপ রেখে গিয়েছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সর্ব প্রকার প্রশ্নের মীমাংসা করার মত কয়েক প্রস্থ আইনের নীতি নির্ধারিত করে গিয়েছিলেন। মাহমুদ গজনভী তুর্কী ছিলেন এবং তুর্কীগণ প্রায় হানাফি মাযহাবের। যখন উত্তর ভারত হানাফি বিজয়ীগণ কর্তৃক অধিকৃত হল, তখন হতে ভারতবর্ষে হানাফি মাযহাবের সম্প্রসারণ আরম্ভ হল। বর্তমানে ভারত উপমহাদেশের সকল মুসলমানগণই প্রায় হানাফি মাযহাবের। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমানই হানাফি মতাবলম্বী।

ইমাম মালিক (৭১৩- ৭৯৫ খৃ.)

ইমাম মালিক ইবন আনাস ৯৫ হিজরীতে মদীনা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। মদীনাতেই তাঁর বাণী সার্থকতা লাভ করেছিল এবং সেখানেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং মদীনা হাদীস ও সূন্নাহ সম্পর্কীয় শিক্ষার আবাস স্থল, (দার উস সূন্নাহ) হয়ে উঠেছিল। ইমাম মালিক উক্ত পরিবেশে মানুষ হয়ে হাদীস ও সূন্নাহর অনুসারী একজন বড় আইনবিদ হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। হযরত (সা) এর সাহাবীগণ কর্তৃক স্থাপিত হাদীসের উপরই তিনি নির্ভরশীল ছিলেন। যদিও তিনি হাদীস ও সূন্নাহর উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন তবুও তাঁকে নিছক গোঁড়া ট্র্যাডিশনপন্থী বলা যেত না। তিনি ব্যবহারিক আইনবিদও ছিলেন। যখন তিনি অন্য কোন উৎস হতে আইন উদ্ধার করতে বিফল হতেন, তখন তিনি নিজস্ব বিচার শক্তি ব্যবহারের উপর অত্যন্ত জোর দিতেন। ইমাম আবূ হানিফার মত কিয়াসের উপর অত্যধিক নির্ভর না হলেও, তিনি কিয়াস একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি ইজমা'র ন্যায্যতা শুধু যে স্বীকার করতেন তাই নয়, তিনি ইজমা' সম্বন্ধে ধারণাকে অধিকতর সুষ্ঠু ও সুস্পষ্ট করেন। মদীনাতে যে সকল প্রথা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল উহা নিশ্চয়ই হযরত (সা) এর সময় হতেই ছিল এবং তাঁর দ্বারা সমর্থিত ছিল, ইহা স্থির করেই

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মদীনার প্রচলিত প্রথার উপর অধিকতর নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁর মতে মদীনাবাসীদের প্রতিষ্ঠিত ইজমা'কে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। ইমাম আবূ হানিফার 'ইসতিহসান' এর মত ইমাম মালিকও একটি মত প্রবর্তন করেন, উহাকে 'ইসতিসলাহ' বলা হয়। উহার ভিত্তি হল 'মুসলাহাত' বা জনসাধারণের হিত।

তিনি 'ইসতিদলাল' বলেও একটি যুক্তিতর্কবাদ প্রবর্তন করেন। উহাকে কুরআন, হাদীস, ইজমা' ও কিয়াসের বহিঃর্ভুত আইনের একটি উৎস বলে ধার্য করা হয়। ইমাম মালিক মদীনাতেই ইন্তেকাল করেন। ইমাম শাফিঈ তাঁর শিস্য ছিলে, তিনি ইমাম মালিককে হাদীসের উজ্জল নক্ষত্র বলে অভিহিত করতেন। ইমাম মালিকের প্রধান রচনা হল 'আল মুয়াত্তা'। ইহা তিনশত হাদীসের একখানি সংকলন গ্রন্থ। ইমাম আবূ হানিফার শিস্য মুহাম্মদ তাঁর নিকট হাদীসের পাঠ গ্রহণ করেন। স্পেন এর মূরগণ মালিকি সম্প্রদায়ভুক্ত। উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেন এ মালিকি সম্প্রদায়ের লোক বর্তমান রয়েছে। কিন্তু এই উপমহাদেশে তাদের কোন অস্তিত্ব নাই।

ইমাম শাফি'ঈ (৭৬৭- ৮২০ খৃ.)

ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইদরিস আশ শাফি'ঈ ফিলিস্তিনে ১৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম মালিক ও ইমাম মুহাম্মদের শিস্য ছিলেন। তিনি হযরত (সা) এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী এবং ধী- শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। আধুনিক আইনবগদগণ ইমাম শাফি'ঈকে অনেক উচ্চে স্থান দান করেন। তাঁকে ইসলামের শ্রেষ্ঠ আইনবিদগণের অন্যতম বলে ধরা হয়। কারণ তিনিই ইসলামী আইন বিজ্ঞানের ক্লাসিক রীতির প্রবর্তনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হাদীস ও সূন্নাহকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করেন এবং অত্যন্ত সুবিবেচনা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে উহা গ্রহণ করেন। তিনি 'উসূল' শাস্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং পদ্ধতি হিসেবে ইজমা'কে সুষ্ঠু এবং পূর্ণাঙ্গ করেন। এ সম্বন্ধে তাঁর বহু রচনা ছিল বলে জানা যায়। যদিও তিনি হাদীসপন্থী ছিলেন, তবুও তিনি হাদীস নির্বিচারে গ্রহণ করেননি। তিনি হাদীসের উপর ইমাম আবূ হানিফা অপেক্ষা অধিক এবং ইমাম মালিক অপেক্ষা কম নির্ভর করতেন এবং ইজমা' ও কিয়াসকেও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। তিনি ভারসাম্য রক্ষা করে সকল প্রশ্ন বিচার করতেন। তাঁর আইন সংক্রান্ত নানাবিধ লেখার মধ্যে সূন্নাহ ও হাদীস সংক্রান্ত 'সুনান' ও 'মসনদ' প্রধান। তার সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায়ঃ

(ক) হাদীস ও সূন্নাহর উপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি হানাফিদিগের অপেক্ষা ইহার উপর বেশী নির্ভর করতেন। তিনি নানাবিধ বিপ্রতীপ হাদীসের মধ্যে সমন্বয় বিধানের চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু উহা ইমাম মালিক অপেক্ষা কঠোরভাবে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে করতেন।

(খ) তিনি ইমাম মালিক অপেক্ষা ইজমা'র উপর অধিকতর নির্ভরশীল ছিলেন এবং ইজমা'কে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করতেন।

(গ) তিনি কিয়াসেরও অধিকতর ব্যবহার করতেন। অবশ্য তাঁর ব্যবহার ছিল স্বতন্ত্র ধরনের।

(ঘ) তিনি হানাফি 'ইসতিহসান' এবং মালিকি 'ইসতিসলাহ'কে শুধু প্রত্যাখ্যানই করেননি, ইহাদের ত্রুটিও নির্দেশ করেন। তাঁর মাযহাবের স্থান হানাফি মাযহাবের পরেই। আরবের উপকুল, সিংহল, জাভা, দক্ষিণ ভারত এবং উত্তর আফ্রিকায় শাফি'ঈ মাযহাবের লোক অধিক সংখ্যায় বাস করে।[১২]

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (৭৮০- ৮৫৫ খৃ.)

আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবন হাম্বল সূন্নি সম্প্রদায়ের চতুর্থ কিংবা সর্বশেষ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। আইনবিদ অপেক্ষা ধর্মপ্রাণ মনীষী হিসেবেই তাঁর অধিক প্রসিদ্ধি ছিল। সূন্নাহপন্থী এবং ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবেও তাঁর সমধিক খ্যাতি ছিল। তিনি যতগুলো সূন্নাহ ও হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন ঐ যুগে ততগুলো সূন্নাহ ও হাদীস অন্য কেহ সংগ্রহ করেননি। আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি অতি নিষ্ঠা সহকারে সূন্নাহ ও হাদীসের অনুসরণ করতেন, উহার আক্ষরিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করতেন এবং সে ব্যাপারে তাঁর মনোভাব ছিল অনড়। অনেকের মতে ইজমা' ও কিয়াসে তাঁর বিশেষ প্রত্যয় ছিল না। তিনি একান্ত সংরক্ষণশীল এবং খোদাপরস্ত লোক ছিলেন, তজ্জন্য খলিফা আল মামুনের সঙ্গে কতিপয় ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যাপারে তাঁর বিরোধ ঘটে, ফলে তিনি নির্যাতিত হন। ইহাতে তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তিনি আদৌ কোন মাযহাব প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন কি না এ সম্বন্ধে গোলডযিহার (Goldzihar) সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[13] কারো কারো মতে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিস্যগণ একত্রিত হয়ে তাঁর মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে তাঁর মাযহাব সম্পূর্ণ রূপে স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়নি।[14] ইহা অবশ্য সত্য যে সূন্নিগণ তাঁকে চতুর্থ ইমাম হিসেবে গণ্য করেন। তাঁর শিস্যগণ প্রতিক্রিয়াশীল ছিল বলে সময়ে সময়ে নির্যাতিত এবং ক্রমশঃ সংখ্যায় হ্রাস পেতে থাকে। বর্তমানে তাঁর শিস্যগণ কেবল মধ্য আরবেই বর্তমান আছে এবং তারা ইসলামী নীতি নিষ্ঠা সম্প্রসারণে ব্রতি রয়েছে। পৃথিবীর অন্যত্র এই মাযহাবের কেহ বর্তমান নেই। তথাকথিত ওহাবীগণকেও এই মাযহাবের বলে ধরা হয়।[১৫] তাঁর বিখ্যাত রচনা হল 'মসনদুল ইমাম হানবল'। উহাতে পঞ্চাশহাজার হাদীস সংকলিত হয়েছে।

---

১২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১- ২০

১৩ Abdur Rahim- 29.

১৪ Verma 3rd Ed. 22.

১৫ Fyzee- 3rd Ed. 34.

ওহাবীগণ

আবদুর রহিম ওহাবীদিগকে হানাবলী মাযহাবের অন্তর্গত বলে ধরেন নাই। ফৌজি উহা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, উহারা ইবন সউদের ভাবশিস্য। তিনি বলেছেন, আহলে হাদীস ও ওহাবীগণ চারি মাযহাবের অন্তর্গত নহে। তারা একটি পঞ্চম মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেছে। ওহাবীগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর ইবন আবদুল ওহাব নামক ধর্মীয় নেতার শিস্য। তারা নিজেদেরকে একমাত্র মুওয়াহহীদ অর্থাৎ এক আল্লাহতে বিশ্বাসী সত্যিকার মুসলমান বলে মনে করে এবং অন্যদিগকে মুশরিকীন বা শিরককারী বলে দোষারূপ করে। তারা ইসলামকে হযরত (সা) এর সুবর্ণ সময়ের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ওহাবী আন্দোলন একটি নীতিনিষ্ঠার আন্দোলন। তারা সিদ্ধ পুরুষদের কবর যিয়ারত করাও পৌত্তলিকতা বলে ধার্য করে। তারা বহু কবর এবং দরগাহ ধ্বংস করেছে। ‘‘ওহাবীগণ অপ্রামাণিক বলে বহু হাদীস ও সূন্নাহ পরিত্যাগ করেছে। তারা মুসলিম ও বুখারীর হাদীস ছাড়া অন্য কারো হাদীস গ্রহণ করে না। তাদেরকে গায়ের মুকাল্লীদ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত মতে অবিশ্বাসী বলে ধরা হয় এবং তারা নিজেদেরকে ‘আহল উল হাদীস’ আখ্যায়িত করে। তারা হযরত (সা) এর সাহাবীগণের ইজমা’ই শুধু গ্রহণ করে এবং কিয়াস সীমিতভাবে ব্যবহার করে। এই উপমহাদেশে নানা প্রকার ওহাবী নানা নামে অভিহিত হয়।[১৬]

---

[১৬] Verma 3rd. Ed.22.

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম আইনের প্রবর্তন এবং বিধিসমূহ

উপমহাদেশে মুসলিম আইন প্রবর্তন

মুসলমানদের সামাজিক অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে পূর্ণাজ্ঞ আইন বিদ্যমান রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে মোগল রাজত্বের সময় মুসলিম আইন সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। বৃটিশ সরকারও পূর্ব প্রচলিত রীতিই অনুসরণ করা স্থির করে এবং প্রথম হানাফি আইন দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আদালতে ব্যবহৃত হতে থাকে, অবশ্য ক্রমে ক্রমে উহার প্রয়োগ হ্রাস পায়। কিন্তু পরবর্তীকালে ইংরেজগণ Regulation 11 of 1772 দ্বারা ইহার ক্ষেত্রকে বিশেষভাবে সীমিত করল। ফৌজদারী কর্মবিধি এবং দণ্ডবিধি আইন মুসলিম আইনকে ফৌজদারী আদালত হতে বহিষ্কৃত করল। ইহা তখন মুসলিম ব্যক্তিগত আইন হিসেবে দেওয়ানী আদালত কর্তৃক পরিবেশিত হতে লাগল।[১৭] মোগল শাসকগণ মুসলিম ও হিন্দু আইন মুসলমান এবং হিন্দুগণের উপর প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন। কারণ তারা চেয়েছিলেন যে হিন্দু মুসলমান যেন নিজেদের মতানুযায়ী তাদের আইন অনুসরণ করতে পারে। ইংরেজগণ এই নীতিই গ্রহণ করেছিল।[১৮] কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োগের ক্ষেত্র সীমিত করে বিধিবদ্ধ আইন[১৯] দ্বারা ইংরেজগণ স্থির করেছিল যে, উত্তরাধিকার, বিবাহ ও বর্ণ এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রথা কিংবা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত মোকদ্দমায় মুসলমানদের জন্য কুরআনের আইন এবং হিন্দুদের[২০] জন্য শাস্ত্রের আইন অপরিহার্য ভাবে প্রয়োগ করা হবে। যদি উভয় পক্ষের এক পক্ষ হিন্দু কি মুসলমান হয়, তাহলে বিবাদী পক্ষের আইন ও প্রথা প্রয়োগ করা হবে।[২১]

অতঃপর এই উপমহাদেশে মুসলিম আইন নানাবিধ বিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে প্রবর্তিত হয়। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নেপ্রদত্ত হল।

---

১৭ Shaukat Mahmood, *Muslim Law. P. 14*

১৮ Charter of George 11, Granted in 1753: *W.H. Morly, Administration of Justice in British India,* 193, 197. Cited by Fyzee, 111 Ed. 54.

১৯ By See 27 of Regulation of 1780.

২০ Gentoos.

২১ Sir George Renkin, *Bacground of Indian Law*, Cited by Fyzee at p. 54.

মুসলিম আইন প্রয়োগ

এই উপমহাদেশে মুসলিম আইন আদালত কর্তৃক মুসলমানদের সকল বিষয়ে নয়, কতিপয় বিষয়ে প্রয়োগ করা হয় মাত্র। এই আইন প্রয়োগ ক্ষমতা বৃটিশ আইন পার্লামেন্টের আইন কর্তৃক মূলতঃ প্রদত্ত এবং নিয়ন্ত্রিত হলেও, অধিকাংশ স্থলেই উহা এতদঞ্চলের আইন পরিষদ কর্তৃক বিধিবদ্ধ এবং প্রসারিত হয়েছে। উপমহাদেশে মুসলিম আইন তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়েছেঃ

(১) যা আইন পরিষদ মুসলমানদের উপর সুস্পষ্টভাবে প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছে উক্ত আইন। যথা উত্তরাধিকার, বিবাহ, উইল, ইত্যকার বিষয় সম্বন্ধ আইন।

(২) যা 'ন্যায়বিচার এবং সুবিবেচনা' নীতি হিসেবে (as a matter of justice, equity, and good conscierce) মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় উক্ত আইন। যথা অগ্রক্রয়াধিকার আইন (Law of pre-emption)

(৩) যে মুসলিম আইন, উভয়পক্ষ মুসলিম হলেও উপমহাদেশে কখনই প্রয়োগ করা হয় না, উক্ত আইনসমূহ। যথা মুসলিম ফৌজদারী আইন, মুসলিম সাক্ষ্য আইন ইত্যাদি।

উপরোক্ত তিন শ্রেণির আইনের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির আইনাবলীই শুধু আদালত কর্তৃক মুসলমানদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে উপমহাদেশীয় সাধারণ আইনই প্রযোজ্য হয়।

সুস্পষ্টভাবে প্রয়োগের নির্দেশ

যে সব আইন সুস্পষ্টভাবে প্রয়োগ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা প্রয়োগ করা হয়। তবে উহা যদি কোন বিধিবদ্ধ আইন কর্তৃক নাকচ কিংবা প্রত্যাহার করা হয়ে থাকে তাহলে উহা প্রয়োগযোগ্য থাকবে না। যথা মুসলিম উত্তরাধিকার আইন সুস্পষ্টভাবে মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করার নির্দেশ রয়েছে। উক্ত আইনানুসারে যদি কোন মুসলমান মুসলিম ধর্ম ত্যাগ করে তা হলে সে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে। কিন্তু এ বিধিটি Freedom of Religious Act XXl অনুসারে প্রযোজ্য নয়। কারণ ঐ আইন অনুযায়ী ধর্মত্যাগ তাকে সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করতে পারে না। হিন্দু এবং মুসলিম আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে আদালতের কর্তব্য হল আইনের ব্যাখ্যা করা, যতই বিজ্ঞ হোক না কেন, বিশেষজ্ঞদের মতের উপর নির্ভর করা নয়।[২২]

[২২] Shahidganj V Gurdwara Prabandha Committee (1940) Lah. 493, 671.A. 251.

সুস্পষ্ট ভাবে অনির্দেশিত মুসলিম আইন

সুস্পষ্টভাবে অ-নির্দেশিত কোন মুসলিম আইনের বিধি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে যদি কোন বিধিবদ্ধ আইনের প্রতিকুল হয় তাহলে উহা মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করা যাবে না। মুসলিম অগ্রক্রয়াধিকার আইন কোন প্রকার সুস্পষ্টভাবে মুসলমানদের উপর প্রযোজ্য বলে বলা হয়নি। সুতরাং যে ক্ষেত্রে মুসলমানদের উপর প্রযোজ্য হয়, তা ন্যায়, সুবিচার এবং সুবিবেচনার নীতি হিসেবেই করা হয়। কারণ এই আইন অযোধ্যা, পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাব ইত্যাকার বহু জায়গায় প্রয়োগ করা হয় না, যেহেতু সে সব স্থানে অগ্রক্রয়াধিকার ক্রয় সম্বন্ধে আইন বিধিবদ্ধ রয়েছে এবং তা হিন্দু মুসলমান উভয়ের উপরই প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে মুসলিম ফৌজদারী আইনও কোন কোন স্থানে সুস্পষ্টভাবে মুসলমানদের উপর প্রয়োগের জন্য নির্দেশিত হয়নি। কিন্তু এই উপমহাদেশে ফৌজদারী দণ্ডবিধি এবং কার্যবিধি আইন যথারীতি বিধিবদ্ধ রয়েছে। সুতরাং মুসলিম ফৌজদারী আইন ন্যায়, সুবিচার এবং সুবিবেচনার নীতি হিসেবেও প্রয়োগ করা যাবে না। সুতরাং এই উপমহাদেশে এখনকার বিধিবদ্ধ ফৌজদারী আইনই মুসলমানদের উপর প্রযোজ্য হবে। সেক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ দেওয়ানী আইন প্রচলিত রয়েছে সে ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ মুসলমান তা মুসলিম আইনানুযায়ী বিচার্য হবে না।[২৩]

ন্যায়, সুবিচার এবং সুবিবেক বিবেচনার নীতি

এই নীতি অনুযায়ী আদালতকে রায় প্রদানের ক্ষমতাও বিধিবদ্ধ আইন কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। যে সব ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে মুসলিম আইন প্রয়োগের নির্দেশ নাই, সে সব ক্ষেত্রে আদালতকে কখনও এই নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে মুসলিম আইন প্রয়োগ করতে হয়।[২৪] এই নীতি অনুসরণ উপমহাদেশের কতিপয় হাই কোর্ট মুসলিম অগ্রক্রয়াধিকার আইন মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে। কিন্তু মাদ্রাজ হাই কোর্ট ইহা ধার্য করেছে যে, যেহেতু ইহা ক্রেতাকে প্রথমত তার প্রতিবেশীর নিকট বিক্রয় করতে বাধ্য করে সেহেতু ইহা জমি ক্রয় করার স্বাধীনতার পরিপন্থী, সুতরাং 'অগ্রক্রয়াধিকার' ন্যায়, সুবিচার এবং সুবিবেক বিবেচনা নীতির বিরুদ্ধে গমণ করে। যা হোক, ন্যায় সুবিচার এবং সুবিবেক বিবেচনা নীতি অনুসণে ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তিনটি অনুবিধি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্যঃ

(১) যদি কোন আইন বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা মুসলিম আইন সুস্পষ্টভাবে প্রয়োগ করার কথা উল্লেখ থাকে তাহলে তা ন্যায়, সুবিচার এবং সুবিবেক বিবেচনা নীতির বিরোধী হলেও তা প্রয়োগ করতে হবে। যথা বল প্রয়োগ দ্বারা যদি কোন স্বামীর নিকট হতে তার স্ত্রীর তালাক গ্রহণ করা হয় তাহলে আদালত তাকে যতই ন্যায়, সুবিচার

---

[২৩] Qamar Din V Aisha Bi (56) P. Lah. 795.

[২৪] Rahman V Ddasrah Raut, 1953 Pat. 138, Rowther V Fatima Bibi 221. C. 697.

এবং সুবিবেচনার পরিপন্থী মনে করুক না কেন, তা অগ্রাহ্য করতে পারবে না, কারণ তা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত আইন কর্তৃক প্রযোজ্য করা হয়েছে।[২৫]

(২) ন্যায়, সুবিচার ও সুবিবেচনা নীতি কোন বিষয়ে শুধু তখনই অনুসরণ করা হয় যখন উক্ত বিষয়ের উপর প্রয়োগ করার জন্য অন্য কোন প্রতিকূল বিধিবদ্ধ আইন না থাকে। যথা অগ্রক্রয়াধিকারের ব্যাপারে আগ্রা এবং পাঞ্জাবে অগ্রক্রয়াধিকার আইন বিধিবদ্ধ রয়েছে, সুতরাং ঐ সকল স্থানে মুসলিম আইনের অগ্রক্রয়াধিকার অচল।

(৩) বিধিবদ্ধ আইন কর্তৃক প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে যে সব কেত্রে মুসলিম আইন বর্জন করা হয়েছে, ঐ সব ক্ষেত্রে মুসলিম আইন কখনই প্রযোজ্য হবে না। যথা ফৌজদারী আইন কিংবা দেওয়ানী কার্যবিধি আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় এবং সকলের সঙ্গে মুসলমানদের উপর তা প্রযোজ্য হওয়ায় উক্ত বিষয় সম্পর্কে মুসলিম আইনের প্রয়োগ বাতিল করা হয়েছে ধরতে হবে। সুতরাং উক্ত আইনের বিধিসমূহকে ন্যায়, সুবিচার এবং সুবিবেচনা নীতি প্রয়োগেরও বহির্ভূত করা হয়েছে।

যে স্থলে পুরাতন ভাষ্যকারদের মতানুসারে মুসলিম আইন নিশ্চিতভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে, সে স্থলে আদালত ন্যায়, সুবিচার এবং সুবিবেচনার নীতি প্রয়োগ সুযুক্তি বিরুদ্ধ কিংবা ত্রুটিযুক্ত বলে ঐ আইন উপেক্ষা কিংবা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না, যদি তা সত্যি ন্যায়, সুবিচার এবং সুবিবেচনার পরিপন্থী না হয়। কারণ উক্ত নীতি অনুক্রমেই শুধু ঐ সকল আইনাবলী এই উপমহাদেশে আদালত কর্তৃক গৃহীত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।[২৬]

কোন কোন বিষয়ে মুসলিম আইন প্রযোজ্য হবে

Regulation of 1772 এবং Regulation of 1780 তে মোটামুটি ভাবে মুসলিম আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহের উল্লেখ রয়েছে। বর্তমানে যে সব আইন দ্বারা তা স্পষ্টভাবে সুনিদির্স্ট করা হয়েছে তার বিবরণ দেয়া হলঃ

(১) Government of India Act, 1935 কলিকাতা মাদ্রাজ এবং বোম্বাই হাই কোর্টের মৌলিক এলাকাসমূহের অর্থাৎ কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের অধিবাসীদের জমি, কর এবং দ্রব্যাদির উত্তরলব্ধি এবং উত্তরাধিকারের ব্যাপারে এবং পরস্পরের মধ্যে চুক্তির ব্যাপারেও যদি উভয় পক্ষ একই ব্যক্তিগত আইনাধীন হয়, তাহলে তাদের ব্যক্তিগত আইন, কিংবা আইনগ্রাহ্য প্রথা প্রযোজ্য হবে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত আইনাধীন হয়, তাহলে প্রতিবাদীর ব্যক্তিগত আইন কিংবা আইনগ্রাহ্য প্রথা প্রয়োগ করা হবে।

---

[২৫] Ibrahim V Enayetur (1869), 12 W. R. 460.

[২৬] Mohd. Ismail V Abdur Rashid (1956), I All. 143, 154 (F.B).

(২) Bengal, Agra and Assam Civil Corts Act (1887), Sec. 37- (i) উত্তরাধিকার, উত্তরলব্ধি, বিবাহ এবং অন্যান্য ধর্মীয় আচার এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে মুসলমানদের উপর মুসলিম আইন প্রযোজ্য হবে।

(৩) Oudh Laws Act (1876), Sec. 3- উত্তরাধিকার, স্ত্রীলোকদের বিশেষ সম্পত্তি, বিবাহের বাগদান, বিবাহ, তালাক, দেনমহর, দত্তকগ্রহণ, অভিভাবকত্ব, নাবালকত্ব, জারজত্ব, পারিবারিক সম্বন্ধ, উইল, উইলক্রমে প্রদত্ত সম্পত্তি, সম্পত্তি বিভাগ এবং ধর্মীয় আচার এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে মুসলমানদের উপর নিম্নলিখিত ভাবে আইন প্রয়োগ করা হবেঃ

(ক) প্রথমতঃ আইন অনুযায়ী অবশ্য পালনীয় প্রথাসমূহ প্রয়োগ করতে হবে। তার অবর্তমানে,

(খ) যেখানে উভয় পক্ষ মুসলমান সেখানে মুসলিম আইন প্রয়োগ করতে হবে। অন্যথায়,

(গ) ন্যায়, সুবিচার এবং সুবিবেচনা নীতি অনুসরণ করে তার মীমাংসা করতে হবে।

(৪) The Punjab Act (1872), Sec. 5- তার শর্তগুলি হুবহু Oudh Laws Act- এর মত। শুধু পার্থক্য এই যে, এতে 'দান' (হিবা) এবং সম্পত্তি বিভাগের কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং দেনমহরের কথা বলা হয় নাই।

(৫) Central Provinces Laws Act, Sec. 5 & 6- ইহা উপরোক্ত (৩) এবং (৪) এর অনুরূপ।

(৬) Madras Civil Courts Act (1873), অনুযায়ী উক্ত প্রদেশের আদালত কর্তৃক উত্তলরব্ধি উত্তরাধিকার, বিবাহ এবং অন্যান্য ধর্মীয় আচার এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে মুসলিম আইন মুসলমানদের উপর প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় তা ন্যায়, সুবিচার এবং সুবিবেচনার ভিত্তিতে বিচার করা হবে।

(৭) The Bombay Regulation- এ মুসলিম আইন প্রয়োগের প্রত্যক্ষ কোন বিধি নাই, তথাপি বোম্বাইতে মুসলিম আইন প্রয়োগ করা হয় এবং বোধ হয় প্রতিবাদীর আইন হিসেবেই করা হয়।

(৮) Ajmiere- Marwara Laws এবং N.W. Forntier Laws গুলির Regulation গুলিও Punjab Act এর অনুরূপ।

(৯) The Cutchi Memons Act (1938) এবং (1942)- কাচ্চি মেমনগণের উত্তরাধিকার হিন্দু আইন এবং প্রথানুযায়ী বর্তিত হত। এই দু'টি সংবিধি উত্তরাধিকার এবং উত্তরলব্ধির ব্যাপারে মুসলমানদের উপর সুস্পষ্টভাবে মুসলিম আইন প্রয়োগের নির্দেশ দান করেছে।

(১০) The shariat Act, (1937)- উপরোক্ত সংবিধি বিচার করলে দেখা যাবে যে, বহু ক্ষেত্রে মুসলমানদের উপর মুসলিম আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হলেও, বহু ক্ষেত্রে পুরাতন আইন গ্রাহ্য প্রথা প্রয়োগ করার নীতিও

অব্যাহত থাকে। শারী'আত আইন দ্বারা সমস্ত উপমহাদেশে সকল প্রথা নাকচ করে মুসলিম আইন সকল ব্যাপারে সকল মুসলমানের উপর প্রয়োগ করার সুস্পষ্ট বিধান করা হয়। শুধুমাত্র উইল, উইল সূত্রে উত্তরলব্ধি এবং দত্তকগ্রহণ সরাসরি ইহার আওতায় আনয়ন করা হয় না। তবে যারা উক্ত বিষয়ে প্রথার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল, তাদের এরূপে মুসলিম আইন নির্বাচনের ক্ষমতা প্রদান করা হয় যে, তাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত তারা, ঐ সকল বিষয়েও মুসলিম আইন তাদের এবং তাদের বংশধরদের উপর প্রযোজ্য হবে এই প্রকার ঘোষণা দ্বারা তা তাদের উপর প্রয়োগযোগ্য করতে পারে। যথারীতি এই ঘোষণা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণের নিকট করার পর হতে যেন তা আইনে বিধিবদ্ধ হয়েছে, এরূপে তাদের উপর প্রযোজ্য হবে।

যে সকল বিষয় প্রাদেশিক সংবিধানের আওতাভুক্ত ছিল, যথা জমি এবং জমি সংক্রান্ত প্রশ্নাদি এবং দাতব্য ওয়াকফ ব্যতীত অন্যান্য ধরনের ওয়াকফ এর ব্যাপারে শারী'আত আইন কোন প্রকার পরিবর্তন আনয়ন করে নাই। এ সকল ব্যাপারে কোন কোন প্রদেশ মুসলিম আইন প্রয়োগকল্পে আইন বিধিবদ্ধ করলেও সম্পূর্ণভাবে তা মুসলিম আইনের আওতায় আনয়ন করা হয় নাই।

মুসলিম আইন যাদের উপর প্রযোজ্য

মুসলিম আইন প্রত্যেক মুসলমানের উপর প্রযোজ্য, সে জন্মানুসারে মুসলমান হোক কিংবা অন্য ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতই হোক।[২৭] নব দীক্ষিত মুসলমান শুধু তার ধর্মই পরিবর্তন করে না, তার ব্যক্তিগত আইনও সেই সঙ্গে পরিত্যাগ করে আসে।[২৮] কোন বিশেষ ব্যক্তি ধর্ম পরিবর্তন করলে অবশ্য এই বিধি প্রয়োগে কোন শিথিলতা হয় না। কিন্তু যে ক্ষেত্রে একটি জাতি কিংবা গোষ্ঠী ধর্ম পরিবর্তন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সে স্থলে তারা তাদের ব্যক্তিগত আইনের কোন কোন বিধি, পরিস্থিতি কিংবা অবস্থাভেদে মুসলিম আইনের পরিবর্তে নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে।[২৯]

মেমনগণ, খোজাগণ, গিয়াসিয়া এবং বোহরাগণ সম্প্রদায় হিসেবে বহুপূর্বে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। মেমনগণ প্রায় চারশত বৎসর পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ইহারা ১৯৩৭ সালের শারী'আত আইন এবং বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত প্রথানুসারে বহু ক্ষেত্রে হিন্দু আইন দ্বারা পরিচালিত হত। শারী'আত আইন এবং কাচ্চি মেমন আইন[৩০] ইহাদেরকে বর্তমানে প্রায় সম্পূর্ণরূপে মুসলিম আইনের আওতায় এনেছে। শারী'আত আইন প্রথাকে প্রায় নির্মূল করে মুসলিম আইন মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করা হলেও

---

[২৭] Jowala Baksh V Dharun Singh (1866) 10 MIA. 511.

[২৮] Miter Sen Singh V Maqbul Hassan Khan (1930) 571.A. 313.

[২৯] Fidahusein V (1936) 38. Bom. L. R. 387, 400.

[৩০] Shariat Act. 1937 and Cutchi Memons Act 1920 & 1938.

'মুসলমানকে' তার সম্বন্ধে কোন সংজ্ঞা কিংবা ধারণা প্রদান করা হয় নাই। সুতরাং পরবর্তী প্রসঙ্গ আলোচনার পূর্বে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে বিভিন্ন আদালত যে ধারণা প্রদান করেছে তার আলোচনা করা হবে।

মুসলিম কেঃ?

মুসলিম আইন শুধুমাত্র মুসলমানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং মুসলিম আইন অধ্যয়নের প্রাককালে মুসলিম তবুও মুসলিম আইনের প্রচলিত সংজ্ঞা অনুসারে যারা ইসলামকে স্বীয় ধর্ম বলে স্বীকার করে এবং আল্লাহ এক এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) তার প্রেরিত নবী শুধুমাত্র ইহা বিশ্বাস করে, তাদেরকেই মুসলিম বলে ধার্য করা হয়। কোন মুসলিম তার ধর্মের অন্যান্য রীতি নীতি কিংবা কর্তব্য পালন সঠিকভাবে করতেছে কি না, মুসলিম আইন প্রয়োগ কল্পে তা আদালতের বিচার্য নয়; ''আল্লাহ এক এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) তার প্রেরিত নবী'' উক্ত বিশ্বাসই তাকে মুসলমান হিসেবে ধার্য করতে আদালত কর্তৃক যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়। এমন কি সে নৈতিকভাবে ধর্মে বিশ্বাসী কী না তাও বিচার্য নয়, কারণ 'কোন আদালতই মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের গভীরতা ও অকপটতা নির্ণয় করতে সক্ষম নয়'।[৩১]

সুতরাং এক আল্লাহ এবং হযরত (সা) এর নবুয়্যতে বিশ্বাসী হলেই মুসলিম আইন তার উপর প্রযোজ্য হবে ভিত্তি স্বরূপ এ বিশ্বাসই শুধুমাত্র প্রয়োজন। এ বিশ্বাসের বহির্ভূত পরস্পর বিরোধী মতবাদ মুসলমানদের মধ্যে বর্তমান থাকলেও তা তাদেরকে 'মুসলিম' হিসেবে ধার্য করার পক্ষে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না। এজন্য আহমদী বা কাদিয়ানীগণও আইনত মুসলিম বলে গণ্য হয়।[৩২] এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে Atia Waris V Sultan Ahmed Khan P. L. D.1959. Lah. 205. এই মোকদ্দমাটিতে যে রায় প্রদান করা হয়েছে তাতে মুসলমানের সংজ্ঞা এভাবে প্রদত্ত হয়েছেঃ 'ইহা শারী'আতের একটি স্বীকৃত মূলনীতি যে, যে ব্যক্তি অন্ততঃ একবার কালিমা পাঠ করেছে এবং আল্লাহ এক ও হযরত মুহাম্মদ (সা) কে তাঁর প্রেরিত শেষ নবী বলে স্বীকার করে এবং নিজকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী বলে মানে, তাকেই মুসলমান বলে ধরা হবে''। হযরত (সা) কে শেষ নবী বলে স্বীকার করার কথা পূর্বে কোন সংজ্ঞায় নাই। সুতরাং মাদ্রাজ হাই কোর্ট আহমদীগণকে মুসলমান ধার্য করে রায় প্রকাশ করেছে। সুতরাং এই প্রশ্ন পুণরায় উত্থিত হতে পারে যে, আতিয়া ওয়ারিসের মোকদ্দমার রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আহমদীগণকে মুসলমান বলে ধরা যাবে কি না? অবশ্য ইহা বলা হয় যে, আহমদীগণ হযরত মুহাম্মদ (সা) কে শেষ নবী বলে স্বীকার করে না। কিন্তু তারা তদুত্তরে বলে যে, তারা যখন

---

৩১ Abdool Razzak Vrs Aga Mahomed 1893. 211. A 56, 64.

৩২ Hakim Khalil V Malik Israfil. 37. 1. C 302.

বিশ্বাস করে যে হযরত মুহাম্মদ (সা) এর পর কোন নবী 'নতুন শারী'আত নিয়ে আসবেন না, তখন তাদের দ্বারা মির্জা আহমদকে 'যিলি নবী' বলে মানা খাতমী নবুয়্যত এর পরিপন্থী নয়।[৩৩]

যা হোক, এই রায় দারা কিয়ৎপরিমাণে যে বিভ্রমের সৃষ্টি হয়েছে অতঃপর তা কোন উর্ধ্বতন এবং গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণ্য রায়ের মাধ্যমেই শুধু বিদূরিত হতে পারে।

মুসলিম দু'রকম হতে পারেঃ জন্মানুসারে মুসলিম এবং ধর্মান্তর গ্রহণ দ্বারা মুসলিম অর্থাৎ দীক্ষিত মুসলিম।

জন্মানুসারে মুসলিম

(১) কোন ব্যক্তি মুসলমান হিসেবে জন্মগ্রহণ করলে যে পর্যন্ত না সে তা প্রকাশ্য ভাবে পরিত্যাগ করে সে পর্যন্ত তাকে মুসলমান বলেই ধার্য করা হবে। সে যদি কোন হিন্দু ধর্মাচরণ কিংবা উপাসনায়ও অভ্যস্ত থাকে তাহলেও তা ধর্ম ত্যাগের শামিল বলে ধৃত হবে না।[৩৪] এমনকি কোন খ্রিস্টান রমণী যে বিবাহের উদ্দেশ্যে মুসলমান হয়েছিলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করে প্রতি রবিবারে সে গির্জায় গমন করলেও, তাকে মুসলমান বলে ধার্য করা হয়। কারণ তার দ্বারা তিনি যে ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তা প্রমাণিত হয় নাই।

(২) মুসলিম আইন (শারী'আত) অনুসারে সন্তানের পিতা মাতার কোন একজনও যদি মুসলিম হয়, তাহলে আইনত প্রাক ধারণা করতে হবে যে ঐ সন্তানও মুসলমান। এমনকি কোন সন্তানের অমুসলমান পিতা মাতার কোন একজনও যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তাহলেও একই রূপে প্রাক ধারণা করতে হবে যে, ঐ সন্তানও মুসলমান।[৩৫] কিন্তু ভারতে হিদায়া কর্তৃক উল্লিখিত শারী'আতের এই আইনটি পূর্ণভাবে গৃহীত হয়নি। তা অবশ্য মুসলিম হওয়ার পক্ষে প্রাক প্রত্যয় সৃষ্টি করে মাত্র; কিন্তু তা ঘটনা এবং পরিস্থিতিক্রমে খণ্ডিতও হতে পারে।[৩৬]

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ দ্বারা মুসলিম

কেউ যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে তার উপর পূর্বের ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তে মুসলিম আইন প্রযোজ্য হবে। কিন্তু বহুপূর্বে যারা মুসলিম হয়েছিল, তারা বহুক্ষেত্রে মুসলিম আইনের পরিবর্তে হিন্দু ব্যক্তিগত আইন দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তা প্রথা অনুযায়ী হয়।[৩৭] সুতরাং যারা ঐ প্রথা প্রমাণ করতে সক্ষম

---

[৩৩] Report of the court of inquiry constituted under act 11. of 1954, page 9.

[৩৪] Azima Bibi V Munshi Shamalanad, 40. Cal 378; 171.C 758.

[৩৫] *Hedaya 64.*

[৩৬] Bhaiya Sher Bahadur V. Bhaiya Gauga Baksh Singh (1914) 41.1, A. 1, 36 A. 11. 101.

[৩৭] Advocate Geneal V. Jimba Bai, 41 Bom, 181, pp 196-97.

হবে না, তাদের উপর মুসলিম আইন প্রযোজ্য হবে। তাদেরক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কতিপয় অনুবিধি বিশেষভাবে লক্ষণীয়-

(১) উত্তরাধিকার

কোন ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে কে হবে তা স্থিরিকৃত হয়, মৃত্যুকালে ঐ ব্যক্তি কোন ধর্মাবলম্বী ছিল তার উপরে।[৩৮] যদি দীক্ষিত মুসলমান কোন পুরাতন প্রথা বিধি হিসেবে অনুসরণ না করে থাকে তাহলে মুসলিম আইনানুসারে তার সম্পত্তি বন্টন হবে। তার অমুসলমান আত্মীয়গণ কখনও তার উত্তরাধিকারী হবে না।[৩৯]

(২) অছিয়ত

অছিয়ত বা উইলের ব্যাপারেও প্রথা, মুসলিম আইনের উপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হত। কাচ্চি মেমন ও খোজাগণ উইলক্রমে, এবং মুসলিম আইনের ব্যতিক্রমে, সম্পূর্ণ সম্পত্তিই উইলযোগে দান করে যেতে পারত, কিন্তু বর্তমানে শারী'আত আইন এবং কাচ্চি মেমন আইন- ১৯৩৮ অনুসারে তাদের ঐ ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে।

বিবাহের ক্ষেত্রে ধর্মান্তর ও মুসলিম আইনের প্রয়োগ

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও বিবাহ নাকচ করার ব্যাপারে উপমহাদেশের আদালত কর্তৃক যেভাবে গৃহীত হয়েছে, তা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে বাংলা, পাক- ভারত উপমহাদেশ দার- উল-ইসলাম কিনা, তা সংক্ষেপে বিচার করা প্রয়োজন।

ভারতীয় আদালতের রায়

প্রথমে ইহা বলা প্রয়োজন যে, এই উপমহাদেশীয় আদালতে, ভিন্ন ধর্মের ব্যক্তিগণ ইসলামে দীক্ষিত হলে তাদের উপর প্রয়োগ কল্পে যে আইন গৃহীত হয়েছে তা আদি মুসলিম আইন হতে ভিন্ন। সুতরাং উহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নেপ্রদত্ত হল।

---

[৩৮] Shinner V. Shinner, 25 Cal. 537.

[৩৯] Mitar Sen Singh v. Maqbul Hassan 1930 P. C. 251: 1281. C. 268. Chedambarain V. Ma Nyein, 1928 Rang. 179 Farooq Leivers V. Adetaide.

(ক) স্ত্রী কর্তৃক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

(১) যদি কোন অমুসলমান স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তৎকারণেই শুধু সে স্বামীর নিকট হতে তালাক গ্রহণের অধিকারিণী হবেনা। কিংবা তার স্বামীকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ করায় সে তা প্রত্যাখ্যান করেছে বলে আদালত কর্তৃক বিবাহ নাকচ করার ঘোষণা ও দাবি করতে পারবে না। তদ্রূপ স্বামী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলে এবং স্ত্রীকে তা গ্রহণ করার আহবান জানান হলে এবং স্ত্রী তা গ্রহণ না করলে স্বামী উক্তরূপে বিবাহ নাকচ করার দাবি করতে পারবে না।

(২) কোন হিন্দু পত্নী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে শুধু উক্ত কারণে বিবাহ আপনা হতে নাকচ হবে না। সুতরাং স্ত্রী ইসলামে দীক্ষিত হবার পর যদি কোন মুসলমানের সঙ্গে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাহলে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৪৯৪ ধারানুযায়ী তাকে এক স্বামীর বর্তমানে অন্য স্বামী গ্রহণকারিণী বলে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে।[৪০]

(৩) যদি কোন খ্রিস্টান স্ত্রী মুসলমান স্বামীর সঙ্গে খ্রিস্টীয় মতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং পরবর্তীকালে ঐ স্ত্রী স্বয়ং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তাহলে সে ইসলামী আইনের আওতাধীন হয়ে পড়বে এবং তার স্বামী তাকে বিধিমতে ‘তালাক’ দিয়ে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে।[৪১]

(খ) স্বামী কর্তৃক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

(১) যদি কোন খ্রিস্টান স্বামী তার খ্রিস্টান স্ত্রী বর্তমান থাকাকালীন, সত্যিকারভাবে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত না হয়ে, শুধু দ্বিতীয় দার পরিগ্রহণ করার সুবিধা গ্রহণের জন্য কৃত্রিমভাবে নিজকে মুসলমান বলে ঘোষণা করে অন্য স্ত্রী বিবাহ করে, তাহলে উক্ত বিবাহ সিদ্ধ হবে কিনা উহাতে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়।[৪২]

(২) যদি কোন ভারতীয় খ্রিস্টান কোন ভারতীয় খ্রিস্টান রমণীকে বিবাহ করে এবং ঐ স্বামী যদি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়, তাহলে সে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যদি তারা Special Marriage Act (iii of 1872) যাতে শুধু এক বিবাহ স্বীকৃত হয়, তাহলে স্বামী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও ইসলামী আইন মতে

---

৪০ Gobt of Bombay V. Ganga (1880), 4 Bom. 330; Mst. Nandi V. The Crown (1920) Lah. 440.

৪১ Khambata V. 1935, Bom. 5.

৪২ Skinner V. Orde (1871) 15 M. 1. A 309 (Validity doubted).

তালাক দিতে সক্ষম হবে না। উহা শুধু Divorce Act অনুসারে প্রদান করলে সিদ্ধ হবে। সুতরাং ইসলামী তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিবাহ করলে তা দ্বি- পত্নী গ্রহণ অপরাধ বলে গণ্য হবে।[৪৩]

(৩) যদি কোন ভারতীয় খ্রিস্টান কোন ভারতীয় খ্রিস্টান স্ত্রীকে বিবাহ করে এবং নিজে ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্ত্রী না করে, তাহলে সে দ্বিতীয় স্ত্রী বিবাহ করতে পারে।[৪৪]

(গ) বিশুদ্ধ মুসলিম আইনানুসারে[৪৫]

যেক্ষেত্রে মুসলিম আইন দেশের আইন, অর্থাৎ দেশটি দার- উল- ইসলাম, সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত আইন অবলম্বনীয়ঃ

(১) স্বামীর ইসলাম গ্রহণ

যদি উভয় পক্ষই কিতাবী হয়, তাহলে স্বামীর ইসলাম গ্রহণ বিবাহ নাকচ করবে না।

যদি উভয় পক্ষ কিতাবী না হয়, তাহলে স্বামী ইসলাম গ্রহণের পর স্ত্রীকে উহা গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে; এবং স্ত্রী যদি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাহলে আদালত কর্তৃক বিবাহ নাকচ করতে পারবে।

(২) স্ত্রীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

যদি স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সে স্বামীকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে এবং স্বামী অস্বীকার করলে আদালত কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে।

যেক্ষেত্রে মুসলিম আইন দেশের আইন নয়, অর্থাৎ দেশটিকে দার- উল- ইসলাম নয় বলে ধরা হয়, সেক্ষেত্রে তিন মাস অন্তে বিবাহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাকচ হয়ে যাবে। শাফি‘ঈ আইনে বলে যে, স্বামী স্ত্রীর কাউকেও অন্য পক্ষকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণের প্রয়োজন নাই।[৪৬]

---

[৪৩] Andal V. Abdul Allam. 1946 Mad. 446.

[৪৪] John Jiban Candra V. Abinash, 1939 Cal. 417: 1939. 2. cal. 12

[৪৪] Gobt of Bombay V. Ganga (1880), 4 Bom. 330; Mst. Nandi V. The Crown (1920) Lah. 440.

[৪৪] Khambata V. 1935, Bom. 5.

[৪৪] Skinner V. Orde (1871) 15 M. 1. A 309 (Validity doubted).

[৪৪] Andal V. Abdul Allam. 1946 Mad. 446.

[৪৫] Hed 63-65 Baillie ii 30-31.

[৪৬] Hed 63-65 Baillie ii 3o-31.

(৩) উভয় পক্ষের ইসলাম গ্রহণ

যদি স্বামী- স্ত্রী উভয় পক্ষই ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ইমাম আবূ হানিফার মতে তা বৈধ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদের মতে তাদের বিবাহ 'ইদ্দতকালীন ঘটলে ঐ বিবাহ শুদ্ধ হবে না।[৪৭]

দত্তক গ্রহণ

কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে প্রাকপ্রত্যয় হিসেবে ধার্য করা হয় যে, সে দত্তক গ্রহণের প্রথা পরিত্যাগ করেছে। সুতরাং যে উহা দাবি করে তাকে তা প্রমাণ করতে হবে যে, সে উহা সংরক্ষণ করে আসতেছে। Shariat Act-1937 এই প্রথাকেও বিদূরিত করে মেমন গিরাসিয়াগণকে এক্ষেত্রেও মুসলিম আইনের আওতাধীনে আনয়ন করার চেষ্টা করেছে।

---

[৪৭] Hed 63, Durr. 94.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

শারী‘আত ও ফিকহ

শারী'আত ও ফিকহ

(الشريعة والفقه)

ইসলামী ফিকহ (الفقه الاسلامى)

আল মাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যা কুয়েত সরকারের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও প্রকাশিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ ফিকাহ বিশ্বকোষ। ৪৫ খণ্ডে বিভক্ত এই বিশ্বকোষের সর্বমোট প্রায় ২০০০ ভুক্তি রয়েছে। এতে ফিকহের যাবতীয় তথ্যাবলী প্রচলিত পরিভাষাসমূহের ভিত্তিতে আরবি বর্ণানুক্রম অনুসারে ধারাবাহিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইসলামী আইন চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এটি সকলের জন্য নতুন দ্বার খুলে দিয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষায় এর অনুবাদ কার্যক্রম চলছে। বাংলা ভাষী বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বার্থে 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' এ বিশ্বকোষটি বাংলায় অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছে। 'ইলমুল ফিকহ' ইসলামী জ্ঞান ভাণ্ডারের অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে। কেননা এটি এমন আইন যদ্বারা প্রত্যেক মুসলমান তার কর্মকাণ্ডকে পরখ করে নিতে পারে, কাজটি হালাল না হারাম, সঠিক না ভ্রান্ত? সব যুগেই মুসলমানগণ তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিলেন তা হালাল না হারাম, সঠিক না ভুল, হোক সেটি আল্লাহ বা তাঁর বান্দাহদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কিত বিষয়। তা নৈকট্যের কিংবা দূরত্বের, শত্রুতা কিংবা বন্ধুত্বের, শাসকের কিংবা শাসিতের এবং মুসলিম কিংবা অমুসলিম যার সাথেই সংশ্লিষ্ট হোক না কেন। 'ইলমুল ফিকহের' মাধ্যমেই কেবল এ সব বিষয়ে জানা যায়। এতে বান্দাহদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহর বিধান আলোচনা করা হয়েছে, তা অবধারিত ঐচ্ছিক কিংবা উদ্ভাবিত যাই হোক। অবধারিত বিধানটি হতে পারে কোন কাজ করার অথবা কোন কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ।

ফিকহ এর বিষয়টি অন্যান্য জ্ঞান শাস্ত্র বা প্রাণী জগতের মত যা চর্চা, বাস্তবে প্রয়োগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নতি লাভ করে এবং অবহেলার কারণে সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত হয়ে পড়ে। এ শাস্ত্র অনেক স্তর অতিক্রম করে বিস্তার লাভ করেছে ও বিকশিত হয়েছে এবং জীবনের প্রতিটি দিককে নিজ আওতাভুক্ত করেছে। যুগে যুগে এ শাস্ত্রের অনেক উত্থান- পতন ঘটেছে এবং তার ক্রমোন্নতি বাধাগ্রস্থ হয়েছে অথবা স্তব্দ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কেননা ইচ্ছায় কিংবা অবহেলায় হোক জীবনের অনেক বিষয় থেকে একে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে এবং অধিকাংশ মুসলিম দেশ তাদের জীবনাচার, পারিপার্শিক অবস্থা ও আকীদা বিশ্বাসের সাথে সংগতিহীন বিজাতীয় আইনকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছে। তারা বিজাতীয় আইনের অনিষ্টকর দিকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে এর বাহ্যিক চমকে মুগ্ধ হয়েছে এবং সেখান থেকে কিছু আইন গ্রহণ করে নিজেদের সমাজ জীবনে প্রয়োগ করেছে। ফলে মুসলমানদের সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে এবং যাবতীয় সমস্যা জটিল রূপ ধারণ করেছে। এসব মুসলিম দেশের মধ্যে কোন কোন দেশে সর্বপ্রথম দৃষ্টি সরিয়ে

নেয়া হয়েছে হুদূদ (নির্ধারিত গুরুদণ্ড) কিসাস (মানব জীবন ও দেহের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অপরাধের শারী'আহ নির্ধারিত শাস্তি) ও তা'যীর (বিচারকের বিবেচনা ভিত্তিক দণ্ড) সংক্রান্ত ইসলামী আইন থেকে। অতঃপর এর সাথে যুক্ত হয়েছে তাদের মনগড়া দেওয়ানী আইনসমূহ যা ক্রয় বিক্রয়, আদান প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রন করে। আল্লাহ যে সুদ ফাসিদ (অবৈধ) ক্রয় বিক্রয় ও বাতিল লেনদেন হারাম করেছেন তা বৈধ ঘোষণা করেছে। এভাবে তারা মানুষের জীবনকে জটিল করে তুলেছে। একইভাবে তারা বিচার প্রার্থনার পথকেও দুর্গম করে দিয়েছে, এমনকি বহুলোক আইনি জটিলতা ও বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা জনিত ভোগান্তির আধিক্যের কারণে তাদের আইনানুগ অধিকার দাবি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

হিজরী ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ফকিহগণের শ্রম ও গবেষণা পারিবারিক আইনের গবেষণায় গণ্ডিবদ্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে এ বিভাগটিকে ব্যক্তিগত বিষয় নামে অভিহিত করা হয়েছে; বরং কোন কোন রাষ্ট্র সংশোধন ও সংস্কারের নামে ইসলামী আইনের উপর আযাচিতভাবে হস্তক্ষেপ করে এর দুর্নাম রটনা করেছে। ফিকহ শাস্ত্রের উপর অব্যাহত আঘাত সত্ত্বেও সেটি তাঁর মযবুত ভিত্তি ও বলিষ্ঠ কাঠামোর কারণে দৃঢ়ভাবে যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে যাচ্ছে। আর আল্লাহ এই উম্মতকে তাদের সুখ নিদ্রার পর পূর্ণজাগরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমরা চতুর্দিক থেকে বজ্রকঠোর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, যা সকল বিষয়ে অবশ্যই আল্লাহর আইনের দিকে প্রত্যাবর্তনের জোরালো আহবান জানাচ্ছে। কোন কোন রাষ্ট্র এ ডাকে সারা দিয়ে আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তায়নের জন্য ইসলামের কাঠামোয় ফিরে আসতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কুয়েত এদের অন্যতম। ১৯৭৭ সালে ১৯ জানুয়ারী ১৩৯৭ হিজরী রবিউল আউয়াল মাসের শুরুতে সে দেশের মন্ত্রী পরিষদ দেশের সকল আইন কানূন ইসলামী শারী'আতের আলোকে সংশোধন করার সিদ্ধান্ত জারি করে। এ উদ্দেশ্যে একটি কমিশনও গঠন করা হয়। আশা করা যায়, আল্লাহ সকলকে তাঁর শারী'আত অনুযায়ী কাজ করার তাওফিক দান করবেন এবং জীবনের সকলক্ষেত্রে তার বাস্তব প্রয়োগ সহজ করে দিবেন, যাতে মুসলিম উম্মাহ যেভাবে সামরিক আগ্রাসন থেকে মুক্ত হয়েছে, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিক ও আইনি আগ্রাসন থেকেও মুক্ত হতে পারে।

ফিকহ এর আভিধানিক অর্থ

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফিকহ (فقه) শব্দটি বুঝা (فهم) জানা, (علم) অনুধাবন করা, (ادراك) বিচক্ষণতা, (فطنة) শিক্ষা লাভ করা, (تعلم) দক্ষতা অর্জন করা, (مهارة) ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১]

[১] জামাল উদ্দীন ইবন মুহাম্মদ ইবন মানযূর আল-আফ্রিকী, লিসানুল আরব, বিশুদ্ধকরণ: আমীন মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব ও মুহাম্মদ আস-সাদিক আল-উবাইদী, বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ৩য় প্রকাশ ১৯৯৯ ইং, খ. ১০, পৃ. ৩০৫।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ অর্থ বুঝ, হৃদয়ঙ্গম, উপলব্ধি, অনুধাবন, তা বাহ্যিক বা অপ্রকাশ্য হোক। আল কামুস, মিসবাহুল মুনির অভিধানে এরূপ অর্থই করা হয়েছে। তারা তাদের মতের অনুকূলে শু'আইব (আ) এর জাতির ঘটনা সম্পর্কিত আল্লাহর বাণীকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। "তারা বলল, হে শু'আইব! তুমি যা বলো তার অনেক কথা আমরা বুঝি না"।[২]

"They said: "O Shu'aib! We do not understand much of what you say." (Surah 11. Hud. Part 12. Ayat 91).

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ "প্রতিটি জিনিসই (সৃষ্টি) তাঁর স-প্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না"।[৩]

"And there is not a thing but glorifies His Parise. But you understand not their glorification." (Surah 17. Al-Isra'. Part 15. Ayar 44).

একদল আলিমের মতে, ফিকহ শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবন করা। যেমন বলা হয়, فقهت كلامك 'আমি তোমার কথা অনুধাবন করতে পেরেছি। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে এবং যে তাৎপর্যের ইঙ্গিত করা হয়েছে আমি তা বুঝেছি। এ কথা বলা হয় না, আমি আসমান ও যমিন সব বুঝেছি। পবিত্র কুরআনের পর্যালোচনাকারী মাত্রই বুঝতে পারেন যে, ফিকহ শব্দটি কেবল সূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবন করার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা রশিদ রেযা আল মিসরী (রহ) তাঁর তাফসির গ্রন্থে (আল মানার) উল্লেখ করেন যে, ফিকহ শব্দটি কুরআনের বিশটি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে, তন্মধ্যে উনিশ স্থানে তা সূক্ষ্ম জ্ঞানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "এবং তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান রয়েছে। অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য আমি তো নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি"।[৪]

"It is He Who has created you from a single person (Adam), and has given you a place of residing (on the earth or in your mothre's wombs) and a place of storage [in the earth (in your graves) or in your father's loins]. Indeed, We have explained in detail Our

[২] আল কুরআন, ১১: ৯১ - قالوا يشعيب مانفقه كثيرا مما تقول

[৩] আল কুরআন, ১৭: ৪৪ - وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم

[৪] আল কুরআন, ৬: ৯৮ - وهو الذى انشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الايت لقوم يفقهون

Dhaka University Institutional Repository

revelations (this Qur‘an) for people who understand.” (Surah 6. Al-An‘am. Part 7. Ayat 98).

ফিকহ শব্দের পারিভাষিক অর্থের ক্রমপরিবর্তন

কাল পরিক্রমায় ফিকহ শব্দের ব্যবহারিক অর্থের বিবর্তনের ধারা নিম্নরূপঃ

১। প্রাচীন আরবে ফিকহ শব্দটি আভিধানিক অর্থেই ব্যবহৃত হত। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে শব্দটিকে বুঝা, অনুধাবন করা, প্রাজ্ঞ হওয়া ইত্যাদি অর্থে প্রয়োগ করতেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ মূসা (আ) এর দু‘আ[৫] বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

২। ইসলাম আগমনের প্র ফিকহ শব্দটির ব্যবহার শুধু দীনি জ্ঞানে পারদর্শিতার ক্ষেত্রে সীমিত হয়ে যায়। সে সময় দীনি জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহ এ দুয়ের মাঝে কেন্দ্রীভূত থাকায় কুরআন ও সুন্নাহের জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিকে ফকীহ বলা হত। ইসলাম আগমনের পর ফিকহ শব্দটি দীনি জ্ঞান তথা ধর্মতত্ত্বের জন্য প্রয়োগ শুরু হয়।[৬]

৩। প্রথম যুগে ফিকহ শব্দটি আখিরাতের জ্ঞান ও আত্মার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়, আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ ও দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা অর্থে ব্যবহৃত হত। রাগিব আল- ইস্পাহানীর [মৃ. ৫০২ হি.] মন্তব্য থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ফিকহ এর সংজ্ঞায় বলেনঃ - الفقه هو التوصل الى علم غائب بعلم شاهد “দৃশ্যমান জ্ঞানের মাধ্যমে অদৃশ্য জ্ঞানে পৌঁছানোই ফিকহ”।[৭]

৪। ইমাম আবু হানিফা [৮০- ১৫০ হি.] (রহ) সর্বপ্রথম ফিকহের গ্রন্থবদ্ধ সংজ্ঞা দেন। তাঁর মতে ফিকহ হলঃ

- معرفة النفس ما لها وما عليها “মানুষের জন্য কল্যাণকর ও ক্ষতিকারক বিষয় অবগত হওয়া”।[৮] এই সংজ্ঞা থেকে বুঝা যায়, তিনি ফিকহ দ্বারা শারী‘আত অর্থ নিয়েছেন এবং ‘আকীদা, আখলাক, দৈনন্দিন কার্যাবলীসহ মানুষের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সব কিছুর ভাল মন্দ দিক অবহিত হওয়াকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ফিকহের

---

৫ আল কুরআন, ২০: ২৭-২৮ - واحلل عقدة من اساني يفقهوا قولي

৬ ফিরোযাবাদী, বসায়েরু যাভীত তামঈয, কায়রো: আল-মাজালিস আলা লিশ শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৭৩ ইং, খ. ৪, পৃ. ২১০

৭ আবুল কাসিম রাগিব ইবন হুসাইন আল-ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন, রিয়াদ: মাকতাবাতু নাযযার মুস্তফা আল-বায, তা. বি. খ. ২, পৃ. ৪৯৬

৮ আলাউদ্দীন মাসউদ আত-তাফতাযানী, শারহুত তালভীহ আলাত তাওদীহ লিমাতানিত তানকীহ ফী উসূলিল ফিকহ, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ ইং, খ. ১, পৃ. ১৬

এই ব্যাপক অর্থ গ্রহণের কারণে তিনি আকীদা সংক্রান্ত তাঁর প্রণীত গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন " আল- ফিকহুল আকবর"।

৬। অবশেষে ফিকহ শব্দটি পারিভাষিক অর্থের বিবর্তনের সর্বশেষ পর্যায়ে শুধু ব্যবহারিক বিধি- বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ পর্যায়ে সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়ঃ

- الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية العلمية المستمدة من الادلة التفصيلية "বিস্তারিত দলিল থেকে আহরিত শারী'আতের গৌণ ও ব্যবহারিক বিধি- বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান ফিকহ"। বর্তমান সময় পর্যন্ত ফিকহ শব্দটি এই অর্থই প্রকাশ করেছে।[৭]

(ক) উসূলবিদগণের মতে ফিকহ এর সংজ্ঞা

উসূলবিদগণ ফিকহের সংজ্ঞা ধারবাহিক তিনটি স্তরে বর্ণনা করেছেন।

প্রথম স্তর

ফিকহ শব্দটি শার'উন (شرع) শব্দের সমার্থক। এ স্তরে ফিকহ বলতে বুঝায় মহান আল্লাহ প্রদত্ত এমন প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যেগুলো মানুষের 'আকীদা বিশ্বাস, আখলাক এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত। ইমাম আবূ হানিফার (রহ) মতে 'মানুষের উপকার ও অপকার বিষয়ক জ্ঞানকে ফিকহ বলে'। এ কারণেই তিনি তাঁর 'আকীদা বিষয়ক পুস্তকের নামকরণ করেছেন 'আল ফিকহুল আকবর'।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরে 'ইলমূল 'আকাইদ ও ইলমূল ফিকহকে স্বতন্ত্র দু'শাস্ত্রে বিভক্ত করা হয়েছে। 'ইলমূল 'আকাইদকে বলা হতো 'ইলমূত তাওহীদ বা 'ইলমূল কালাম, এ স্তরে ফিকহের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছেঃ 'বিশদ দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে সংকলিত শারী'আতের আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিধান সম্পর্কিত জ্ঞানকে ফিকহ বলে'। এখানে মূল বিষয় অর্থাৎ 'আকীদা বিশ্বাস ছাড়া অন্যগুলোকে আনুষঙ্গিক হিসেবে বুঝানো হয়েছে।

---

[৭] *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১২

তৃতীয় স্তর

যার উপর আমাদের বর্তমানকালের বিশেষজ্ঞ আলিমগণের অভিমত স্থিত হয়েছে, তাহলো বিশদ দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে সংকলিত ব্যবহারিক শারী'আতের আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিধান সম্পর্কিত জ্ঞানকে ফিকহ বলে'।

ফকিহগণের মতে ফিকহ এর সংজ্ঞা

ফকিহগণের মতে ফিকহ শব্দটি নীচের দু'টি অর্থের যে কোন একটি অর্থে প্রযোজ্য হয়।

(এক) কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত বিধান অথবা ইজমা' প্রসূত বিধান অথবা শারী'আত সমর্থিত কিয়াসের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত বিধান অথবা উপরোক্ত দলিলসমূহের আশ্রিত দলিলের ভিত্তিতে গঠিত শারী'আতের ব্যবহারিক কতক বিধানাবলী দলিলসহ বা দলিল ছাড়া আয়ত্ব করাকে ফিকহ বলে।

(দুই) শারী'আতের যাবতীয় ব্যবহারিক বিধি- বিধান ও মাস'আলা মাসায়েল বুঝতে ফিকহ শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে। এখানে মাছদার (ক্রিয়া মূল) ব্যবহার করে উদ্দিষ্ট বস্তু বুঝানো হয়েছে।

ফিকহ (الفقه) শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিভাষাসমূহ

(ক) দীন (الدين)

অভিধানে দীন শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি বিভিন্নার্থক (المشركة) শব্দসমূহের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিভাষাগুলো তুলে ধরা হলো।

১। প্রতিদান (الجزاء)

যেমন- আল্লাহর বাণী "প্রতিদান দিবসের মালিক"।[১০]

২। পথ (الطريقة)

মহান আল্লাহর বাণী "তোমাদের জন্য তোমাদের পথ আমার জন্য আমার পথ"।[১১]

---

১০ আল কুরআন, ১: ৩ - مالك يوم الدين

১১ আল কুরআন, ১০৮: ৬ - لكم دينكم ولى دين

৩। শাসন ক্ষমতা (الحاكمية)

যেমন- আল্লাহর বাণী "যাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান আনে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তাকে তারা হারাম মানে না এবং দীন অনুসরণ করেনা তাদের সাথে যুদ্ধ করো"।[১২]

(খ) শারী'আত ও শির'আহ (الشرعة والشريعة)

অভিধানে শারী'আত শব্দের অর্থ চৌকাঠের নিম্নাংশ, পথ, পানির উৎস, ঘাট, ঝর্ণা। অনুরূপভাবে শির'আহ শব্দটিও একই অর্থবোধক। ভাষাবিদদের মতে, শারী'আত শব্দটি আশ শারউ' الشرع এর স্থলে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন- আল্লাহর বাণী "এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর; সুতরাং তুমি তাঁর অনুসরণ করো, অজ্ঞদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না"।

(গ) আইন প্রবর্তন

(التشريع) আত তাশরী (التشريع) শব্দটি আভিধানিক ভাবে শার রা'আ (شرع) এর ক্রিয়ামূল। অর্থ আইন বা আইনের সূত্র তৈরী করা। পরিভাষায় আত- তাশরী হল বান্দাহর উদ্দেশ্যে আল্লাহর বক্তব্য, তা অবধারিত, ঐচ্ছিক অথবা উদ্ভাবিত যে কোন প্রকার হতে পারে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো শারী'আতের বিধান প্রবর্তনের অধিকার নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আইন প্রবর্তনের কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ"।[১৩]

ফিকহশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের স্তরসমূহ

ইসলামী ফিকহ এর ক্রমবিকাশ ঘটেছে ধাপে ধাপে, যার পূর্ববর্তী স্তরের সাথে পরবর্তী স্তরের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যে, এ ধরনের বেশ কিছু স্তর অতিক্রম করে ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করা যায়।

---

[১২] আল কুরআন, ৯: ২৯ - قتلوا الذين لا يؤمنون با الله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق

[১৩] আল কুরআন, ৬: ৫৭, - ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفصلين

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম স্তর

নবুয়তের যুগ (عصر النبوة)

এটি ছিল নবী করীম (সা) এর মাক্কী ও মাদানী যুগ। এ কালে উদ্ভূত প্রায় সকল সমস্যার সমাধান ওহীর মাধ্যমে হতো। যে সব বিষয়ে সরাসরি ওহীর নির্দেশনা ছিল না সেক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) ইজতিহাদ করতেন অথবা সাহাবীদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে ইজতিহাদ করে তাঁকে জানানোর পর ওহীর ভিত্তিতে তা গ্রহণ করতেন অথবা প্রত্যাখ্যান করতেন। আল্লাহ তা'আলা যে ইজতিহাদকে ওহীর মাধ্যমে স্বীকৃতি দিতেন তা শারী'আতের বিধান হিসেবে গণ্য হতো। তাই সে সময় স্বতন্ত্রভাবে ফিকহ শাস্ত্র প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি।

নবী যুগে পবিত্র কুরআন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ সংকলন করা হয়নি। আল্লাহর বাণীর সাথে রাসূল (সা) এর কথা মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার আশংকায় কুরআন মাজিদ ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ প্রণয়ন সাধারণ ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কারণ অতীতে দেখা গেছে, পূর্ববর্তী জাতি সমূহ আল্লাহর বাণীর সাথে তাদের নবী, পাদ্রি ও সন্যাসীদের কথা মিশিয়ে সবটাকে আল্লাহর বাণী হিসেবে চালিয়ে দিয়েছে। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইবন আমর ও ইবনুল আস সহ মুষ্টিমেয় সাহাবীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর মুখনিসৃত বাণীগুলো 'সাদিকা' নামক একটি সহীফায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

দ্বিতীয় স্তর

সাহাবীদের যুগ (عهد الصحابة)

খুলাফায়ে রাশিদীন ও সাহাবায়ে কিরামের যুগ বিভিন্ন নতুন নতুন ঘটনার কারণে নবুয়্যতের যুগ থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম। অসংখ্য রাজ্য জয়ের ফলে এবং অনারব মুসলমানদের সংস্পর্শে আশায় মুসলমানগণকে বৈচিত্রময় সামাজিক রীতিনীতি ও নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এমতাবস্থায় এ সব সমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহর বিধান জানা জরুরী হয়ে পড়ে। কেননা এমন কোন বিষয় নেই যার ব্যাপারে শারী'আতের নির্দেশনা দেয়া সম্ভব নয়। এ যুগে অসংখ্য ফকিহ সাহাবী ছিলেন। যে কোন নতুন সমস্যা বা ঘটনার উদ্ভব হলে সাধারণ মুসলমানগণ সে সম্পর্কে ইসলামের বিধান জানার জন্য তাদের নিকট যেতেন। তাদের মধ্যে অধিক ফাতওয়াদানকারী সাহাবীর সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম, তের (১৩) জনের বেশী নয়। যেমন- হযরত উমর, হযরত 'আলী, যায়েদ ইবন সাবিত, 'আয়েশা, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, মু'আয ইবন জাবাল, 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম। তাদের প্রত্যেকের এক একটি ফাতওয়া একত্রে সংকলিত করা হলে এক একটি বিশাল গ্রন্থ হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় স্তর

তাবে‘ঈদের যুগ (طور التابعين)

এ স্তরটি কনিষ্ঠ সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু হয়েছে। তাদের অধিকাংশই কলহ বিবাদপূর্ণ যুদ্ধসমূহে অংশ গ্রহণ করেছেন। এ যুগে মুসলিম বিশ্বে দু’টি চিন্তাগোষ্ঠীর (School of thought) উন্মেষ ঘটে। একটি ছিল হিজায বা আরব উপ- দ্বীপ কেন্দ্রিক এবং অন্যটি ইরাক কেন্দ্রিক। হিজায অঞ্চলে ইজতিহাদের ক্ষেত্রে কুরআন ও সূন্নার মূল পথের (Text) উপরই নির্ভর করা হতো। সেখানে যুক্তিবাদের আশ্রয় খুব একটা নেয়া হতো না। কেননা এ অঞ্চলে হাদীস বিশারদগণের প্রবল প্রভাব ছিল। এছাড়া এটি ছিল রিসালাতের উৎসভূমি, আনসার ও মুহাজিরগণ এখানেই বেড়ে উঠেছিলেন। তাবে‘ঈদের যুগে চিন্তা গবেষণার দ্বিতীয় কেন্দ্রটি ছিল ইরাকে, যেখানে ব্যাপকভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির আশ্রয় নেয়া হতো। তাদের মতে এই বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি শেষ পর্যন্ত কিয়াস শীর্ষক মূলনীতির আওতাভুক্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) এ যুগকে উত্তম যুগ বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ ‘সর্বোত্তম মানুষের যুগ হলো আমার যুগ, অতঃপর যারা তাদের পর আসবে অতঃপর যারা তাদের পর আসবে’।

চতুর্থ স্তর

কনিষ্ঠ তাবে‘ঈ ও প্রবীণ তাবে‘ঈ তাবে‘ঈনের যুগ

এ স্তরটি হিজরী প্রথম শতাব্দীর সমাপ্তি এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে শুরু হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, খলিফা হযরত উমর ইবন আবদুল আযীযের শাসনামলই এ যুগের সূচনা বিন্দু। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসব স্তরের তারিখ ভিত্তিক কোন সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এক যুগের সাথে পরবর্তী যুগ সংশ্লিষ্ট বা সংযুক্ত। এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সে সময় রাসূল (সা) এর হাদিস এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও তাবে‘ঈদের ফাতওয়া যৌথভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজ আরম্ভ হয়। আর এটি হয়েছি আমিরুল মু’মিনিন হযরত উমর ইবন ‘আবদুল আযিয (রহ) এর নির্দেশে। কারণ তিনি আশংকা করেছিলেন যে, কালের পরিক্রমায় রাসূল (সা) এর সূন্নাহ এবং সাহাবী ও তাবে‘ঈদের অভিমতসমূহ হারিয়ে যেতে পারে। কুরআন মাজীদের সাথে মানবীয় বক্তব্যের মিশ্রণ ঘটতে পারে এরূপ আশংকা দূরীভূত হওয়ার পরই হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্য লিখে রাখার উদ্যোগ নেয়া হয়। সে সময় কুরআন লিখিত আকারে ও স্মৃতিতে উত্তমরূপে সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল, হাজার হাজার হাফিযে কুরআন তৈরী হয়েছিল এবং এমন কোন মুসলিম ঘর পাওয়া যেত না যেখানে এক কপি কুরআন ছিল না।

পঞ্চম স্তর

ইজতিহাদের যুগ (طور الاجتهاد)

ইসলামী সাম্রাজ্যে ব্যাপক 'ইলমী জাগরণের মধ্য দিয়ে এ যুগের সূচনা হয়। তা ছিল উমাইয়া খিলাফতের শেষ দিক হতে প্রায় হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শেষ সময় পর্যন্ত। যেমনটি আমরা বারবার উল্লেখ করেছি যে, সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণের আলোকে এ সবের শুরু এবং শেষ উল্লেখ করা কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব নয়। বড় বড় ইমাম, বিভিন্ন মাযহাবের মুজতাহিদ ও আহলুত তারজীহদের (অগ্রাধিকার দানকারী) যুগ এ স্তরের অন্তর্গত। তদ্রূপ সূক্ষ্ণ 'ইলমী পদ্ধতিতে বিভিন্ন ফিকহি মাযহাবের সংকলন ও লিপিবদ্ধ করণের যুগও এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

শারী'আত

শারী'আতের আক্ষরিক অর্থ হল যে রাস্তা পানি সরবরাহের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে, যে রাস্তা অনুধাবন করতে হবে। ইহার প্রায়োগিক অর্থ হল, ইসলামের ধর্মীয় সর্বব্যাপী নীতিসমূহ। মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ ইহার অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহর আদেশের সমষ্টি দ্বারা ইহা গঠিত। আল্লাহর আইন এবং উহার অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ধার সহজ নয়। মানুষের যাবরীয় কার্যকলাপ উহা নৈতিক ধর্মীয় কিংবা আইন সংক্রান্ত যাই হোক না কেন শারী'আতের আওতায় পতিত হয়। তবুও শারী'আতকে বর্তমান অর্থে আইন বলে ধরে নেয়া হয় না, উহাকে নৈতিক ব্যাপারে অভ্রান্ত পথ প্রদর্শক বলে ধার্য করা হয়, যদিও বহুক্ষেত্রে আইন ও অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নাবলী শারী'আতের সঙ্গে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে যে, শারী'আত হতে ফিকহ অর্থাৎ আইনকে পৃথক করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এখন বিচার করা যাক আইন সম্বন্ধে ইসলামী ধারণা কি? এই ধারণাকে علم اليقين 'ইলমূল ইয়াকীন' বলে। উহা কি আমাদেরকে নিশ্চিত ভাবে 'হুসন' বা সুন্দর এবং নিশ্চিত ভাবে 'কুভ' বা অসুন্দরের নির্দেশ দেয়। 'হুসন' এবং 'কুভ' এর মধ্যে এই যে নিশ্চিত পার্থক্য, আমাদের মধ্যকার দুর্বলতার জন্য উহা আমরা সম্যক উপলব্ধি করতে সমর্থ নই। সে জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা) এর পথ নির্দেশনার প্রয়োজন হয় এবং শারী'আতই এই পথ নির্দেশ করে দেয়। যা নৈতিকভাবে সুন্দর বলে গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণ করতে হবে। নির্বাচন করার জন্য কুরআন, হাদীস, সূন্নাহ এবং ইজমা'র সাহায্যের প্রয়োজন। সুতরাং উক্ত উৎসসমূহকে একত্রে শারী'আত বলে ধার্য করা হয়।

শারী‘আত বলতে মানুষের সমগ্র কার্যাবলীর কাঠামো বুঝায়। ফিকহ শুধুমাত্র আইনগত কার্যাবলী নির্দেশ করে। সুতরাং শারী‘আত দ্বারা আল্লাহর সামগ্রিক নির্দেশ বুযায় এবং তা আদর্শ জীবন যাপন করতে সহায়তা করে।[14] তা মানুষের মধ্যে ন্যায় বিধানের উদ্দ্যশ্যে আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশ।[১৫]

ফিকহ

ইমাম আবূ হানিফার মতে ‘ফিকহ’ এর দ্বারা মানুষের আত্নদর্শন, অর্থাৎ মানুষের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে ভাল মন্দের জ্ঞান বুযায়। সদ- উস- শারী‘আত অনুসারে ফিকহ দ্বারা ভাল মন্দের ফল বিচার বুঝায়। মালিকি এবং শাফি‘ঈ (রহ) এর মতে ফিকহ দ্বারা শারী‘আতের জ্ঞান এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচার বুদ্ধি দ্বারা তার প্রয়োগ বুযায়। কিন্তু স্যার আব্দুর রহিম বলেন, উক্ত মতগুলোর একটির সাথে অন্যটির কিঞ্চিতাধিক পার্থক্য রয়েছে। তার মতে ইসলামের প্রথম যুগে ফিকহ দ্বারা পরকালের জ্ঞান লাভই নির্দেশিত হত এটা সত্য, কিন্তু পরবর্তীকাল হতে ইহার দ্বারা সত্যিকারভাবে আইনের বিধি নিয়মই বুঝিয়ে আসতেছে এবং ইহার দ্বারা আইন ভিত্তিক নীতিই বুঝানো হয়। সুতরাং ইহার দ্বারা ইসলামী আইন বিজ্ঞান (Islamic Jurisprudence) বুঝায়। ‘ফিকহ’ এর আক্ষরিক অর্থ হল ‘বুদ্ধি’। ইহাকে আল্লাহ প্রদত্ত আইন উপলব্ধি করার তীক্ষ্ণ ধী- শক্তি বলে ধরা হয়। যখন এমন কোন আইনের বিচার সমুপস্থিত হয় যার উপর কুরআনের কোন নির্দেশ নাই এবং হাদিসও পাওয়া যায় না, কিংবা তৎসম্বন্ধে জ্ঞান না থাকার দরুন, যখন তার দ্বারা কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তখন ধী-শক্তির ব্যবহার দ্বারা স্বাধীনভাবে নিজস্ব বিবেক ও জ্ঞান বুদ্ধির মাধ্যমে ইহা মীমাংসা করার বিধান স্বীকৃত হয়। সে জন্য ইহাকে ফিকহ বলে। যেহেতু এই ধরনের বিচার দ্বারা প্রায় সম্পূর্ণ আইনশাস্ত্র গঠিত হয়েছে সে জন্য ইহা দ্বারা মুসলিম আইন শাস্ত্র বুঝায়। ‘ইলম’ অর্থাৎ জ্ঞানের সঙ্গে ‘ফিকহ’ অর্থাৎ ধী-শক্তির পার্থক্য রয়েছে। কারণ ফিকহ অর্থ হল নিজস্ব বুদ্ধি এবং মতামত দ্বারা স্বাধীনভাবে বিচার করার ক্ষমতা। কোন ব্যক্তি বিদ্বান বা ‘আলিম’ হতে পারেন, কিন্তু তাকে ‘ফকিহ’ হতে হলে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা নিজস্ব মতামত প্রকাশের ক্ষমতা থাকা চাই। ইসলামী আইন বিশারদগণ ফিকহ বা মুসলিম আইন বিজ্ঞানের এরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, “কুরআন ও সূন্নাহ হতে উৎসারিত এবং জ্ঞানীগণ কর্তৃক যুক্তভাবে স্বীকৃত ব্যাখ্যার দ্বারা ইহা সম্প্রসারিত হয়ে যে অধিকার এবং কর্তব্য স্থাপন করেছে, ইহার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত সজ্ঞানতাকেই ফিকহ বলে”। সুতরাং ইহা দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত আইন যা আমাদের নিকট কুরআন, সূন্নাহ এবং হাদীসের মাধ্যমে এসেছে ইহাই শুধু নয়, ইজমা’ এবং কিয়াস এর মাধ্যমে যা এসেছে তাও বুঝার ক্ষমতা বুঝায়। ফকিহগণের এই বুঝার ক্ষমতা অনন্যসাধারণ হতে হবে। তাদেরকে ক্লাসিক আইনবিদগণের লিখা হতে ‘দুর্বল’ কিংবা ‘অসমর্থিত’ মত বাছাই করে সঠিক মত উদ্ধার করার ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে। মানুষের কার্যাবলী আল্লাহর

---

[১৪] Majid Khaduri.

[১৫] Dr. Subhi Mahmesani.

অনুমোদন লাভ করতে হলে, শারী'আত কিংবা ফিকহ যার মাধ্যমেই তা হোকনা কেন, ইহা এ আদর্শ নীতিসম্মত হতে হবে। যেহেতু শারী'আত ও ফিকহ আদর্শনীতি হতে উদ্ভুত সে জন্য বহু মুসলিম আইনবিশারদ 'শারী'আত' ও 'ফিকহ' শব্দদ্বয়কে একার্থবোধক ভাবে ব্যবহার করেন।[১৬] শারী'আত ও ফিকহ যদিও অনেকক্ষেত্রে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে মনে হয়, তথাপি ইহাদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কারণ, শারী'আতে সাতটি ধর্মীয় অনুশাসন রয়েছে। যথাঃ

(১) ফরয

ইহা দ্বারা অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহের কথা বলা হয়। কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশসমূহ মানুষের অবশ্য করণীয় কতিপয় কর্তব্য স্থির করে দিয়েছে, যথাঃ নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস অর্জন করাও মানুষের জন্য ফরয। যদি কেউ উহাতে বিশ্বাস জ্ঞাপন করে কিংবা উহা ইচ্ছা করে পালন না করে সে ফাসিক হয়ে যায়। তা দুই প্রকার। যেমনঃ (ক) ফরযে আইন বা সকলের জন্য ব্যক্তিগত ফরয, যা প্রত্যেককে পালন করতে হয়। যথাঃ নামায, রোযা ইত্যাদি। (খ) ফরযে কিফায়া হল সামাজিক ফরয, যা মুসলিম সমাজের যে কেহ পালন করলে আদায় হয়ে যায়। যথাঃ মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায, জিহাদ ইত্যাদি।

(২) মাকরূহ

যা অমনোপুতঃ কিন্তু সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নয়। ইহা দু'প্রকারঃ প্রথমতঃ তাহরীমা, অর্থাৎ যা হালালের নিকটবর্তী, অথচ অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। যাথাঃ বিড়াল যদি কোন খাদ্য দ্রব্য হতে কিছু ভক্ষণ করে তাহলে উহা গ্রহণ করা। দ্বিতীয়তঃ তানজীন, অর্থাৎ হারামের নিকটবর্তী। যথা- কচ্ছপের মাংস ভক্ষণ করা।

(৩) মানদুব বা ওয়াজিব

এটাও বাধ্যতামূলক কর্মের আওতাভূক্ত। শারী'আর প্রারম্ভিক ওয়াজিব নির্ধারিত হয়েছে। ওয়াজিব পালন না করলে কবিরা গুনাহ হয়। এটা পড়ায় ফরযের কাছাকাছি। তবে ফরযের মত ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া এরূপ দু'ভাগে বিভক্ত নয়। যথাঃ জুম'আ ও 'ঈদের খুৎবাহ, দুই 'ঈদের নামায ও বিতরের নামায ওয়াজিব।

(৪) সূন্নাত

হযরত মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক যা অবশ্য পালনীয় করা হয়েছে এবং যা তাঁর নিকট হতে অনুসরণ করার কথা তিনি নিজে বলেছেন তা- ই সূন্নাত। সূন্নাত দুই প্রকার। যথাঃ (ক) সূন্নাতে মুয়াক্কাদাঃ ইহা পালন না করলে প্রায় ওয়াজিব পালন না করার সমতুল্য পাপ হয়। যেমনঃ ইমামের পিছনে জামা'আতে নামায আদায় করা। (খ) সূন্নাতে যায়েদাঃ

[১৬] ফৈজীর *'মুসলিম আইন'* পৃ. ২৩ (৩য় সংস্করণ)

যা নবী করীম (সা) পালন করেছেন, তবে ইহা পালন না করলে এত বেশী গুনাহের বিষয় নহে। যেমনঃ পোশাক আশাক, মেছওয়াক ইত্যাদি।

(৫) নফল বা মুস্তাহাব

ইহা হযরত মুহাম্মদ (সা) মাঝে মধ্যে পালন করেছেন, আবার কখনো বর্জন করছেন। ইহা পালন না করা গুনাহের কাজ নহে, পালন করলে সাওয়াব হবে। যেমনঃ পরিমাণের চেয়ে বেশী যাকাত প্রদান করা।

(৬) হারাম

যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যাথা- মদ্যপান, চুরি করা, উৎকোচ গ্রহণ করা।

(৭) জায়িয

যার সম্বন্ধে ধর্মীয় অনুশাসন নিরপেক্ষ, অর্থাৎ উহার পক্ষেও নহে, বিপক্ষেও নহে। কিন্তু ফিকহ'তে মাত্র দু'টি ধর্মীয় অনুশাসন রয়েছে। ফিকহ অনুসারে কোন কাজ হয় জায়িয বা অনুমোদনীয়, নয় নাজায়িয বা অননুমোদনীয় হবে, অর্থাৎ বৈধ কিংবা অবৈধ হবে। আইনবিদগণ শারী'আতের পরিপ্রেক্ষিতে যেরূপই বিচার করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত তাদের সম্মুখে উত্থাপিত প্রশ্নটি বৈধ কি অবৈধ, ইহার উপরই তাদের মত প্রকাশ করতে হবে। তৃতীয় কোন বিচার তাদের সম্মুখে উপস্থিত হবে না।সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায়, শারী'আত হল মূলতঃ আদায়ী ফরয এবং ধর্মীয় পাবন্দী বিষয়ক নীতির সমষ্টি; উহা ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে আল্লাহর পথ দর্শন করতে সাহায্য করে। ফিকহ হল আইন শাস্ত্র যা সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং যার দ্বারা কুরআন, হাদীস ও ইজমা' হতে গৃহীত নীতি উপলব্ধি করে, আইনগত কর্তব্য এবং বাধ্যবাধকতা কী তার সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করে কোন প্রশ্নের বৈধতা কিংবা অবৈধতা বিচার করার ক্ষমতা লাভ করা যায়।

ফিকহ দু'অংশে বিভক্ত

(১) উসূল

মূলনীতি শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে উসূল (اصول) এটি আসল (اصل) শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ মূল বা ভিত্তি যে বস্তুর উপর অন্য বস্তুর ভিত্তি স্থাপন করা হয় তাকে আসল (اصل) বলে।[১৭] অতএব উসূলুল ফিকহের অর্থ দাড়াল আইনশাস্ত্রের ভিত্তি ও আইনের মূলনীতি। ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায় উসূলুল ফিকহ হচ্ছে, এমন সব সামগ্রিক মূলনীতি যার দ্বারা শারী'আতের আমলী বিধি- বিধানসমূহ তার

[১৭] মুফতি মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, *কাওয়াইদুল ফিকহ,দেওবন্দঃ* আশরাফী বুক ডিপো, ১৯৯১, পৃ. ১৮১

বিস্তারিত দলিল হতে উদ্ভাবন করা যায়।[১৮] ইসলামী শারী'আতের দলিল সংক্রান্ত ঐ সব মূলনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান যা থেকে শারী'আতের বিধি- বিধান আহরণ করা।[১৯]

(২) ফুরু'

(فروع) আইনের শাখা, অর্থাৎ বিশিষ্ট বস্তু ভিত্তিক ব্যবহারতত্ত্ব। 'ফুরু' নির্দিষ্ট আইন নির্দেশিতভাবে প্রয়োগ করে মাত্র। বিশেষ বিশেষ আইন বাস্তবিক ক্ষেত্রে যাকে যে অধিকার প্রদান করেছে, কিংবা যে কর্তব্য পালন করতে আদেশ দিয়েছে, ফুরুর মাধ্যমে আদালত ইহা প্রয়োগ করে বিচার করে। যথা- বিবাহ আইন, উত্তরাধিকার আইন, ওয়াকফ আইন, ইত্যকার আইনের ব্যবহারিক প্রয়োগ ফুরু'র মাধ্যমে হয়। উসূলকে বর্তমানে Jurisprudence বা মূল আইন বিজ্ঞানের সঙ্গে এবং ফুরুকে Substantive বা স্বত্ব- ভিত্তিক ব্যবহারিক আইনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

ইজতিহাদ

ইজতিহাদের অর্থ হল সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোন কিছু সম্পাদন করতে নিজেকে উদ্যোগী করা। ইহা জিহাদ এর অর্থ প্রকাশ করে এই জন্য যে সমগ্র একাগ্রতার দ্বারা সমাধান আবিষ্কারে জয়লাভ করার প্রচেষ্টাও ইহাতে বুঝা যায়। ইহা যে প্রায়োগিক অর্থে ব্যবহৃত হয় তা হল কোন আইনবিদ বা ফিকহ কর্তৃক এরূপ উদ্যোগ দ্বারা কুরআন, সূন্নাহ ও ইজমা' মুসলিম আইনের এই প্রাধিকার ত্রয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কোন নব উদ্ভূত ব্যাপার কিংবা আইনের বিধি সম্বন্ধে নিজ মত গঠন করা। সুতরাং কুরআন সূন্নাহ এবং ইজমা' হতে সাদৃশ্য অনুসন্ধান করে উহার সাহায্যে এই মত গঠন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে অনুসন্ধান করেও যখন কোন কার্যকরি বিধান সন্ধান ইজমা'তে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তখনই এই ইজতিহাদ দ্বারা নতুন আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চলে। ইমাম শাফি'ঈর মতানুসারে ইজতিহাদের আদি ব্যবহার কিয়াসের অনুরূপ বলে ধার্য করা হয়। ইহা তাঁর মতে 'রায়' সদৃশ এবং মুজতাহিদ ঐ ব্যক্তি, যে তাঁর এ 'রায়' ঐরূপ উদ্যোগ দ্বারা গঠন করে। হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন যে, মুজতাহিদের রায় যদি ভ্রান্ত হয় তাহলেও সে একটি পুরস্কারের অধিকারী হবে এবং তা যদি অভ্রান্ত হয় তাহলে সে দু'টি পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। সুতরাং ইজতিহাদ যে সঠিকই হবে, তা সব সময় প্রত্যাশিত নয়, এর ফল ভ্রমাত্নকও হওয়া সম্ভব। শুধুমাত্র মুসলিম জাহানের সকল মুজতাহিদগণের সম্মিলিত ইজতিহাদকেই ইজমা' হিসেবে অভ্রান্ত বলে ধার্য করা হয়।

---

[১৮] আবদুল ওয়াহহাব খাল্লাফ, *আল কাহেরাঃ* দারুল হাদীস, ২০০৩, পৃ. ১২

[১৯] ড. হাসান আলী আশ-শায়ীলি, *আল মাদখাল লিল ফিকহিল ইসলামী,* ত.বি. পৃ. ৪১৬

Dhaka University Institutional Repository

মুজতাহিদ

ইজতিহাদ কেবল মুজতাহিদগণই সৃষ্টি করার অধিকারী। এই মুজতাহিদ বা আইনবিশারদ যিনি, তিনি আইনজীবি বা ফকিহ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের হবেন। তিনি যে শুধু আইনে সুশিক্ষিত হবেন তা নয়, কুরআনের জ্ঞান এবং উহার ভাষার আভিধানিক এবং আইনানুগ অর্থ উদ্ধারের ক্ষমতা তার থাকতে হবে। সুন্নাহর জ্ঞান এবং উহা সম্পর্কিত মূলবচন এবং প্রাধিকার সমূহের সঙ্গে তার পরিচয়ও থাকতে হবে। তার সঙ্গে সাদৃশ্য অনুসন্ধান করে উহার পরিপ্রেক্ষিতে নিজ মত সুষ্ঠুভাবে গঠন করার মত তীক্ষ্ণ ধী-শক্তিও তাকে থাকতে হবে। তার সঙ্গে তাকে সাবালক, সুস্থ মনা এবং কর্তব্য জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে, যাতে তিনি প্রয়োজনবোধে শারী'আর এবং প্রাধিকারের মূলে গমন করে নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হতে পারেন। কিন্তু এই সাধারণ ও প্রশস্ত ইজতিহাদ কালক্রমে বিশিষ্ট ইজতিহাদে পর্যবসিত হয়। কারণ কতিপয় মুজতাহিদ এতদূর তীক্ষ্ণ ধী এবং আইন জ্ঞানসম্পন্ন হন যে, পরবর্তীকালে তাদের সমকক্ষ কেউ হতে পারেন নাই। এই মুজতাহিদগণ ছিলেন সুন্নী মাযহাব চতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ এবং ইমাম হাম্বল। আর ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ের ইমাম জাফর সাদিক। অবশ্য ইহাদের সঙ্গে কতিপয় সমসাময়িক আইনবিদকেও মুজতাহিদের পদমর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল। এই মুজতাহিদগণ প্রত্যেকটি প্রশ্নের মূলে গমন করে কুরআন, সূন্নাহ, কিয়াস, ইসতিহসান, ইসতিসলাহ, ইসতিসহাব ইত্যাদির ব্যবহার দ্বারা উহা মীমাংসা করার অধিকারী ছিলেন। ইহাদিগকে প্রথম শ্রেণির মুজতাহিদ অর্থাৎ পরম মুজতাহিদ বা মুজতাহিদ ফিশ- শরা' (مجتهد في الشرع) বলা হয়। ইহাদের পরবর্তী পর্যায়ের অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের মুজতাহিদ হলেন মুজতাহিদ ফিল মাযহাব। (مجتهد في المذهب) তারা উপরোক্ত মুজতাহিদগণের শিস্য। যথা হানাফি সম্প্রদায়ের ইমাম আবূ হানিফার শিস্য ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ এবং শাফি'ঈ সম্প্রদায়ের ইমাম মাযানি এই শ্রেণির মুজতাহিদ ছিলেন। যদিও তারা কোন মাযহবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না এবং নিজস্ব মাযহবের প্রতিষ্ঠাতাগণ কুরআন এবং সুন্নাহর ভিত্তি বা মূল বিচার করে যে ইজতিহাদসমূহ স্থাপন করে গিয়েছিলেন, তার অন্তর্গত থেকে সেগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগ কিংবা তদুদ্ভূত শাখা শ্রেণির কোন প্রশ্নের বিচার অধিকারী ছিলেন মাত্র, তথাপি তাদের ইজতিহাদের মূল্য অত্যধিক ধার্য করা হয়। এমন কি ইমাম আবূ হানিফার মতের সঙ্গে ইহার শিস্যগণের মতভেদ দর্শন করা গেলে কোন কোন ক্ষেত্রে শিস্যগণের মতকে প্রাধান্য দেয়া হত।

তৃতীয় পর্যায়ের মুজতাহিদ বা মুজতাহিদ উল মাসায়েল (مجتهد المسائل) তাদেরকে বলে, যারা পূর্বোক্ত প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের মুজতাহিদগণ কর্তৃক বিবেচিত হয় নাই এরূপ কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে নিজস্ব চিন্তা দ্বারা তা সমাধান করে কোন নতুন ইজতিহাদ সৃষ্টি করেন। অবশ্য পূর্বোক্ত মুজতাহিদগণ কর্তৃক যদি কোন আইন কিংবা নীতি সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহেল এই মুজতাহিদ- উল মাসায়েলগণ তা অনুসরণ করতে

বাধ্য। এই পর্যায়ের মুজতাহিদ ছিলেন ইমাম গাযযালী, তাহাভী, ইমাম হাযাক, সারকাশী ইত্যকার মনীষীগণ। এই শ্রেণির মনীষীগণের পর নিম্নোক্ত পর্যায়ের আইনবিদগণের কথা উল্লেখযোগ্য।

(১) আসহাবুত তাখরীজ (اصحاب التخريج)

তারা উপরোক্ত তিন শ্রেণির মুজতাহিদগণ কর্তৃক প্রদত্ত আইনাবলী সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ধারণ করেন এবং উক্ত মনীষীগণ প্রদত্ত বিভিন্ন আইনাবলীর মধ্যে সত্যিকার আইন উদ্ধার করার ক্ষমতায় উহাদেরকে ক্ষমতাবান বলে ধার্য করা হয়।

(২) আসহাবত-তারজীহ (اصحاب الترجيح)

উপরোক্ত একই শ্রেণির মুজতাহিদগণের মধ্যে মতভেদ হলে উহার কোনটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য, তা ধার্য করার ক্ষমতা এই শ্রেণির আইনবিদগণের বর্তমান রয়েছে।

(৩) আসহাবুত-তাসহীহ (اصحاب التصحيح)

তারা শুধু এই বলতে সমর্থ কোন আইনের কোন ব্যাখ্যা জোড়ালো এবং কোন আইনের ব্যাখ্যা দুর্বল। ইজতিহাদের উপরোক্ত বিবর্তনক্রমে প্রতীয়মান হয় যে, মুজতাহিদগণের ক্ষমতা ক্রমশঃই হ্রাস প্রাপ্ত হতে হতে এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে তাদের ‘ওয়াজ’ এবং ‘ফাতওয়া’ ব্যতীত অন্য কিছু প্রদানের ক্ষমতা ছিল না।

ওয়াজ

সূন্নী সম্প্রদায়ের মাযহাবগুলির প্রতিষ্ঠাতাগণের প্রদত্ত মূলসূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোন মুতাহিদ তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তার বক্তব্য পেশ করতেন তাহলে তাকে ‘ওয়াজ’ বলা হত।

ফাতওয়া

পরবর্তীকালে এসব আইনবিদ বা মুজতাহিদগণের ক্ষমতা অধিকতর হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তাদের নিকট শুধু কোন প্রশ্ন করলে, তারা তখন তার উত্তর দেয়ার অধিকারী ছিলেন মাত্র। তাদের এই উত্তরগুলোকে ‘ফাতওয়া’ বলা হয়। তাদিগকে ‘মুজতাহিদুন বিল ফতওয়া’ কিংবা সংক্ষেপে ‘মুফতি’ বলে অভিহিত করা হয়।

মুফতিগণের দান

যদিও এ মুফতিগণ কোন বিশেষ প্রশ্নে আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিধিবদ্ধ মত ফাতওয়া প্রদান করতেন, তথাপি তাদের এই ফাতওয়াগুলিতে তারা পূর্বসূরীদের নিছক পাণ্ডিত্যবাহী আইনের নীতিসমূহের সঙ্গে বর্তমান জীবনের প্রভাবকে সংশ্লিষ্ট করতেন এবং এর মাধ্যমে ঐ নীতিসমূহকে মুসলিম সমাজের ক্রম পরিবর্তনশীল প্রয়োজনে প্রয়োগ করতেন। এই প্রয়োগ যতই মৌলিক হোক না কেন মুফতিগণ মনে করতেন যে, তারা তাকে পূর্বসূরীদের নীতির মধ্যে আবদ্ধ রেখেই তা করতেছেন এবং প্রয়োজনের স্বাভাবিক তাগিদেই তা করতেছেন। এটা তাকলীদের পরিপন্থী কিনা এ সম্বন্ধে চতুর্দশ শতাব্দীর মিশরীয় মালিকি আইনবিদ ও মুফতি আল কারাফির মত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "প্রথাকে ভিত্তি করে যে সব আইন রয়েছে তাদের পরিবর্তন হবে, যদি সে সব আইন প্রথারও পরিবর্তন হয়"।

এই ফাতওয়াসমূহ শধু মাত্র দেওয়ানী সংব্যবহারের ক্ষেত্রেই নয় শারী'আ আইনের সর্বক্ষেত্রেই আইনকে সম্প্রসারিত করেছে এবং শারী'আ আইনের পরিপূরক হিসেবে উহা নির্দেশিত হয়। আমাদের এই উপমহাদেশে সপ্তদশ শতাব্দীতে সংকলিত 'ফাতওয়া আলমগিরী' এসব ফাতওয়াসমূহের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং ব্যাপক সংকলন।

তাকলীদ (التقليد)

হানাফি, মালিকি, শাফি'ঈ ও হাম্বলি সূন্নী আইনের এই চারটি মাযহাব স্থাপিত হওয়ার পর, পরবর্তী আইনবিশারদগণের কার্যাবলী সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কারণ, এই মাযহাবগুলির প্রতিষ্ঠাতাগণ কুরআন ও সুন্নাহ সম্বন্ধে এত অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁদের বিচার বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ ছিল, শারী'আত এবং ফিকহ সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান এত গভীর ছিল যে, পরবর্তীকালে অপর কারো তাদেরকে অতিক্রম করার মত ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার প্রশ্নও কল্পনাতীত ছিল। সুতরাং পরবর্তীকালের আইনবিশারদগণের জন্য তারা যে নীতি ধার্য করে গিয়েছিলেন তার গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করেই শুধু তাদের আইন সম্প্রসারণের ক্ষমতা স্বীকৃত হয়েছে। ইহাই ক্লাসিক আইনের চিন্তাধারার সারমর্ম এবং ইহার সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হল আইনের বিশিষ্ট রীতি তাকলীদ। তাকলীদের আক্ষরিক অর্থ হল কোন প্রাণীকে বলগা ধরে পরিচালনা করা। এর আইনগত তাৎপর্য হল "কারো মতের কারণ এবং ভিত্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবিদিত থেকেও তা অনুসরণ করা"।[২০] প্রশ্ন ব্যতিরেকে এই অনুকরণ এবং অনুসরণনীতিকে সঠিক বলে এই জন্য গ্রহণ করা হয় যে, ইহাই তদানিন্তন আইন বিচারে একান্ত করনীয় পন্থা ছিল। কারণ পূর্ববর্তী যুগে ক্লাসিক আইনবিদগণের সম্মিলিত মতে যে ইজমা' সৃষ্টি হয়েছিল তা এত অভ্রান্ত ছিল যে, উক্ত বিষয়ে কোন প্রকার মূলগত প্রশ্ন উত্থাপন না করে তা যথাযোগ্য মনে

---

[২০] Abdur Rahim: (এই মত উল্লেখিত হয়েছে Jam 'ul awami' vol. 1v p. 276. হতে)

করা হত। সুতরাং কুরআন, সূন্নাহ এবং ইজমা' ইত্যকার ব্যাপারে যেখানে ঐ ক্লাসিক আইনবিদগণের মত সুস্পষ্ট ভাবে প্রদত্ত হয়েছে, সেখানে পরবর্তীকালের কোন আইনবিদ বা মুজতাহিদ নিজস্ব বুদ্ধি প্রয়োগ কিংবা বিশ্লেষণ দ্বারা কোন প্রশ্নের যে সমাধান করতে পারেন ইহার স্বীকৃতি প্রদান করা বন্ধ হয়ে গেল। ইজতিহাদের দ্বার রুদ্ধ হয়েছে বলে ধার্য করা হল। সুতরাং এই সবক্ষেত্রে তাকলীদ শুধু প্রযোজ্য রইল। অর্থাৎ আইনের অনুসন্ধান দ্বারা নিজস্ব মত প্রকাশ না করে, পূর্বসূরীদের অনুসরণই শুধু করনীয় ছিল। পরবর্তীকালের মুজতাহিদগণ এই তাকলীদের নীতিক্রমে শুধুমাত্র মাযহাবের প্রবর্তিত আইনাবলী, যা অপরিবর্তনীয় বলে ধরা হয়, তার বেষ্টনী সীমার মধ্যে থেকে নিয়ন্ত্রিতভাবে যতদূর সম্ভব নিজস্ব সিদ্ধান্ত প্রদান করতে সক্ষম ছিলেন মাত্র। যদিও আইনের মূল অনুসন্ধান করে বিচারের প্রশ্নে তাঁরা অনুকরণকরী ছিলেন, তবুও যে স্থলে মূল অনুসন্ধানের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না সে স্থলে অর্থাৎ আইনের বিভিন্ন শাখার ব্যাপারে, তাদেরকে মুজতাহিদ বলে ধরা হত। সুতরাং যদিও তাঁরা অনুকরণকারী ছিলেন তবুও ক্লাসিক আইনের পরিপ্রেক্ষিতে শাখা আইন সম্প্রসারণ করার ক্ষমতাও তাঁদের বিলক্ষণ ছিল। আধুনিক যুগে, নজীর দৃষ্টে যেখানে বিচার করতে হয়, সেখানে পূর্বোক্ত নজীর অনুসরণের বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও যেমন বিচারকগণ ঘটনা ভাদে রায়ের মধ্যে যথেষ্ট স্বকীয়তা এনে তা সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হন, পরবর্তীকালের এই আইনবিদগণও রয়েছেন বলে ধার্য ভ্রমাত্নক নয় বললে, তা আশা করা যায় অতুক্তি বলে গণ্য হবে না।

ইসতিদলাল (الاستدلال)

الاستدلال। শব্দটির মূল শব্দ হচ্ছে দলিল। এর অর্থ তলব করা, তালাশ করা, খোঁজ করা বা দলিলের সাহায্যে কোণ কিছু প্রমাণ করা। এটি হচ্ছে এমন একটি পরিভাষা যার সাহায্যে কোণ কিছু প্রমাণ করা হয়।[২১] 'ইসতাদলাল' এর প্রকৃত অর্থ হল কোন একটি বিষয়বস্তু হতে অন্য একটি বিষয়বস্তু অনুমান করা। মালিকি এবং শাফি'ঈগণ এটাকে ব্যাখ্যার এমন একটি পন্থা বলে গণ্য করেন, যা ইহাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি আইন সংক্রান্ত যুক্তি তর্কবাদ বলে ধার্য করেন। তাদের নিকট ইহা মুসলিম আইনের পঞ্চম উৎস। কিন্তু হানাফিগণ ইহাকে সে রূপ মনে করেন না, ইহাকে এইরূপ গণ্য করেন যেন তা ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আইনাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন নীতি মাত্র।

[২১] মুফতি আমীমুল ইহসান, আল-কাওয়াইদুল ফিকহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২

ইসতিদলালকে তিন শ্রেণির ধরা যেতে পারেঃ

প্রথম শ্রেণির ইসতিদলাল আবার তিন প্রকারঃ

(১) প্রথম প্রকারের ইসতিদলাল উদ্ভূত হয় তখন, যখন একটি প্রতিজ্ঞার সঙ্গে অন্য একটি প্রতিজ্ঞার কোন প্রকার ইল্লত (علت) বা কার্যকরণ পরম্পরা না থাকা সত্ত্বেও তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করার প্রচেষ্টা করা হয়। যথাঃ

(ক) (১) যে বৈধ তালাক দিতে পারে সে বৈধ জিহারও দিতে পারে। (২) বিক্রয় করার চুক্তি এবং তার জন্য সম্মতির চুক্তি একই প্রকার হলেও তা বিভিন্ন; কিন্তু বিক্রয়ের জন্য উক্ত সম্মতির প্রয়োজন। এ স্থলে দু'টি হ্যাঁ ধর্মী প্রতিজ্ঞার মধ্যে সম্বন্ধের অনুসন্ধান করা হয়েছে।

(খ) যদি 'নিয়ত' ব্যতীত ওযু শুদ্ধ হয়, তাহলে তায়াম্মুমও 'নিয়ত' ব্যতীত শুদ্ধ হবে। এখানেও দু'টি না ধর্মী প্রতিজ্ঞার মধ্যে সম্বন্ধের অনুসন্ধান করা হয়েছে।

(গ) যদি কোন কিছু করার অনুমতি প্রদান করা হয়ে থাকে, কিংবা তা অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে ধরতে হবে তা হারাম নয়। যথা- অশ্বের মাংস যেহেতু হালাল, সে জন্য তা নিষিদ্ধ বলে ধার্য করা যাবে না, অনুমোদিত দ্রব্যকে অননুমোদিত করা যাবে না। এখনে একটি হ্যাঁ ধর্মী প্রতিজ্ঞার মধ্যে সম্বন্ধের অনুসন্ধান করা হয়েছে।

(ঘ) যদি কোন কিছু বৈধ নয় বলে গণ্য হয়ে থাকে, তাহলে ধরতে হবে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যথাঃ অবিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রী লোকের মধ্যে যৌন সম্পর্ক অননুমোদিত রয়েছে, সেজন্য ধার্য করা হবে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে একটি না ধর্মী এবং অন্যটি হ্যাঁ ধর্মী প্রতিজ্ঞার মধ্যে সম্বন্ধ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণির ইসতিদলালকে 'ইসতিসহাবিল হাল' বলা হয়। কোন কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলে যদি প্রমাণ পাওয়া না যায়, তাহলে ধরতে হবে যে, তা বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে; তা উক্ত প্রকার ইসতিদলালের অন্তর্গত।

(৩) তৃতীয় শ্রেণির ইসতিদলাল তখনই উদ্ভূত হয়, যখন ইসলামের পূর্বে যে সব আইন নাযিল হয়েছিল তার বিচার করার প্রশ্ন উত্থিত হয়। কিছু সংখ্যক আইনবিদের মত এই যে, যে সব আইন ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে নাযিল হয়েছে তা ইসলাম কর্তৃক নাকচ না হয়ে থাকে তাহলে তা মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। পক্ষান্তরে অন্যেরা এই মত পোষণ করেন যে, উক্ত আইনাবলী প্রতিপালনের কোন বাধ্যবাধকতা আর নেই। হানাফি মতে পূর্বের প্রত্যাদিষ্ট আইনের যেগুলি কুরআনে উল্লেখিত ও অনুমোদিত হয়েছে শুধু তাই

বাধ্যতামূলক হবে। এই আইনবিদগণের মতে তা এইরূপে সীমাবদ্ধ করণের উদ্দেশ্য হল এই যে, পূর্ববর্তী ধর্ম যথার্থ ও সঠিকভাবে আমাদের নিকট পৌঁছায় নাই, তা ভুল পরিমাণে কলুষিত হয়েছে। উক্ত ক্ষেত্রে ইসতিদলাল ক্রমে ইহা ধার্য করা হয় যে, যে সব নীতি ইসলামের পূর্বে উদ্ভূত হয়েছিল তা যদি ইসলামের নীতির বিরুদ্ধে না যায় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। সূন্নী সম্প্রদায়ের সকল মাযহাবই এই মত পোষণ করেন।

ইসতিদলালের রূপসমূহ

ইসতিদলালের ৪টি রূপ রয়েছে। যথাঃ

১। এটি এমন একটি দলিল যা মূল টেক্সট থেকেই বুঝা যায়;

২। এটি এমন একটি বিষয় যা দলিল প্রমাণদানে ইঙ্গিতবাহী;

৩। এর রূপ হচ্ছে এমন, যার মর্মদ্বারা সহজে বুঝা যায়;

৪। এর রূপ হচ্ছে এমন, অবস্থার দাবি হিসেবে দলিলরূপে যা প্রতিভাত হয়।[২২]

ইখতিলাফ (الاختلاف)

'ইখতিলাফ' এর অর্থ হল সুস্থ এবং অর্থপূর্ণ মতানৈক্য। যদি কোন আইনবিদ সাধুভাবে কোন মত কিংবা রায় প্রদান করেন এবং তা যদি ইজমা' হতে ভিন্ন হয় তাহলে তাকে 'ইখতিলাফ' বলে। সুতরাং ইখতিলাফ ইজমা'র পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। ইজমা'র সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ মুসলিম আইনবিদগণের ঐক্যবদ্ধ মতের সঙ্গে সঙ্গে, তা হতে যে পৃথক মত প্রকাশ হতে পারে তা প্রত্যাশা করাও স্বাভাবিক। এই মতানৈক্য একক কিংবা যৌথভাবে একাধিক ব্যক্তির হতে পারে। ইহাকে ক্ষেত্র বিশেষে স্বীকৃতি দান করাও হয়, কারণ তার ভিত্তি হযরত মুহাম্মদ (সা) এর একটি বাণীর দ্বারা সমর্থিত। হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, ''আমার কাওমের মধ্যে মতানৈক্য আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ''। কিন্তু ইজমা'র বিপরীতে ইখতিলাফকে শুধুমাত্র তখনই আমল দেয়া হয়, যখন মুসলিম আইনে ও কার্যকরণ নির্ণয়ে বিশারদ যারা, তাঁরা তাঁর দ্বারা এরূপ মত প্রকাশ করেন, যা প্রধান কোন মূল তত্ত্বকে ব্যাহত না করে, শুধুমাত্র আইনের প্রচলিত রীতিনীতির বিচারের মধ্যে সীমিত থাকে। ক্লাসিক আইনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দর্শন করা যায় যে, ইখতিলাফকে যে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে তা অত্যন্ত সীমিত। যদি কোন বিষয়ে কোন প্রকার সর্বব্যাপ্ত ইজমা' প্রাপ্ত না হয়ে যায়, তাহলে উক্ত ক্ষেত্রেই শুধু ইখতিলাফ প্রয়োগের কথা বিবেচিত হতে পারে।

---

[২২] গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ঢাকা: ই. ফা. বা, ১৯৯৬, ২য় ভাগ, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন মাযহাব একই ব্যাপারে যে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন তা এই ইখতিলাফ প্রসূতই ধরা যায়। এই জন্যই একই বিষয়ে হানাফি, মালিকি, শাফি‘ঈ এবং হাম্বলিদের মত বিভিন্ন হলেও তা আমরা গ্রহণ করি। ইহা স্মরণ রাখতে হবে যে, ইখতিলাফ ‘নিযা’ হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ‘নিযা’র অর্থ হল বিসম্বাদ; সুতরাং তা হেয় এবং মুসলিম আইনবিদগণ তা অগ্রাহ্য করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওয়ারিশাধিকার ও সম্পদ বন্টন আইন

দান বা হিবা আইন

ওয়াকফ আইন

ওয়ারিশাধিকার ও সম্পদ বন্টন আইন

মুসলিম আইনের বিধান মতে যখন উত্তরাধিকারের মধ্যে অংশ বন্টন করা হয় তখন কখনও কখনও দেখা যায় সে সম্পত্তির অংশ বন্টনের পর্যায়ে মূল সম্পত্তি অংশ বৃদ্ধি হয়ে যায়। প্রত্যেক অংশ বন্টনের সময় সমস্ত সম্পত্তিতে একক হিসাবে অর্থাৎ ষোলআনা হিসাবে ধরা হয়। এখনও এ ষোলআনা বা এক টাকা অর্থাৎ সম্পত্তি সঠিক ও সমানভাবে প্রত্যেকের অংশ অনুযায়ী ভাগ করে দেয়ার জন্য কিছু নিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়, যা মুসলিম আইনের বৃদ্ধি (আউল) নিয়ম, এবং প্রত্যাবর্তন (রদ) নিয়ম হিসাবে স্বীকৃত।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন

মুসলিমগণ উত্তরাধিকার আইনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। কারণ রাসূল (সা) বলেছেনঃ "উত্তরাধিকার আইন শিক্ষা কর, এবং লোকদিগকে উহা শিক্ষা দাও, যেহেতু উহা প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অর্ধেক"।[১]

বর্তমান যুগের আইনবিদগণও মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের কার্যকারিতা এবং বিন্যাস প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

Macnaghten বলেছেনঃ "এই বিধিসমূহের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, প্রকৃতি আমাদের ভালবাসার ক্ষেত্রে যাদেরকে অধিষ্ঠিত করেছে, তাদের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে মনোযোগ দেয়া হয়েছে, বস্তুত ইহা বলা যায় যে, এরূপ নির্ভুলভাবে ন্যায্য এবং পক্ষপাতশূন্য একটি আইনের তন্ত্র কল্পনা করা কঠিন"।[২]

উত্তরাধিকার আইন যে সম্পূর্ণ সুষ্ঠু এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে সমাধান করার ক্ষমতা রাখে, এর প্রশংসা করে ইহার আইনগত সৌন্দর্যের সম্বন্ধে উইলিয়াম জোন্সের মন্তব্য কোড করতে গিয়ে-

Tayabji বলেছেনঃ I am strongly disquisted to believe that no possible question could accur on Mohammadan Law of succession which might not be rapidly and corrently answered."[৩]

[১] Sirajlyyah, Tr, Rumsey 2nd Ed. citedby Fyzee, P. 380.

[২] Macnaghten, Preliminary Remarks, P. V." In these Provisions we find ample attention paid to the interest of all those who nature places in the first Rank of our affections: and indeed it is difficult to conceive any system containing rules more strictly Just and equitable."

[৩] Tayabji P. 601.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে নারীর অধিকার

আধুনিককালে নারীদের অধিকার নিয়ে ভিন্ন রকমের আলোচনা পর্যালোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু যতই নারীদের অধিকার আদায়ের জন্য হৈ- চৈ করা হোক না কেন। যতই নারীদের অধিকার প্রদানের কথা বলা হোক না কেন; প্রকৃতপক্ষে কিছু সংখ্যক পুরুষ ও স্ব-ঘোষিত কিছু আধুনিকা নারী, তাদের ধর্ম সম্বন্ধে পরিপক্ক নলেজ না থাকার কারণে এবং শয়তানের কু- প্ররোচনায় তারা সত্যিকার নারী জাতিকে ধ্বংস করা ও সমাজকে কলুষ করার কাজে সর্বদাই ব্যস্ত থাকে। সত্যিকার অর্থে পৃথিবীতে মর্যাদা, অধিকারের কোন ভাল মূল্যায়ন থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে একজন মুসলিম নারী সবচেয়ে বেশী মর্যাদা ও বেশী সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে। নারী জাতিকে ইসলামী আইন যে মর্যাদার সিংহাসনে আসীন করেছেন এই দুনিয়া আর অন্য কোন ধর্মে নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেছেনঃ "পিতা- মাতা ও আত্নীয় স্বজনের সম্পত্তিতে পুরুষের যেরূপ অধিকার রয়েছে নারীরও সেরূপ অধিকার রয়েছে"।[৪]

"There is a share for men and a share for women from what is left by parents and those nearest related, whether the property be small or large – a legal share." (Surah 4. An-Nisa'. Part 4. Ayat 7).

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক আরও বলেছেনঃ "তোমাদের কাউকে কারো উপর যা দ্বারা আল্লাহ সম্মানিত করেছেন তাতে লোভ করনা। পুরুষ যা অর্জন করে তার অংশের তার এবং নারী যা অর্জন করে তা তারই প্রাপ্য। আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত"।[৫]

"And wish not for the things in which Allah has made some of you to excel others. For men there is reward for what they have earned, (and likewise) for women there is reward for what they have earned, and ask Allah of His Bounty. Surely, Allah is Ever All-Knower of everything." (Surah 4. An-Nisa'. Part 5. Ayat 32).

সৎকাজের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ নারী পুরুষ সকলকে সমান অধিকার প্রদান করেছেন। অর্থাৎ পুরুষ যা অর্জন করবে, সে তাই পাবে এবং নারী যা অর্জন করবে সে তাই পাবে। পবিত্র কুরআনে নারী পুরুষের অধিকার

---

[৪] আল কুরআন, ৪: ৭ - *للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون*

[৫] আল কুরআন, ৪: ৩২ *بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسئلوا الله من فضله ان الله كان بكل*

ولا تتمنوا مافضل الله به شىء عليما-

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "নারীর উপর পুরুষের যতটুকু অধিকার রয়েছে পুরুষের উপরও নারীর ততটুকু অধিকার রয়েছে"।

হাদীসে নববীতে বলা হয়েছেঃ "বেহেস্ত মায়ের পদতলে"। নারীদের অধিকার পুত পবিত্র, যাতে তাদের অধিকার নষ্ট না হয় সে দিকে খেয়াল রাখো'। নবী (সা) আরো বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যে তার স্ত্রীর প্রতি সর্বোত্তম ব্যবহার করে"। বুখারী শরীফের এক হাদীসে এসেছেঃ নবী করীম (সা) এরশাদ করেনঃ "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর- নারীর উপর ফরয"। তিরমিযি শরীফে উল্লেখ আছে নবী করীম (সা) বলেছেন "পিতামাতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাদের অসন্তুষ্টিতেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি"।

ওয়ারিশ আইনে মুসলমান নারীর অধিকার ও মর্যাদা লক্ষণীয়, যা অন্য ধর্মে চিন্তাই করা যায় না। যেমন- একজন মুসলিম নারী সম্পদের উত্তরাধিকার এর ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে খুব একটা কম নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশী পরিলক্ষিত হয়। কত জন মৃত ব্যক্তির নিকট থেকে কিভাবে সম্পত্তি পাবে তা লক্ষণীয়। যেমনঃ

(ক) মাতা হিসাবে সম্পত্তি পাবে, (খ) স্ত্রী হিসাবে সম্পত্তি পাবে, (গ) বোন হিসাবে সম্পত্তি পাবে, (ঘ) কন্যা হিসাবে সম্পত্তি পাবে, (ঙ) ফুফু হিসাবে সম্পত্তি পাবে, (চ) খালা হিসাবে সম্পত্তি পাবে, (ছ) দাদী হিসাবে সম্পত্তি পাবে, (জ) নানী হিসাবে সম্পত্তি পাবে, (ঝ) পুত্রের কন্যা (নাতনী) হিসাবে সম্পত্তি পাবে এবং (ঞ) ছেলের, ছেলের কন্যা হিসাবেও সম্পত্তি পাবে।

লক্ষ্য করুণ একজন নারী জীবনের প্রতিটি স্তরে সম্পূর্ণভাবে সম্মানিতা। ইসলাম নারী জাতিকে অধিকারহীন করে রাখে নাই, বরং পৃথিবীতে সকল ধর্ম বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে একজন মুসলমান নারীই প্রকৃত অর্থে সবচেয়ে বেশী মর্যাদা সম্মান ও সর্বাধিক অধিকার ভোগ করে থাকেন। যে নারী যত বেশী ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, যত বেশী ইসলামী আইন কানূন নিয়ম- নীতি মেনে চলবে। সে তত বেশী সম্মানিত হবে। ওয়ারিশাধিকার আইনে বা মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে নারী জাতি সবচেয়ে বেশী সম্মানিত ও অধিকার প্রাপ্ত।

ওয়ারিশ সূত্রে সম্পদ প্রাপ্তি

যদি কোন মৃত মুসলমানের রেখে যাওয়া সম্পদ উইল করা না থাকে তবে তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারদের উপর বর্তাবে। উইল করা থাকলে উইল এর এক তৃতীয়াংশ উইল অনুযায়ী প্রাপকগণ গ্রহণ করবে। বাকি অংশ ইসলামী সম্প্রদায়ের আইন অনুযায়ী তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ করতে হবে।

মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ ব্যবহার

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ব্যয় করতে হবে। যেমনঃ

(ক) দাফন কাফন ও সমাধিস্থকরণ খরচাদিতে ব্যয় করতে হবে;

(খ) উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট সংগ্রহের খরচ;

(গ) কোন ব্যক্তি যদি অপরিশোধিত মজুরি মরহুমের নিকট দেনা থাকেন তাহলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হতে তাদের মজুরি বা বেতন পরিশোধ করতে হবে;

(ঘ) মৃত ব্যক্তির যদি কোন ওয়াছিয়ত থাকে তাহলে তা পূরণ করা;

(ঙ) মৃত ব্যক্তির যদি অন্য কোন ঋণ থাকে তবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিশোধ করতে হবে। ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির ঐ সমস্ত দায় দেনা পরিশোধ তার উইল অনুযায়ী সম্পদ প্রাপকদের উপর অগ্রাধিকার লাভ করে।

যে সকল কারণে ওয়ারিশগণ সম্পদের অংশিদারিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়।

ধর্মের ভিন্নতা

ধর্মের পার্থক্যের কারণে মুসলিম বিধি- বিধান অনুসারে একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী যার ইসলামের নিয়ম- নীতির উপর কোন বিশ্বাস নেই সেই ব্যক্তি কোন মুসলমানের মৃত্যুর পর তার সম্পদের ওয়ারিশাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে না অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। বিধর্মীর কোন অধিকার এখানে স্বীকৃত নয়।

বৈরী শত্রু

মুসলিম আইনের বিধান মতে মৃত মুসলমানের সম্পদের ওয়ারিশাধিকারের ক্ষেত্রে বৈরী শত্রুর পথ সর্বত্রই রুদ্ধ বলে গণ্য হবে।

নিন্দনীয় নরহত্যা

মুসলিম আইনে, সূন্নী সম্প্রদায়ের হানাফি মতে কোন ব্যক্তি, ইচ্ছা করে ভুল করল গাফিলতির কারণে বা দুর্ঘটনার কারণে, নর হত্যার দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে সে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির সম্পদের ওয়ারিশাধিকার হতে বঞ্চিত হবে। তবে শিয়া সম্প্রদায়ের মত অনুসারে ইচ্ছা করে যদি উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু না ঘটিয়ে থাকে তবে সে ওয়ারিশাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।

জীবিত ব্যক্তির সম্পদের ওয়ারিশাধিকার হওয়ার ক্ষেত্রে

মুসলিম বিধি- বিধান মতে একজন ব্যক্তি দুনিয়া ত্যাগ করায় তার সম্পদের ওয়ারিশাধিকারদের অধিকার সৃষ্টি হয় কিন্তু কোন ব্যক্তিই জীবিত ব্যক্তির সম্পদের ওয়ারিশাধিকার হতে পারে না।

যারা ওয়ারিশাধিকার থেকে বাদ পড়েন না

(ক) সন্তান, পুত্র বা কন্যা,

(খ) পিতা,

(গ) মা,

(ঘ) স্বামী,

(ঙ) স্ত্রী।

এদের পরবর্তী অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী

(ক) পুত্রের সন্তান, নিম্নবর্তীগণ,

(খ) দাদা ঊর্ধ্বতন ওয়ারিশ (পিতার দিকের),

(গ) নানী, মাতার মাতা (মাতার দিকের)।

উত্তরাধিকারী লাভের অধিকার

(ক) মৃতের কোন সন্তান জীবিত না থাকলে পুত্রের সন্তান (নিম্নবর্তী) সব সময়ই ওয়ারিশ হবে।

(খ) পিতা জীবিত না থাকলে দাদা (পূর্ণ) সব সময়ই ওয়ারিশ হবে।

(গ) মা, জীবিত না থাকলে মার মা (নানী) সব সময়ই ওয়ারিশ হবে। মা বাবা কেউ না থাকলে পিতার মাতা (দাদী) সব সময়ই ওয়ারিশ হবে।

(ঘ) প্রধান ওয়ারিশ জীবিত থাকলে যে সমস্ত আত্নীয় উত্তরাধিকার থেকে বাদ পড়ে, প্রধান ওয়ারিশ এর স্থলাধিকারী জীবিত থাকলেও সেই সকল ওয়ারিশ উত্তরাধিকারী হতে বাদ পড়বে। যেমন সন্তান ও পিতা থাকলে বৈমাত্রেয় বোন এবং বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন বাদ পড়ে। ঠিক একই রকম। পুত্রের সন্তান বা দাদা বর্তমান থাকলেও তারা উত্তরাধিকার হতে বাদ পড়বে।

(ঙ) প্রধান ওয়ারিশ থাকলে স্থলাধিকারী উত্তরাধিকার লাভ করে না। যেমন পিতা থাকলে দাদা এবং মা থাকলে নানী উত্তরাধিকার লাভ করবে না। তবে যদি মৃতের কোন পুত্র না থাকে কিন্তু একজন কন্যা ও একজন পুত্রের কন্যা থাকে তবে কন্যা ২/১ অংশ, এবং পুত্রের ৬/১ অংশ সম্পত্তি লাভ করবে। এটাই হানাফি বিধান।

মুসলিম আইনে সম্পত্তি উত্তরাধিকার আইনের লক্ষণীয় নীতিসমূহ সংক্ষেপে আলোচিত হলোঃ

স্বামী- স্ত্রী উভয়েই একে অপরের সম্পদ পাবে। দাদা জীবিত থাকা অবস্থায় পিতা মারা গেলে নাতি নাতনীরা সম্পদ পাবে না। তবে ১৯৬১ সালের মুসলিম পরিবার আইন এর বিধান মতে দাদার সম্পদে তাদের পিতার প্রাপ্য সম্পূর্ণ অংশ তারা লাভ করতে পারবে। পুরুষ ও নারী উভয়ই ওয়ারিশাধিকার ক্ষেত্রে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। পিতা মাতা ও তার উর্ধ্বতন পুরুষগণকে সম্পদের ওয়ারিশাধিকারের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী নারী পুরুষের অর্ধাংশ পাবে।

যদি কোন অংশীদার বা অবশিষ্টভোগী বর্তমান না থাকে তবে সে ক্ষেত্রে মৃতের সম্পত্তির দূরবর্তী আত্নীয়গণের মধ্যে ভাগ বন্টন করে দেয়া হয়। কিন্তু যদি স্বামী কিংবা স্ত্রী একমাত্র অংশীদার হিসেবে থাকে এবং কোন অবশিষ্টভোগী যদি জীবিত না থাকে অর্থাৎ মৃত হয় তবে স্বামী অথবা স্ত্রী পূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে এবং বাকি অংশ দূরবর্তী আত্নীয়গণের মধ্যে ভাগ বন্টিত হবে।

বার জন উত্তরাধিকার

পবিত্র আল কুরআনের বিধান অনুযায়ী মুসলিম আইনে যে বার জন ওয়ারিশ সর্বপ্রথম অংশীদারিত্ব পাওয়ার অধিকার আছে তাদের প্রত্যেকের অংশ এবং এখন কি অবস্থায় অংশ হ্রাস বৃদ্ধি পাবে তার কিছু বিধি- বিধান সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হলো। হানাফি বিধান মতে মুসলিম আইনে সর্বপ্রথম অংশ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ।

১। দাদা (পিতামহ)

মুসলিম আইনের বিধান অনুযায়ী ৬/১ অংশ দাদা পাবেন। (যখন এক ছেলে বা ছেলের ছেলে থাকে এবং পিতা অথবা নিকটতম অন্য কেউ বা থাকেন তখন) কিন্তু যখন কোন ছেলে বা ছেলের ছেলে না থাকে তখন দাদা অবশিষ্টভোগী হিসেবে অংশ পাবেন। কিন্তু (পিতা এবং নিকটতম কেউ না থাকে) কারণ নিকটতর দূরবর্তীকে বঞ্চিত করে।

২। পিতা

মুসলিম আইনের বিধান মতে পিতা ৬/১ অংশ পাবেন। কিন্তু যদি ছেলে বা ছেলের ছেলে না থাকে যত নিম্নগামী হোক না কেন, তখন পিতা অবশিষ্টভোগী হিসেবে অংশ পাবেন।

৩। স্বামী

মুসলিম আইনের বিধান অনুযায়ী স্বামী ৪/১ অংশ পাবেন। কিন্তু যখন কোন ছেলে বা ছেলের ছেলে বা ছেলের ছেলে না থাকে তখন স্বামী ২/১ অংশ পাবেন।

৪। স্ত্রী

মুসলিম আইনের বিধান অনুযায়ী স্ত্রী ৮/১ অংশ পাবেন। (যখন এক ছেলে বা এক ছেলের ছেলে থাকে) কিন্তু, কোন ছেলে বা ছেলের ছেলে না থাকে তখন স্ত্রী অবশিষ্টভোগী হিসেবে অংশ পাবেন।

৫। কন্যা

মুসলিম আইনের বিধান মতে সাধারণ কন্যা পাবেন ২/১ অংশ, কিন্তু, যদি একের অধিক কন্যা থাকেন তবে সম্মিলিতভাবে পাবেন ৩/২ অংশ। (যদি কোন ছেলে না থাকেন তখন) কিন্তু যদি কোন ছেলে থাকেন তখন মেয়ে/কন্যা, অবশিষ্টভোগী হিসেবে ছেলের সাথে অংশ পাবেন।

৬। ছেলের মেয়ে

মুসলিম আইনের বিধান মতে ছেলের মেয়ে ২/১ অংশ পাবেন। কিন্তু যদি একের অধিক ছেলের মেয়ে থাকেন তবে সমষ্টিগতভাবে পাবেন ৩/২ অংশ। সাধারণ অংশ কখন পাবেন, যখন কোন ছেলে বা মেয়ে না থাকে। কিন্তু যদি সমমানের ছেলের ছেলে থাকে তবে ছেলের মেয়ে অবশিষ্টভোগী হিসেবে অংশ পাবেন। (যদি এক মেয়ে থাকে তবে ৬/১ অংশ পাবে।

৭। দাদী (পিতামহী)

মুসলিম আইনের বিধান অনুযায়ী দাদী পাবেন ৬/১ অংশ। (যখন মায়ের দিক হতে, কোন মা না থাকেন এবং বাবার দিক হতে, কোন মা বা বাবা না থাকেন তখন)।

৮। মাতা

মুসলিম আইনের বিধান অনুযায়ী মা পাবেন ৬/১ অংশ (যখন একটি সন্তান বা সন্তানের সন্তান থাকে, কিন্তু যখন কোন ছেলে বা ছেলের ছেলে না থাকে এবং এক ভাই অথবা এক বোনের বেশী না থাকে, তখন মা পাবেন ৩/১ অংশ।

৯। রক্ত সম্পর্কিত বোন

মুসলিম আইনের বিধান অনুযায়ী একজন রক্ত সম্পর্কিত বোন পাবেন ২/১ অংশ| কিন্তু যদি তারা একের অধিক, একাধিক থাকেন তবে পাবেন ৩/২ অংশ। কিন্তু কখন পাবেন যখন কোন ছেলে বা ছেলের ছেলে বা পিতা বা সত্যিকার পিতামহ বা পূর্ণভাই বা পূর্ণবোন বা রক্ত সম্পর্কিত ভাই না থাকেন তখন। কিন্তু যদি কেবল মাত্র একজন পূর্ণবোন থাকেন এবং শেয়ারার হিসেবে ওয়ারিশাধিকার হন তখন রক্ত সম্পর্কটিও বোন পাবেন ৬/১ অংশ। কিন্তু রক্ত সম্পর্কিত ভাই থাকলে, রক্ত সম্পর্কিত বোন, অবশিষ্টভোগী হিসেবে তার সঙ্গে অংশ পাবেন।

১০। পূর্ণবোন

মুসলিম আইনের বিধান অনুযায়ী পূর্ণবোন পাবেন সাধারণ শেয়ার ২/১ অংশ এবং যদি একাধিক পূর্ণবোন থাকেন তবে সমষ্টিগতভাবে পাবেন ৩/২ অংশ।

১১। বৈপিত্রেয় ভাই

মুসলিম আইনের বিধান অনুযায়ী বৈপিত্রেয় ভাই পাবেন ৬/১ অংশ সাধারণ শেয়ার। কিন্তু যদি একের অধিক থাকেন তা সমষ্টিগতভাবে পাবেন ৩/১ অংশ।

১২। বৈপিত্রেয় বোন

মুসলিম আইনের বিধান অনুযায়ী বৈপিত্রেয় বোন পাবেন ৬/১ অংশ। সাধারণ শেয়ার কিন্তু যদি একের অধিক থাকেন তবে ৩/১ অংশ পাবেন। কিন্তু কখন পাবেন, (যখন কোন, ছেলে বা ছেলের ছেলে বা পিতা বা পিতামহ না থাকেন)।

ইসলামিক আইন মোতাবেক একজন মৃত মুসলমানের কাফন দাফনের ঋণ পরিশোধের পর উদ্বৃত্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশী উইল গ্রহণযোগ্য নয়। যদি এক-তৃতীয়াংশের বেশী উইল করা থাকে তবে ওয়ারিশদের সম্মতি লাগবে। ওয়ারিশদের সম্মতি ব্যতীত এক-তৃতীয়াংশের বেশী উইল কার্যকর হবে না। পবিত্র কুরআনে এর স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও আল কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন যে কোণ মুসলমান তাঁর সম্পদের এমনভাবে উইল করে হস্তান্তর করতে পারবে না, যাতে তাঁর ওয়ারিশরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে পড়তে পারে। মহানবী (সা) তাঁর সাহাবা আবূ ওয়াক্কাসের জিজ্ঞাসার উত্তরে উইল করার ক্ষমতার উপরোক্ত সীমা নির্দেশ করেছিলেন। উইল গ্রহণকারী, ওয়ারিশ বা অনাত্নীয় হলেও যদি অন্যান্য ওয়ারিশরা তাতে সম্মতি দান

করেন তবে তা আইনসঙ্গত হবে। যদি কোন মুসলমানের কোন উত্তরাধিকারী/ওয়ারিশ না থাকে তবে তাঁর সমুদয় সম্পত্তি যে কোন ব্যক্তিকে উইল করে হস্তান্তর করতে পারেন।

পূর্ব পুরুষদের অবর্তমানে ভাই বোন এর অংশ

শিয়া আইনে, স্ত্রী বা স্বামীর অংশ বাদে নিম্নলিখিত নিয়মে মরহুমের ত্যাক্ত সম্পত্তি বন্টন করতে হবে।

ক. পূর্ণ ভাই বোন বর্তমান থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই বোন ওয়ারিশ হবে না।

খ. পূর্ণ ভাই বোন এবং বৈমাত্রেয় ভাই বোন বর্তমান থাকলে বৈপিত্রেয় ভাই বোনেরা উত্তরাধিকার হতে বাদ পড়বে না। তারা একই সঙ্গে উত্তরাধিকার লাভ করবে। সংখ্যা অনুসারে তারা ৩/১ বা ৬/১ অংশ পাবে।

গ. পূর্ণ ভাই এবং বৈমাত্রেয় ভাই অবশিষ্টভোগী হিসেবে ওয়ারিশ হবে।

ঘ. পূর্ণ ভাই না থাকলে পূর্ণ বোন অংশীদার হিসেবে ওয়ারিশ হবে। পূর্ণ ভাই বোন একসঙ্গে অবশিষ্টভোগী হিসেবে উত্তরাধিকার লাভ করবে ভাই বোনের দ্বি-গুণ পাবে। পক্ষান্তরে বৈমাত্রেয় ভাই না থাকলে বৈমাত্রেয় বোন অংশীদার হিসেবে ওয়ারিশ হয় কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাই বোন ও এক সঙ্গে অবশিষ্টভোগী হিসেবে ভাই বোনের দ্বি-গুণ অংশ প্রাপক হিসেবে উত্তরাধিকার লাভ করবে।

দূরবর্তী জ্ঞাতীদের মধ্যে অংশ বন্টন এর শর্ত

১। অধিকতর নিকটবর্তী জ্ঞাতি বর্তমান থাকলে তদপেক্ষা দূরবর্তীজ্ঞাতী উত্তরাধিকার লাভ করবে না। অর্থাৎ নিকটতম আত্নীয়গণ বর্তমান থাকলে দুরের আত্নীয়গণ বাদ যাবেন। যেমন কন্যার পুত্র বা কন্যার কন্যা থাকলে, পুত্রের কন্যার কন্যা, উত্তরাধিকার থেকে বাদ পড়বে।

২। উত্তরাধিকারী দাবিদারগণের মধ্যে অংশিদার ওয়ারিশ ও অবশিষ্টভোগী ওয়ারিশদের সন্তান বর্তমান থাকলে দূরবর্তীজ্ঞাতীর সন্তান উত্তরাধিকার থেকে বাদ যাবে। অর্থাৎ প্রথমত ও দ্বিতীয় শ্রেণির ওয়ারিশ এর সন্তান থাকলে তৃতীয় শ্রেণির ওয়ারিশ এর সন্তান বাদ পড়বে। যেমন পুত্রের কন্যার পুত্র একজন ওয়ারিশের সন্তান তার বর্তমানে কন্যার কন্যার পুত্র যে একজন দূরবর্তীজ্ঞাতীদের সন্তান সে উত্তরাধিকার হতে বাদ পড়বে।

৩। যাদের মাধ্যমে মরহুমের সঙ্গে আত্নীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই মধ্যবর্তী পূর্ব পুরুষগণের সকল পুরুষ অথবা সকল মহিলা হলে এই শ্রেণির ওয়ারিশরা মাথাপিছু ভিত্তিতে অংশ পাবেন এবং পুরুষ ওয়ারিশ মহিলা ওয়ারিশের অংশের দ্বিগুণ পাবেন। অর্থাৎ মধ্যবর্তী ঊর্ধ্বতন আত্নীয়গণ যদি লিঙ্গভেদে বিভিন্ন না হয় তবে মরহুমের ত্যাক্ত সম্পত্তির দাবিদার ওয়ারিশদের মধ্যে পুরুষ ওয়ারিশ স্ত্রী ওয়ারিশের দ্বি-গুণ পাবে এই নীতি অনুসারে মাথাপিছু সম্পদ বন্টন করতে হবে।

৪। মধ্যবর্তী পুরুষগণের কেউ পুরুষ এবং কেউ মহিলা হন তাহলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

ক. দুই ধারার মাধ্যমে দুইজন দাবিদার হলে, যে দুইজন পূর্ব পুরুষের মাধ্যমে দাবি করেছে সেই পূর্ব দুইজনকে যে স্তরে একজনকে পুরুষ অপরজনকে মহিলা হিসেবে পাওয়া যাবে সে স্তরের পুরুষের জন্য দুইভাগ এবং মহিলার জন্য একভাগের ভিত্তিতে ভাগ করে দিতে হবে।

খ. দাবিদার ওয়ারিশ তিনজন বা ততোধিক হলে তারা যাদের মাধ্যমে দাবি করছে সে পূর্ব পুরুষগণ যে পুরুষের জন্য দুইভাগ এবং মহিলার একভাগের ভিত্তিতে সম্পত্তি ভাগ করে দিতে হবে। অতঃপর পুরুষ ও মহিলা পুর পুরুষদের অংশ দু'টি পৃথক সমষ্টিতে বিভক্ত হয়ে তাদের বংশধরদের স্তরে নেমে যাবে।

গ. দুইজন বা ততোধিক ওয়ারিশ একত্রে পূর্বপুরুষের মাধ্যমে হলে একটি অতিরিক্ত নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। দাবিদারের সংখ্যা অনুসারে পূর্ব পুরুষদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে নিতে হবে। দাবিদার তিনজন থাকলে পূর্ব পুরুষকে তিনজন বলে ধরে নিতে হবে।

প্রথম শ্রেণির দূরবর্তী জ্ঞাতীদের ক্রমানুসারে উত্তরাধিকার লাভ

ক. কন্যার সন্তান- সন্ততিগণ।

খ. পুত্রের কন্যার সন্তান- সন্ততিগণ।

গ. কন্যার পৌত্র- পৌত্রী ও দৌহিত্র- দৌহিত্রীগণ।

ঘ. পুত্রের পুত্রের কন্যার সন্তান- সন্ততিগণ।

ঙ. কন্যার ও পুত্রের কন্যার প্রপৌত্র- প্রপৌত্রীগণ।

চ. মরহুমের অন্যান্য বংশধরগণ, অনুরূপভাবে ক্রমানুসারে।

উপরোক্ত ক' হতে চ' পর্যন্ত ওয়ারিশদের মধ্যে এক গ্রুপের ওয়ারিশ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী গ্রুপের কেউ উত্তরাধিকার লাভ করবে না।

প্রথম শ্রেণির দূরবর্তী কোন ওয়ারিশ না থাকলে সমস্ত সম্পত্তি দ্বিতীয় শ্রেণির দূরবর্তী ওয়ারিশদের মধ্যে এসে উপনীত হবে এবং এই শ্রেণিতে যে নিকটতম আত্নীয় থাকবে অন্য সকলকে বাদ দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি তারই প্রাপ্য হবে। এইরূপ শ্রেণির মধ্যে সবচাইতে নিকটতম আত্নীয় হলেন মাতার পিতা। কিন্তু মাতার পিতা জীবিত না থাকলে, এটা পিতার মাতার পিতা ও মাতার মাতার পিতার প্রাপ্য হবে। এইরূপ ক্ষেত্রে পিতার মাতার পিতা যেহেতু মাতৃস্থানীয় আত্নীয় সেহেতু এক ভাগ পাবেন।

ওয়ারিশাধিকার প্রাপ্তির পর্যায়ক্রমিক বিধান

নিকটতর সম্পর্কের আত্নীয় বর্তমানে থাকলে দূরবর্তী সম্পর্কে আত্নীয় উত্তরাধিকার হতে বাদ পড়বে। যেমন ভাই বোনদের সন্তানরা থাকলে, ভাই বোনদের নাতি নাতনীরা বাদ পড়বে। বোনের পুত্র থাকলে ভাই এর পুত্রের কন্যা বাদ পড়বে।

উত্তরাধিকারী লাভের পর্যায়ক্রম

ক. পূর্ণভাই এর কন্যা, সহোদর বোনের পুত্র কন্যা এবং বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের পুত্র কন্যাগণ।

খ. পূর্ণবোনের পুত্র কন্যা, বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের পুত্র কন্যা, বৈপিত্রেয় পক্ষের ওয়ারিশরা পাবে।

গ. বৈপিত্রেয় ভাই এর কন্যা, বৈমাত্রেয় বোনের পুত্র কন্যা এবং বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের পুত্র কন্যাগণ।

ঘ. পূর্ণভাই এর পুত্রের কন্যাগণ অবশিষ্টভোগী ওয়ারিশদের সন্তান- সন্ততি।

ঙ বৈমাত্রেয় ভাই এর পুত্রের কন্যাগণ, অবশেষে প্রাপক ওয়ারিশদের সন্তান- সন্ততি।

চ. পূর্ণভাই এর কন্যার সন্তান- সন্ততি, পূর্ণবোনের নাতি- নাতনী এবং বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের নাতি- নাতনীগণ।

ছ. পুর বোনের নাতি- নাতনীগণ বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনদের নাতি- নাতনীগণ বৈপিত্রেয় ভাই এর কন্যার সন্তান- সন্ততি এবং বৈমাত্রেয় বোন এর নাতি- নাতনীগণ।

জ. বৈমাত্রেয় ভাই এর কন্যার সন্তান- সন্ততিগণ বৈমাত্রেয় বোনের নাতি- নাতনীগণ এবং বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনদের নাতি- নাতনীগণ। উপরে বর্ণিত ওয়ারিশদের মধ্যে প্রথম গ্রুপ এর সকলে উত্তরাধিকার লাভের পর পরবর্তী গ্রুপের ওয়ারিশরা উত্তরাধিকার লাভ করবে। অর্থাৎ আত্নীয়তার পর্যায়ে নিকটতর সম্পর্কের ব্যক্তিরা সবার আগে উত্তরাধিকার লাভ করে। এই পর্যায়ের ওয়ারিশরা অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণির সকলেই পূর্ণ (সহোদর) বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই বোনদের বংশধর। তাই ভাই বোনরাই হচ্ছে মূল আত্নীয়। বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনরা অংশীদার ওয়ারিশ এবং একজন হলে ৬/১ অংশ ও দুই বা ততোধিক হলে ৩/১ অংশ পায়। পূর্ণ ভাই ও বৈমাত্রেয় ভাই অবশিষ্টভোগী ওয়ারিশ। পূর্ণ ভাই না থাকলে পূর্ণ বোন অবশেষে প্রাপক ওয়ারিশ হয় এবং একজন হলে ২/১ ও দুই বা ততোধিক জন হলে ৩/২ অংশ পায়। কিন্তু সহোদর ভাই বর্তমান থাকলে পূর্ণবোন ভাই এর সঙ্গে অবশিষ্টভোগী হিসেবে ওয়ারিশ হয়। বৈমাত্রেয় বোনের বেলায়ও একই নিয়ম বলবৎ থাকবে।

মৃতের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার ভার ব্যবস্থাপক বা নির্বাহকের উপর ন্যস্ত

১৯২৫ সালের উত্তরাধিকার আইনের ২১১ ধারা মোতাবেক, কোন মৃত মুসলমানের সম্পত্তির নির্বাহক অথবা ব্যবস্থাপকই যাবতীয় ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির আইনগত প্রতিনিধি এবং তার উপরই মৃতের যাবতীয় সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্বভার ন্যস্ত হবে।

যেহেতু কোন মুসলমান তার দাফন কাফন ও অন্যান্য যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করবার পর তার সম্পত্তি অবশিষ্টাংশের অধিক উইল দ্বারা হস্তান্তর করতে পারে না এবং যেহেতু উত্তরাধিকারীগণ বেশী দিতে সম্মত না হলে অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ সম্পত্তি অবশ্যই তার উত্তরাধিকারীগণ প্রাপ্ত হবে, তাই নির্বাহক উক্ত সম্পত্তি প্রাপ্তির পর ওই দুই তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের পক্ষে নামে মাত্র অছি হিসেবে থাকবে; কিন্তু উইলকৃত এক তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি কার্যত অছি থাকবে, এবং ওই দুই শ্রেণির ট্রাষ্টের মধ্যে উইলে যাই থাকুক না কেন একটির সৃষ্টি হয় অ্যাক্ট ও প্রবেট, দ্বারা এবং অপরটির সৃষ্টি হয় প্রবেট দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উইলের মাধ্যমে।

মুসলিম আইনে সম্পত্তির নির্বাহককে 'অছি' বলা হয় এবং শব্দটি একই মূল 'অছিয়াত' হতে গৃহীত হয়েছে, যার অর্থ উইল। কিন্তু মুসলিম আইনে অছিকে 'অছি' সম্পত্তির কেবল একজন ম্যানেজার হিসেবেই স্বীকৃত তার একমাত্র ক্ষমতা হল উইলে নির্দেশিত আকারে ঋণ পরিশোধ করা, মৃতের সম্পত্তির বিক্রয় কিংবা বন্ধক দিবার কোন অধিকার তার নেই; এমনকি ঋণ পরিশোধের জন্যেও নয়। উত্তরাধিকার আইনের মত কোন ব্যক্তি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাপক বা নির্বাহকের উপর সম্পত্তি বর্তানোর কোন বিধান মুসলিম আইনে নাই।

ভূ- সম্পত্তি বন্টন

যেহেতু মৃত্যুর পর পরই মৃত ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তি উত্তরাধিকারীগণের নিকট পাত্রান্তরিত হয়, তাই ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পর যে কোন সময়ে তার উক্ত সম্পত্তি বন্টন করে নিতে পারে। ঋণ পরিশোধ করা থাকলে সম্পত্তি বন্টনের সময় ইহা বিবেচিত হবে।[৬]

---

[৬] এম, মনিরুজ্জামান, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স*(ইসলামিক আইন), ধানসিঁড়ি পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১ম সংস্করণ জানুয়ারি- ২০০৪, ৮ম সংস্করণ জানুয়ারী- ২০১৩, পৃ. ৬৩-৭৫

হিবা বা দান আইন

হিবা বা দান এর সংজ্ঞা

ইসলামী সম্পত্তি আইনে "দান" একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আইনের ভাষায় দান হল অবিলম্বে এবং কোন কিছুর বিনিময় ছাড়া সম্পত্তির হস্তান্তর। অন্য কথায় হেবা বা দান হল এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তিকে কোন বিনিময়মূল্য ছাড়া অনতিবিলম্বে সম্পত্তি হস্তান্তর এবং যা শেষোক্ত ব্যক্তি বা তৎপক্ষে গৃহীত হয়ে থাকে। সংজ্ঞার মধ্যেই ইচ্ছাপত্র এবং দানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাৎক্ষণিক হস্তান্তর দানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য, কিন্তু উইল বা ইচ্ছাপত্রের দ্বারা দাতার মৃত্যুর পরে হস্তান্তর কার্যকরি হয়। দান সুসম্পন্ন হতে হলে সম্পত্তিটি সে ব্যক্তি অর্থাৎ দান গ্রহীতা কর্তৃক উহা গ্রহণ করতে হবে ইসলামী **আইনে এরূপ দান** মৌখিক বা বিনা রেজিস্ট্রি দলিলেও হতে পারে।[৭] "যদি কোন সম্পত্তি, কোন প্রতিদান গ্রহণ ব্যতিরেকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহীতাকে হস্তান্তর করা হয়, তাহলে তাকে 'হিবা' বলে।[৮]

দানের মূলভাব

মুসলিম আইন অনুসারে যে কোন কিছু যার উপর দখল কিংবা সম্পত্তির অধিকার প্রয়োগ করা যায়, অথবা এমন কোন কিছু যাহা একটি স্পষ্ট স্বত্ব হিসাবে বিদ্যমান বা কোন প্রয়োগযোগ্য অধিকার অথবা কার্যত কোন কিছু যা মাল এর অর্থে অন্তর্ভুক্ত হয়, তা দানের বিষয়বস্তু তৈরী করতে পারে।

দানের উদ্দেশ্য

একটি দান কার্যকরি করতে হলে তা অবশ্যই একটি খাঁটি লেনদেন হতে হবে এবং অবশ্য কেবলমাত্র ভবিষ্যতের কোন এক দূরবর্তী উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হতে পারবে না। যেমন ভবিষ্যতে শুধু কতিপয় ওয়ারিশকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যেই দান করা হয়ে থাকলে তা অবৈধ হবে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, কতিপয় ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে দান করলে সকল দানই অবৈধ হবে। একটি দান কেবল তখনই অবৈধ হবে, যখন উদ্দেশ্যটিই হয় 'ওয়ারিশগণকে বঞ্চিত করা' কিন্তু কেবলমাত্র দানের ফলের কারণেই নহে। দাতার পক্ষে প্রত্যেক দানেই গ্রহীতাকে সম্পত্তি হস্তান্তরের একটি সৎ মনোভাব বা উদ্দেশ্য থাকতে হবে। পাওনাদারদিগকে প্রতারিত করার মনোভাব লইয়া কোন দান সম্পন্ন করলে তা পাওনাদারের ইচ্ছানুযায়ী

---

৭ এম মনিরুজ্জামান, মোঃ সাঈদুল হক সাঈদ, শাহনাজ পারভীন, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন,* (ইসলামিক আইন), ধানসিঁড়ি পাবলিকেশন্স, ঢাকা: ১ম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৪, ৮ম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৬২

৮ *Hedaya*, 482, Bailliee 1, 515.

বাতিল যোগ্য হবে। তবে দান করার সময় দাতা কিছু ঋণগ্রস্থ ছিল, ইহা হতেই দাতার প্রতারণামূলক মনোভাব বা উদ্দেশ্য অনুমান করা যাবে না।

অশরীরী অধিকারসমূহ

যদি দাতা গ্রহীতাকে দানকৃত সম্পত্তির অধিকার হতে উপকার লাভ করার অবস্থানে রাখার জন্য সকল কিছুই করে থাকেন বরং নিজেকে দানের বিষয় সম্পর্কে স্বত্বের যাবতীয় চিহ্ন হতে বিমুক্ত করে থাকেন, তবে কোন অশরীরী অধিকারের দান বৈধ এবং পরিপূর্ণ হবে, পাওনা টাকা মালিকানা বা জমিদারীর অধিকার ইজারায় প্রদত্ত সম্পত্তি এবং কোন বীমা পলিসিও দানের বিষয়বস্তু হতে পারে। ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তিও দানের বিষয়বস্তু হতে পারে। কোন পবিত্র স্থানে তীর্থ যাত্রীগণ কর্তৃক উৎসর্গিত বস্তুর একটি সুনির্দিষ্ট অংশ লাভ করাকেও দান করা যায়।

দাতার বিরুদ্ধে দখলীয় সম্পত্তির দান

কোন বাস্তব বা শরীরী সম্পত্তি দানমূলে হস্তান্তর করা যাবে না, যার প্রকৃত দৈহিক দখলে দাতা নিজে অধিকারী বলে দাবি করেন, যদি না নিজে দখল লাভ করেন এবং দখল অর্পণ করেন বা গ্রহীতাকে দখল লাভে সমর্থন করেন। যখন কোন প্রকৃত মালিক তিনি যা পান তার সমগ্র হতে নিজেকে বিমুক্ত করে গ্রহীতাকে উক্ত সম্পত্তি পাওয়ার অবস্থানে রাখেন তখনই কাজটি করা হয়েছে বলা যায়। দাতা দখল লাভ এবং দখল অর্পণের জন্য সকল কিছুই করবেন বা গ্রহীতাকে গ্রহণ লাভ সম্ভব করার জন্য সকল কিছুই করবেন। যখন কোন দাতা অন্যজন কর্তৃক তার বেদখলীয় স্থাবর সম্পত্তি দান করেন এবং ওই দখলকারী তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা না করে মারা যান, সেই ক্ষেত্রে দানটি বৈধ নয় বলে সাব্যস্ত হয় কারণ দাতা দখল রাখা সম্ভব করার জন্যও কিছু করেন নাই। কিন্তু সেক্ষেত্রে দাতা হিবানামা দ্বারাই গ্রহীতাকে দখল লওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তার দখল গ্রহণ করেন, সে ক্ষেত্রে দানটি বৈধ বলে সাব্যস্ত হয়েছিল। মোট কথা হল এই যে, দাতা যতক্ষণ পর্যন্ত তার বেদখলি সম্পত্তি উদ্ধার করে গ্রহীতাকে ইহার দখল প্রদান না করবে বা দানটিকে সম্পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে দখল লাভ করে ইহা যাতে দান গ্রহীতার ক্ষমতার মধ্যে আনা যায় সে জন্য যতক্ষণ সকল ব্যবস্থা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত দাতার বেদখলীয় সম্পত্তির দান বৈধ হবে না।[৭]

[৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২- ৬৩

দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের যৌথ দখল

যে ক্ষেত্রে দানের সময় দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ই দানকৃত সম্পত্তিতে বসবাস করতেছেন সেক্ষেত্রে দাতার পক্ষে শারীরিক পরিত্যাগ বা গ্রহীতার ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক দখল প্রবেশ প্রয়োজন নাই। এরূপ ক্ষেত্রে দাতা কর্তৃক হস্তান্তর ও দানের বিষয়বস্তুর উপর হতে যাবতীয় কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করার এবং তার পক্ষে দখল হস্তান্তরের মনোভাব প্রকাশে এবং দাতা কর্তৃক প্রকাশ্যে কিছু কর্ম সম্পাদনক্রমে দানটি সম্পূর্ণ হতে পারে। দানকৃত সম্পত্তি দাতা বাস করতে থাকলে দাতাকে সে সম্পত্তির মধ্যস্থিত বাসাবাড়ি ছেড়ে চলে যাবার দরকার নাই, কিন্তু দাতা এবং গ্রহীতাকে এই মর্মে সম্মত হতে হবে যে, যেহেতু পূর্বে দাতা এই সম্পত্তির মালিক ছিল এবং গ্রহীতা তার সাথে বাস করেছিল, এখন দলিলের গ্রহীতা ওই সম্পত্তির মালিক হয়েছেন এবং দাতা তার সাথে বসবাস করতেছেন। তবে ইহা উল্লেখ্য যে, একত্রে খাওয়া দাওয়া করলেই কেবল যৌথ দখল প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। দাতা এবং গ্রহীতাকে প্রকৃতই যৌথ দখলে থাকতে হবে। যেক্ষেত্রে দাতা এবং গ্রহীতা একত্রে বাস করেন এবং খাওয়া দাওয়া করেন এবং দাতা কিছু কৃষি ভূমির দানপত্র করেন, যা দাতা গ্রহীতা বা তৎসকলের জন্য আবাদ করতেছিলেন, সেক্ষেত্রে প্রকৃত দখল অর্পণ প্রয়োজন হয়েছিল, কারণ সেক্ষেত্রে দাতা এবং গ্রহীতা দানকৃত সম্পত্তিতে একত্রে বাস করতেছিলেন।

কন্যাকে দান

যেক্ষেত্রে মা তার কন্যার সাথে একটি গৃহে বাস করতেছিলেন যা তিনি তার কন্যাকে দান করেছেন কিন্তু মা কন্যা উভয়েই উহাতে পূর্বের মত বসবাস বহাল রাখেন, সেক্ষেত্রে দানটি বৈধ ছিল, কারণ এ ক্ষেত্রে কন্যার দখল নিশ্চিত করার জন্য মাকে ওই বাসাবাড়ি বা গৃহ পরিত্যাগ করা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়।

পুত্রকে দান

যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি তার পুত্রের হস্তে দানপত্র দলিলটি অর্পণ করতঃ পুত্রকে দান করেন, সেক্ষেত্রে দাতাকে দখল প্রদান করার জন্য ইহাই যথেষ্ট হবে। আইনের চোখে একবার বৈধ দখল অর্পণ হয়ে থাকলে দানটি সম্পূর্ণ এবং কার্যকরি হয়ে যায়, পরবর্তীতে দাতা এবং গ্রহীতা একত্রে বাস করলে তদ্বারা কোন ভাবেই দানের বৈধতা ক্ষুণ্ন হবে না। একজন মুসলিম মহিলা তার পুত্রকে রেজিস্ট্রি দানপত্র দ্বারা তার বাড়িটি দান করছিলেন এবং উক্ত দানপত্র দলিলে উল্লেখ করা হলে যে, দাতাকে সম্পত্তির দখল অর্পণ করা হয়েছে। তৎপর মা ও ছেলে একত্রে ওই বাড়িতে বাস করতে লাগলেন এবং পুত্র পূর্বের মতই পৌরকর পরিশোধ করতে থাকেন। সেক্ষেত্রে দানটিকে বৈধ করার মত দখল অর্পণ ছিল এবং পরবর্তীতে পৌরকর পরিশোধের মাধ্যমে ইহা যথেষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দানকে বৈধ করার মত দখল অর্পণ করা হয়েছিল।

ভ্রাতুষ্পুত্রকে দান

একজন মুসলিম মহিলা তার ভ্রাতুষ্পুত্রের বরাবরে যাকে তিনি পুত্রের মত লালন পালন করতেছেন, একটি বাড়ির দানপত্র দলিল সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু সে মহিলা উক্ত বাড়ি পরিত্যাগ করলেন না বরং ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে একত্রে বাস করতে লাগলেন। সম্পত্তিটি গ্রহীতার বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছিল এবং গ্রহীতা খাজনা পরিশোধ করতেছিল। এক্ষেত্রে দানটি বৈধ ছিল।

অভিভাবক কর্তৃক নাবালকের বরাবরে দান

পিতা কর্তৃক সন্তানকে দান করা হলে, অন্যান্য সকলের মতই দখল অর্পণ প্রয়োজন। আইনের স্বীকৃত একমাত্র ব্যতিক্রম হল নাবালক সন্তানাদির বরাবরে দান। যখন কোন পিতা বা অভিভাবক বা নাবালকের দায়িত্ব প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কোন নাবালকের বরাবরে দান করেন, তখন কোন আনুষ্ঠানিক দখল অর্পণ প্রয়োজন নাই। এক্ষেত্রে যা প্রয়োজন তা হল দান করার বা দেয়ার জন্য সদিচ্ছা বা সৎ ইচ্ছা। যেক্ষেত্রে দাতা দলিলের বর্ণনা দ্বারা দখল অর্পণ কার্যকরি গণ্য হয়েছিল। যদি পিতা মৃত হন এবং সেক্ষেত্রে পিতামহ কর্তৃক নাবালক পৌত্রকে দান করা হলে দখল অর্পণের দরকার নাই, কারণ তখন ঐ পিতামহই নাবালকের পক্ষে দখল গ্রহণের অধিকারী। কিন্তু নাবালকের পিতা জীবিত থেকে নাবালকের সাথে বাস করতে থাকলে পিতামহকে নাবালকের পিতার বরাবরেই দখল হস্তান্তর করতে হবে। এমনটি যদি নাবালকগণকে তাদের পিতামহই লালন- পালন করেন এবং ভরণ- পোষণ দেন, তবুও যতদিন নাবালকের পিতা জীবিত থাকেন, ততদিন তিনি বৈধ অভিভাবক নহেন এবং পিতা অভিভাবকের অধিকার ও ক্ষমতা হতে বঞ্চিত হতে পারেন না এজন্য এক্ষেত্রে নাবালকদের বরাবরে কৃত দানের দখল পিতামহ কর্তৃক নাবালকদের পিতার নিকটই অর্পণ করতে হবে।

ভাড়াটিয়া দখলীয় সম্পত্তি দান

যেক্ষেত্রে দানকৃত সম্পত্তি ভাড়াটিয়ার দখলে থাকে, সেক্ষেত্রে ভাড়াটিয়া কর্তৃক দান গ্রহীতাকে নতুন মালিক হিসেবে মেনে নেয়ার মাধ্যমেই গ্রহীতার বরাবরে দখল অর্পণ কার্যকরি হতে পারে। যখন দান গ্রহীতা দানকৃত বাসাবাড়িতে উপস্থিত থাকেন, তখন দাতার ঘোষণার দ্বারাই গ্রহীতার বরাবরে দখল হস্তান্তরিত হবে। যেক্ষেত্রে দাতা স্বত্বের দলিল এবং দালিলিক প্রমাণাদি গ্রহীতার দখলে প্রদান করেন এবং গ্রহীতাকে তার স্বত্ব প্রতিষ্ঠায় সমর্থন করেন এবং ভাড়াটিয়াদের নিকট হতে দখল উদ্ধার করেন বা গ্রহীতার বরাবরে দখল ছেড়ে দেবার জন্য প্রকাশ্যভাবে ভাড়াটিয়াকে নির্দেশ দেন, সেক্ষেত্রে এই দাতার সকল কার্যাবলী দানকে বৈধ করার মত দখল অর্পণ বলে গণ্য হতে পারে। ভাড়াটিয়াদের দখলীয় স্থাবর সম্পত্তির দান তখনই সম্পন্ন হবে, যখন দাতা ঐ সম্পত্তির দখল দান গ্রহীতাকে দিবার জন্য ভাড়াটিয়াগণকে অনুরোধ করবে। অথবা মালিকানা সংক্রান্ত দলিল হস্তান্তর করবে কিংবা রাজস্ব খাতায় বা মালিকের সেরেস্তায় নামজারি করবে। তবে স্বামী

যেক্ষেত্রে তার জীবদ্দশায় ঐ জমি ভাড়া আদায়ের অধিকার স্বয়ং সংরক্ষিত রেখেছেন পৌরকর প্রদান করেছেন, সে ক্ষেত্রে দলিলে দান গ্রহীতাকে দখল প্রদান করা হয়েছে বলে উল্লেখিত থাকলেই ইহাতে দানটি সম্পন্ন হবে না। যে ক্ষেত্রে দাতা গ্রহীতার বরাবরে সম্পত্তিটি পৌর এবং সরকারি ভূমি রেকর্ড হস্তান্তর করেছেন, সেক্ষেত্রে ঐ দান বৈধ হবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে দান করার ইচ্ছা সম্পর্কে এরূপ নিঃশর্ত ঘোষণা নাই, অর্থাৎ দানপত্র দলিল বা নাম খারিজ, দানের প্রস্তাবিত সম্পত্তির ভাড়া আদায় সেক্ষেত্রে ভাড়াটিয়া কর্তৃক গ্রহীতাকে মেনে না নিলে বৈধ দান প্রমাণিত হবে না।

দান বা হিবা এওয়াজ

যেক্ষেত্রে দাতা বিনিময়ে কোন সম্পত্তি লাভ না করেন, সেক্ষেত্রে দানটি বিশুদ্ধ এবং যেক্ষেত্রে দান কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হওয়ার পর, দান গ্রহীতা নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এবং নিজে কোনরূপ বাধ্য না হয়েও দাতাকে কিছু সম্পত্তি প্রদানের মাধ্যমে মূল্য দেয়ার দায় সম্পন্ন বিল এওয়াজ দানের প্রথম দু'টি কর্ম সমন্বয়ে গঠিত হয়, অর্থাৎ দু'ব্যক্তির মধ্যে নির্ধারিত সম্পত্তির পারস্পরিক দান, যার প্রত্যেক বিকল্পভাবে একটি দানের দাতা এবং অন্যটির মধ্যে দান গ্রহীতা থাকেন। উভয় দানই সাধারণ দান, কিন্তু একবার দ্বিতীয় দানটি প্রথমটির এওয়াজ হিসেবে প্রথমটির দাতা কর্তৃক গৃহীত হয়ে গেলে উভয় দানের দখল অর্পণ করতে হবে। হিবা বিল এওয়াজের বৈধতার জন্য দুটি অপরিহার্য শর্ত হল গ্রহীতা কর্তৃক বিনিময় স্বরূপ প্রকৃত পক্ষে কিছু পরিশোধ করা এবং দাতার পক্ষে নিজেকে সম্পত্তি হতে তখনই সর্বস্বত্ব ত্যাগ করার এবং তা গ্রহীতার উপর ন্যাস্ত করার নিমিত্ত একটি সাধু অভিপ্রায়। উপরোক্ত দু'টি শর্ত পূরণ হলে হিবা বিল এওয়াজের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রকৃত দখল অর্পণ প্রয়োজনীয় নয়। এ অবস্থায় একজন দাতা পরবর্তীকালে কোন নিবন্ধিত হিবা বিল এওয়াজ দলিল প্রত্যাহার করতে পারেন না।

বিশুদ্ধ হিবা বিল এওয়াজ

আক্ষরিক অর্থে হিবা বিল এওয়াজ হল বিনিময়ের জন্য দান। ইহা দু'প্রকারেরঃ

(১) প্রথম প্রকারের হল বিশুদ্ধ "হিবা বিল এওয়াজ" অর্থাৎ ইসলামের প্রাক্তন আইন বিশারদগণ কর্তৃক সংজ্ঞায়িত "হিবা বিল এওয়াজ"।

(২) দ্বিতীয় প্রকারের হল পাক বঙ্গ ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত "হিবা বিল এওয়াজ"।

শেষোক্ত প্রকারকে আধুনিক হিবা বিল এওয়াজ ও বলা যায়। বিশুদ্ধ হিবা বিল অর্থাৎ হিবার সময় এওয়াজের বিষয়টি শর্তে বা চুক্তিতে ছিল নাম, এমন এওয়াজ অনুসরণ করেছে। তবে শেষোক্ত শ্রেণির হিবা বিল এওয়াজ কেবলমাত্র একটিই কাজ, যেমন এওয়াজ বা বিনিময় দানের চুক্তিতে ইহার প্রত্যক্ষ প্রতিদানের মত বিজড়িত

থাকে। বিশুদ্ধ হিবা বিল এওয়াজের ক্ষেত্রে হিবা এবং এওয়াজ উভয়টিই দানের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। হিবা এবং এওয়াজ উভয়টিরই দখল অর্পণ করতে হবে এবং দাতা এই উভয়টিই মুশাহর মতবাদ সাপেক্ষে দাতার নিকট এওয়াজের দখল অর্পণের পূর্বে দাতা যে কোন সময় এমনকি দখল অর্পণের পরও দান প্রত্যাহার করতে পারে, কিন্তু এওয়াজ দখল অর্পণের পর কোন পক্ষই তার দানকে প্রত্যাহার করতে পারে না। মোটকথা বিশুদ্ধ হিবা বিল এওয়াজ দু'টি সাধারণ দানের সমন্বয়ে গঠিত হবে যা অতিরিক্ত বিষয়, তা হল যে, প্রথম দানটি দ্বিতীয় দানটির জন্য প্রতিদান নির্মাণ করে। যখন প্রথম দানটি করা হয়, তখন দ্বিতীয় দানটির কথা মোটেই চিন্তার মধ্যে ছিল না, অর্থাৎ দ্বিতীয় দানটি করতে হবে এমন কোন চুক্তি প্রথম দানের সাথে সংযুক্ত ছিল না। দ্বিতীয় দানের দাতা দান করবেন কি করবেন না এই ব্যাপারে স্বাধীন। কার্যত হিবা বিল এওয়াজ কোন আলাদা শ্রেণির দানই নয়। দ্বিতীয় দানটি গ্রহণ তাঁর দান প্রত্যাহার করতে বাধিত হবেন। কেবল এই সকল কারণে হিবা বিল এওয়াজকে আলাদা শ্রেণিভুক্ত করার প্রয়োজন নাই। প্রথম দানের বা পূর্ববর্তী দানের গ্রহীতা দান দ্বারা তার প্রাপ্ত উপকারের তুল্য বিনিময় প্রদান করতে ইচ্ছা করেন ইহা পরবর্তী দানের শর্ত নয়, কিন্তু ইহা কেবল একটি কারণ, যুক্তি বা উদ্দেশ্য।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি ক' কোনরূপ বিনিময় বা প্রতিদানের চুক্তি না করে খ' কে একটি আংটি দান করে আংটির দখল অর্পণ করে এবং খ' পরবর্তীতে কোনরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হওয়াই ক' কে একটি ঘড়ি দান করে বলে যে, এই ঘড়িটি ক' এর দানকৃত আংটির এওয়াজ বা বিনিময় স্বরূপ, এবং ক' কে উহার দখল অর্পণ করে এই লেনদেনটি একটি বিশুদ্ধ হিবা বিল এওয়াজ এবং ক' ও খ' কেহই তাঁদের দানগুলি প্রত্যাহার করতে পারবে না। কিন্তু যদি খ' ঘড়িটি, ক' কে ক' এর দানের এওয়াজ বা বিনিময়ে দান করা হয়েছে বলে কোনরূপ উল্লেখ না করে অর্পণ করে। তবে তা কোন একটি আলাদা দান হবে যা প্রত্যেকেই প্রত্যাহার করতে পারবে। যদি ক' খ' কে এই বলে একটি আংটি দান করে যে, আমি তোমাকে ইহা এই দেয়ার জন্য প্রদান করেছে তবে ইহা ভারতীয় শ্রেণির হিবা বিল এওয়াজ। ইহা প্রকৃতপক্ষে এক শ্রেণির বিক্রয়। পক্ষান্তরে হিবা বিল এওয়াজ ইহার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কোন বিক্রয় স্বরূপ নয়।[১০]

মরজ- উল- মউত (মৃত্যু শয্যায়) দান

মরজ- উল- মউত হল এমন অসুখ, যা অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে আশু মৃত্যুর আশংকা সৃষ্টি করে এবং যার ফলে শেষ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। মৃত্যু শয্যায় থেকে একজন মুসলমান দান করলে এবং দাতার মৃত্যুর পর ঐ দানে উত্তরাধিকারীগণের কোন সম্মতি প্রদান না করলে দাফন কাফন ও দেনা পরিশোধের পর মোট

---

[১০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪- ৬৭

সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের উর্ধ্বে দান কার্যকরি হবে না। এমনকি অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ সম্মতি প্রদান না করলে কোন একজন উত্তরাধিকারীকে প্রদত্ত এই দানও কার্যকরি হবে না।

মরজ- উল- মউত এর একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হল এই যে, অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে অবশ্যই আসন্ন মৃত্যুর আশংকা থাকতে হবে। ইহা এমন একটি অসুখ, যাতে প্রাণনাশের উচ্চ সম্ভাবনা থাকে। অসুখটি দীর্ঘস্থায়ী হলে, যেমন ক্ষয়রোগে বা এলবুমিণূরিয়ার আসন্ন মৃত্যুর কোন আশংকা না থাকায় অসুখটি মরজ- উল- মউত নয়। কিন্তু পরে যদি উহা মৃত্যুকে উচ্চ সম্ভাবনাময় করে তোলে এবং উহার ফলে যদি তার মৃত্যু ঘটে তবে অসুখটি মরজ- উল- মউত বলা যাবে। হেদায়া অনুযায়ী অসুখটি এক বৎসরের মধ্যে যদি তার মৃত্যু ঘটে তবে অসুখটি মরজ- উল- মউত বলা যাবে, হেদায়া অনুযায়ী অসুখটি এক বৎসরকাল স্থায়ি হলে তাকে "দীর্ঘস্থায়ী" অসুখ বলা হবে। এক বৎসরকাল স্থায়ী হলে কোন অসুখ দীর্ঘস্থায়ী অসুখ বিধায় তা মরজ- উল- মউত বলে গণ্য হবে না। কারণ রোগী তার রোগের সাথে পরিচিত হয়ে গেছে। তবে এই এক বৎসরের এ সময় কোন বাঁধা- ধরা বিধি নয়, ইহা এক বৎসর বা কিছু বেশী হয়ে পারে। সংক্ষেপে দানটি মৃত্যুর আশংকায় করা হলে প্রিভিকাউন্সিলের মতে, ইহা মরজ- উল- মউত বলে গণ্য হবে না।

সংক্ষেপে দানটি মৃত্যুর আশংকায় করা হলে, প্রিভিকাউন্সিলের মতে উহা মরজ- উল- মউত বলে ধরতে হবে। একটি অসুখ মরজ- উল- মউত হতে হলে তাতে (ক) অবশ্যই নিকটতম মৃত্যু ঝুঁকি থাকবে, যাতে মৃত্যুর আশংকা খুব বেশী হবে। (খ) অসুস্থ ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে কিছু থাকবে এবং (গ) কিছু বাহ্যিক লক্ষণ যেমন সে তার সাধারণ কাজ কর্মে অসমর্থ হবে। যদিও তার সাধারণ কাজ কর্মে যাওয়া দ্বারা চূড়ান্ত আসাও প্রয়োজনীয় নয় যে, সে মরজ- উল- মউতে ভুগছিল না। এরূপ স্ত্রীর সিদ্ধান্তে আসাও প্রয়োজনীয় নয় যে, সে পীড়ার কারণে তার মৃত্যুর আশংকায় পতিত হয়ে করা হয়ে থাকে, তবে ইহা এর মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হবে। প্রত্যেক মানুষের মনেই এরূপ আশংকা থাকে যে, সে হঠাৎ যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে, কিন্তু ইহাই আসন্ন মৃত্যুর আশংকা সৃষ্টি করবে। দানের বৈধতার জন্য দখল প্রদানসহ যে সকল শর্তাবলী রয়েছে, মরজ- উল- মউতের জন্য ঐ সকল শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে। দাতা যক্ষ্মারোগে ভুগছিল, ইহাই কেবল মরজ- উল- মউতের মতবাদ প্রয়োগের জন্য যথেষ্ট হবে না। কিন্তু যেক্ষেত্রে এ মর্মে পর্যাপ্ত প্রমাণ আছে যে, রোগী রোগটির কারণে মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে এবং সে খুবই দুর্বল ছিল এবং আশাহীন অবস্থায় ভুগছিল, সেক্ষেত্রে মরজ- উল- মউতের মতবাদ প্রযোজ্য হবে।

এজন্য গর্ভবতী মহিলাকে মরজ- উল- মউতের রোগী বলে গণ্য করা যাবে না, যদিও তার ব্যথা উঠার পর সে কোন দান করে থাকে এবং সেক্ষেত্রে মরজ- উল- মউতের মতবাদ প্রযোজ্য হবে না।

মরজ- উল- মউত অবস্থায় দানের ফলাফল

যখন কোন ব্যক্তি অসুখে ভুগতে থাকার কারণে আসন্ন মৃত্যুর আশংকার মধ্যে কোন কিছু দান করে, যা তার জীবদ্দশায়ই কার্যকরি হওয়ার কথা সে প্রকাশে ব্যক্ত করেছে, তা প্রকৃত পক্ষে একটি উইল করার বিবৃতি এবং উহা কেবল মাত্র অনুরূপ ভাবেই কার্যকরি হবে। অতএব যদি কোন ব্যক্তি ভয়ানক অসুস্থ অবস্থায় দান করেন কিন্তু পরবর্তীতে আরোগ্য লাভ করেন, দানটি বৈধ, তবে যদি তিনি ঐ রোগে মারা যান এবং তার ওয়ারিশগণ ঐ দানের প্রতি সম্মতি জানাতে অস্বীকৃত হন, তবে দানটি কেবলমাত্র তার ভূ- সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কার্যকরি হবে। তবে দাতার মৃত্যুর পূর্বে গ্রহীতাকে অবশ্যই দখল অর্পণ করে থাকতে হবে কিন্তু দাতা দানের চুক্তির পরে এবং দখল অর্পণের পূর্বে মারা গেলে, সম্পত্তিটি তার ওয়ারিশদের নিকট চলে যাবে। কোন আগন্তুককে সম্পত্তি মরজ উল মউত অবস্থায় দান করলে ওয়ারিশদের সম্মতি ছাড়া এক তৃতীয়াংশের বেশী কার্যকরি হবে না। কিন্তু এই অবস্থায় কোন ওয়ারিশকে দান করলে তা বৈধ হবে যদি না অন্যান্য সকল ওয়ারিশ তাতে সম্মতি দেয়। শিয়া আইনে উত্তরাধিকারীদের বিনা সম্মতিতে একজন উত্তরাধিকারীদেরকে দেওয়া এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির দান বৈধ। তবে ইছমাঈলি শিয়ার ক্ষেত্রে এরূপ দান অবৈধ।

হিবা বিল এওয়াজের জন্য প্রতিদান

যে সম্পত্তি দান করা হল, ইহারই অংশ বিশেষ ফিরত দিলে মুসলিম আইনে উহাকে ‘এওয়াজ’ (বিনিময়) হিসেবে গণ্য করা হবে না। এওয়াজ বলতে এমন কিছু বুঝাবে যা আলাদাভাবে শুধুমাত্র দান গ্রহীতারই এবং যা কেবল দানের ফলশ্রুতি ব্যতীত দাতার হাতে আসতে পারত না। কিন্তু প্রতিদান বা এওয়াজের পর্যাপ্ততা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। যে সম্পত্তি দান করা হয়েছে, উহার মূল্যের তুলনায় এওয়াজ অতি নগণ্য মূল্যের হলেও তা সম্পূর্ণরূপে বৈধ হবে। এমনকি একটি আংটিও যথেষ্ট প্রতিদানরূপে হতে পারে, কিন্তু যে পরিমাণের প্রতিদানই হউক না কেন, উহা অবশ্যই প্রকৃত এবং আন্তরিকভাবে প্রদান করতে হবে। এ উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশে এওয়াজের প্রকৃতিতে বিক্রয়মূল্য সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই এওয়াজ বা প্রতিদান প্রায়শই পবিত্র কুরআনের একখানা কপি এবং তসবীহ অথবা জায়- ই- নামায অথবা অত্যন্ত নগণ্য মূল্যের অন্য কোন সম্পত্তি অথবা এমন কোন সম্পত্তি হয়ে থাকে, যার আদৌ কোন মূল্য নাই এবং এরূপ লেনদেন বৈধ। দানের জন্য এরূপ প্রতিদান বিভিন্ন রকম হতে পারে। শুধু আর্থিক প্রতিদানই নয়, বিবাহ- সাদিও কোন দানের প্রতিদান হতে পারে। সুতরাং যদি কোন প্রস্তাবিত বিবাহ কোন দানের প্রতিদান হয়, তবে তা বৈধ হবে এবং বিবাহ অনুষ্ঠানের পর সে দান অপ্রত্যাহারযোগ্য হয়ে পড়বে। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ায় দাতা তার দানের জন্য প্রতিদান পেয়ে যান, যা কোন অতিরিক্ত শর্ত সাপেক্ষে নয় যে, দাতা এবং গ্রহীতা একত্রে স্বামী স্ত্রী হিসেবে বসবাস চালু রাখবেন। যদি দেখা যায় যে এওয়াজ প্রদান করা হয়

নাই, তবে দানটি হিবা বিল এওয়াজ নয় এবং তা আইনের চোখে অবৈধ হবে। যদি প্রতিদানের অভাবের জন্য কোন দলিল হিবা বিল এওয়াজ হিসেবে না টিকে তবে দাতার ইচ্ছা এবং বৈধ দানের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো বিদ্যমান থাকে, তবে ইহাকে একটি সাধারণ হিবা বা দান হিসেবে গণ্য করা যাবে। কোনরূপ সেবা বা কাজকে দানের জন্য এওয়াজ হিসেবে গণ্য করতে হলে উহার অবশ্যই একটি আর্থিক মূল্য থাকতে হবে, অন্যথায় ইহা সাধারণ দান হিসেবে গণ্য হবে। কোন নাবালকের প্রতি হিবা বিল এওয়াজ করা হলে সে যদি দানটির জন্য এওয়াজ প্রদান করে তবে সে তার পক্ষে লেনদেন সম্পন্ন করেছেন এবং এই ক্ষেত্রে তার নাবালকত্ব সত্ত্বেও তার দান সম্পূর্ণ এবং বৈধ।

নিয়োগ ক্ষমতা

সম্পত্তির গ্রহীতাকে উত্তরাধিকারী নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা হলে মুসলিম আইনে আইনে তা অবৈধ হবে। নয়াজিস আলী খান বনাম আলী রেজান খান মামলায় অছিয়তকারী একজন শিয়া মুসলমান ছিলেন এবং তিনি পর পর তিন ব্যক্তিকে তার সম্পত্তির জীবনস্বত্ব প্রদান করবার পর নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রদান করেন। সর্বশেষ দান গ্রহীতা তিনজন উত্তরাধিকারী প্রত্যেকের বংশধরদের মধ্য হতে যে কোন একজনকে বিবেচনা করলে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে নিয়োগ করতে পারবেন। “প্রিভি কাউন্সিলের রায়টি নিম্নরূপঃ “যদি উক্ত উত্তরাধিকারীগণকে সম্পত্তিটি শর্তহীন ভাবে গ্রহণ করতে হয়, প্রদত্ত ক্ষমতাটি মূল বস্তুর উপর কার্যকর হচ্ছে বলে মহামান্য আদালতের মতে ইহা হলে প্রদত্ত ক্ষমতাটি মূল বস্তুর উপর কার্যকর হচ্ছে বলে মহামান্য আদালতের মতে উহা মুসলিম আইনের বিধানাবলীর সাথে সামঞ্জস্যহীন। ইহাতে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মুসলিম আইনের বিধানটি বাধা প্রাপ্ত হবে এবং এমন ধারণার সৃষ্টি করবে যে, উত্তরাধিকারীগণ সম্পত্তির কেবল একটি সীমিত মেয়াদের জন্যই গ্রহণ করেছে”।[১১]

হিবা বাতিল

১। দখল প্রদানের পূর্বে যে কোন সময় দাতা কর্তৃক হিবা বাতিল করা যেতে পারে। কারণ এই যে, দখল প্রদানের পূর্বে প্রদত্ত হিবা আদৌ সম্পূর্ণ নয়।

২। (৪) উপ-ধারার ব্যবস্থাবলী সাপেক্ষে নিম্নলিখিত অবস্থা ব্যতীত আর সকল ক্ষেত্রেই দখল অর্পণের পরও প্রদত্ত দান রদ করা যেতে পারেঃ

ক. স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে যখন কোন কিছু দান করা হয়;

---

[১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮- ৭১

খ. নিষিদ্ধ ধাপের মধ্যে যখন দান গ্রহীতা দাতার সাথে সম্পর্কিত হবে;

গ. দাতা গ্রহীতা যখন মারা যাবে

ঘ. যখন দাতা দানের বিনিময়ে (এওয়াজ কিছু গ্রহণ করবে;

ঙ. যখন প্রদত্ত বস্তুটি এমনভাবে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হবে যে, ইহার আসল আকৃতি সনাক্ত করা যাবে না, যেমন যখন গম পিষাইবার পর আটায় রূপান্তরিত হয়;

চ. যে কোন কারণেই হোক, যখন প্রদত্ত বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি পাবে;

ছ. প্রদত্ত বস্তুটি যখন হারিয়ে কিংবা ধ্বংস হয়ে যাবে;

জ. যখন প্রদত্ত বস্তুটি বিক্রয় হিবা কিংবা অন্যভাবে দান গ্রহীতার দখল বহির্ভূত হবে;

৩। দাতা কর্তৃক প্রদত্ত কোন কোন দান বাতিল করা যেতে পারে কিন্তু তার মৃত্যুর পর স্বীয় উত্তরাধিকারীগণ ইহা বাতিল করতে পারেন না।

৪। একবার দখল অর্পিত হলে আদালতের ডিক্রি ব্যতীত প্রদত্ত হিবা বাতিল হতে পারবে না। দান বাতিলের জন্য দাতার ঘোষণা কিংবা ইহা পুণরায় গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন মামলা দায়ের করলে তা দানটি বাতিলের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ডিক্রি প্রদান করা না হত ততক্ষণ পর্যন্ত দান গ্রহীতা দানের বিষয়বস্তুটি ব্যবহার ও হস্তান্তর করতে পারে।

স্বামী কিংবা স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত সম্পত্তির দানটি কিংবা নিষিদ্ধ ধাপের মধ্যে সম্পর্কিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত দান কি কারণে রদ করা চলে, তা হেদায়ার ৪৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছেঃ

“কোন আগন্তুককে প্রদত্ত দানের উদ্দেশ্য হল প্রদানে কিছু লাভ করা, কারণ উচ্চ পদস্থ কোন ব্যক্তি যাতে দাতাকে রক্ষা করতে পারে তাই তাকে উপঢৌকন প্রেরণ করা একটা রীতি বা রেওয়াজ। কোন নিম্নপদস্থ ব্যক্তিকে কোন উপঢৌকন প্রেরণের উদ্দেশ্য হল দাতা কর্তৃক ঐ ব্যক্তির নিকট হতে কাজ বা সেবা গ্রহণ করবার সুযোগ লাভ এবং সম মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে উপঢৌকন প্রেরণের উদ্দেশ্য হল সমান মানের কোন কিছু লাভ করা এবং অবস্থাটি এরূপ হওয়াতে যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পাদিত দলিলের মূল উদ্দেশ্যটির জবাব প্রদান না করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত দাতা স্বভাবতই দানটি রদ করার ক্ষমতা রাখেন যেহেতু এ দান রদযোগ্য বস্তু”।

মামা কর্তৃক ভাগিনীর পুত্রকে প্রদত্ত দানটি রদযোগ্য। ভাই কর্তৃক ভাইকে প্রদত্ত দানটি রদযোগ্য নয়। কারণ, এরা বিপরীত লিঙ্গের হলে অর্থাৎ ভাই বোন হলে পরস্পর পরস্পরকে বিবাহ করতে পারত না। এ দুই ক্ষেত্রে

প্রদত্ত যুক্তির মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। নিষিদ্ধ ধাপের কোন আত্মীয়ের অনুকূলে প্রদত্ত হিবা বা দান রদযোগ্য নয়। কারণ, উহাদের কোন একজন বিপরীত লিঙ্গের হলে ইহারা পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে পারত না যেমন ভাই কর্তৃক অন্য ভাইকে প্রদত্ত হিবা দান। এই জাতীয় দানে দানগ্রহীতা দাতার সাথে সম্পর্কিত বলে ইহা রদযোগ্য নয়।

সাদকা

সাদকা হল ধর্মীয় পুণ্য বা নেকী অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটা দান। হিবার ন্যায় ইহার সাথে দখল প্রদান না করলে কিংবা ইহা বিভাগযোগ্য সম্পত্তির অবিভক্ত অংশ হলে সাদকাটি বৈধ হবে না (ধারা ১৬০)। তবে একবার দখল অর্পিত হলেও যেমন একটি হিবা রদ করা সম্ভব, সাদকার ক্ষেত্রে একবার দান করা হলে ইহা আর রদ করা চলেনা; কিংবা দুই বা ততোধিকবার গরীব ব্যক্তিকে দান করলেও ইহা অবৈধ হয় না। যে উদ্দেশ্যে হিবা ও সাদকা প্রদান করা হয়, ইহার মধ্যেই বিষয় দু'টির তফাৎ বা পার্থক্য নিহিত রয়েছে। হিবার ক্ষেত্রে দান গ্রহীতার প্রতি দাতার স্নেহ ভালবাসা জ্ঞাপন অথবা দাতার প্রতি তার ভক্তি- শ্রদ্ধা প্রদর্শনই হল মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু সাদকার ক্ষেত্রে আল্লাহর দৃষ্টিতে ধর্মীয় পুণ্যের কাজ করাই হল এর উদ্দেশ্য। ধর্মীয় পুণ্য বা নেকী হাসিলের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হলে এমনকি ধনীকে কোন সম্পত্তির দানটিও সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।[১২]

শর্ত সাপেক্ষ হিবা (Contingent gift)

কোন প্রকার ঘটনা ঘটলে হিবা কার্যকরী হবে, এরূপ শর্তে কোন হিবা বৈধ হবে না।[১৩]

"কোন দান কোন শর্তের উপর নির্ভর করবে না। যথাঃ যায়েদের আগমন কিংবা খালেদের উপস্থিতি"।[১৪]

যখন কোন হিবা এমন কোন শর্ত সাপেক্ষ করা হয়, যা দানটির পরিপূর্ণতায় বাধা দান করে, তখন আরোপিত শর্তটি বাতিল হবে এবং দানটি এমনভাবে কার্যকরি হবে যেন ইহাতে কোন শর্তই আরোপিত নেই।

বেইলী বলেছেনঃ "আমাদের প্রাচীন আইনবিশারদ এ সম্বন্ধে একমত যে, যদি কেহ কোন দান করে এবং উহার সঙ্গে কোন ফাসিদ শর্ত আরোপ করে, তাহলে ঐ দান বৈধ হবে; শর্ত বাতিল ধার্য করা হবে"।[১৫]

---

[১২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩- ৭৬

[১৩] Bailliee 1, 515: Macnaugten P.50. See 3, Abdul karim V. Abdul Qayum (1906) 28 All. 342, 345; Alla Plchai Tharaganzar V. Mohd. Moideen Thanaganzar A.I.R. 1914.

[১৪] Bailliee, 515- 516, 49- 50.

[১৫] Bailliee1, 546.

হিবায় বেআইনি শর্ত

হিবায় বেআইনি কোন শর্ত যেমন দাতার সাথে গ্রহীতার কোন কোন বিবাহ দিতে হবে এইরকম থাকলে দানটি বৈধ; কিন্তু শর্তটি বেআইনি হবে।

হিবা সংক্রান্ত ধারাসমূহ

(ধারা ৪৭৭) হিবার সংজ্ঞা

কোন ব্যক্তির মাল বিনিময়মূল্য ব্যতিরেকে দান করা এবং যাহার বরাবরে দান করা হয় সেই ব্যক্তি কর্তৃক উহা গ্রহণ করাকে “হিবা” বলে।

(ধারা ৪৭৮) হিবা সম্পাদন

হিবা একটি চুক্তি যা ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

(ধারা ৪৭৯) হিবা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার শর্তাবলী

(ক) হিবাকারী সুস্পষ্ট বাক্যে হিবাকৃত বস্তুর মালিকানা ও তৎসম্পর্কিত সকল এখতিয়ার সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করবে এবং হিবাকৃত বস্তু হিবা গ্রহীতার এখতিয়ারে চূড়ান্তভাবে ছেড়ে দিবে এবং হিবা গ্রহীতা কর্তৃক ইহা গৃহীত হবে।

(খ) হিবাকারী হিবাকৃত বস্তুর উপর নিজের অধিকার প্রসূত কর্তৃত্ব খাটাতে থাকলে হিবা অনুষ্ঠিত হয় না।
(গ) হিবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হওয়া আবশ্যক, জবরদস্তি মূলক হিবা অবৈধ এবং বাতিল বলে গণ্য হবে।

(ধারা ৪৮০) হিবার যোগ্যতা

(ক) বালেগ ও সুস্থবুদ্ধির অধিকারী যে কোন ব্যক্তি নিজ সম্পত্তি অপরের অনুকূলে হিবা করতে পারে।

(খ) যার অনুকূলে হিবা করা হয় তার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা জরুরী নহে, তবে তার জীবিত থাকা জরুরী।

(ধারা ৪৮১) যে সব জিনিস হিবা করা যায়

যে কোন বৈধ মাল হিবা করা যায়।

(ধারা ৪৮২) অবিভক্ত সম্পত্তি হিবা করা যায়

(ক) যে সম্পত্তি বিভক্ত করা সম্ভব নয় তা হিবা করা যায়।

(খ) বিভক্ত করার উপযুক্তসম্পত্তি বিভক্ত না করে হিবা করলে উহা ফাসিদ বলে গণ্য হবে; কিন্তু (গ) এক ওয়ারিশ অপর ওয়ারিশের অনুকূলে বিভাগযোগ্য সম্পত্তি বিভক্ত না করে হিবা করতে পারে।

(ধারা ৪৮৩) একাধিক ব্যক্তির অনুকূলে হিবা

বিভাগযোগ্য সম্পত্তি দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে হিবা করা হলে এবং হিবা গ্রহীতাদের অংশ নির্দিষ্ট করে না দেয়া হলে বা বন্টন করে না দিলে এ হিবা ফাসিদ বলে গণ্য হবে। তবে হিবা গ্রহীতাগণ আলাদাভাবে নিজ নিজ অংশের দখল গ্রহণ করলে ইহা বৈধ হবে।

(ধারা ৪৮৪) যে পরিমাণ সম্পত্তি হিবা করা যায়

কোন ব্যক্তি তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ বা ইহার অধিক বা সমস্ত সম্পত্তি নিজের কোন ওয়ারিশের অনুকূলে বা অন্য কোন ব্যক্তির অনুকূলে হিবা করতে পারে।

(ধারা ৪৮৫) আজীবনের (উমারা) জন্য হিবা

যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে তার জীবৎকাল পর্যন্ত সময়ের জন্য কিছু হিবা করলে তা হিবা গ্রহীতারই হবে এবং হিবা গ্রহীতার মৃত্যুর পর ইহা তার (হিবা গ্রহীতার) ওয়ারিশগণের প্রাপ্য হবে এবং জীবৎকালের জন্য এই দান সীমিত থাকবে না।

(ধারা ৪৮৭) হিবা বিল এওয়াজ

বিনিময় প্রদানের পরিবর্তে হিবা করা হলে তাকে “হিবা বিল এওয়াজ” বলে এবং বিনিময় প্রদানের পর ইহা কার্যকরি হবে।

(ধারা ৪৮৮) বিনিময় প্রদানের শর্তে হিবা

নির্দিষ্ট বিনিময় প্রদানের শর্তযুক্ত করে হিবা করলে ইহাকে “হিবা বিশ- শর্ত” বলে এবং সংশ্লিষ্ট শর্ত পূরণ হলে হিবা কার্যকর হয়।

(ধারা ৪৮৯)

সম্ভাব্য কোন ঘটনা বা সময়ের সহিত সংশ্লিষ্ট করে হিবা করা বৈধ নহে।

(ধারা ৪৯০) শর্তযুক্ত হিবা

যে ক্ষেত্রে এমন কোন শর্তযুক্ত করে হিবা করা হয় যাতে দানের সম্পূর্ণতা ক্ষুণ্ন হয় সেক্ষেত্রে হিবা এমনভাবে কার্যকর করা হয় যেন আদৌ কোন শর্ত আরোপিত হয় নাই।

(ধারা ৪৯১) মৃত্যুব্যাধিগ্রস্থ অবস্থায় হিবা

মৃত্যুব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তির হিবা করা বৈধ নহে, কিন্তু হিবাকৃত সম্পদ গ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করলে সর্বাধিক এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে উহা কার্যকর হবে এবং হস্তান্তরের পূর্বে দাতা মারা গেলে হিবা বাতিল হবে।

(ধারা ৪৯২) ঋণগ্রহীতার অনুকূলে হিবা

ঋণগ্রহীতার অনুকূলে ঋণ হিবা করা বৈধ ও পছন্দনীয়।

(ধারা ২৯৩) অমুসলিমের অনুকূলে হিবা

কোন মুসলিম ব্যক্তি অমুসলিম ব্যক্তির (যিম্মি) অনুকূলে হিবা করতে পারবে।

(ধারা ৪৯৪) মুসলিম ব্যক্তির অনুকূলে অমুসলিম ব্যক্তির হিবা

কোন অমুসলিম ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির অনুকূলে হিবা করলে উহা গ্রহণ করা বৈধ।

(ধারা ৪৯৫) দাতা ও গ্রহীতার মতবেধে সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা

কোন ব্যক্তি হিবা করে সংশ্লিষ্ট বস্তুর মালিকানা অর্পণের পর ইহা অস্বীকার করল হিবা গ্রহীতা সাক্ষী উপস্থিত করে নিজের অনুকূলে হিবা প্রমাণ করতে পারে।

(ধারা ৪৯৬) হিবা রদ করণ

হিবা রদ করা সর্বাবস্থায় মাকরূহ হলেও আইনের দৃষ্টিতে বৈধ।[১৬]

---

[১৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০-৮৩

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াকফ আইন

প্রাথমিক কথা

ইসলামী আইনে ওয়াকফ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলিমের ধর্মীয় জীবনে সামাজিক ওয়াকফ নীতিতে ওয়াকফ অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত। বলা বাহুল্য যে, ওয়াকফের আইন অতি জটিল এবং এ সম্পর্কে আলোচনাও হয়েছে অতি ব্যাপক। এ আলোচনার মধ্যে রয়েছে স্ববিরোধিতা। রয়েছে এক মতের সাথে অন্যের মতের দুস্তর ব্যবধান। কিন্তু এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। পৃথিবীর এক অতি বৃহৎ অংশে মুসলিমের বাস। নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে আছে ধর্মীয় ঐক্য, কিন্তু তাদের জীবন ধারায় পার্থক্য কম নয়। সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং সামাজিকতার ক্ষেত্রে উত্তর আফ্রিকা, মিসর, তুরস্ক, সৌদি আরব, প্যালেস্টাইন, ইরান, মধ্যএশিয়া, ভারত এবং দূরপ্রাচ্য এক ও অভিন্ন নয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক এই বিভিন্নতার ফলে ওয়াকফ আইন একদেশে নিয়েছে একরূপ এবং অন্যদেশে নিয়েছে অন্যরূপ। এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে বিপুল সম্পত্তি, বিরাট অর্থ ভাণ্ডার এবং প্রচুর জমি জমা ওয়াকফের অন্তর্ভুক্ত। “ওয়াকফ” শব্দের অর্থ আটকানো। ইসলামী আইনে এ শব্দের অর্থ সেই সমস্ত সম্পত্তি আটকানো, যা জনকল্যাণের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং যা হস্তান্তরযোগ্য নয়। ইসলামী আইনে ওয়াকফ বলতে ধর্মীয় কারণে উৎসর্গ বা দানকে বলা যায়।

হযরত মুহাম্মদ (সা) এর আবির্ভাবের আগে আরব দেশে ওয়াকফ বলতে কিছু ছিল না। ইতিহাসে আমরা যে প্রথম ওয়াকফের দেখা পাই, তা হচ্ছে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) এর ওয়াকফ। বস্তুত দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের এই ওয়াকফ শুধু আদি নয়, এটাই ওয়াকফ বিধির প্রধানতম এবং পুরাতন উৎস।

এই প্রসঙ্গে বুখারী শরীফের হাদীস নিম্নরূপঃ

উমর ইবন খাত্তাবের খায়বরে কিছু জমি ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এলেন কিছু পরামর্শের জন্য। তিনি বললেন, “হে রাসূলুল্লাহ (সা), খায়বারে আমার কিছু জমি আছে। এর চাইতে ভাল জমি আমার আর কখনও ছিল না এবং আজও নেই। এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কী? “রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, “তোমার যদি পছন্দ হয় তবে ঐ জমি খানিকে হস্তান্তরের অযোগ্য ঘোষণা কর আর সমস্ত উৎপন্ন শস্য জনকল্যাণে দান কর”। এই নির্দেশ মোতাবিক হযরত উমর (রা) এই সম্পত্তি দান করে দিলেন কয়েকটি শর্তে। যথাঃ

ক. এই সম্পত্তি বিক্রয় করা যাবে না,

খ. কারো উত্তরাধিকারে যাবে না,

গ. আত্নীয়গণ এবং দরিদ্রগণ এর থেকে মুনাফা পাবে,

ঘ. এর আয় থেকে ক্রীদাসের মুক্তিপণ দেয়া হবে,

ঙ. আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা হবে,

চ. মুসাফির এবং মেহমানের জন্য ব্যয় করা হবে,

ছ. যারা এ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় থাকবে তারাও এর আয় নিতে পারবে এবং

জ. অন্যকে দিতে পারবে কিন্তু জমাতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর অনুসারী এবং সাহাবাগণ এমনিভাবে জনকল্যাণে অনেক সম্পত্তি উৎসর্গ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ “সম্পত্তির বস্তুকে বেধে রাখ আর তার মুনাফাকে বিলিয়ে দাও”। হযরত ওমর (রা) জমি ওয়াকফ করেছিলেন পরবর্তীকালে অন্যান্য সম্পত্তি এমনকি উটও ওয়াকফ করার ইতিহাস পাওয়া যায়। ইসলামের আদি যুগে ওয়াকফ এর বিধি ও নিয়ম সম্বন্ধে প্রচুর অনিশ্চয়তা ছিল। ইমাম আবূ হানিফা বলেছেন যে, ওয়াকফ সম্পাদনা করার পরেও সম্পত্তির উপর মালিকের অধিকার থেকে যায়, কিন্তু ইমাম শাফি‘ঈ এবং ইমাম আবূ হানিফার শিস্য আবূ ইউসুফ বিপরীত মত পোষণ করেন। হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীতে ওয়াকফ সম্পর্কে বিধিমালার একটি ইজমা’ প্রকাশিত হয় এবং তার উপরেই ওয়াকফের বিধিমালা গড়ে উঠে। ইসলামে দানশীলতা অতি মহৎ বৃত্তি। দানের ক্ষেত্রে মুসলিমগণ তাই বড়ই উদার। সেদিন বিজয়ী আরবগণ তাদের বিজিত দেশসমূহে দেখতে পেয়েছিলেন অনেক সম্পত্তি, প্রকৃতিতে যেগুলো ওয়াকফের অনুরূপ। গির্জা, মঠ, ইয়াতিমখানা প্রভৃতির জন্য অনেক সম্পত্তি সংরক্ষিত রাখা ছিল সেসব দেশে এগুলো বিশপদের তত্ত্বাবধানে থাকতো। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশে ওয়াকফ যে কত বিরাট স্থান অধিকার করে আছে, তা নিম্মে আলোচনা করা হল।

তুরস্কে যে চাষ যোগ্য জমি আছে, ১৯২৫ সালের হিসেবে দেখা যায় যে, তার তিন চতুর্থাংশ ওয়াকফের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আলজেরিয়ার অর্ধেক চাষ যোগ্য জমি ওয়াকফের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমনিভাবে তিউনেসিয়ায় এক তৃতীয়াংশ এবং মিসরে এক ষষ্ঠাংশ চাষ যোগ্য জমি আল্লাহর মালিকানায় চলে গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সকলের মনে বিশেষ করে ফ্রান্স, তুরস্ক এবং মিসরে এ ধরনের আলাপ আলোচনা চলা শুরু করল যে, ওয়াকফ প্রথা জাতীয় অর্থনীতির স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। মরক্কোতেও তাই করা হয়। ১৯২৪ সালে তুর্কী প্রজাতন্ত্র ওয়াকফ মন্ত্রণালয় তুলে দেয়। মোহাম্মদ আলীর সমস্ত কৃষি যোগ্য জমি ওয়াকফ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন এবং ১৯৪০ সালে ওয়াকফ মন্ত্রণালয়কে সংসদের

অধীন করেন। বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতে ওয়াকফ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং সেগুলোকে সরকারের বলে ঘোষণা করা হয়। ওয়াকফ সম্পত্তির মালিকানা আল্লাহ তা'আলার। দরিদ্র কল্যাণে ওয়াকফের অবদান আছে সত্য, কিন্তু এর অন্ধকার দিক বড়ই করুন, যখন কোন দরদী পিতা তার সন্তানদের ভরণ- পোষণ কে নিরাপদ করবার জন্য তার সম্পত্তি এই শর্তে ওয়াকফ করে যে, ঐ সম্পত্তির আয় নিয়মিতভাবে তার সন্তানরা পাবে, যখন এই ব্যবস্থায় পিতার দরদ এবং মমতা যতই পরিস্ফুট হউক না কেন, সন্তানদের বড় হবার পথে তা এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নিজের মেহনতে বড় হবার প্রেরণা তারা হারিয়ে ফেলে। তারা অলস হয়ে পড়ে। ওয়াকফের মাল যারা পাবে বলে জানে তারা কর্মে উৎসাহ হারায়। আবার অনেকে যারা ওয়াকফ করে নাম কিনতে চায় তারা অনেক সময় দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জন করে এবং পড়ে তা ওয়াকফ করে দেয়। এতে দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। বিশেষতঃ কৃষি জমি যদি ওয়াকফ করে দেয়া হয় তবে সেই জমি অযত্নে অবহেলায় একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

ওয়াকফের জমি যেহেতু আল্লাহর জমি, কোন মানুষের নয় সেহেতু মানুষ তার দিকে আর মুখ তুলে তাকায় না। কালক্রমে জমি খানি অনুর্বর ও শ্রমহীন হয়ে পড়ে। এদেশে ওয়াকফ সম্পত্তির অব্যবস্থা এবং মুতাওয়াল্লীদের অযোগ্যতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে এবং তা নিয়ে বহু মামলা মোকদ্দমা হয়েছে। এসব বিবেচনা করে, সমাজের জন্য ওয়াকফকে আশীর্বাদ গণ্য করার কোন হেতু নেই। এদেশে ওয়াকফ সম্পত্তি সম্পর্কে দু'টি প্রবণতা বিশেষ লক্ষণীয়। প্রথমতঃ ওয়াকফকে রাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে আপন শাসনে নিতে চাইছে এবং দ্বিতীয়তঃ পারিবারিক ওয়াকফ প্রভৃতি কমিয়ে ফেলবার চেষ্টা হচ্ছে।

ওয়াকফ এর সংজ্ঞা

আক্ষরিক অর্থে 'ওয়াকফ' (الوقف।) বলতে বুঝায় 'নিবৃত্তি' বা আটক। যিনি ওয়াকফ করেন তাকে ওয়াকিফ বলা হয়। ইমাম আবূ হানিফার মতে ওয়াকফ এর অর্থ হল কোন নির্দিষ্ট বস্তুতে ওয়াকিফের মালিকানা আটক করে ইহার আয় দরিদ্রের জন্য বা অন্য কোন নেক উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা। ইমাম আবূ ইউসূফ, ইমাম মুহাম্মদের মতানুসারে ওয়াকফ অর্থ উৎসর্গিত বস্তুতে ওয়াকিফের মালিকানার পরিসমাপ্তি এবং সে বস্তু আল্লাহ তা'আলার পরোক্ষ মালিকানা দ্বারা আটক হওয়া, যার ফলে উহার আয় মানব জাতির কল্যাণের জন্য নিয়োগ করা যেতে পারে এবং ইহা বিক্রি করা কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হওয়া চলবে না।[১৭] তাছাড়া ওয়াকফ অর্থ হল ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি কর্তৃক মুসলিম আইনে ধর্মীয় পবিত্র বা দ্রব্য বলে স্বীকৃত উদ্দেশ্য যে কোন সম্পত্তির স্থায়ীভাবে উৎসর্গ করা। একটি ওয়াকফ ওয়াকিফের মালিকানা শেষ

[১৭] এম. মনিরুজ্জামান, মোঃ সাঈদুল হক সাঈদ, শাহনাজ পারভীন, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন (ইসলামিক আইন)*, ধানসিঁড়ি পাবলিকেশন্স, ঢাকা: ১ম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৪, ৮ম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৮৬

করে তা আল্লাহর বরাবরে হস্তান্তর করে। ওয়াকফের ব্যবস্থাপককে মোতওয়াল্লী বলা হয়, কিন্তু ইংলিশ আইনের ট্রাস্টের ন্যায় ওয়াকফকৃত সম্পত্তি তার নিকট ন্যস্ত হয় না। ওয়াকফ অর্থ হল বস্তুটির মালিকানার নিবৃত্তি ঘটানো এবং উহার উপস্বত্ব কোন পুণ্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা এবং সে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করা যাবে না। যে ক্ষেত্রে উৎসর্গিত সম্পত্তির বস্তুটি ভোগ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে ওয়াকফ শব্দটি প্রযোজ্য নহে। ওয়াকফ মূলতঃ দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে চিরস্থায়ীভাবে সম্পত্তি উৎসর্গ করে দেয়া। ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, একবার ওয়াকফ হয়ে গেলে তা সর্বদাই ওয়াকফ এবং মাঝে মধ্যে ইহাকে অন্য কোন নামে ডাকার কারণেই কেবল উহার প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে না। যদিও ওয়াকফ এবং ট্রাস্টের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য আছে, তথাপি ওয়াকফ এবং ট্রাস্টের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় এবং বাস্তব পার্থক্য রয়েছে।

"ওয়াকফের অর্থ হল, যে মুসলমান ধর্ম পালন করে এমন কোন ব্যক্তির দ্বারা চিরস্থায়ীভাবে কোন সম্পত্তি মুসলমান আইনে ধর্মীয়, পুণ্য এবং দানশীল বলে গণ্য হয়, এরূপ কোন কার্যে উৎসর্গ করা"।[১৮]

"ওয়াকফ এর অর্থ হল মূল স্বত্ব আবদ্ধ রাখা এবং উহার মুনাফা কিংবা আয় কোন সৎকার্যে দান করা। ঐ ওয়াকফ সম্পত্তি বিক্রয় কিংবা দান করা যাইবে না এবং উহা উত্তরাধিকার সূত্রেও বর্তিত হবে না। ওয়াকফ কথাটি এমন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যে ক্ষেত্রে উহা উপভোগ করিয়া নিঃশেষিত করার ইচ্ছা বর্তমান থাকে"।[১৯]

ওমর ইবন খাত্তাবের (রা) খাইবারে জমি ছিল। সুতরাং তিনি পরামর্শ করার জন্য হযরতের (সা) নিকট আগমন করিলেন। তিনি বলিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সা) আমার খাইবারে জায়গা রহিয়াছে, উহা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান আর কোন জায়গা আমার নেই; আপনি উহা সম্বন্ধে আমাকে কি পরামর্শ দেন"? তিনি বলিলেন, "যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সম্পত্তিকে হস্তান্তরের অযোগ্য কর এবং (উহার মুনাফা) খয়রাতের কাজে দান কর"।

সুতরাং ওমর (রা) উহা এই শর্তে খয়রাতের কাজে দান করিলেন যে,

(ক) উহা বিক্রি করা যাবে না;

(খ) উহা উপহার প্রদান করা যাবে না;

(গ) উহা উত্তরাধিকার হিসেবে বর্তিত হইবে না;

---

[১৮] Mussalman Wakf Validating Act, 1913, See 2 (1).

[১৯] Abdul hamid V. Fateh Muhammad. P.L.D 1958 Lah 824.

(ঘ) উহার যে মুনাফা হইবে তাহা গরীব আত্নীয়দিগের মধ্যে দান করা হইবে;

(চ) উহা দ্বারা ক্রীতদাস মুক্ত করা হইবে;

(ছ) উহা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা হইবে; এবং

(জ) মেহমানদের সেবার কাজে ব্যয় করা হইবে; এবং

(ঝ) যে উহা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে সে যদি উহা হইতে 'নিজে কিছু খায় এবং অন্যকে খাওয়ায়' তাহা হিলে তাহাকে দোষারূপ করার কিছুই থাকিবে না।[২০]

ওয়াকফ এর শ্রেণিবিভাগ

ওয়াকফ একটি আইনসঙ্গত নির্দেশমূলক পদ্ধতি। ওয়াকফের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুন্যার্জন বা ধর্মীয় কাজ। ওয়াকফ তিন প্রকারের হতে পারেঃ

১। ধনী ও দরিদ্রের জন্য ২। প্রথমে ধনী ও পরে দরিদ্রের জন্য ৩। শুধু দরিদ্রের জন্য।

প্রথম শ্রেণিতে আসে সে সমস্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠান, যা সকলের জন্য উন্মুক্ত। স্কুল ও হাসপাতালের জন্য ওয়াকফ এই শ্রেণির মধ্যে পড়ে। স্কুল এবং হাসপাতালের উপকার ধনী দরিদ্র সকলেই পায়।

দ্বিতীয় শ্রেণির মধ্যে আসে পরিবারস্থ বংশধরদের জন্য ওয়াকফ। এ ওয়াকফের এক অংশের মুনাফা দরিদ্রের মধ্যে বন্টিত হয়।

তৃতীয় শ্রেণির মধ্যে পড়ে দরিদ্র সেবা কিংবা দরিদ্রকে দান কিংবা দরিদ্রের চিকিৎসার জন্য ওয়াকফ। কেউ কেউ ওয়াকফকে গণওয়াকফ, আধা গণওয়াকফ এবং ব্যক্তিগত ওয়াকফ এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন।[২১]

---

[২০] Muhammad Ali, Manual, 331-32.

[২১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭

ওয়াকফের উপাদান

চিরস্থায়িত্ব

ওয়াকফের একটি প্রধান উপাদান হচ্ছে চিরস্থায়িত্ব। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ওয়াকফ হয় না। বাংলাদেশের আইনও ঘোষণা করেছে যে, ওয়াকফ স্থায়ীকালের জন্য। কেউ যদি বলে যে, সে তার বাড়িখানি দরিদ্র জনকল্যাণে বিশ বছরের জন্য ওয়াকফ করে দিল সে ওয়াকফ অবৈধ অব্যবস্থাজনক পরিস্থিতিতে হলে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি দাতার উত্তরাধিকারগণ পাবে, এ শর্তমূলক ওয়াকফ অবৈধ।

অফেরৎ যোগ্যতা

ওয়াকফ একবার করা হলে তা আর প্রত্যাহার করা যায় না। অবশ্য উইলের মাধ্যমে ওয়াকফ সৃষ্টি করা হলে উইলকারীর মৃত্যুর পর সে ওয়াকফ কার্যকর হয়। মৃত্যুর আগে উইলকারী তার এক উইল বদলে অন্য উইল করতে পারে। ওয়াকফ নামাতে যদি এমন কোন শর্ত সংযুক্ত করা হয় যে, ওয়াকিফ ওয়াকফ প্রত্যাহার করতে পারবে তবে সে ওয়াকফ শুরুতে বাতিল বলে গণ্য হবে।

হস্তান্তরহীণ

বস্তুতঃ পক্ষে ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মালিক আল্লাহ তা'আলা। ফলে নিজেদের গরজে কোন মানুষ সাধারণতঃ এই সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারে না। যেহেতু ওয়াকফ চিরস্থায়ী দান, সেহেতু ওয়াকফকৃত সম্পত্তি হস্তান্তরযোগ্য নয়। সাধারণভবে হস্তান্তরযোগ্য না হলেও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি সংরক্ষণের মুতাওয়াল্লী আদালতে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করবার বা ইজারা দিবার আবেদন করতে পারে।

সম্ভাবনা

কোন সম্ভাবনার পর্যায়ে পরিণত হলে সম্পত্তি ওয়াকফ করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে, এমন দান কখনও ওয়াকফ বলে গণ্য হয় না। একজন মুসলিম স্ত্রী এ মর্মে তার সম্পত্তি তার স্বামীর বরাবরে হস্তান্তর করেন যে, ঐ সম্পত্তির আয় থেকে তাকে (দাতাকে) তার জীবনকাল পর্যন্ত ভরণ- পোষণ দেয়া হবে এবং সন্তান থাকলে তাদেরও ভরণ- পোষণ দেয়া হবে এবং সন্তান বালেগ হলে সম্পত্তি তার হাতে তুলে দেয়া হবে এবং তার যদি কোন সন্তান না হয় তবে সম্পত্তির আয় ধর্মীয় কাজে ব্যয় করা হবে। দেখা যায় মহিলার এই জনকল্যাণমূলক উৎসর্গ তার সন্তানহীন অবস্থায় মৃত্যুর উপর নির্ভরশিল। এই উৎসর্গ অবৈধ।

আয়ের ব্যবহার

যে ক্ষেত্রে দলিল মূলে ওয়াকফ সৃষ্টি হয়, সে ক্ষেত্রে ওয়াকফ নামার নির্দেশ অনুযায়ী ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আয় বিনিয়োগ করতে হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, এরূপ সম্পত্তির আয় নিম্মবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহের জন্য কাজে লাগানো হয়।

১। ওয়াকফভূক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্কার।

২। ওয়াকিফের নির্দেশ পালন।

৩। ওয়াকিফের নির্দেশ পালনের জন্য আনুষঙ্গিক খরচ। এবং

৪। দরিদ্রের কল্যাণে খরচ।

ওয়াকফ রদ করণ বা প্রত্যাহার

ওয়াকফ একবার কার্যকরি হয়ে গেলে ইহা আর প্রত্যাহার করা যাবে না। ওয়াকিফ যদি উইলের মাধ্যম ছাড়া কোন ওয়াকফ সৃষ্টি করে উহাতে ওয়াকিফ প্রত্যাহার বা রদ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন, তবে সে ওয়াকফ অবৈধ হবে। কিন্তু উইল দ্বারা তৈরী কোন ওয়াকফ ওয়াকিফের মৃত্যুর পূর্বে যে কোন সময় বাতিল বা রদ করা যাবে। বিরুদ্ধ দখল জনিত কারণে ওয়াকফ বিনষ্ট হতে পারে।

সম্ভাব্য ঘটনা বিবেচনা পূর্বক ওয়াকফ বৈধ নয়

কোন ওয়াকফের বৈধতার জন্য অত্যাবশ্যকিয় শর্তটি হল যে, উৎসর্গকৃত বস্তুকে কোন বৈধ ঘটনা আকস্মিক ঘটনার উপর নির্ভরশীল করা চলবে না। একজন মুসলমান ছেলে ট্রাষ্টের মাধ্যমে তার বাবার নিকট এই মর্মে স্বীয় সম্পত্তি হস্তান্তর করল যে, তার আয় হতে তার ছেলের ভরণ- পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ছেলে বড় বা সাবালক হলে সম্পত্তিটি তার নিকট হস্তান্তরিত হবে এবং ছেলে যদি কোন কারণে মারা যায় তাহলে তার যাবতীয় অংশ কতিপয় ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করতে হবে। ইহা বৈধ ওয়াকফ নয়।

একজন মুসলমান কর্তৃক সম্পাদিত ওয়াকফনামায় নির্দেশ রয়েছে যে, তার দেয় নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ওয়াকফনামা অনুযায়ী কোন আইনগত ব্যবস্থা বা কার্য দ্বারাই বলবৎ যোগ্য হবে না। এখানে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থাটি কোন দৈব ঘটনা বা আকস্মিক আমদানি করে নাই বলে ওয়াকফটি বৈধ হবে। মাসুদুল হাসান বনাম সোহেল (১৯৩৪) ৫৬ এলাহা ২৯৩, ১৪৮ আই.সি ২৯৪ (৩৪) এ.এ ১৭৬।

ওয়াকফ সম্পত্তির সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণকল্পে একটি রিজার্ভ ফান্ড বা জমা তহবিল গঠনের জন্য ওয়াকফনামায় কোন নির্দেশ প্রদত্ত হলে তদ্বারা ওয়াকফটি অবৈধ হয়ে যায় না। হাশিম আলী বনাম কালু মিয়া (১৯৪২) ৪৬ সি. ডব্লিউ. এন. ৫৬১; ৭৪ সি. এল. জে ২৬১; (৪২) এ. সি ১৮০।

যেখানে ওয়াকফনামায় শর্ত রয়েছে যে, কোন বিশেষ ব্যক্তি সন্তানাদি না রাখিয়া মারা গেলে কেবল তখনই বদান্যতা হিসাবে প্রদত্ত দানটি কার্যকর হবে, সেখানে মুসলিম আইনের অনিশ্চয়তা মূলক বিধানটি এ জাতীয় হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে কিন্তু ১৯১৩ সালের মুসলমান ওয়াকফ ভ্যালিডেটিং অ্যাক্টের কোন কিছুই উক্ত শর্তের পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না।[২২]

বেনিফিশারী এবং ওয়াকিফের নিজের জন্য উপস্বত্ব সংরক্ষণ

ওয়াকফ হতে যে উপকার লাভ করে তাকে বেনিফিশারী বলা হয়। এক বা একাধিক ব্যক্তি বা কোন শ্রেণির ব্যক্তিবর্গও কোন ওয়াকফ এর বেনিফিশারী হতে পারে। বেনিফিশারীগণ দরিদ্র হতে হবে এমন কোন কথা নেই। ধনী ব্যক্তির উপকারার্থেও ওয়াকফ করা যায়। মুসলিম আইনে প্রত্যেক ওয়াকফের মূল এবং সর্বশেষ উপকারভোগী গরীবগণই হবেন। আমির আলির মতে, ধনী এবং দরিদ্র উভয় শ্রেণিকে ওয়াকিফের পরিচিত না হলেও চলে।

ওয়াকিফ যে সকল অধিকার সংরক্ষণ করে ওয়াকফ করতে পারেন

(ক) হানাফি মাযহাব অনুযায়ী ওয়াকিফ ওয়াকফ সম্পত্তির আয় হতে তার ভরণ- পোষণের ব্যবস্থা সংরক্ষিত রাখতে পারে। ইচ্ছা করলে তিনি সারা জীবনের জন্য ওয়াকফ সম্পত্তির সম্পূর্ণ আয় সংরক্ষিত রাখতে পারে।

(খ) হানাফি আইনে ওয়াকিফ ওয়াকফ সম্পত্তির আয় হতে তার দেয় ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা রাখতে পারে। ১৯১৩ সালের ওয়াকফ ভ্যালেডেটিং অ্যাক্টের পূর্বে ইহা সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এখন ইহা অ্যাক্ট ৩ ধারার খ. দফায় পুনর্গঠিত হয়েছে।

১। একজন হানাফি মুসলমান পুরুষ ট্রাস্টের মাধ্যমে এ শর্তে স্বীয় বাড়িটি তার স্ত্রীকে প্রদান করল যে, স্ত্রী তাকে সারাজীবন উক্ত বাড়ির আয় প্রদান করবে এবং তার মৃত্যুকাল হতে সমগ্র আয়টি কোন বিশেষ ধর্মীয় কাজে নিয়োগ করবে।

২। একজন হানাফি মুসলমান একটি ওয়াকফ নামা সম্পাদন করে উহাতে নির্দেশ প্রদান করল যে, ওয়াকফ সম্পত্তির ভাড়া ও লাভ হতে তার দেয় ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ইহা একটি বৈধ ওয়াকফ।

---

[২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭- ৮৭

ওয়াকফ সম্পত্তি অ-হস্তান্তরযোগ্য

যেহেতু ওয়াকফ চিরস্থায়ী দান, সেহেতু ওয়াকফকৃত সম্পত্তি হস্তান্তরযোগ্য নয়। বস্তুতপক্ষে ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মালিক আল্লাহ তা'আলা। ফলে নিজেদের গরযে কোন মানুষ সাধারণত এই সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারে না।

সাধারণভাবে হস্তান্তরযোগ্য না হলেও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করবার বা ইজারা দিবার আবেদন করতে পারে।

মোতাওয়াল্লী

মোতাওয়াল্লী হলেন ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপক। উৎসর্গ করার পরে ওয়াকফ সম্পত্তি আল্লাহর উপর ন্যস্ত হয় এবং তিনি উহার মালিক হন। আল্লাহর পক্ষে সে সম্পত্তি পরিচালনা বা দেখা শোনা করার জন্য অবশ্যই কোন ব্যক্তি বা মনুষ্য সংস্থা থাকতে হবে। যে ব্যক্তি সে সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা বা দেখা শোনা করেন তিনি মোতাওয়াল্লী। তিনি উৎসর্গিত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। ওয়াকফে বর্ণিত নির্দেশ অনুসারে তিনি সম্পত্তির উপস্বত্ব বন্টন করেন। ওয়াকফ সম্পত্তিতে তার কোন উপকারভোগী স্বত্ব থাকে না। তিনি কেবলই একজন আল্লাহর চাকর, যিনি আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণের জন্য সে সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা করেন। কাজেই আইনগত দায়িত্ব ছাড়াও একজন মোতাওয়াল্লীর ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে ধর্মীয় এবং নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। তার এ দায়িত্বের ব্যাপারে কোনরূপ গাফিলতি বা ত্রুটি আল্লাহর প্রতি অসম্মান প্রদর্শনেরই শামিল।

সালিশির মাধ্যমে মোতাওয়াল্লী নিয়োগ

কোন সরকারি বা সাধারণ ওয়াকফ এর মোতাওয়াল্লীর অফিসটি একটি সরকারি অফিসের ন্যায় বিবেচিত হয় বলে দু'জনের মধ্যে কে মোতাওয়াল্লী হবার উপযুক্ত বা অধিকারী এই প্রশ্নটি সালিশি বা মধ্যস্থতার উপর ন্যস্ত করা চলে না। তবে সেখানে ক' দাবি করেছে যে, সম্পত্তিটি ওয়াকফ সম্পত্তি এবং সে উক্ত ওয়াকফ সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী এবং খ' উহার অস্বীকার করতেছে সেখানে আদালত কর্তৃক বিষয়টি মীমাংসিত না হওয়া পর্যন্ত উহাদের প্রত্যেকেই উক্ত ওয়াকফ সম্পত্তির পরিচালনা ও উহা হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশের ক্ষেত্রে সমান অংশ পেতে পারবে এ মর্মে মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত প্রদত্ত হল উহা সম্পূর্ণরূপে বৈধ হবে।

মোতাওয়াল্লী হিসাবে পুরুষ ব্যতীত অন্য কেহ

PRIVICOUNCIL মন্তব্য করেছেন যে, যেহেতু স্বভাবগত ভাবে ট্রাস্টের মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপ বা দায়িত্ববোধের অস্তিত্ব নেই যা সে স্বয়ং কিংবা ডেপুটি দ্বারা পরিচালনা করতে পারে না, তাই

কোন মহিলার ব্যাপারে কোন আইনগত নিষেধাজ্ঞা নেই। যেখানে কোন মহিলা একটি মসজিদ এবং অন্যান্য ধর্মীয় দাতব্য উদ্দেশ্যে কোন ওয়াকফ সৃষ্টি করেছেন যে, এবং নিজেকে প্রথম মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেছেন এবং নির্দেশ দান করেছেন যে, তার দু'জন পুরুষ আত্নীয় তার পর মোতাওয়াল্লী হবে এবং অতঃপর নির্দেশ প্রদান করে যে, উহাদের আইনানুগ উত্তরাধিকারীগণ তার পর মোতাওয়াল্লী হবে এবং অতঃপর নির্দেশ প্রদান করে যে, উহাদের আইনানুগ উত্তরাধিকারীগণ তার পর মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত হবে, সেখানে কলিকাতা হাই কোর্ট মন্তব্য করেন যে, আইনানুগ উত্তরাধিকারী উক্তিটিতে মহিলা উত্তরাধিকারীগণকেও বাদ দেয়া হয় না। মাদ্রাজ হাই কোর্ট মন্তব্য করেছেন যে, কোন আস্তানা অথবা প্লাটফরম যেখানে মহররম উৎসব পালন করা হয় উহার প্রধান মোজাবর একজন মহিলাকে নিয়োগ করা যেতে পারে। আদালত মন্তব্য করে যে, ধর্মীয় দায়িত্ব যদি এমন হয় যা কোন ডেপুটির দ্বারা পালন করা চলে, তা হলে সেক্ষেত্রে বর্জন নীতিটি প্রযোজ্য নয়।

মোতাওয়াল্লীর ক্ষমতা এবং কার্যাবলী

একজন মোতাওয়াল্লী হলেন ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপক এবং ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিমাত্র, তাকে সম্পত্তির মালিক বলা যাবে না। তার প্রাথমিক দায়িত্ব হল সম্পত্তিটি তার নিজের সম্পত্তির মতই সংরক্ষণ করা, কিন্তু আল্লাহর বান্দা বা চাকর হিসাবে উহার ব্যবস্থা ও নির্বাহ করা একজন ট্রাস্টির মতই তার দায়িত্ব ও কাজ। একজন মোতাওয়াল্লী দখলের জন্য মোকদ্দমা করতে পারে যদিও সম্পত্তিটি তার উপর অর্পিত হয়নি, তা স্বয়ং ওয়াকফ সম্পত্তিরই অধিকার। মোতাওয়াল্লীর দখলিস্বত্ব সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধেই চূড়ান্ত। তবে তার এ দখল কখনই ওয়াকিফের বিরুদ্ধে দখল বলে গণ্য হবে না। একজন মোতাওয়াল্লী ওয়াকফের প্রতিষ্ঠাতা বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক বেদখল হলে, কোন আদালতে তার দখল ফিরে পাওয়ার জন্য সে মোকদ্দমা করতে পারে।

একজন মোতাওয়াল্লী আদালতের অনুমতি ছাড়া ওয়াকফ সম্পত্তি বা ইহার কোন অংশের বন্ধক বিক্রয় বা বিনিময় করতে পারে না, যদি না ওয়াকফ দলিলে ঐ ব্যাপারে তাকে স্পষ্ট রূপে ক্ষমতা দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু আদালতের অনুমতি না নিয়েও প্রয়োজনের কারণে সম্পত্তি বন্ধক দিলে তা বাতিল নয় এবং আদালত কর্তৃক ইহা ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতায় অনুমোদন দেয়া যাবে। মোতাওয়াল্লী প্রয়োজন ছাড়া কোন সম্পত্তি বিক্রয় করলে উহা দ্বারা প্রতিষ্ঠানটি অনুমোদনে বাধ্য নয়।

একজন মোতাওয়াল্লী ওয়াকফ দলিলে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার অবর্তমানে কৃষি জমি হলে তিন বৎসর পর্যন্ত এবং অন্যান্য সম্পত্তি এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের জন্য ইজারা দিতে পারে। তবে যখন তাকে ওয়াকফ দলিলে স্পষ্টভাবে ক্ষমতা দেয়া থাকে বা আদালতের অনুমতি নিয়ে কোন মোতাওয়াল্লী আরও দীর্ঘ মেয়াদের জন্য

ওয়াকফ সম্পত্তি ইজারা দিতে পারে। কোন নিয়মিত মোকদ্দমা না করে শুধুমাত্র একটি দরখাস্ত দিয়ে ওয়াকফ সম্পত্তি হস্তান্তরের অনুমতি আদালত হতে লাভ করা যায় এবং এ উদ্দেশ্যে নিয়মিত মোকদ্দমা প্রয়োজন নয়। কোন মোতাওয়াল্লী কর্তৃক আদালতের অনুমতি ছাড়া ওয়াকফ সম্পত্তি ইজারা দিলে তা বাতিল নয় কিন্তু বাতিল যোগ্য। তারপর যিনিই মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত হবেন তিনি ইচ্ছা করলে ঐ ইজারা মঞ্জুর অনুমোদন করতেও পারে আবার নাও করতে পারে। যদি তিনি ইহাকে স্বীকৃতি না দেন, তবে উক্ত ইজারা এড়াইবার জন্য শেষ মোতাওয়াল্লীর মৃত্যুর তারিখ হতে তামাদির মেয়াদ হিসাব করা হবে এবং এ ক্ষেত্রে দখল উদ্ধারের জন্য তাকে বার বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা করতে হবে।

মৃত্যুকালীন সময়ে মোতাওয়াল্লীর উত্তরাধিকারী নিয়োগ

ওয়াকফ এর প্রতিষ্ঠাতা ও তার নির্বাহক উভয়ই মৃত হলে এবং উক্ত পদের উত্তরাধিকারের কোন ব্যবস্থা না থাকলে, মোতাওয়াল্লী মৃত্যু শয্যায় আপাততঃ একজন উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করতে পারে। তবে মরণ অসুখ হতে পৃথক অবস্থায় অর্থাৎ সুস্থ থাকলে তিনি ভবিষ্যৎ কর্ণধার নিযুক্ত করতে পারবেন না। অথবা পদটি বংশানুক্রমিক অধিকারভুক্ত হলে তিনি উত্তরাধিকারী নিয়োগ করতে পারবেন না। মোতাওয়াল্লী তার মৃত্যুশয্যায় এমনকি একজন অজানা অপরিচিত লোককেও স্বীয় উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করতে পারেন এবং দাতা বা প্রতিষ্ঠাতার পরিবারের কোন সদস্যকে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করতে উক্ত মোতাওয়াল্লী বাধ্য নয়। লাহোর হাই কোর্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, মোতাওয়াল্লী যখন মোতাওয়াল্লীর পদটি অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করবেন কেবল তখনই উপরোক্ত নিয়মটি প্রযোজ্য হবে, তবে তিনি অছিয়তের মাধ্যমে স্বীয় উত্তরাধিকারী নিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু প্রিভিকাউন্সিলের নিকট আবেদন করলে আদালত উক্ত বিষয়ে কোন অভিমত প্রকাশে বিরত থাকেন।[২৩]

পাকিস্তান

যেখানে ওয়াকফনামায় ব্যবস্থা রয়েছে যে, আরশাদ- উজ- জুকুরকে মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করতে হবে। সেখানে বেঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিগণ কর্তৃক গৃহীত হয় যে, ওয়াকফনামার মধ্যে উত্তরাধিকারের পদ্ধতি সম্পর্কে সুনির্দিস্ট ভাবে কিছু বলা হয়েছে বলে দাবি করা চলে না। পদ্ধতিটি সম্পর্কে ইঙ্গিত দান করা হয়েছে বলে কেবল তখনই দাবি করা উত্তরাধিকারের চলে যখন উক্ত পদ্ধতির অনুসরণে আদালতই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন কোন ব্যক্তি সর্বশেষ মোতাওয়াল্লীর অধিকারী হবেন। যেহেতু উক্ত ক্ষেত্রে তা হয়নি, অতএব মৃত্যুশয্যায় সর্বশেষ মোতাওয়াল্লী কর্তৃক উত্তরাধিকারী নিয়োগটি বৈধ বলে গৃহীত হবে।

---

২৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬-১১

বয়স্কভাতা ও ওয়াকফ কর্মচারীদের মজুরি

যেখানে ওয়াকিফ ওয়াকফ সম্পত্তির কর্মচারী ও ভৃত্যদের ভাতা নির্ধারিত করেছেন, সেখানে ভাতা বৃদ্ধির কোন ক্ষমতা মোতাওয়াল্লীর নেই। তবে আদালত উপযুক্ত ক্ষেত্রে উক্ত ভাতা বৃদ্ধি করতে পারেন। বর্তমানে ওয়াকফ প্রশাসকও সরকারের পূর্ব অনুমতি নিয়ে ইহা পারেন।

পরিশ্রম অনুযায়ী মোতাওয়াল্লীর পুরস্কার

ওয়াকফ এর প্রতিষ্ঠাতা মোতাওয়াল্লীর জন্য একটি নির্ধারিত পরিমাণ কিংবা ওয়াকফ সম্পত্তির আয় হতে প্রয়োজনীয় খরচ বহন করে অবশিষ্টাংশকে মোতাওয়াল্লীর পারিশ্রমিক হিসাবে নির্ধারিত করতে পারে। যদি ওয়াকিফ বা প্রতিষ্ঠাতা মোতাওয়াল্লীর পারিশ্রমিক সম্পর্কে কোন বিধান না রেখে যান তবে জেলা জজ ওয়াকফ সম্পত্তির আয় হতে উহার অনধিক এক দশমাংশ একেবারেই নগণ্য হয়ে গেলে তা আদালত বৃদ্ধি করতে পারেন। তবে সে বৃদ্ধি অবশ্যই সম্পত্তির আয়ের এক দশমাংশের বেশী নয়।[২৪]

---

২৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১-১২

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

বিবাহ খোরপোষ ও দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার আইন

বিবাহ বিচ্ছেদ ও তালাক আইন

দেনমোহর আইন

বিবাহ খোরপোষ ও দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার আইন

স্বামীর নাবালকত্ব অসুস্থতা বা কারাদণ্ড অথবা স্ত্রীর সম্পদ প্রভৃতি নির্বিশেষে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর খোরপোষ প্রদান একটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব; তবে নাবালক স্বামীর পিতার উপর এ দায়িত্ব এ শর্তে বর্তাবে যে, পুত্র যখন এই টাকা পরিশোধ করতে সক্ষম হবে, তখন পিতা তা ঐ পুত্রের কাছ হতে পুণরায় আদায় করতে পারবেন। তবে শর্ত হল স্ত্রী এতই ছোট নয় যে, তার সাথে বৈবাহিক সহবাস সম্ভব নয়। কিন্তু খোরপোষ প্রদানের বিষয়টি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষঃ

(ক) স্ত্রী স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে এবং

(খ) স্বামীর যুক্তি সঙ্গত আদেশসমূহ মেনে চলবে। কোন স্ত্রী স্বামীর সাথে বসবাস করতে অস্বীকার করলে অথবা অন্যভাবে তার প্রতি অবাধ্য হলে এবং উক্ত অবাধ্যতা তলবী দেনমোহর পরিশোধ না করার জন্য ন্যায় সঙ্গত হলে, স্বামী ঐ স্ত্রীর ভরণ- পোষণের দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য নহেন। কোন স্ত্রী তার দেনমোহর পরিশোধ না করার কারণে স্বামীর সাথে বসবাস করতে অস্বীকার করলেও স্বামী তার স্ত্রীর খোরপোষ দিতে বাধ্য। এক্ষেত্রে তার খোরপোষ পাওয়ার অধিকার বজায় থাকে, যদিও সে স্বামীর সাথে বসবাস করছে না এবং সে অন্য কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ ছাড়াই দূরে বসবাস করছে।

একজন স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ি ত্যাগ করে পিত্রালয়ে বসবাস করলে স্বামীর নিকট হতে খোরপোষ পাওয়ার অধিকারী নয়। তবে সকল সময় এবং সর্বাবস্থায় স্বামীর সাথে স্ত্রীর বসবাস করার দায় চূড়ান্ত নয়। আইনে এমন অবস্থা স্বীকৃত আছে, যখন স্ত্রীকে স্বামীর সাথে বসবাস করতে অস্বীকার করাকে সমর্থন করে। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি স্বামী- স্ত্রীর সাথে বসবাস করতে অস্বীকার করে অথবা যদি স্বামী- স্ত্রীর সাথে অভ্যাসগতভাবে খারাপ ব্যবহার করেন অথবা যদি সে সুদীর্ঘকাল যাবত স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করে থাকে অথবা যদি সে স্ত্রীকে তার গৃহত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে থাকে, এমনকি যদি দেখা যায় যে, স্বামী- স্ত্রীকে বের করে দেয় অথবা দেয়ার ষড়যন্ত্র করে থাকে অথবা তাদের মধ্যকার আচার আচরণ কিংবা খারাপ ব্যবহার এরূপ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ইহা নিরসন সম্ভব নয় এবং স্বামীর গৃহে স্ত্রীর প্রত্যাবর্তন আরো নতুন অসুবিধা এবং বিবাদের জন্ম দিবে, সে অবস্থায় স্ত্রী- স্বামীর সাথে বসবাস না করেও খোরপোষ দাবি করতে পারেন। অনুরূপ ভাবে যদি স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে এরূপ একটি চুক্তি হয় যে, পরস্পরের মধ্যে মতের অমিল হলে কিংবা স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করলে প্রথম স্ত্রী- স্বামীর নিকট হতে দূরে থাকতে পারবে, সে ক্ষেত্রে সে চুক্তি অবশই মুসলিম আইন কিংবা চুক্তি আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী জনস্বার্থ নীতির পরিপন্থী নয় বলে গণ্য হবে। একজন

মুসলিম পুরুষ এবং মহিলার মধ্যকার বিয়ে সম্পূর্ণ রূপে একটি দেওয়ানী চুক্তির মত এবং এজন্য একজন স্ত্রী ভবিষ্যতের মতভেদ কালে স্বামীর হাত হতে অবশ্যই নিজকে রক্ষা করার অধিকারী।[১]

ভরণ- পোষণের সংজ্ঞা

মুসলিম আইনবিদগণ নৈতিক দায়িত্ব এবং আইনগত দায়িত্বকে পৃথক করে দেখেননি। তাই আজকের দিনে কোন বিধি শুধুমাত্র নৈতিক সুপারিশ, আর কোন বিধি অবশ্যপাল্য, এটা বুঝা মুশকিল হয়ে পড়েছে। ইসলামী আইনের পরিভাষায় ভরণ- পোষণকে (نفقه) 'নাফাকা' বলা হয়। নাফাকার মধ্যে আছে খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়। তিন কারণে নাফাকার দায়িত্ব মানুষের উপর বর্তায়।

(ক) প্রথম কারণ হচ্ছে বিবাহ

(খ) দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে অন্যবিধ আত্নীয়তা এবং

(গ) সর্বশেষ কারণ হচ্ছে সম্পত্তি।

মুসলিম আইনে সে ব্যক্তিকে সম্পত্তিওয়ালা বলে যার জন্য মুসলিম আইন ভিক্ষা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। যে ভিখারী সে ফকির। নিজের প্রয়োজনের দাবি মিটিয়ে যার হাতে দশ দিরহাম ৬০- ৮০ টাকা থাকে, তার জন্য ভিক্ষা নিষিদ্ধ এবং সে ব্যক্তি সম্পত্তিওয়ালা।

খাদ্য, পরিচ্ছদ এবং থাকার জায়গার সংস্থান করা ভরণ- পোষণের অন্তর্গত। ভরণ- পোষণের সংস্থান মুসলিম আইনে, আইন এবং কর্তব্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং ভরণ- পোষণ স্নেহ ভিত্তিক নৈতিক কর্তব্য হলেও উহা আইনতঃ অবশ্যকরণীয় কার্যও বটে।[২]

সুতরাং মুসলিম আইনে এই উভয় কর্তব্যের সংমিশ্রণে যাহাদিগকে ভরণ- পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় তাহারা হইলঃ

(১) রক্ত সম্বন্ধীয়ঃ

(ক) উর্ধতন পুরুষগণ, যথাঃ পিতা মাতা, পিতামহ পিতামহী, মাতামহ মাতামহী।

(খ) অধঃস্তন পুরুষগণ, যথাঃ পুত্র কন্যা, পুত্রের পুত্র পুত্রের কন্যা এবং

---

[১] এম. মুনিরুজ্জামান, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন (ইসলামিক আইন),* ধানসিঁড়ি পাবলিকেশন্স, ঢাকা: প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০৪, ৮ম সংস্করণ জানুয়ারী ২০১৩, পৃ. ২২৯- ৩০

[২] মুসলিম আইন, *নুরুল মোমেন,* বাংলা একাডেমী: ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪/জুন ১৯৭৭, পৃ. ৪২৬

(গ) সমগোত্রীর ব্যক্তিগণ; যাহাদিগকে বিবাহ নিষিদ্ধ পর্যায়ের আত্নীয় বলা যায় (মুহাররম)।

(২) বিবাহ সম্বন্ধীয়ঃ

(ক) স্বামী

(খ) স্বামীর পিতা এবং

(গ) সৎ পুত্র।

মুসলিম আইনানুসারে প্রত্যেকে তার নিজস্ব আয় হতে প্রতিপালিত হবে। কারো নিজ সম্পত্তি কিংবা আয়ের সংস্থান থাকলে সে নাবালেগ কিংবা সাবালেগ হোক, কারো নিকট হতে ভরণ- পোষণ প্রাপ্ত হওয়ার অধিকারী হবে না।[৩]

যদি কেউ অভাবগ্রস্থ এবং নিজের রুজিরোজগার করতে অসামর্থ্য না হয় তাহলে সেও ভরণ- পোষণ প্রাপ্ত হওয়ার অধিকারী হবে না।[৪]

স্ত্রীর অধিকার

স্ত্রী সর্বাবস্থায় স্বামীর কাছে ভরণ- পোষণ পেতে অধিকারিণী। সে নিজে যতই ধনী হোক না কেন, তাতে তার অধিকার নষ্ট হয় না। স্বামী যতই দরিদ্র হোক না কেন স্ত্রীর অধিকার থেকেই যায়। স্ত্রী হচ্ছে মূল আর সন্তান হচ্ছে শাখা। মূলকে তাই বেঁচে রাখা প্রয়োজন। মূলের দাবি অগ্রগণ্য। যে সময় স্ত্রী বালেগ হয়, সে সময় থেকে স্বামী স্ত্রীকে ভরণ- পোষণ দিতে বাধ্য; তবে এই বাধ্যবাধকতা শর্তহীন নয়। স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি অনুগত থাকতে হবে এবং সমস্ত বৈধ সময় তার কাছে যাবার অধিকার স্বামীর জন্য অবাধ রাখতে হবে, তবেই স্ত্রী ভরণ- পোষণের হকদার হবে। অবশ্য সঙ্গতকারণ থাকলে স্ত্রী স্বামীর সাথে বসবাস করতে অস্বীকার করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা হাই কোর্টের সাম্প্রতিকতম নজীর উদ্ধৃত করা হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, অনিচ্ছুক স্ত্রীকে স্বামী খোরপোষ দিতে বাধ্য কী না। অনিচ্ছুক বলতে কি বুঝা যায়? বিনা সঙ্গত কারণে স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে বসবাস করতে অস্বীকার করে তবেই তাকে অনিচ্ছুক বলা যায়, কিন্তু যেখানে দীর্ঘকাল ধরে স্বামী তার স্ত্রীকে ঘরে নেবার কোন উদ্যোগই নেয়নি, সেখানে স্ত্রীর ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, স্ত্রীর

---

[৩] Hed. 147

[৪] Baillee 1. 467; Baillee 11 , 103

উপর স্বামী কোন নিষ্ঠুর আচরণ করেননি, বরং তাকে নিজের ঘরে নেবার জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন তবে স্ত্রীকে নিঃসন্দেহে অনিচ্ছুক বলা যায়। অনিচ্ছুক স্ত্রী খোরপোষের অধিকারিণী নয়।

ভরণ- পোষণ ছাড়াও অন্য খরচ দেবার চুক্তি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হতে পারে। স্বামী সে সকল শর্তাবলী প্রতিপালন করতে বাধ্য। দ্বিতীয়বার বিবাহ করবার সময় প্রথম স্ত্রীর সাথে স্বামী যদি চুক্তি করে যে, প্রথমা স্ত্রী তার বাপের বাড়ি থাকবে এবং স্বামী তাকে মাসিক মাসোহারা দেবে, তবে সে চুক্তি স্বামী প্রতি বাধ্যকর। দ্বিতীয় বার বিবাহ করবার সময় দ্বিতীয় স্ত্রীকে বাপের বাড়ি থাকতে দিতে হবে এবং তাকে নির্দিষ্ট মাসোহারা দিতে হবে এরূপ চুক্তিও স্বামীর প্রতি বাধ্যকর। কিন্তু বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর খোরপোষ দেবার শর্ত অসিদ্ধ। খোরপোষের জন্য কোন প্রত্যয়ন পত্র মঞ্জুর করার আগে পক্ষগণের ব্যক্তিগত আইনের সূত্রে বিবাহের বিষয়টি অবশ্যই সুনির্ধারিত হতে হবে। যদি বিবাহটি অস্বীকার করা হয় তবে, একটি বৈধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হতে হবে এবং বিবাহটি প্রমাণের দায়িত্ব স্ত্রীর উপর বর্তায়।

বিবাহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী

কোন বিবাহের বৈধতার জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হল দু'জন প্রাপ্ত ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন মুসলমান পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষীর উপস্থিতিতে এবং তাদেরকে শুনিয়ে বিবাহের এক পক্ষ কর্তৃক অথবা তার পক্ষে প্রস্তাব পেশ করা এবং বিবাহের অপর পক্ষ কর্তৃক অথবা তার পক্ষে উহা গ্রহণ করা। প্রস্তাব ও গ্রহণ একই বৈঠকে সম্পন্ন হতে হবে। এক বৈঠকে প্রস্তাব এবং অপর বৈঠকে গ্রহণ কার্য সম্পন্ন হলে তদ্বারা বৈধ বিবাহ কার্য সম্পন্ন হবে না। মুসলিম বিবাহে কোন লেখা অথবা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন অত্যাবশ্যক নয়। একটি বৈধ মুসলিম বিবাহের অত্যাবশকীয় শর্তাবলী হল এই যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের এক পক্ষ অপর পক্ষের নিকট প্রস্তাব দিবে এবং ঐ পক্ষ সেটি গ্রহণ করবে যা দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষীর উপস্থিতিতে সম্পন্ন হবে। এ দু'জন সাক্ষীকে অবশ্যই সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী ও সাবালক হতে হবে। এছাড়া প্রস্তাব প্রদান ও গ্রহণ ক্রিয়াদ্বয় একটি বৈঠকে সম্পন্ন হতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত মহিলা পক্ষটি ঐ বিবাহে তার মুক্ত সম্মতি জ্ঞাপন করেন মর্মে পরিষ্কার, প্রত্যক্ষ ও সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন কিছুতেই ঐ বিবাহটি প্রমাণ হবে না।

এমতাবস্থায় বিচারের রায়ে গৃহীত হয় যে, মুসলিম বিবাহের বৈধতার জন্য একান্ত আবশ্যকীয় উপাদানসমূহের অনুপস্থিতির কারণে যেমন কনের সম্মতি ইত্যাদি অবস্থায় একমাত্র উপসংহারটি হল এই যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের মধ্যে একটি আইনসঙ্গত বৈধ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এটি বাদী প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বালিকার সম্মতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে এবং যেখানে পর্দানশীন মহিলার বিবাহকার্য সম্পন্ন হবে, সেখানে

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণতঃ কিভাবে প্রস্তাব ও গ্রহণ কার্যসম্পন্ন করা হয় সে মর্মে অনিয়মিত পদ্ধতির পুর্ণ বিবরণ জানতে হলে নিম্নলিখিত মামলাটি দ্রষ্টব্য।

অযোধ্যার চিফ কোর্ট কর্তৃক গৃহীত হয়েছে যে, প্রস্তাব ও গ্রহণ সম্পর্কিত ব্যাপারে কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন বা পালনের আবশ্যকতা নাই। এক্ষেত্রে বালিকার সম্মতির প্রমাণ ছিল এবং স্বামী প্রস্তাবিত দেনমোহরে সম্মত হয়েছিল। আদালত কর্তৃক গৃহীত হয় যে, এমতাবস্থায় বিবাহ সম্পন্ন হবার অনেক দিন গত হবার পর বিবাহ সম্পর্কিত যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। অনুরূপভাবে, যেখানে নিকাহ সম্পাদনকারী ব্যক্তি মারা গিয়েছে, সেখানে বিবাহটি প্রমাণ করবার জন্য একজন সাক্ষীর প্রদত্ত সাক্ষ্যই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। বিচারের রায়ে গৃহীত হয় যে, প্রস্তাব ও গ্রহণ সংক্রান্ত সঠিক শব্দগুলি কি ছিল তা প্রমাণের আবশ্যকতা নাই।

দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার

যদি কোন স্ত্রী আইনসঙ্গত কারণ ছাড়া স্বামীর সাথে বসবাস করতে অস্বীকার করে, তাহলে স্বামী ঐ স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার করার দাবিতে মোকদ্দমা করতে পারে। একইভাবে স্ত্রীও তার দাম্পত্য বা বৈবাহিক দায়গুলো পূরণ করবার দাবিতে স্বামীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করতে পারে। দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য শুধুমাত্র স্বামীই মোকদ্দমা করতে পারে এরূপ ধারণা ভুল, অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীও একই দাবি নিয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করতে পারে। কিন্তু স্বামী যেহেতু স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা রয়েছে সেহেতু স্ত্রী কর্তৃক এরূপ মোকদ্দমা দায়ের করা হলে স্বামী বিবাহ এবং মোকদ্দমা উভয়টির পরিসমাপ্তি ঘটাতে প্রলুব্ধ করতে পারে। সুতরাং এরূপ প্রতিকার শুধুমাত্র স্বামীর সহায়ক হবে।

একটি বৈধ বিদ্যমান বিবাহ এরূপ মোকদ্দমা দায়েরের পূর্ব শর্ত এবং কোন অনিয়মিত বিবাহ দ্বারা এরূপ মোকদ্দমার সঙ্গতকারণ তৈরী হয় না। বিবাহটি অনিয়মিত ইহা এ ধরনের মোকদ্দমায় আত্নপক্ষ সমর্থনের একটি বড় উপায়। এমনকি অনিয়মিত বিবাহে যৌনসঙ্গম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলেও স্বামী দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের কোন ডিক্রি পেতে পারেন না। যদি স্ত্রী- স্বামীর নিকট চাওয়া মাত্র পরিশোধযোগ্য মোহরানা দাবি করে এবং স্বামী তা পরিশোধ না করে তবে সেই স্বামী দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের কোন ডিক্রি পেতে পারে না।

বিবাহটি যৌনকর্ম দ্বারা সুসম্পন্ন হয়ে থাকলেও স্ত্রী এরূপ মোকদ্দমায় মোহরানা পরিশোধ না করাকে আত্নপক্ষ সমর্থনের একটি উপায় হিসেবে দাঁড় করাতে পারে। যদি কোন স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে এবং প্রথম স্ত্রীকে স্বামীর বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য স্বামী তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে, তবে আদালত সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করে দেখবেন যে, প্রথম স্ত্রীকে তার স্বামীর নিকট ফিরে দেয়া ন্যায়সঙ্গত হবে কি না। দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার

মাধ্যমে প্রথম স্ত্রীর প্রতি কোনরূপ নিষ্ঠুরতা বা অপমান করা হয় না। কিন্তু এরূপ আন্তরিক ব্যাখ্যা বা প্রমাণের অনুপস্থিতিতে বর্তমান অবস্থাধীনে আদালত ধরে নিবেন যে, দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার মাধ্যমে স্বামী প্রথম স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করেছেন এবং এরূপ অবস্থায় প্রথম স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে তার এরূপ স্বামীর সঙ্গে বসবাস করতে বাধ্য করা এক প্রকার অন্যায় হবে। দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের মোকদ্দমায় স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুরতার অযুহাত, স্ত্রীর আত্মপক্ষ সমর্থনের একটি বৈধ অযুহাত যেক্ষেত্রে উহা এরূপ প্রকৃতির হয় যে, ঐ স্ত্রীকে স্বামীর গৃহে ফিরে দেয়া মোটেই নিরাপদ নয়। এরূপ নিষ্ঠুরতা প্রকৃত বল প্রয়োগের মাধ্যমে হতে পারে কিংবা জীবন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার অধিকার ভঙ্গ করে অথবা এরূপ প্রকৃত বল প্রয়োগের যুক্তিসঙ্গত আশংকার মাধ্যমও হতে পারে।

স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে জিনার মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে থাকলে উহা স্ত্রীর পক্ষে এ ধরনের মোকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থনের একটি ভাল উপায়। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে আনিত জিনার অভিযোগ পূর্বেই সরল বিশ্বাসে ফিরে নিয়ে থাকে, তবে দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের ডিক্রি প্রদান করা যাবে। কিন্তু যদি জিনার অভিযোগটি সত্য হয়ে থাকে, তবে আদালত কর্তৃক দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের ডিক্রি প্রদান করতে অস্বীকারের জন্য উহা কোন অযুহাত হতে পারে না, কেননা এরূপ ক্ষেত্রে দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের ডিক্রি প্রদান না করার অর্থ হবে, স্ত্রীর অনৈতিকতার উপর উচ্চ প্রিমিয়াম যোগ করা। যেক্ষেত্রে কোন স্বামীর দু'জন স্ত্রী আছে সেক্ষেত্রে তাকেই প্রমাণ করতে হবে যে, সে দু'জন স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার করছে। যদি সে তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়, তবে সে তার অনুকূলে দাম্পত্য অধিকার পুরুদ্ধারের মোকদ্দমায় কোন সুবিবেচনাপ্রসূত প্রতিকার লাভের অধিকারী নয়।

যদি স্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত কোন তালাক অবৈধ ঘোষণার মোকদ্দমায় দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের ডিক্রি দেয়া হয়, তবে তা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং ইহা আইনে কার্যকর। পরস্পরের মধ্যে বনিবার অভাবকে সঙ্গতকারণ হিসেবে দাবি করে কোন স্ত্রী স্বামীর সাথে বসবাস করতে অস্বীকার করলে ঐ স্ত্রীর বিরুদ্ধে দাম্পত্য অধিকার পুরুদ্ধারের ডিক্রি দেয়া যাবে না।

স্বামী কর্তৃক বিবাহের কথা স্বীকার না করার ফল

বিবাহ স্বীকার না করার মাধ্যমেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে না। ইহা আদালত কর্তৃক অবশ্যই অনুমোদিত হতে হবে। উক্ত অনুমোদনের সময় পর্যন্ত বিবাহটির অস্তিত্ব টিকে থাকবে এবং ইতোমধ্যে বিবাহের কোন একপক্ষের মৃত্যু ঘটলে সে ক্ষেত্রে অপর পক্ষ অর্থাৎ জীবিত পক্ষ মৃত পক্ষের নিকট হতে মিরাসের অংশ গ্রহণ করবে। স্ত্রী লোকটি স্বয়ং তার সাবালকত্বের ইচ্ছাধীন অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে বিবাহের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে বা বিবাহ বর্জন করেছে সে মর্মে একটি স্বত্ব প্রচারের মামলা দায়ের করতে পারে। অথবা স্বামী কর্তৃক দাম্পত্য

অধিকার পুনরুদ্ধারের দাবিতে আনিত মামলায় প্রতিপক্ষ হিসাবে সে বিবাহ বর্জন করার মামলায় স্বীয় পক্ষ সমর্থন করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ইচ্ছাধীন অধিকারটি প্রয়োগ করবার পর যদি স্ত্রী লোকটি স্বামীকে তার সাথে সহবাসের অনুমতি প্রদান করে, তাহলে এই জাতীয় ঘোষণা করা যাবে না।

স্ত্রীর ভরণ- পোষণের ব্যাপারে স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

যতদিন পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে এবং তার যুক্তিসঙ্গত নির্দেশসমূহ পালন করবে, ততদিন যাবত স্ত্রীর ভরণ- পোষণের দায়িত্ব পালন করতে স্বামী বাধ্য। তবে কোন স্ত্রী তার স্বামীর সাথে সহবাস করতে অস্বীকার করলে অথবা অন্যভাবে তার প্রতি অবাধ্য হলে এবং উক্ত অস্বীকৃতি অথবা অবাধ্যতা স্ত্রীর আশু দেনমোহর পরিশোধ না করা কিংবা স্বামীর নিষ্ঠুরতার দরুন স্বামীগৃহ ত্যাগ করবার কারণ দ্বারা সমর্থিত না হলে স্বামী ঐ স্ত্রীর ভারণ- পোষণের দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য নয়।

যথেষ্ট যুক্তসঙ্গত কারণ ব্যতীত স্ত্রী তার স্বামীর সাথে বাস করতে অস্বীকার করলে স্বামী কর্তৃক ভরণ- পোষণ প্রদান করা হয়নি, কিংবা এখনও হচ্ছে না এ অযুহাতে স্ত্রী আনিত মামলায় আদালত বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর করবেন না। মিসেস শিরিন আখতার বনাম জামাল জাত এই মামলায় মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক উপরোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়।

বিবাহে অভিভাবকত্বের দায়িত্ব

কোন নাবালকের জন্য বৈবাহিক চুক্তি সম্পাদনের অধিকার আনুক্রমিকভাবে রয়েছে (১) পিতার (২) দাদার যতই উপরের হউক এবং (৩) অবশিষ্টভোগীদের তালিকায় বর্ণিত মিরাসের ক্রমানুযায়ী পিতার দিকের অন্যান্য পুরুষ জাতির। পিতৃকুল জ্ঞাতিগণের অবর্তমানে অধিকারটি মা, মামা অথবা খালা এবং নিষিদ্ধ ধাপের অন্যান্য মাতৃকুল সম্ভূত জ্ঞাতীগণের উপর ন্যাস্ত হবে। মাতৃকুল সম্ভূত জ্ঞাতীগণের অবর্তমানে, উহা শাসনকারী কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হবে।

আদালত কর্তৃক দেহরক্ষী হিসেবে নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ করা হয়েছে বলে তদ্বারা বিবাহ সংক্রান্ত নাবালকের অভিভাবক কর্তৃক উক্ত নাবালকের বিবাহ দানের ব্যাপারে তার ক্ষমতা শেষ হয়ে যায় না। তবে এ ধরনের ক্ষেত্রে, নাবালকটি আদালতের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হচ্ছে বলে আদালতের অনুমতি বা মঞ্জুরী ব্যতীত উক্ত নাবালককে বিবাহ দেয়া বিবাহ সংক্রান্ত অভিভাবকের উচিত হবে না।[৫]

---

[৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩০- ৩৫

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যাবতীয় ব্যয়ভার সংক্রান্ত নির্দেশ

আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত স্বামী স্ত্রীকে অবহেলা করলে কিংবা স্ত্রীর ভরণ- পোষণ যোগাতে অস্বীকার করলে স্ত্রী স্বীয় ভরণ- পোষণের দাবিতে স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে তবে দাবির বুনিয়াদ কোন সুনির্দিষ্ট চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে অতীত ভরণ- পোষণের জন্য সে ডিক্রি লাভের অধিকারী হবে না। অথবা স্ত্রী ১৯০৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির (৪৮৮ ধারা) মোতাবেক ভরণ- পোষণের নির্দেশ প্রাপ্তির জন্য আদালতের নিকট দরখাস্ত করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আদালত তার ভরণ- পোষণের জন্য অনধিক পাঁচশত টাকার মাসিক ভাতা প্রদানের জন্য স্বামীর উপর নির্দেশ জারি করতে পারেন। মুসলিম আইন অনুসারে আশু দেনমোহর পরিশোধ না করার কারণে স্ত্রী তার অধিকার প্রয়োগ করলে এবং স্বামীর সাথে একত্রে বসবাস করতে অস্বীকার করে ভরণ- পোষণ দাবি করতে পারে। যেখানে ভরণ- পোষণ সংক্রান্ত মামলা দায়ের করা হয়েছে সেক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন ভরণ- পোষণ অস্বীকার করা হবে।

স্ত্রী কর্তৃক মামলা করবার অধিকার

স্বামী যদি সঙ্গতকারণ ব্যতিরেকে স্ত্রীর ভরণ- পোষণ দিতে অস্বীকার করে তবে স্ত্রী তার জন্য মামলা করতে পারে। ইসলামী আইন অনুযায়ী যেমন মামলা চলে তেমন ফৌজদারী কার্যবিধি আইনেও স্ত্রী মামলা করতে পারে।

খোরপোষের অধিকারের মেয়াদ

(ক) স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রী তার খোরপোষের অধিকার হারায়। তখন সে স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়। স্বামীর মৃত্যুর প্রতিপালনকালে স্ত্রী খোরপোষ পায় না। কিন্তু তালাক পরবর্তীকালে ‘ইদ্দতের সময় সে খোরপোষ পায়।

মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের ২ (২) ধারা অনুযায়ী স্বামী যদি দু’বছরের জন্য স্ত্রীকে ভরণ- পোষণ দিতে ব্যর্থ হয় বা অবহেলা করে তবে সে কারণে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করতে পারে।

(খ) সন্তান এবং বংশধরগণ পর্যন্ত পুত্র বালেগ না হয় কিংবা কন্যা বিবাহিত না হয় ততদিন পর্যন্ত পিতা তাকে ভরণ- পোষণ দিতে বাধ্য। তার যে মেয়ে বিধবা হয়েছে বা তালাক প্রাপ্তা হয়েছে। সে মেয়ের ভরণ- পোষণের দায়িত্ব পিতার। তবে সঙ্গতকারণ ছাড়া তার শিশু পুত্র যদি তার সাথে একত্রে বসবাসে অসম্মতি জানায় তবে পিতা তার খোরপোষ দিতে বাধ্য নয়। কন্যাও যদি পিতার কাছে থাকতে চায়, তবে সে খোরপোষ পায় না। বালেগ পুত্র যদি সে একেবারেই অক্ষম হয়, পিতার কাছ থেকে খোরপোষ পেতে হকদার নয়।

পিতা যদি দরিদ্র হয় তবেই কেবলমাত্র সন্তানদের প্রতিপালন করতে বাধ্য। মাতা অসামর্থ্য হলে দাদার উপর এ দায়িত্ব বর্তায়। পৌত্র বা পৌত্রীগণও খোরপোষের দাবি করতে পারে, কিন্তু পুত্রবধূ তার শ্বশুরের কাছে ভরণ-পোষণ চাইতে পারে না।

যার সামর্থ্য আছে সে তার দরিদ্র পিতা মাতাকে, দাদা দাদীকে এবং নানা নানিকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য। উত্তরাধিকারে তাদের যেমন অংশ আছে, ভরণ- পোষণ দেয়ার দায়িত্বও ঠিক তেমন।

দাম্পত্য বিভাগীয় অধিকার পুনরুদ্ধারমূলক মামলা

যেখানে স্ত্রী কোনরূপ আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত তার স্বামীর সাথে একত্রে বসবাস বন্ধ করেছে, সেখানে উক্ত দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে। বিবাহটি স্ত্রীর 'ইদ্দতের সময়কালে অনুষ্ঠিত বা সম্পন্ন বলে অনিয়মিত বিবেচিত হলে দাম্পত্যমিলন ঘটে থাকলেও স্বামী তার বিরুদ্ধে কোন ডিক্রি পেতে পারে না। কিংবা স্ত্রীর নাবালকত্বকালে বিবাহটি সম্পন্ন হওয়ার পর যদি বৈধ ভাবে উহার বিচ্ছেদ ঘটে থাকে তাহলে স্বামী তার বিরুদ্ধে কোন ডিক্রি পেতে পারে না।

পাকিস্তান

দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের বিষয়টি আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতার ব্যাপারে এবং বাদীকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, সে মুক্ত বা পরিষ্কার মনোভাব নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ যেখানে সে দু'জন স্ত্রী গ্রহণ করেছে, সেখানে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, দু'জনকেই সে সমান দৃষ্টিতে দেখছে বা দু'জনের সাথে সে সমান ব্যবহার করছে।

স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন

স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনা হলে উহা দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে ডিক্রি প্রদানে আদালতের অস্বীকৃতির পক্ষে একটি উত্তম যুক্তি বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু অভিযোগটি সত্য হলে এবং স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত থাকাকালে অভিযোগটি আনা হলে সে ক্ষেত্রে দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে ডিক্রি প্রদানের অস্বীকৃতি উত্তম যুক্তি নয়।

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীকে সমাজচ্যুতকরণ

বোম্বের একটি মামলায় যেখানে পক্ষদ্বয় মুসলমান খারওয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, সেখানে এ মর্মে হাই কোর্ট স্ত্রীর বিরুদ্ধে দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের ডিক্রি প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন যে, স্বামী সমাজচ্যুত হওয়ায় স্ত্রী তার সাথে বসবাস করতে বাধ্য নয়।[৬]

---

৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪০- ৪১

বিবাহ বিচ্ছেদ ও তালাক আইন

সকলেই স্বীকার করেন যে, আগেরকালে প্রাচীন আরবদের মধ্যে তালাক প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রচলিত ছিল বলেই ঠিক অবস্থা তুলে ধরা হল না; তালাক ছিল অত্যন্ত সহজ এবং ব্যবহার ছিল যথেচ্ছ এবং অতি সাধারণ। অনেক লেখক বলেছেন ইসলাম পরবর্তী যুগেও এই ধারা অব্যাহত ভাবে চলেছে। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই প্রথাকে দারুণ অপছন্দ করতেন এবং তাঁর আচরণে এই অপছন্দের ভাব বুঝা যেত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হালাল কাজের মধ্যে আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় কাজ হচ্ছে তালাক। আমির আলী বলেন, প্রাচ্য আইনের ইতিহাসে হযরত মুহাম্মদ (সা) এর সংস্কার নিঃসন্দেহে একটি অভিনব ব্যতিক্রম। তিনি এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন এতকাল স্ত্রীরা স্বামীদের যথেচ্ছ তালাকের অধিকারে নিষ্পেষিত হচ্ছিল, তিনি সেই অধিকারকে সংযত করেন। তিনি স্বামীদের বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গতকারণে বিচ্ছেদের অধিকার স্ত্রীদের উপর অর্পণ করেন।

জীবনের শেষের দিকে তিনি এই ব্যাপারে আরও অনেক দূর অগ্রগামী হয়েছিলেন। সালিশ বা কাযীর মাধ্যম ছাড়া তালাকের ব্যবহার প্রায় নিষিদ্ধ করেছিলেন। তাঁর মতে এ প্রথা দাম্পত্য সুখকে ব্যাহত করে এবং ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যতকে অন্ধকারে ঢেকে দেয়। তিনি বলেন, আল্লাহর কাছে তালাকের মত ঘৃণ্য আর কিছুই নেই; তালাকের অনুমতি আছে তবুও সে বিধানকে রাসূলূল্লাহ (সা) এর আদেশ নির্দেশের আলোকে ব্যাখ্যা করা উচিত। ইসলামে ধর্মের সাথে আইন একেবারে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই ইসলামী আইনকে বুঝতে হলে ইসলামের নৈতিক দিককেও মনে রাখতে হবে।

ইসলামে তালাক প্রথা নিয়ে অনেক বক্রোক্তি শোনা যায়। অনেকে বলেন যে, ইসলাম স্ত্রীকে তালাক দেবার যে অবাধ অধিকার স্বামীকে দিয়েছে তা সমর্থনযোগ্য নয়। একমাত্র দেনমোহর পরিশোধের ভার ছাড়া স্বামীকে সংযত রাখার আর কোন ব্যবস্থা ইসলাম রাখেনি। এ অভিযোগ সত্য নয়, তালাক দেয়ার অধিকারের দায়িত্বহীন প্রয়োগের চেয়ে তালাক না দিলেই স্ত্রীদের ভাগ্যে বেশী যন্ত্রনা নেমে আসে। কোন কোন অবস্থায় স্ত্রী যদি স্বামীকে ত্যাগ করবার অধিকার পায়, তবে সে তাকে সত্যিকার অর্থে মুক্তি দেয়। আইন করে সুখ আনা যায় না। দাম্পত্য প্রেমের উৎস আইন নয়। আইনের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনে যখন এমন অবস্থা আসে যে, আর সহ্য হয় না, তখন বিচ্ছেদ ছাড়া আর পথ কি? যখন একে অন্যকে সন্দেহ করে, হিংসা করে তখন সেই সংসারে দু'জনের একত্রে থাকার অর্থ কি? এই অবস্থায় স্ত্রী যদি বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার পায় তবে সে কী তার জন্য নিয়ামত নয়? এ দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, মেয়েরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় এবং পুরুষ জেনেও জানে না।

অধ্যাপক চেশায়রা লর্ড ওয়েস্টবেরির বক্তৃতা উদ্ধৃত করে বলেন, সমাজের ভিত্তিই হচ্ছে বিবাহ। সুতরাং যে আইন বিবাহকে এবং বিবাহ বিচ্ছেদকে নিয়ন্ত্রন করে সেই আইন অতি গুরুত্বপূর্ণ। সভ্য সমাজের অনেক ভিত্তিই দুর্বল হয়ে গিয়েছে। তাই এই ভিত্তিকে আর অবহেলা করা চলেনা। যে আইন তালাকি স্ত্রীর বা স্বামীর তালাক পরবর্তীকালের মর্যাদা সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ না দেয়, সে আইনের সংস্কারের প্রয়োজন আছে। একবার দাম্পত্য জীবন ভেঙ্গে গেলে নতুন করে যারা জীবন শুরু করতে চায়, যে আইন তাদের সেই জীবনের নিরাপত্তা দেয় না, সে আইনের সংস্কার হওয়া উচিত। বিবাহ বিচ্ছেদ নিশ্চয়ই দাম্পত্য একতাকে ধূলিসাৎ করে এবং সে কারণে এটা একটা সামাজিক বিপর্যয়। কিন্তু এই বিপর্যয় অনাবশ্যক নয়। সে মিলন টিকবার নয়, যে মিলন দাম্পতির প্রতিমুহূর্তকে বিষময় করে তোলে সে মিলনকে তালি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা উভয় পক্ষের জন্য ক্ষতিকর। ভবিষ্যতের সুখের দিকে চেয়ে একটা পারিবারিক বিপর্যয়কে মেনে নেয়া সঙ্গত, যে পরিবারে মতৈক্য নেই আছে কেবল সংঘাত সে পরিবারে সন্তানদেরও কোন শান্তি নেই। সুতরাং বিবাহ বিচ্ছেদ থাকতে হবে। শুধু মনে রাখা উচিত যারা বিচ্ছিন্ন হলেন, বিচ্ছেদের পর তারা যেন কোন সামাজিক অমর্যাদায় না ভোগেন।

বিবাহ বিচ্ছেদের শ্রেণিবিভাগ

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইসলামী আইনের বিবাহ বিচ্ছেদকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন

১। আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই, (আদালতের মাধ্যম ছাড়া) স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ

২। আদালতের মাধ্যম ছাড়া পক্ষদ্বয়ের (স্বামী স্ত্রীর) পারস্পরিক সম্মতি দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ

৩। স্বামী অথবা স্ত্রীর যে কোন এক পক্ষের আনিত মামলায় আদালতের ডিক্রি দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ।

এই শ্রেণিবিভাগ মৃত্যুর দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনাকে বিবেচনায় আনেনি। তাই নিম্নবর্ণিত শ্রেণিবিভাগ বাঞ্চনীয়ঃ

(ক) স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়;

(খ) পক্ষ দ্বয়ের কাজের দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে;

(গ) আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে;

(ঘ) স্বামী- স্ত্রী মুবারতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে;

(ঙ) স্বামী- স্ত্রী উভয়ই খুলার মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে;

(চ) নিয়ান দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়;

(ছ) স্ত্রী তালাকে তাফরিজ দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে;

(জ) ইলা দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে;

(ঝ) স্বামী তালাক দিতে পারে;

(ঞ) ফাসক দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়; এবং

(ট) স্বামী জিহার দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে।

খুল বা মুবারত

স্বামী এবং স্ত্রীর ঐকমতের মাধ্যমে ইসলামী আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে। আগের দিনে আরবে বিবাহ বিচ্ছেদের কোন প্রকার অধিকার নারীর ছিল না। আল কুরআন স্ত্রীদের এই অধিকার সর্বপ্রথম অর্পণ করে। ফাতওয়া আলমগীরিতে বলা হয়েছে। যখন স্বামী স্ত্রীদের মধ্যে মতানৈক্য উপস্থিত হয় এবং যখন তারা বুঝতে পারে তাদের পক্ষে আর দাম্পত্য কর্তব্য পালন সম্ভব নয় এবং যখন তাদের মনে আশঙ্কা জাগে যে, আল্লাহর আইনের সংযমের সীমা তারা রক্ষা করতে পারবে না, তখন স্বামীকে কিছু পণ্য দিয়ে স্ত্রী তার কাছ থেকে মুক্তি কিনে নিতে পারে। এভাবে যে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় তাকেই ইসলামী আইনের পরিভাষায় বলা হয় খুলা। খুলার মাধ্যমে যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়, তা প্রত্যাহারযোগ্য নয়।

খুলা এর উপাদানগুলো

(১) স্বামী এবং স্ত্রী ঐকমত্যে আসবে এবং (২) স্ত্রী স্বামীকে কিছু এওয়াজ দিবে। যেক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধন ভেঙ্গে ফেলার উদ্যোগ স্ত্রীর পক্ষ থেকে আসে, সেক্ষেত্রে এই বিচ্ছেদকে বলা হয় খুল। আর যদি উভয় পক্ষের তরফ থেকে উদ্যোগ আসে তবে যে বিচ্ছেদ হয় তার নাম মুবারত। 'খুল' শব্দের অর্থ কাপড় খুলে ফেলা। আইনের পরিভাষায় এই শব্দের অর্থ স্ত্রীর উপর অধিকার ত্যাগ করা। 'মুবারত' শব্দের অর্থ একজন অন্যজনকে যুক্ত করা। খুলের ক্ষেত্রে স্ত্রী মুক্তি ভিক্ষা চায় আর স্বামী কিছু পণ্যের বিনিময়ে তাতে রাজি হয়ে যায়। মুবারতের ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রী দু'জনই চায় বিবাহ বন্ধনের যন্ত্রনা থাকে মুক্তি পেতে।

মুন্সি বজলুর রহিম এর কেসটি খুল সম্পর্কে সবচেয়ে পুরাতন। সে কেসে প্রিভিকাউন্সিল বলে, ইসলামী আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ তালাকের মাধ্যমে হতে পারে। মুসলিম স্বামী তার আপন খেয়াল খুশী মাফিক যে কোন সময় এবং যে কোন অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু তালাক দিতে চাইলে স্ত্রীর দেনমোহর দিতে তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আর খুলের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে স্বামীর

এবং স্ত্রীর মতেই তা হয়, তবে এক্ষেত্রে যেহেতু উদ্যোগ স্ত্রী গ্রহণ করে সেহেতু মুক্তির বিনিময়ে তাকে (স্ত্রীকে) কিছু দিতে হয়। স্বামী স্ত্রী উভয়ে নিজেদের মধ্যে দেনা পাওনার বিন্যাস করতে পারে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রী তার দেনমোহরের দাবি ত্যাগ করে এবং স্বামী তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদে রাজি হয়।

সাম্প্রতিক কালে বিলকিস ফাতিমার কেসে ১০৯ লাহোর হাই কোর্ট এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। লাহোর হাই কোর্ট বলেন। বিচারক যদি মনে করেন যে, স্বামীর সীমানা মেনে চলা সম্ভব নয়, তবে তিনি এই শর্তে বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ দিবেন যে, বিবাহে স্ত্রী যা পেয়েছে তা সে তার স্বামীকে ফেরত দিবে। বিবাহের পণ্য বাবদ স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে যা পেয়েছে সে তা ফেরত দিতে চাইলেও স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার পাবে না। স্ত্রী ক্ষণিক উত্তেজনায় তালাক চাইতে পারে না। তবে আদালতের মতে অবস্থা যখন এরকম দাঁড়ায় যে, আল্লাহ যেভাবে চলতে বলেছেন সেভাবে তারা চলবে না। তবেই তিনি বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ দিবেন। আদালত যদি আশঙ্কা করেন যে, স্ত্রী- স্বামীর দাবি মানবে না এবং দিবে না স্ত্রীর অধিকার তখন এই কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ দিবেন যে ব্যভিচারের চেয়ে তালাক ভাল বিবাহ বন্ধনে টিকে থাকতে দিয়ে অথবা আরো খারাপ হবে, এমন হলে আদালত তখন বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ দিবেন। আল কুরআনের সূরা আল বাকারার ২২৯ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীর দেয়া জিনিসের বিনিময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। কিন্তু স্বামী যদি জেদ করে বিবাহ বিচ্ছেদে অসম্মতি জ্ঞাপন করে, তবে বিবাহ বিচ্ছেদ কী সম্ভব নয়? আল কুরআনের এই আয়াতে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে, স্বামীর অসম্মতিতেও বিচারক এরূপ আদেশ দিতে পারেন। যাদের মধ্যে মিল নেই, তাদের বিবাহ বন্ধন বেধে রাখতে ইসলাম চায়না। স্বামীর বিনা দোষে যদি দাম্পত্য জীবন দুঃসহ হয়ে উঠে তবে মুক্তির বিনিময়ে স্ত্রীকে সে সম্পত্তি ফেরত দিতে হয়, যা সে বিবাহের সময়ে পেয়েছিল। খুরশিদ বিবির কেসে বিলকিস ফাতিমার কেস বিবেচিত হয়। এ কেসে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এস,এ রহমান বলেনঃ পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে এরশাদ হয়েছে, এই তালাক দু'বার। স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যা প্রদান করেছ তন্মধ্যে হতে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নয়। যদি তাদের উভয়ের আশঙ্কা হয় যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোন অপরাধ নাই। এই সব আল্লাহর সীমারেখা। তোমরা উহা লজ্ঘন করো না। যারা সব সীমারেখা লজ্ঘন করে তারাই যালিম। এই আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা যদি আশঙ্কা কর'। এই 'তোমরার' মধ্যে বিচারক আছেন। আল্লাহর সীমারেখা বলতে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব প্রতিপালন বুঝায়। স্বামীর প্রতি ঘৃণাবোধ খুলার জন্য যথেষ্ট। বিখ্যাত মুফাসসির কুরতুবী এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দিল্লীর শাহ ওয়ালিউল্লাহ আরো অগ্রসর হয়ে বলেছেন বিনা কারণে খুলা নেওয়া অনুমোদিত নয় কিন্তু আইন সিদ্ধ। শাওকানী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থের 'খুলা অধ্যায়ে বলেছেন, খুলাকে তালাক বলা যায় না। শা'আরানী তাঁর 'মিজানুল কোবরা'

গ্রন্থে বলেন, স্বামী যদি কুৎসিত হয় কিংবা অসৎ আচরণ করে এবং সে কারণে স্ত্রী যদি স্বামীকে অপছন্দ করে তবে ক্ষতিপূরণ দিয়ে স্ত্রী খুলা চাইতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও স্ত্রীকে এই অধিকার দিয়েছিলেন। স্ত্রীর অপছন্দের কারণে তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন। মুসলিম বিশ্বে বিশেষ করে ইরাক, ইজিপ্ট, তিউনিসিয়া, মরক্কো, জর্ডান, এবং সিরিয়াতে যে কোন ক্ষতির কারণে স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার স্বীকৃত আছে।

বিবাহ বিচ্ছেদের বিভিন্ন পদ্ধতি

স্বামী কিংবা স্ত্রী, যে কোন একজনের মৃত্যুতে একটি মুসলিম বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। দম্পতির জীবদ্দশায় নিম্নলিখিত যে কোন একটি পদ্ধতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটতে পারে।

(ক) স্বামীর কার্য দ্বারা

একজন মুসলিম স্বামী তাহার স্ত্রীর উপর তালাক উচ্চারণ করে তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। ইহা ইলা বা জিহার দ্বারাও করা যেতে পারে।

(খ) স্ত্রীর কার্য দ্বারা

একজন মুসলিম স্ত্রী তার নিজের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাবার স্বাধীন কোন ক্ষমতা নেই, কিন্তু তার স্বামী তাকে এই ক্ষমতা প্রকাশ্য ভাবে দিয়ে থাকলে সে তা করতে পারে।

(গ) পারস্পরিক সম্মতিতে

পারস্পরিক সম্মতিতে খুলা বা মুবারত পদ্ধতিতে।

(ঘ) সম্ভাব্য ঘটনা সাপেক্ষ

যে ক্ষেত্রে স্বামী এই মর্মে কোন অঙ্গীকার করেন যে, যদি কোন একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে, তবে বিবাহটি আপনা আপনিই ভঙ্গ হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে উক্ত ঘটনা ঘটলে বিবাহটি ভঙ্গ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঞ) বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম

লিয়ান, কাসখ এবং খুলার ক্ষেত্রে ভাল কারণের প্রেক্ষিতে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো যায়। স্ত্রী তার মোহরানা দাবি পরিত্যাগ করলে স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক মঞ্জুর করতে অস্বীকার করে, তবে এরূপ কার্যক্রম দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে।[৭]

তালাকের প্রকারভেদ

অনুমোদিত তালাক দু'প্রকারের, যথাঃ

(ক) তালাক- ই আহসান এবং

(খ) তালাক- ই হাসান।

তালাক- ই আহসান

'তালাক- ই আহসান' হল সে তালাক যা স্ত্রীর মাসিক পরবর্তী পবিত্রকালে স্বামী একবার উচ্চারণ করেন এবং তাদের মধ্যে কোনরূপ যৌনমিলন অনুষ্ঠিত না হয় এবং এরূপ 'ইদ্দতের মেয়াদ না হওয়া পর্যন্ত তারা যৌনমিলন থেকে বিরত থাকেন। এই প্রকারের তালাক 'ইদ্দতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অপ্রত্যাহারযোগ্য হবে এবং সে 'ইদ্দতের মেয়াদ হল তিন মাস। স্ত্রী গর্ভবতি হলে সন্তান প্রসব কিংবা তিন মাস অতিক্রম হলে 'ইদ্দতের অবসান ঘটবে।

তালাক- ই হাসান

'তালাক- ই হাসান' হল সে তালাক যা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর মাসিক পরবর্তী পবিত্রকালে একবার উচ্চারিত হয় এবং পরবর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় পবিত্রকালে পর পর তিনবার তালাক ঘোষণার পূণরাবৃত্তি করে যৌনমিলন হতে স্বামী স্ত্রী বিরত থাকেন। এভাবে উচ্চারিত তৃতীয় বারের তালাকটি চূড়ান্ত হয় এবং বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাকটি অপ্রত্যাহারযোগ্য হয়ে যায়। ইমাম মালিক ইহাকে তালাকুস সূন্নাহ বলেই মনে করেন না।

তালাক- ই বিদা

'তালাক- ই বিদা' হল সে তালাক, যেক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীর কোন পবিত্রকালে একাধারে তিন বার তালাক উচ্চারণ করেন অথবা একবারই তালাক উচ্চারণকালে এরূপ শর্ত আরোপ করেন যে, এই একবারের

---

[৭] এম. মনিরুজ্জামান, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন (ইসলামিক আইন)*, ধানসিঁড়ি পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১ম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০৪, ৮ম সংস্করণ জানুয়ারী ২০১৩, পৃ.২৫৯- ৬৪

উচ্চারণকেই তিন বার বলে গণ্য করতে হবে। যেমন কোন স্বামী বলেন ‘‘আমি তোমাকে তিন তালাক দিলাম। অপ্রত্যাহারযোগ্য তালাক একবার উচ্চারণ করলেই তা তালাক- ই বিদা হয়ে যাবে। ইহা অবিলম্বে কার্যকরি হয় এবং তা অপ্রত্যাহারযোগ্য। স্ত্রীর মাসিক চলাকালীন সময়েও এরূপ তালাক উচ্চারণ করতে বাধ্য হয় নাই। শিয়া আইনে এরূপ তালাক স্বীকৃত নেই।

তালাকের ধরন এবং মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ

তালাকের বিভিন্ন ধরন আলোচনা করলে প্রতিয়মান হয় যে, ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৭ ধারার মাধ্যমে তালাক- ই হাসান এবং তালাক- ই আহসানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এক প্রকার তালাক পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে বলবৎ করা হয়েছে। ‘ইদ্দতের মেয়াদ শেষ হলে তালাক- ই আহসান অপ্রত্যাহারযোগ্য হওয়ার জন্য কমপক্ষে ৯০ দিন বা ইহার কাছকাছি সময় প্রয়োজন এই অর্থে মুসলিম আইনে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। পক্ষান্তরে এই অধ্যাদেশ দ্বারা তালাকের বিভিন্ন ধরনকে একত্রিত এবং কার্যকর করা হয়েছে। এই অধ্যাদেশ দ্বারা কেবলমাত্র যা মৌখিকভাবে উচ্চারণের পরই কিংবা এক টুকরা কাগজ অথবা অন্য কিছুর উপর লিখিত হলে যা বেদা- ই তালাক অর্থাৎ তালাক- ই বিদা আক্রান্ত হয়েছে। এখন ঐ প্রকৃতির তালাকও ৯০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর কার্যকরি হবে।

তালাক শেষে পক্ষদ্বয়ের অধিকার ও দায়িত্ব

যে পদ্ধতিতেই তালাক হোক না কেন, তালাক সম্পূর্ণ না হলে নিম্নলিখিত অধিকার ও দায়িত্বের সৃষ্টি হয়।

১। অন্য বিবাহ করার অধিকার

দাম্পত্য মিলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলে ‘ইদ্দতের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর স্ত্রী অপর একজন স্বামী গ্রহণ করতে পারে। আর না হয়ে থাকলে এবং তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ‘ইদ্দতের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর স্বামী অপর একজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে।

২। দেনমোহর তৎক্ষণাৎ দিতে হবে

দাম্পত্য মিলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলে স্ত্রী স্বামীর নিকট হতে তাৎক্ষণিক এবং বিলম্বিত দেনমোহরের পুরাটাই পাবার অধিকারিণী হবে। দাম্পত্য মিলন অনুষ্ঠিত না হয়ে থাকলে এবং চুক্তির মধ্যে দেনমোহরের পরিমাণ উল্লেখিত থাকলে, স্ত্রী উল্লেখিত দেনমোহরের অর্ধাংশ পাবার অধিকারিণী হবে। আর যদি দেনমোহরের পরিমাণ নির্দিষ্ট না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে স্ত্রী মাত্র তিনটি পোশাক উপহার পাবে।

মুসলিম পারিবারিক আইনে তালাক উত্তর দেনমোহর

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ১০ ধারায় নিম্নরূপ বিধান রয়েছে। যেখানে কাবিননামায় দেনমোহর পরিশোধের পদ্ধতি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নাই, সেখানে চাহিবা মাত্র সমগ্র অর্থ দেয় বলে ধরে নিতে হবে। ইহাতে তালাকোত্তর কথা উল্লেখিত না থাকলেও তালাকের ক্ষেত্রে দেনমোহরের সমস্ত অর্থ পরিশোধ করতে হবে সন্দেহ নাই। স্ত্রী স্ব- ধর্ম ত্যাগের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে, দাম্পত্য মিলন হয়ে থাকলে স্ত্রী দেনমোহরের সমস্ত টাকা পাবার অধিকারিণী হবে।

বাধ্য হয়ে তালাক দান

স্বামী কর্তৃক তালাকের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি “প্রকাশ্য ভাবে স্পষ্ট” হলে (ধারা ৩১০), এবং ইহা বাধ্য হয়ে ঘোষিত হলেও অথবা ইচ্ছাকৃত মদ্যপানরত অবস্থায় তালাক ঘোষিত হলেও অথবা পিতা কিংবা অন্য কাকেও সন্তুষ্ট বা খুশি করার নিমিত্ত ইহা ঘোষিত হলেও উক্ত তালাক বৈধ হবে। স্থির হয়েছে যে, হানাফি আইন অনুযায়ী বাধ্য হয়ে অথবা উপহাস করে তালাকের ঘোষণা করলে, ইহা উচ্চারিত হবার পরপরই কার্যকরি ও অপরিবর্তনীয় হবে।

তালাকের অর্পিত ক্ষমতা

তালাক দিবার অধিকার যদিও প্রধানত স্বামীরই, তবুও স্বামী পরিপূর্ণ ভাবে কিংবা শর্ত সাপেক্ষে, কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা স্থায়ী ভাবে তালাক প্রদানের ক্ষমতা স্ত্রীকে বা অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে প্রদান করতে পারেন। ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি তখন সেই অনুযয়ীয়ী তালাক দিতে পারে। অস্থায়ী ভাবে তালাকের ক্ষমতা প্রদান করা হলে তা অপরিবর্তনীয় হবে, কিন্তু স্থায়ী ভাবে ক্ষমতা প্রদান রদ হতে পারে।

তালাক- ই তৌফিজ

(অর্পিত ক্ষমতার তালাক) স্বামী নিজে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারেন বা তালাক দিবার তৃতীয় ব্যক্তিকে অথবা স্ত্রীকেও ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন। এই জাতীয় ক্ষমতা অর্পণকে ‘তাওফিজ’ বলে। “যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে বলে, ‘তুমি আজই’ অথবা ‘এই মাসের মধ্যে’ অথবা ‘এক বছরের মধ্যে’ তোমার রাস্তা দেখে নাও’ তখন স্ত্রী উক্ত সময়ের যে কোন সময়ে তার এই অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।[৮]

---

[৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫- ৭৭

বিবাহ বিচ্ছেদ তালাক সম্পর্কিত ধারা সমূহঃ

(ধারা ৩৩২) তালাকের সংজ্ঞা

স্বামী কর্তৃক সরাসরি অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে নির্দিষ্ট বাক্যে অথবা ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ অথবা পরিণামে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করাকে ‘তালাক’ বলা হয়।

(ধারা ৩৩৩) তালাকের শ্রেণিবিভাগ

(ক) পদ্ধতিগত দিক হতে তালাক দু’প্রকার ১। সুন্নাত তালাক ও ২। বিদ’ঈ তালাক।

(খ) ফলাফলের দিক হতেও তালাক দু’প্রকার ১। রিজ’ঈ তালাক ও ২। বায়ন তালাক।

(গ) সুন্নাত তালাক আবার দু’প্রকার ১। আহসান তালাক ও ২। হাসান তালাক।

(ঘ) বাইন তালাকও দু’প্রকার ১। বাইন তালাক সুগরা ও ২। বাইন তালাক কুবরা (বা মুগাল্লাযা তালাক।)

(ধারা ৩৩৪) সূন্নাত তালাক

মহানবী (সা) ঠিক যে সময় এবং যে পদ্ধতিতে তালাক দিতে শিক্ষা দিয়েছেন তদনুরূপ তালাককে সূন্নাত তালাক বলে।

(ধারা ৩৩৫) আহসান তালাক

যে তুহরে সহবাস হয় নাই এবং ইহার পূর্ববর্তী তুহরেও তালাক দেয়া হয় নাই সে অবস্থায় স্ত্রীকে এক রিজ‘ঈ তালাক প্রদানের পর ‘ইদ্দাত পূর্ণ হতে অথবা গর্ভ খালাস হতে দিলে ইহাকে আহসান তালাক বলে।

(ধারা ৩৩৬) হাসান তালাক

সহবাস বর্জিত তুহরে স্ত্রীকে এক রিজ‘ঈ তালাক দেয়ার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তুহরে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক প্রদানকে হাসান তালাক বলে।

(ধারা ৩৩৭) বিদ‘ঈ তালাক

স্বামী তার স্ত্রীকে একই তুহরে এক বা একাধিক শব্দে একাধিক তালাক দিলে অথবা সহবাসকৃত তুহরে এক তালাক দিলে উহাকে বিদ‘ঈ তালাক বলে।

(ধারা ৩৩৮) রিজ'ঈ তালাক

তালাক শব্দ উচ্চারণ পূর্বক স্বামী স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দিলে এবং ইহার সাথে বাইন শব্দ যোগ না করলে ইহাকে রিজ'ঈ তালাক বলে। স্ত্রীকে 'ইদ্দত চলাকালে ফিরিয়ে না দিলে 'ইদ্দাত শেষে ইহা বাইন তালাকে পরিণত হবে।

(ধারা ৩৩৯) বাইন তালাক সুগরা

তালাক শব্দের সাথে 'বাইন' শব্দ যোগ করে স্ত্রীকে এক অথবা দুই তালাক প্রদান করলে উহাকে 'বাইন তালাক সুগরা' বলে।

(ধারা ৩৪০) বাইন তালাক কুবরা

(মুগাল্লাযা তালাক) একই সময়ে অথবা বিভিন্ন সময়ে এক বা একাধিক শব্দে স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করলে উহাকে বাইন তালাক কুবরা বা মুগাল্লাযা তালাক বলে।

(ধারা ৩৪১) তালাকের সংখ্যা

কোন স্বামী তার স্ত্রীকে সর্বাধিক তিন তালাক দিতে পারবে।

(ধারা ৩৪২) তালাকের যোগ্যতা

প্রত্যেক সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন বালেগ ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে।

(ধারা ৩৪৩) তালাকের পদ্ধতি

সুস্পষ্ট বাক্যে অথবা পরোক্ষ বক্তব্যে অথবা ইশারা ইঙ্গিতে অথবা লিখিতভাবে প্রদত্ত তালাক সংঘটিত হবে।

(ধারা ৩৪৪) তালাকের সাক্ষী

তালাক সংঘটিত হওয়ার জন্য সাক্ষী শর্ত নহে।

(ধারা ৩৪৫) তাফবিয তালাক

স্বামী তার তালাকের অধিকার স্ত্রীর উপর অর্পণ করতে পারে এবং স্ত্রী এ অধিকার বলে নিজেকে তালাক প্রদান করলে উক্ত তালাককে তাফবিয তালাক বলে।

(ধারা ৩৪৬) যাদের প্রদত্ত তালাক কার্যকর হয় না

নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রদত্ত তালাক, তালাক নয় (ক) নাবালেগ (খ) পাগল (গ) জড়োবুদ্ধি যুক্ত ব্যক্তি (ঘ) বেহুশ (ঙ) বুদ্ধি লোপ প্রাপ্ত ব্যক্তি (চ) ঘুমন্ত ব্যক্তি ও (ছ) রোগের প্রকোপে পাগল ব্যক্তি।

(ধারা ৩৪৭) নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তালাক

মাতাল অবস্থায় তালাক দিলে তা কার্যকর হবে; কিন্তু হালাল জিনিস বা ঔষধের প্রতিক্রিয়াতে মাতাল হয়ে তালাক প্রদান করলে তা কার্যকর হবে না।

(ধারা ৩৪৮) মৃত্যুব্যাধিগ্রস্থ অবস্থায় তালাক

মৃত্যুব্যাধিগ্রস্থ অবস্থায় তালাক প্রদান করলে তা কার্যকর হবে এবং ‘ইদ্দত কালের মধ্যে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তার ওয়ারিশ হবে।

(ধারা ৩৪৯) জোরপূর্বক তালাক

কোন ব্যক্তিকে বল প্রয়োগে বা ভীতি প্রদর্শন করে নিজ স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য করলে তা কার্যকর হবে না; তবে হানাফি মতে কার্যকর হবে।

(ধারা ৩৫০) মুমূর্ষু অবস্থায় তালাক

উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে মুমূর্ষু অবস্থায় প্রদত্ত তালাক কার্যকরি হবে, কিন্তু যদি স্বামী ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রী ইদ্দত পালনরত থাকে তবে সে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে না।

(ধারা ৩৫৪) যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয় নাই তাকে তালাক দিলে

যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয় নাই তাকে এক বাক্যে তিন তালাক দিলে উহা তৎক্ষণাৎ কার্যকর হবে এবং তাহলীল ব্যতীত উভয়ের পুনর্বিবাহ বৈধ হবে না। অবশ্য এক এক বা দুই তালাক দেয়া হলে প্রথম তালাকেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, তবে এই অবস্থায় উভয়ে তাহলীল ব্যতীত পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হতে পারে।

(ধারা ৩৫৫) খোলার সংজ্ঞা

স্ত্রীর ইচ্ছার ভিত্তিতে তৎকর্তৃক প্রদত্ত মালের বিনিময়ে সমঝোতায় স্বামী ‘খোলা’ বা অনুরূপ অর্থবোধক শব্দের প্রয়োগে তাকে বিবাহ বন্ধন হতে মুক্ত করলে উহাকে ‘খোলা’ বলে।

(ধারা ৩৫৬) খোলার বিনিময়ের পরিমাণ

মহরের সমপরিমাণ অথবা উহার কম বেশী পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে স্বামী তার স্ত্রীকে খোলা তালাক দিতে পারে।

(ধারা ৩৬১) মুবারাত

স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সংঘটিত তালাককে 'মুবারাত' বলে। ইহার দ্বারাও এক বাইন তালাক সংঘটিত হয়।

(ধারা ৩৬৮) স্বামীর কারাদণ্ড

কোন অপরাধের শাস্তি স্বরূপ সাত বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ড হয়ে থাকলে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য মামলা দায়ের করতে পারে কিন্তু কারাদণ্ডের রায় প্রদান চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত আদালত স্ত্রীর মামলায় ডিক্রি প্রদান করবে না।

(ধারা ৩৬৯) ধর্ম ত্যাগের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ

স্বামী স্ত্রীর কোন একজন ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে ইহাতে সরাসরি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

(ধারা ৩৭০) ঈলা

যদি কোন স্বামী শপথ করে যে, সে তার স্ত্রীর সাথে চার মাস বা উহার অধিক কাল সহবাস করবে না এবং সহবাস হতে বিরত থাকে তবে চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর উহা এক বাইন তালাকে পরিণত হবে।

(ধারা ৩৭১) যিহার

স্বামী যদি স্ত্রীকে তার মায়ের সাথে অথবা কোন চিরস্থায়ী মুহরিম মহিলার সাথে তুলনা করে, তাহলে যে পর্যন্ত না সে ইহার জন্য অনুতপ্ত হয়ে কাফফারা দেয় সে পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে তার মেলামেশা করা হারাম।

(ধারা ৩৭২) লি'আন

আদালতের সামনে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের বিরুদ্ধে লি'আন করলে আদালত তৎক্ষণাৎ তাদের বিবাহ ভেঙ্গে দিবে।

(ধারা ৩৭৩) 'ইদ্দাতের সংজ্ঞা

তালাক অথবা মৃত্যুজনিত কারণে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হওয়ার পর যে সময়সীমার মধ্যে কোন নারী পুণরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না তাকে 'ইদ্দত' বলে।

(ধারা ৩৭৪) ইদ্দাত পালন বাধ্যতামূলক

নিম্নলিখিত অবস্থায় নারীর 'ইদ্দত পালন বাধ্যতামূলক। (ক) ধারা (২৬৬) মোতাবেক বৈধ (সহীহ) বিবাহের ক্ষেত্রে সহবাস অথবা ধারা (২৩) মোতাবেক নির্জনে মিলনের পর বিবাহ বিচ্ছেদ হলে; (খ) ধারা (২৬৯) মোতাবেক অনিয়মিত (ফাসিদ) বিবাহের ক্ষেত্রে সহবাস বা নির্জনে মিলনের পর বিবাহ বিচ্ছেদ হলে।[৯]

---

[৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭- ৮৪

দেনমোহর আইন

দেনমোহরের সংজ্ঞা

দেনমোহর হল কিছু অর্থ বা অন্য কোন সম্পত্তি বিবাহের বদৌলতে স্ত্রী স্বামীর কাছ হতে পাওয়ার অধিকারী হয়। বিবাহ চুক্তির অনুষঙ্গ স্বরূপ, অর্থ কিংবা অন্য সম্পত্তি যা স্ত্রী পাওয়ার অধিকারী হয়, ইহাকে দেনমোহর বলে।[১০] মুল্লা ইহাকে বিবাহের বিনিময়মূল্য (Consideration) বলেছেন।[১১] বিবাহের দেনমোহরের চুক্তিকে বিক্রি করার চুক্তির সঙ্গে প্রায় তুলনা করা হয়। স্ত্রীকে দত্ত দ্রব্য এবং দেনমোহরকে তার মূল্য হিসেবে বিচার করা হয়।১২ আরবের আইনবিদগণ কখনো কখনো ঐরকম তুলনা করেন।[১৩] আবার স্ত্রীকে ব্যবহার করার জন্য, কিংবা স্ত্রী অঙ্গের মূল্যস্বরূপ[১৪] উহা প্রদান করা হয়, এরূপ মতও কেউ কেউ পোষণ করেন। কিন্তু ইহা ধার্য হয়েছে যে, দেনমোহর স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে বিবাহের বিনিময়মূল্য হিসেবে প্রদান করা হয় না। ইহা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর সম্মানার্থে আইন কর্তৃক আদিষ্ট কর্তব্য হিসেবে প্রদান করা হয়।

প্রতিদান

প্রতিদান শব্দটি ঠিক চুক্তি আইনে ব্যবহৃত শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয় না। মুসলিম আইন অনুযায়ী, দেনমোহর স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্বরূপ স্বামীর প্রতি অর্পিত একটি দায়িত্ব মাত্র। আসাদ বনাম সালমা মামলায় বিচারপতি আসাদুজ্জামান বলেন যে, দেনমোহরকে বিচার চুক্তির মূল্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে; কারণ বিবাহ একটি দেওয়ানি চুক্তি এবং বিক্রয় হল একটি রূপক বা প্রতিরূপ চুক্তি, যা মুসলমান আইনবেত্তাগণ কর্তৃক সমতা বা সদৃশ্য হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। দেনমোহরটি যদি স্ত্রীর মূল্য হয়, তাহলে ইহা পরিশোধের ব্যাপারে বিবাহোত্তর চুক্তিটি অবৈধ কারণ, ইহাতে প্রতিদানের অভাব রয়েছে; কিন্তু এই জাতীয় চুক্তি বৈধ ও আইনে বলবৎ যোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

নির্ধারিত দেনমোহর

দেনমোহরের জন্য কোন সবোর্চ্চ পরিমাণ অর্থ নির্ধারিত নাই। দেনমোহর হিসেবে যে কোন পরিমাণ অর্থ নির্ধারিত হতে পারে। যদিও তা স্বামী কর্তৃক পরিশোধের ক্ষমতার বাহিরে, কিন্তু কোন অবস্থায়ই আইনে নির্ধারিত পরিমাণের কম হতে পারবে না। হানাফি মাযহাব অনুসারে দেনমোহরের ন্যুনতম পরিমাণ হল দশ দিরহাম; মালিকি মাযহাবের আইনে তিন দিরহাম; শাফি'ঈ মাযহাবের আইনানুযায়ি কোন বস্তুর খরিদ বা বিক্রির মূল্য হিসেবে যা আইনসঙ্গত তাই দেনমোহর আইনসঙ্গত। হাদীসে উল্লেখিত সর্বনিম্ন পরিমাণ হল একটি লোহার আংটি। কিন্তু মোহরানার এই সকল সর্বনিম্ন পরিমাণ বর্তমানে সেকেলের হয়ে পড়েছে এবং বর্তমানে মোহরানার পরিমাণ নির্ধারিত স্বামী ও স্ত্রী অন্যান্য বিষয়াদি ও অবস্থার বিবেচনার উপর নির্ভর

---

[১০] Baillee 191.

[১১] Mulla 9. 28

[১২] Saburun Nessa V. Sabu 1934 Cal. 609, P.694.

[১৩] Abdul Kadir. V. Salma 8. All. 149, P. 198.

[১৪] Jung: *Muslim Law of Marriage.* P. 28, Hed 44, Baillee 11, 70 f. n.

করে, যেমন স্বামীর উপর ন্যাস্ত ক্ষমতা বলে স্বামী যাতে স্বেচ্ছাচারীভাবে স্ত্রীকে তালাক দিতে না পারে। ইহার কৌশল হিসেবে মোহরানার পরিমাণ নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা; স্ত্রীর পৈতৃক পরিবারের অবস্থা, স্ত্রীর বুদ্ধিবৃত্তিগত সফলতা বা ব্যক্তিগত যোগ্যতা, স্বামীর সম্পদ, স্ত্রীর চতুর্দিকস্থ সামাজিক অবস্থান এবং পক্ষগণের আত্নগৌরব প্রকাশের ইচ্ছা ও অহংকাররোধের উপর নির্ভর করে। তবে দেনমোহরের পরিমাণ বিবাহের পূর্বে, বিবাহের সময় কিংবা বিবাহের পরে নির্ধারণ করা যাবে। বিবাহ বলবৎ থাকাকালীন যে কোন সময় মোহরানার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাবে। স্বামী নিজের উদ্যোগেই তা বাড়াতে পারেন।

মোহরানা পরিশোধ একটি বাধ্যতামূলক দায়, যা বিবাহের ফলশ্রুতিতে জন্ম নেয় বিবাহটি যৌনকর্ম দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে থাকলে মোহরানার সমগ্রটাই পরিশোধ্য হয়। স্ত্রী তার জীবদ্দশা কিংবা পুণঃবিবাহ না হওয়া পর্যন্ত সময়ে স্বামীর কোন সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে এই শর্তে কোন সম্পত্তি স্ত্রীর নামে হস্তান্তর করে কোন স্বামী মোহরানা পরিশোধ করতে পারেন না। স্ত্রী তার মোহরানার পরিবর্তে স্বামীর কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করলে স্বভাবতই ইহা একটি চূড়ান্ত হস্তান্তর। অতএব, যেক্ষেত্রে উপরোক্ত কোন শর্ত সাপেক্ষে কোন হস্তান্তর অনুষ্ঠিত হয়, সে ক্ষেত্রে সে শর্তটি বাতিল এবং স্ত্রী চূড়ান্ত রূপেই সম্পত্তিটি গ্রহণ করেন। চুক্তিকৃত মোহরানার পরিমাণ অতিরিক্ত বা উহা স্বামীর পরিশোধের ক্ষমতার বাহিরে এরূপ কোন যুক্তি স্ত্রীর দাবির মোকাবেলায় কোন অযুহাত নয়। কোন কোন স্থানে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং আত্নম্ভরিতার জন্য অস্বাভাবিক পরিমাণ মোহরানা ধার্য করা হয় যা পরিশোধের ইচ্ছা কোন পক্ষেরই তখন থাকে না। এরূপক্ষেত্রে উচ্চ পরিমাণ মোহরানা নির্ধারণের প্রথা প্রচলিত থাকার কারণে আদালত মিসাল বা প্রচলিত মোহরানা মঞ্জুর করবেন। নির্ধারিত পরিমাণ মোহর নয়।
যেক্ষেত্রে শুধু মানুষকে দেখানোর জন্য অতিরিক্ত পরিমাণ ধার্য্য করা হয়, সেক্ষেত্রে আদালত উপযুক্ত মোহরানা মঞ্জুর করবেন। তবে ইহা কেবল তখনই করা যাবে যখন দেখা যাবে যে, একটি ক্ষুদ্র পরিমাণকে প্রকৃত মোহরানা রেখে একটি কাল্পনিক বেশী পরিমাণ মোহরানা ঘোষণার রেওয়াজ কোন এলাকায় প্রচলিত আছে। যদি এরূপ রীতি প্রচলিত না থাকে, তবে যেই পক্ষ এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন সেই পক্ষকেই প্রমাণ করতে হবে যে, পক্ষগণের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পরিমাণ মোহরানা হিসেবে ধার্য হয়েছিল। যা কোন কাবিননামা বা দলিল সম্পাদিত হয়, তবে কাবিননামায় উল্লেখিত পরিমাণ মোহরানা পরিশোধের ব্যাপারে পক্ষগণের কোন ইচ্ছা ছিল না এই বিষয়টি প্রমাণের জন্য মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

অনির্ধারিত দেনমোহর

বিবাহ হলেই দেনমোহর দিতে হবে। ধনী হোক, বালেগ হোক, নাবালেগ হোক, তরুণ হোক, বৃদ্ধ হোক, যেখানেই বিবাহ সেখানেই দেনমোহর। স্বামীকে সব অবস্থাতেই দেনমোহর দিতে হবে। আইন তার কাঁধে এই দায় চাপিয়েছে। এই দায় থেকে বাধ্য। আর্থিক অবস্থায় না কুলালেও আদালত স্বামীকে রেহাই দেবে না। দেনমোহর দায় বড় কঠিন দায়। দেনমোহর নির্ধারিত না থাকলে স্ত্রী তবুও দেনমোহর পাবে। সে দেনমোহরকে বলা হয় অনির্ধারিত দেনমোহর বা 'আল মাহরুল মিসিল'। এই দেনমোহর স্ত্রীর পিতার সামাজিক মর্যাদা এবং

স্ত্রীর গুণের উপর নির্ভর করে। এখানে স্বামীর সামাজিক মর্যাদা বা আর্থিক সঙ্গতির প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। হিদায়ার মতে পাত্রীর বয়স, সৌন্দর্য, সম্পদ, জ্ঞান বিদ্যা এবং চরিত্র দেনমোহর নির্ধারণের সময় বিবেচনা করতে হয়। স্ত্রী যে পরিবার থেকে আসে পরিবারের অন্যরা যে পরিমাণ দেনমোহর বা কুফু পায়, দেনমোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেটা বিবেচনা করা হয়। হানাফিদের মতে দশ দিরহাম এর কম পাঁচশত দিরহামের বেশী দেনমোহর হতে পারে না। কারণ সেটাই ছিল রসূল তনয়া ফাতিমা (রা) এর দেনমোহর। শিয়াদের মতে দেনমোহর তিন রকম হতে পারে

(১) আল মাহরুস সূন্নাত অর্থাৎ যে দেনমোহর হাদীস কর্তৃক সমর্থিত এবং যার পরিমাণ পাঁচশত দিরহাম

(২)আল মাহরুল মিসিল অর্থাৎ সেই দেনমোহর যা সমপর্যায়ের পাত্রী পায়।

(৩) আল মাহরুল মুসাম্মা বা নির্ধারিত দেনমোহর।

সুতরাং দেখা যায় যে, স্ত্রীর মর্যাদার সাথে সমতা রেখে দেনমোহরের পরিমাণ নির্ধারণের ব্যবস্থা ইসলাম করেছে। যে সামাজিক স্তরে সে জন্মেছে এবং প্রতিপালিত হয়েছে সে সামাজিক মর্যাদা স্ত্রী যেন বজায় রাখতে পারে, সে জন্য দেনমোহরের এই গ্যারান্টি।

দেনমোহর কমানো বা মওকুফের অধিকার

বালেগ স্ত্রী তার প্রাপ্য দেনমোহর কমাতে পারে। সে সমস্ত দেনমোহরও মাফ করে দিতে পারে। তবে কোন প্রশ্ন উঠলে আদালত দেখবেন কি পরিস্থিতিতে স্ত্রী দেনমোহর হ্রাস বা মওকুফ করে দিয়েছিল। স্ত্রী যদি বুঝবার ক্ষমতা সে সময় না থাকে বা সে সময় যদি তার স্বাধীন পরামর্শ পাবার সুযোগ না থাকে তবে তার রেয়াত বা মওকুফ গ্রাহ্য হয় না।

মোহরানা আদায়

দেনমোহর সর্বাবস্থায় স্বামীর ঋণ। এই ঋণের পিছনে কোন জামানত নেই। এই ঋণ আদায়ের জন্য নালিশ চলে; অন্যান্য জামানতহীন ঋণের মতই এর গুরুত্ব। বেঁচে থাকলে স্ত্রী নিজেই তার মৃত স্বামীর সম্পত্তি থেকে এই দেনা আদায় করতে পারে। আর স্বামীর আগে যদি সে মারা যায় তাহলে স্ত্রীর ওয়ারিশগণ তার দেনমোহর পেতে হকদার হয়। বলা বাহুল্য, তার স্বামীও একজন ওয়ারিশ। স্বামী যদি স্ত্রীকে টাকা দেয়, একবার নয় অনেকবার, তবুও ধরে নেয়া যাবে না যে, এই টাকা তার দেনমোহরের জন্য দেয়া হচ্ছে।[১৫]

---

[১৫] এম. মনিরুজ্জামান, *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন (ইসলামিক আইন)*, ধানসিঁড়ি পাবলিকেশন্স, ঢাকা: ১ম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০৪, ৮ম সংস্করণ জানুয়ারী ২০১৩, পৃ. ২৪২- ৪৪

ন্যায্য বা উপযুক্ত দেনমোহর

যদি দেনমোহরের অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট না হয়ে থাকে, কোন মোহরানা পরিশোধ করা হবে না অথবা যখন কোন মোহরানার পরিমাণ ধার্য করা না হয় তখন সেই বিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রী ন্যায্য বা উপযুক্ত পরিমাণ মোহরানা পাওয়ার অধিকারী হন। কারণ মোহরানা পরিশোধের দায় পক্ষগণের মধ্যকার মোহরানা পরিশোধ না করা মর্মে কোন চুক্তির উপর নির্ভর করে না। মোহরানা হল মুসলিম বিবাহের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং ইহা যদি বিবাহের সময় অনির্ধারিত থাকে, তবে তাহা অবশ্যই কোন স্পষ্ট নীতিমালা দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে। ন্যায্য মোহরানার পরিমাণ স্ত্রী লোকটির পরিবারের সামাজিক অবস্থান তার স্বামীর সম্পদ, তার নিজের ব্যক্তিগত যোগ্যতা হিসেব করার ক্ষেত্রে স্বামীর পদমর্যাদা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। স্ত্রী লোকটির পৈতৃক আত্নীয় স্বজনদের বিবাহের ক্ষেত্রে পরিশোধিত মোহরানার গড় পড়তা পরিমাণ হিসাব করে আদালতকে ন্যায্য মোহরানা ধার্য করা উচিত। তবে স্ত্রীর চেহারার সৌন্দর্য, শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত যোগ্যতাও এই সাথে বিবেচনা করতে হবে।

আশু এবং বিলম্বিত দেনমোহর

দেনমোহরের অর্থ দুই অংশে বিভক্তঃ

(১) একটিকে 'আশু' দেনমোহর বলা হয় যা চাহিবামাত্র পরিশোধযোগ্য এবং

(২) অপরটিকে 'বিলম্বিত' দেনমোহর যা মৃত্যু অথবা তালাকের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদের উপর পরিশোধযোগ্য।

দাম্পত্য মিলনের পূর্বে অথবা পরে যে কোন সময়ে স্ত্রী কর্তৃক আশু দেনমোহর আদায় করতে পারে। তৎক্ষণাৎ প্রদান করা হল না বলেই পরে প্রদত্ত দেনমোহরকে বিলম্বিত দেনমোহর বলা যেতে পারে, তবে স্ত্রী কর্তৃক দাবি না করা পর্যন্ত যদি উহা মুলতবি বা স্থগিত থাকে, তাহলে আইনত উহা আশু দেনমোহর বলে গণ্য হবে। কিন্তু কেবল স্ত্রী চেয়েছে বলেই বিলম্বিত দেনমোহরটি আশু দেনমোহর হতে পারে না।

পাকিস্তান

চাহিবামাত্র 'আশু' দেনমোহর ঋণে পরিণত হয় এবং উহা প্রদানে স্বামীকে বাধ্য করে। 'আশু' দেনমোহর পরিশোধ না করা পর্যন্ত স্ত্রী তার স্বামীর সাথে একত্রে বাস করতে অস্বীকার করতে পারে।

পিতৃ কর্তৃক দেনমোহরের চুক্তি সম্পাদন

নাবালক পুত্রের পক্ষে তার পিতা দেনমোহর সম্পর্কে চুক্তি করতে পারেন এবং ইহা পুত্রের উপর বাধ্যতামূলক বলে গণ্য হবে, যদিও চুক্তিটি বিবাহের পরে পুত্রের নাবালকত্ব বহাল থাকার সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যদি তার শিশু পুত্রের বিবাহে অভিভাবক হিসেবে কাজ করেন, তখনও তিনি ব্যক্তিগত ভাবে মোহরানার জন্য দায়ী হবে না। যদি না তিনি চুক্তিকৃত মোহরানার জন্য স্পষ্টত জামিনদার হন; অন্যথায় পিতা শুধুমাত্র নাবালক পুত্রের পক্ষে কাজ করেছেন এবং পুত্রকে বাধ্য করেছেন এবং তার নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে নহে।

মোহরানার প্রতি বিধবা স্ত্রীর অধিকার

মোহরানা ঋণের সমতুল্য এবং ইহা একটি অরক্ষিত ঋণ। ইহা স্বামীর সম্পত্তিতে কোন দায় সৃষ্টি করে না। তবে স্ত্রী অন্যান্য পাওনাদারগণের সাথে স্বামীর মৃত্যুতে তার ভূ সম্পত্তি হতে এ মোহরানা আদায় করে নেয়ার অধিকারী হবেন। যদি অন্য পাওনাদার না থাকে, তবে স্ত্রী তার মোহরানা আদায় না হওয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র দখলে রাখতে পারেন। স্ত্রীর অধিকার এরূপ ক্ষেত্রে অন্য একজন অরক্ষিত পাওনাদারের চেয়ে কোন অংশেই বেশী নহে, কেবলমাত্র ইহা ছাড়া যে, একজন বিধবা স্ত্রী মোহরানার জন্য তার স্বামীর দখলে রাখার অধিকারী। মোহরানার ঋণ আইনত কোন দায় নহে, যদি না এই মর্মে কোন চুক্তি থাকে। একজন মুসলিম বিধবার মোহরানার দাবি হল একটি সাধারণ অর্থ দাবির সমতুল্য। একজন বিধবা তার মোহরানার জন্য অন্যান্য ওয়ারিশদের বিরুদ্ধে কোন ডিক্রি প্রাপ্ত হলে মৃত ব্যক্তির ঐ সম্পত্তির উপর উহা কোন দায় সৃষ্টি করে না যে সম্পত্তি হতে এই ডিক্রির টাকা আদায়যোগ্য, যদি না উক্ত ডিক্রিতে সুনির্দিষ্টভাবে কোন দায় সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। যে ক্ষেত্রে দায় সৃষ্টি করে কোন ডিক্রি প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে আপিল আদালতের উপযুক্ত পন্থা হল যে পরিমাণ দায় সৃষ্টি করা হয়েছে সে পরিমাণে উহা রদ করে দেয়া। কিন্তু ইহাও উল্লেখ্য যে, কেবলমাত্র এই জন্যও কোন দায় সৃষ্টি করা হয় নাই যে, উল্লেখিত সম্পত্তি বিক্রয় করার জারির জন্য ডিক্রিতে নির্দেশ আছে। কোন বিধবাকে তার প্রাপ্য মোহরানা পরিশোধ করা না হয়ে থাকলেও একজন ওয়ারিশ সম্পত্তিতে তার অংশ হস্তান্তর করতে পারেন, কিন্তু মোহনার পরিবর্তে যদি বিধবা ঐ সম্পত্তি ধলে রাখেন, তবে হস্তান্তরটি তার দখলাধিকার বজায় রাখা সাপেক্ষ হবে।

দেনমোহর পরিশোধ না করার ফলাফল

যখন স্ত্রী তাহার মোহরানার জন্য দাবি উত্থাপন করেন তখন তা পরিশোধ করা না হলে তিনি তার মোহরানা পরিশোধ না করা পর্যন্ত স্বামীর নিকট হতে অন্য কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ ছাড়া দূরে বসবাস করতে থাকা সত্ত্বেও স্বামী তার খোরপোষ পরিশোধ করতে বাধ্য। এ অবস্থায় কোন স্বামী দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য ডিক্রি পেতে পারে না। স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান করা হয়েছিল কি না তা যিনি উহা করেছেন তাকেই প্রমাণ দ্বারা ইহা প্রমাণ করতে হবে। মোহরানা পরিশোধে অস্বীকৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবেও হতে পারে।

যেমন যদি কোন স্বামী মোহরানার জন্য ডিক্রি কৃত টাকা নির্ধারিত সময়ের ভিতরে আদালতের নির্দেশ মত পরিশোধ না করেন, তবে তা একটি পরোক্ষ অস্বীকৃতি হিসেবে গণ্য হবে।

মোহরানা পরিশোধিত হলে দখলের অধিকার শেষ হয়

মোহরানার ঋণটি পরিশোধিত হওয়ার প্রেক্ষিতে দখলের অধিকার শেষ হয়ে যায়। দু'ভাবে এই অধিকার শেষ হতে পারে।

(ক) বিধবা যে সম্পত্তি দখলে রেখেছে উহার রাজস্ব এবং মুনাফা হতে সে তার মোহরানা আদায় করে নিলে অথবা

(খ) স্বামীর ওয়ারিশগণ কর্তৃক স্ব- স্ব অংশ উদ্ধারের জন্য তারা তাদের আনুপাতিক হারে মোহরানা পরিশোধ করে দিলে বিধবার দখলাধিকার শেষ হয়ে যায়।

দেনমোহর না দেয়ার দায়ে স্বামীর সম্পত্তি দখল

যখন কোন বিধবা তার অপরিশোধিত মোহরানার পরিবর্তে কোন রূপ বল প্রয়োগ বা প্রতারণা ব্যতীতই তার মৃত স্বামীর সম্পত্তির দখল লাভ করে তখন সে তার স্বামীর অন্যান্য ওয়ারিশদের বিরুদ্ধে এবং তার স্বামীর পাওনাদারদের বিরুদ্ধে দখল বজায় রাখার অধিকারী, যতক্ষণ না ঐ সম্পত্তির রাজস্ব এবং মুনাফা হতে তার মোহরানা পরিতুষ্ট হয়। যদি বিধবার নামে কোন রূপ আপত্তি ছাড়া মিউটেশন হয়ে থাকে, তবে মোহরানার পরিবর্তে সে কোন রূপ বল প্রয়োগ বা প্রতারণা ছাড়াই আইনসঙ্গত ভাবে দখল পেয়েছিল মর্মে যথেষ্ট গণ্য করা যাবে।

স্ত্রী কর্তৃক দেনমোহর মাফ

কোন স্ত্রী সাবালকত্ব বা বয়োঃপ্রাপ্তির পর তার স্বামীর বা স্বামীর উত্তরাধিকারীদের অনুকূলে মোহরানা বা মোহরানার অংশ বিশেষ ছেড়ে দিতে পারেন। কোন কিছুর বিনিময় ব্যতিরেকেই এরূপ ছেড়ে দেয়া বৈধ।এরূপভাবে মোহরানা ছেড়ে দিতে হলে স্ত্রীকে মুক্ত মন নিয়ে তা করতে হবে এবং আদালতকে এই মর্মে পরিতুষ্ট করতে হবে যে, সে যা করছে তা এবং ইহার ফলাফল সে উপলব্ধি করেছে। যখন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর কারণে বিরাট মানসিক দুঃখে ছিল, তখন মোহরানা ছেড়ে দিলে তা বৈধ হবে না এমনকি কেবল মাত্র স্বামীর স্নেহ লাভ বা স্নেহ বজায় রাখার আশায় তা করা হয়ে থাকলেও ঐ স্ত্রী তা মুক্ত মন নিয়ে করছে বলা যাবে না।

মোহরানা পরিশোধ

সাধারণতঃ মোহরানা বিষয়টির পরিপূর্ণতা পায়, যদি যৌন সহবাস হওয়ার পূর্বেই স্বামী মারা যায়, তবে স্ত্রী তার পূর্ণ মোহরানা পাওয়ার অধিকারি হবে না। যদি দেখা যায় যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ মোহরানা ধার্য হয় নাই, তবে স্ত্রী তার পূর্ণ ন্যায্য পরিমাণ মোহরানা পাবে। যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে, তবে উক্ত তালাক যৌনকর্ম অনুষ্ঠানের পূর্বেই হয়ে থাকলে স্ত্রী নির্ধারিত মোহরানার অর্ধেক পাবে। যদিও মোহরানাটি 'তাৎক্ষণিক' হিসেবে সাব্যস্ত করা ছিল।

তামাদি আইন

তাৎক্ষণিক মোহরানা আদায়ের জন্য তামাদির মেয়াদ হল তিন বৎসর। যে দিন মোহরানার দাবি করা হয় এবং তা অস্বীকৃত হয় সে দিন হতে তামাদির সময় শুরু হয়। যে ক্ষেত্রে বিবাহ চালু করা অবস্থায় দেনমোহর দাবি করা না হয়, সেক্ষেত্রে মৃত্যু বা তালাক দ্বারা বিবাহ ভঙ্গ হবার জন্য মোকদ্দমার তামাদির মেয়াদ তিন বৎসর। যে দিন হতে মৃত্যু বা তালাকের দ্বারা বিবাহ ভঙ্গ হয়, সে দিন হতে তামাদির মেয়াদ শুরু হয়। তবে বিবাহ চালু থাকা অবস্থায় বিশেষ কোন সময়ে বিলম্বিত দেনমোহর পরিশোধ করার শর্ত থাকলে তা প্রাপ্য হওয়ার পরে যে সময় তা দাবি করা হয়, সে সময় হতে তামাদির মেয়াদ শুরু হবে। তামাদির মেয়াদ কেবল তখনই শুরু হবে, যখন দাবি এবং অস্বীকার পরিষ্কারক এবং দ্ব্যর্থহীন ভাবে হয়ে থাকবে। যেক্ষেত্রে দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের মোকদ্দমা আদালত এ শর্তে ডিক্রি প্রদান করেন যে, স্বামী তিন মাসের মধ্যে তাৎক্ষণিক মোহরানা আদালতে জমা দিবেন এবং সে ভাবে তিন মাসের মধ্যে উক্ত টাকা জমা দান করা না হয়, সেক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের অভিমত হল যে, উহা দ্বারা স্বামী কর্তৃক মোহরানা পরিশোধ করতে পরোক্ষভাবে অস্বীকার করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে মোকদ্দমার তামাদি ঐ তারিখ হতে আরম্ভ হবে যে তারিখে তিন মাস শেষ হয়। কারণ স্বামীর আচরণ হতে এরূপ অস্বীকৃতির অনুমান করা যাবে এবং তা মৃত স্বামীর ওয়ারিশদের বিরুদ্ধে মোহরানা দাবি পরিশোধ করার জন্য মোকদ্দমা করতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে তামাদির মেয়াদ যে সময় হতে সে মোহরানার পরিবর্তে বৈধভাবে সম্পত্তির দখলে আছে সে সময় হতে শুরু হবে না।

১। দেনমোহর একটি অনিশ্চিত ঋণ

দেনমোহর ঋণ শ্রেণিভুক্ত এবং বিধবা তার মত স্বামীর অন্যান্য পাওনাদারদের সাথে স্বামীর মৃত্যুর পর উক্ত ঋণ স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তি হতে আদায় করতে পারে। তবে তার অধিকারটি কোন অনিশ্চিত উত্তমর্ণের অধিকার অপেক্ষা শ্রেয় নয়। কেবল একমাত্র ব্যতিক্রমটি হল, পরবর্তী ধারায় উল্লেখিত ত্যক্ত সম্পত্তির উপস্বত্ব হতে দেনমোহরের টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সে স্বীয় অধিকারে স্বামীর সম্পত্তি নিজ দখলে রাখতে

পারে। সে তার স্বামীর সম্পত্তির উপর কোন চার্জ সৃষ্টি করতে পারে না, যদিও চুক্তির মাধ্যমে এ জাতীয় চার্জ সৃষ্টি করা চলে।

২। দেনমোহর ঋণের বাবদ ডিক্রি করে চার্জ সৃষ্টি করা

দেনমোহর ঋণের জন্য ডিক্রির মাধ্যমে আদালত মৃতের সম্পত্তির উপর চার্জ সৃষ্টি করতে পারে। চার্জটি সৃষ্টি করা হলে এবং প্রদত্ত ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল না করা হলে, সৃষ্ট চার্জটি কার্যকরি করা হবে; অন্য কথায় আদালতের চার্জ সৃষ্টিকারী ডিক্রি এখতিয়ারের অভাবে নিস্ফল হবে না। কিন্তু চার্জ সৃষ্টিকারী ডিক্রি প্রদান আদালতের ক্ষমতা না হলেও স্বাভাবিক অবস্থায় আদালত এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না; কারণ এই জাতীয় ডিক্রি প্রদানের অর্থ হল মৃতের দেয় অন্যান্য ঋণের প্রতিটি অগ্রাধিকার প্রদান করা।

৩। উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক দেনমোহর ঋণ পরিশোধের পূর্বে সম্পত্তি হস্তান্তর

কোন উত্তরাধিকারী কর্তৃক স্বীয় অংশ ৪২ (১) ধারা মতে হস্তান্তরের অধিকারটি দেনমোহর ঋণ পরিশোধ করা হয় না এ অযুহাতে খবর হবে না; তবে উক্ত হস্তান্তরের তারিখে বিধবা ঐ সম্পত্তির দখলে থাকলে, হস্তান্তরটি তার দখলে রাখবার অধিকার সাপেক্ষ হবে।[১৬]

দেনমোহর সম্পর্ক সমর্থন

দেনমোহরটি সমর্থিত হয়

(ক) দাম্পত্য মিলন বা সহবাস দ্বারা; অথবা

(খ)বৈধ নির্জনতা (খালাওয়াত-ই-ছাহিয়্যা) দ্বারা; অথবা

(গ) স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর দ্বারা।[১৭]

দেনমোহর সংক্রান্ত মামলা এবং সময়সীমা

দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করা না হলে স্ত্রী এবং তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীগণ ইহার জন্য মামলা দায়ের করতে পারে। 'আশু' দেনমোহর আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করবার সময়সীমা হল দেনমোহরটি দাবি ও ইহা প্রদানে অস্বীকৃতির তারিখ হতে তিন বছর, অথবা যেখানে বিবাহের অস্তিত্বকালে এ জাতীয় কোন দাবিই উত্থাপন করা হয় নাই, সেখানে মৃত্যু কিংবা তালাকের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে তখন পর্যন্ত বিলম্বিত

---

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫- ৫০

[১৭] বেঈল, পৃ. ৯৬

দেনমোহরটি আদায়ের সময়সীমা হল মৃত্যু অথবা তালাকের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে ঐ তারিখ হতে তিন বছর। তবে যেখানে 'আশু' দেনমোহরটি নির্ধারিত হয় নাই, সেখানে ইহা আদায়ের জন্য মামলা দায়েরের ব্যাপারে দাবি ও অস্বীকৃতি কোন পূর্ব শর্ত নহে। 'আশু' দেনমোহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সময়সীমাটি শুরু হয় উহার দাবি এবং উহা প্রদানে অস্বীকৃতির তারিখ হতে, কিন্তু দাবি ও অস্বীকৃতি উভয়ই দ্ব্যর্থহীন হতে হবে। 'বিলম্বিত' দেনমোহরের ক্ষেত্রে দেনমোহরের দাবিতে স্বামীর সম্পত্তি বিধবার বৈধ দখলে থাকলে তামাদির মেয়াদ তার (বিধবা) বিপক্ষে যাবে না। যেখানে লিখিতভাবে স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়েছে সেখানে তামাদি আইনের ১০৩ ও ১০৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্ত্রীকে উক্ত লিখিত তালাক দানের তথ্য বা সংবাদটি অবগত করবার তারিখ হতেই তামাদির সময় শুরু হবে। দাম্পত্য মিলন বা সহবাসের পূর্বে অথবা পরে আশু দেনমোহর আদায়ের দাবিতে মামলা দায়ের করবার অধিকার স্ত্রীর রয়েছে। দাম্পত্য মিলনের ফলে আশু দেনমোহর বিলম্বিত দেনমোহরে পরিণত হতে পারে না। অপরিশোধিত দেনমোহর একটি ঋণ এবং আইনগত নীতিটি হল এই যে, অধমর্ণকে অনুসন্ধান করবে। অতএব স্ত্রী দূরে থাকাকালে স্বামীর ঠিকানা না জানা থাকলে স্ত্রীর বাসস্থানটি যে আদালতের আওতাভূক্ত, স্ত্রী সেখানেই মামলাটি দায়ের করতে পারবে।[১৮]

[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামের শাস্তি আইন

ইসলামী দণ্ডবিধি আইন

(التعزير فى الشريعة الاسلامية)

হাদ্দ, কিসাস, দিয়াত, তা'যীর

অপরাধ সভ্যতার জন্য হুমকি এবং সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য বড় বাধা। মানব জীবন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে অশান্তি ও কল্যাণে ভরে উঠে। অপরাধ এবং অপরাধ প্রবণতা থেকে মানুষকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে ন্যায় বিচারের মাধ্যমে শাস্তির বিধান কার্যকর করার জন্য ইসলামে কতগুলো সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। ইসলামী শাস্তি আইনের মূল উদ্দেশ্য কাউকে শাস্তি দেয়া নয়; বরং অপরাধ সংঘটনের সুযোগকে বাধা গ্রস্থ করা। এ কারণেই মানব রচিত আইনে যেখানে অপরাধ সংঘটনের পরেই কেবল শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, সেক্ষেত্রে ইসলাম অপরাধ সংঘটনের পূর্বেই এর সকল উপায় উপকরণ ও পন্থা রোধ করে দেয়ার প্রতিই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এরূপ প্রতিবন্ধকতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও কেউ অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়লে তখন ইসলাম তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম শুধু অপরাধ ও শাস্তি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং প্রত্যেক অপরাধ ও শাস্তির সাথে আল্লাহভীতি ও পরকালের চেতনা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান ধারণাকে এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যার কল্পনা মানুষকে যাবতিয় অপরাধ ও গোনাহ থেকে পবিত্র করে দেয়। জন মনে আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের ভয় সৃষ্টি করা ছাড়া জগতের কোন আইন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীই অপরাধ দমনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। ইসলামের এই বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতিই জগতে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে এবং এমন লোকদের সমাজ গঠন করেছে, যারা পবিত্রতায় ফেরেশতাদের চেয়েও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ 'মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তাঁর নিকটস্থ অনেক ফেরেশতার চেয়েও অধিকতর সম্মানের অধিকারী'।[১] পৃথিবীতে সাধারণ আইনে অপরাধ সম্পর্কিত সব শাস্তিকেই 'দণ্ডবিধি' নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ইসলামী আইন এরূপ নয়। ইসলামী আইনে অপরাধের শাস্তিকে হুদূদ, কিসাস ও তা'যীরাত এ তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এ তিন প্রকারের শাস্তির বিধানসমূহে অনেক বিষয়েই পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং যারা নিজেদের পরিভাষার আলোকে প্রত্যেক অপরাধের শাস্তিকে দণ্ড বলে এবং ইসলামী আইনের পরিভাষাগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা ইসলামী আইনের বিধি- বিধানে অনেক বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়। দণ্ডগত শাস্তিকে অবস্থানুযায়ী লঘু থেকে লঘুতর, কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। কিন্তু হুদূদের বেলায়

---

[১] ইবন মাজাহ, *কিতাবুল ফিতান*, হা. নং- ৩৯৪৭, - المؤمن اكرم على الله من بعض الملا ئكة الذين عنده

Dhaka University Institutional Repository

কারো সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা পরিবর্তন করার অধিকার নেই। স্থান ও কাল ভেদেও এতে কোন পার্থক্য হয় না এবং কোন শাসক ও বিচারক তা ক্ষমাও করতে পারে না।

ইসলামী আইন বিশেষ কয়েকটি অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়নি; বরং বিচারকের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্য যেরূপ ও যতটুকু শাস্তি প্রয়োজন মনে করবেন, ততটুকুই দিবেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এ পর্যায়ের অপরাধসমূহ বুঝি প্রকৃত অপরাধ নয়; বরং আসল কথা হল দলিল প্রমাণ সীমিত আর অপরাধ ও অপরাধমূলক ঘটনাবলীর তো শেষ নেই। মানুষের বিবেক বুদ্ধি যখন বিকৃত আর বিপথগামী হয়ে পড়ে, তখন তারা নিত্য নতুন ও রকমারী অপরাধ উদ্ভাবন করে। ইসলামী শারী'আত এ অবস্থার বাস্তবতা ও গুরুত্ব স্বীকার করেছে।

উল্লেখ্য যে, যে সব অপরাধের দরুন অন্য মানুষের কষ্ট বা ক্ষতি হয়, তাকে একদিকে সৃষ্টিজীবের প্রতি অন্যায় করা হয় এবং অপরদিকে স্রষ্টারও নাফরমানী করা হয়। তাই এই জাতীয় অপরাধে 'আল্লাহর হক' ও 'বান্দাহর হক' উভয়টির ক্ষুণ্ন হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের কাছেই অপরাধী বলে বিবেচিত হয়।

শাস্তির সংজ্ঞা

শাস্তির আরবি প্রতিশব্দ হল (العقاب) এর আভিধানিক অর্থ হল মানুষকে তার অপকর্মের প্রতিদান দেয়া।[২] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আর যদি তোমরা অপকর্মের প্রতিদান দাও, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিদান দিবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়"।[৩]

And if you punish (your enemy, O you believers in the Oneness of Allah), then punish them with the like of that with which you were afflicted. (Surah 16. An-Nahl. Part 14. Ayat 126).

ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায় শাস্তি হল

শাস্তি বলতে কাউকে তার অপকর্মের জন্য শারীরিক বা মানসিক যাতনা বা উভয়বিধ কষ্ট দেয়াকে বুঝানো হয়। অন্য কথায় শাস্তি হল মানুষের অপকর্মের প্রতিফল, যা সমাজের কল্যাণ ও ব্যক্তির প্রয়োজনের স্বার্থে অপরাধির বিরুদ্ধে নির্ধারণ করা হয়।

---

২ ইবনুল মানযুর, *লিসানুল আরব*, খ. 8, পৃ. ৩০২৭

৩ আল কুরআন, ১৬: ১২৬ - وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম তাহাবী বলেন

“অপরাধের কারণে মানুষ যে যাতনা ভোগ করে তাকে শাস্তি বলা হয়”।[৪]

মুফতি আমীমুল ইহসান (রহ) বলেন

“অপরাধ সংঘটনের পর অপরাধীকে প্রতিদান হিসেবে দুনিয়া বা আখিরাতে যে কষ্ট ভোগ করতে হবে তাকে শাস্তি বলে”।[৫] উল্লেখ্য যে, শাস্তি বলতে যদিও আখিরাতের মন্দ প্রতিফলকেও বুঝানো হয়; তবে এ প্রবন্ধে আমাদের আলোচনা রাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় শাস্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

শাস্তির শ্রেণিবিন্যাস

মুসলিম ফৌজদারী আইন ব্যাপকভাবে অপরাধকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করেছেন।

(ক) সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে অপরাধ;

(খ) রাজার বিরুদ্ধে অপরাধ;

(গ) ব্যক্তি সাধারণের বিরুদ্ধে অপরাধ।

হিন্দু আমলে প্রচলিত অর্ডিল বা চরিত্র পরীক্ষার মাধ্যমে বিচার পদ্ধতিকে মুসলিম আমলে নিষিদ্ধ করা হয়। এর পরিবর্তে মুসলিম আইনে তিন ধরনের শাস্তি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

(ক). হাদ্দ (নির্ধারিত শাস্তি) (Hadd or fixed penalties)

‘হুদুদ’ (حدود) শব্দটি ‘হাদ্দ’ (حد) এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ বাধা দান বা বারণ করা।৬ সুতরাং প্রত্যেক জিনিস যা মানুষকে কোন কিছু থেকে বারণ করে রাখে তাকে ‘হাদ্দ’ বলা হয়। এ অর্থের নিরিখে আরবিতে দারোয়ান ও কারারক্ষীকে ‘হাদ্দাদ’ বলা হয়ে থাকে। কেননা তাদের একজন অপরিচিত

---

৪ *আল মওসূ‘আতুল ফিকহিয়্যা*, কুয়েতঃ ওয়াযারাতুল আওকাফ, খণ্ড. ৩০, পৃ. ২৬৯ *هى العقوبة الالم الذى يلحق الانسان مستحقا على الجناية -*

৫ মুফতি মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, *কাওয়াইদুল ফিকহ*, পৃ. ৩৮৩ الجزاء بالشر ما يلحق الانسان بعد الذنب من المحنة الاخزة او ما يلحقه من المحنة بعد الذنب فى الدنيا فيسمى عقوبة -

৬ *আল মু‘জামুল ওয়াসীত*, ইউ. পি: কুতুবখানা হুসায়নিয়্যা, দেওবন্দ: পৃ. ১৬০

কাউকে বাইরে থেকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। অপরজন কয়েদীদেরকে ভেতর থেকে বাইরে যেতে বারণ করে। আর 'হুদূদুল্লাহ' বলতে আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ বস্তুগুলোকে বুঝানো হয়।

ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায় 'হাদ্দ' হল

কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত বিভিন্ন অপরাধের সুনির্ধারিত শাস্তিসমূহ।[৭] চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ধর্মান্তর, মানহানি এবং মদ্যপান প্রভৃতি অপরাধের জন্য এ সব শাস্তি শারী'আহ কর্তৃক নির্ধারিত। এগুলো মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য ছিল। 'হাদ্দ' এর শাস্তি প্রদানের দায়িত্ব স্বয়ং রাষ্ট্রের। এ সব অপরাধে ক্ষতিপূরণ স্বীকৃত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ ব্যভিচার ও মদ্যপানের শাস্তি ছিল পাথর নিক্ষেপ, চুরির জন্য ডান হাত কর্তন প্রভৃতি। 'হাদ্দ' এর অধীনে অপরাধসমূহ সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে অপরাধ বা সার্বজনীন ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে গণ্য হয়। ইসলাম বড় বড় কয়েকটি অপরাধের জন্য 'হদ্দের' বিধান ফরয করে দিয়েছে। এগুলো হলঃ চুরি, ডাকাতি ও সন্ত্রাস, ব্যভিচার, ও ব্যভিচারের অপবাদ এ চারটি শাস্তির পরিমাণ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম মদ্যপানের শাস্তি হাদীস ও সাহাবা কিরামের ইজমাত দ্বারা প্রমাণিত। অনেকের মতে ধর্মান্তর এবং রাষ্ট্র বা সরকারদ্রোহীতার শাস্তিও 'হাদ্দের' শামিল। এগুলোর শাস্তিও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

(খ). কিসাস (সদৃশ বা প্রতিশোধনমূলক শাস্তি) (Qisas) (Retaliation)

The Arabic term Qisas is almost synonymous with "Musawah" making a thing equal to another thing: In this instance, making the punishment equal (or appropriate) to the crime. This word is derived from the verb root Qissa which means: "He followed, after his track or footsteps or he endeavoured to track him." Since the culprit is tracked and punished, this procedure is, therefore, knows as Qisas.

The subject of Qisas must be considered, first, as to occasions affecting life and, secondly, as to retaliation in matters short of life. The former are called "Crimes against Person" While the latter are termed as "Crimes against Body."[৮]

কিসাস (قصاص) শব্দের অর্থ একইরূপ কাজ করা, পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলা।

---

[৭] *আল জুমাল,* ফুতুহাতুল ওয়াহাব, দারুল ফিকর, খ. ৫, পৃ ১৩৬

[৮] Muhammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam,* Kazi Publications, Lahore (Pakistan). Page 145.

ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায় কিসাস হল

অপরাধীর সাথে তার বাড়াবাড়ির অনুরূপ আচরণ করা[৯] অর্থাৎ কোন ব্যক্তির যে পরিমাণ দৈহিক ক্ষতিসাধন করবে তারও সে পরিমাণ দৈহিক ক্ষতিসাধন করাই হচ্ছে কিসাস। অপরাধী তাকে হত্যা করলে প্রতিশোধস্বরূপ সেও মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হবে এবং যখম করে থাকলে প্রতিশোধ স্বরূপ তাকেও যখম করা হবে। উল্লেখ থাকে যে, কিসাসের শাস্তিও হুদূদের মতই কুরআন মাজীদে নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, হুদূদকে আল্লাহর অধিকার বা জনস্বার্থ হিসেবে বাস্তবায়ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও তা ক্ষমা হবেনা এবং হাদ্দ অকার্যকর হবে না। কিন্তু কিসাসের ব্যাপারটি এর ব্যতিক্রম। কিসাসে বান্দাহর অধিকার প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের এখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। সে ইচ্ছে করলে কিসাস হিসেবে তার মৃত্যুদণ্ড দাবি করতে পারে। ক্ষমাও করে দিতে পারে।[১০] নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীদেরকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলে হত্যাকারীদের সাহস বেড়ে যাবে কিংবা ব্যাপকহারে হত্যা কাণ্ড শুরু হয়ে যাবে এরূপ আশঙ্কা করা ঠিক নয়। কেননা হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করা ছিল নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অধিকার। তারা তা ক্ষমা করে দিয়েছে। কিন্তু অপরাপর লোকদের প্রাণ রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। তাই ইসলামী আইন মতে, সরকার এ দায়িত্ব পালনের জন্য হত্যাকারীকে যাজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা কোন শাস্তি দিয়ে এ বিপদাশঙ্কা রোধ করতে পারে। যখমের ব্যাপারটাও তদ্রূপ।

(গ). দিয়াত (রক্তমূল্য) (Diya) (Blood money)

দিয়াত হল খুনের বদলায় হত্যাকারীর উপর আরোপিত সুনির্দিষ্ট পরিমাণে প্রদেয় সম্পদ বিশেষ।

ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায় দিয়াত হল

মানব দেহের অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধে অপরাধের বদলায় অপরাধীর উপর আরোপিত সুনির্দিষ্ট পরিমাণ দেয়া।

(ঘ). তা'যীর (বিবেচনামূলক শাস্তি) (Tajir or Discretionary Punishment)

তা'যীর আরবি (عزر) উযর শব্দ থেকে উদ্ভৃত। আভিধানিক অর্থে তা'যীর (تعزير) শব্দের অর্থ হল বাধা দেয়া, বারণ করা, নিষেধ করা, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, ফিরিয়ে রাখা বা রুখে দেয়া। আরবিতে বলা হয় عزر فلان اخاه সে তার ভাইকে সাহায্য করেছে। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে "রাসূল (সা) এর সাথে

---

৯ ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব,* খ. ৮, পৃ. ৩৪১

১০ *আল মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যা,* খ. ১৭,পৃ. ১৩৪; খ. ১২, পৃ. ২৫৪-২৫৭,

সহযোগিতা করো এবং তাকে মহান মনে করো?[১১] এ ছাড়া আরো বলা হয় عزرته আমি তাকে সম্মান করেছি। এ বাক্যটি আমি তাকে শিষ্টাচার শিখিয়েছি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তা'যীর বিপরীত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যখন কোন ব্যক্তি শাস্তি ভোগের কারণে অপরাধ কর্ম থেকে বিরত থাকে তখন সে নিজেকে সম্মানিত করে সমাজে মর্যাদাবান হয়ে যায়। এ ধরনের শাস্তিকে এ অর্থেও তা'যীর বলা হয় যে, শাস্তি অপরাধীকে অপরাধ কর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখে। অথবা কোন একবার অপরাধ করে শাস্তি ভোগের পর আর দ্বিতীয়বার একই অপরাধ করার সাহস করে না। তবে শব্দটি সম্মান ও সাহায্য করা অর্থেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায় তা'যীর হল

"আল্লাহ বা মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট যে সব অপরাধের জন্য শারী'আত নির্দিষ্ট কোন শাস্তি কিংবা কাফফারা নির্ধারণ করে দেয়নি সে সব অপরাধের শাস্তিকে তা'যীর বলে।[১২] মাওয়ার্দি বলেনঃ হাদ্দ নির্ধারণ করা হয়নি এ ধরনের অপরাধসমূহের শাস্তিকে তা'যীর বলে।[১৩] স্থান, কাল, অবস্থার প্রেক্ষিতে কল্যাণের দাবি অনুপাতে এ ধরনের অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত হবে। সুতরাং অপরাধ, অপরাধী, সময় ও পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিচারক যতটুকু ও যেরূপ শাস্তি দান করা যৌক্তিক মনে করবেন, ততটুকুই দিবেন। ইসলামী সরকার যদি আলিম ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শক্রমে শারী'আতের রীতিনীতি বিবেচনা করে এ সব অপরাধের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে বিচারকদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করে, তবে তাও জায়িয। যেমন আজকাল এসেম্বলীর মাধ্যমে দণ্ডবিধি নির্ধারণ করা হয় এবং বিচারক ও জজগণ নির্ধারিত দণ্ডবিধির অধীনে মামলা মোকদ্দমায় রায় দেন। হুদূদ ও কিসাস জাতীয় কয়েকটি অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট সব অপরাধ- ই তা'যীরি অপরাধ।[১৪]

---

[১১] আল কুরআন, ৪৮: ৯ - وتعزروه وتعقروه

[১২] ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর,* খণ্ড. ৪, পৃ. ৪১২; *আল মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা,* খণ্ড. ১২, পৃ. ২৫৪ هو عقوبة غير مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى او لادمى فى كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا -

[১৩] আল মাওয়ার্দি, *আল আহকামুস সুতানিয়্যা,* পৃ. ২৯৩, - تا ديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

[১৪] *আল আহকামুস সুলতানিয়্যা,* পৃ. ২৯৩; মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম,* ঢাকাঃ ইফাবা, ২০০৭, পৃ. ২০৩-৩০৪

Dhaka University Institutional Repository

হাদ্দ, কিসাস, দিয়াত ও তা'যীর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হলঃ

হাদ্দ

(Hadd or fixed penalties)

এক. চৌর্যবৃত্তির শাস্তি

ধনসম্পদ মানব জীবনের অস্তিত্বের রক্ষাকবচ। মানব দেহের জন্য যেমন রক্তের প্রয়োজন, মানবজীবনের জন্য অর্থ সম্পদও ঠিক ততোখানি গুরুত্বপূর্ণ। মানব জীবনের চাঞ্চল্য ও চাকচিক্য বলতে গেলে ধন সম্পদের উপর নির্ভরশীল। ইসলাম এ ধন সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় ভোগের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান পেশ করেছে। হালাল পথে উপার্জিত ধন সম্পদকে হালাল ঘোষণা করেছে আর অন্যায় পথে উপার্জিত ধন সম্পদকে সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে এবং এর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কঠোর শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। নিতান্ত প্রয়োজন মেটানোর কোন ব্যবস্থাই না থাকলে মানুষ একান্ত ঠেকায় পরে হয়ত চুরি করতে পারে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রত্যেকটি নাগরিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার এমন সুদৃঢ় ব্যবস্থা করে থাকে, যাতে কেউ না খেয়ে বা অভাব অনটনে কষ্ট পেতে পারে না। এ কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রে কারো চুরি করার প্রয়োজন পরে না। এ রূপ সু- ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কেবল সে লোকই চুরি করতে পারে, যে অন্যায়ভাবে অধিক সম্পদ অর্জন করার অভিলাসী কিংবা যে অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা বা বে- হিসাব অর্থ ব্যয় করতে অভিপ্রায়ী। তাই সুস্থ সমাজ বিনির্মাণের পক্ষে এ ধরনের চুরি খুবই মারাত্মক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। এ কারণে ইসলাম চুরিকে নিষিদ্ধ করেছে, চুরির যাবতীয় পথ ও উপলক্ষকে সর্বআত্নক ভাবে বন্ধ করে দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চুরির সংজ্ঞা

চুরি বলতে সাধারণত অপরের মাল গোপনে করায়ত্ব করাকে বুঝানো হয়।[১৫] শারী'আতের পরিভাষায় কোন মুকাল্লাফ (বালিগ ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি) কর্তৃক অপরের মালিকানা বা দখলভুক্ত নিসাব পরিমাণ বা তার সমমূল্যের সম্পদ সংরক্ষিত স্থান থেকে গোপনে করায়ত্ত করাকে 'চুরি' বলে।[১৬]

যখন কোন বুদ্ধিমান, বালেগ, সুস্থ ব্যক্তি কোন ধরনের সংশয় সন্দেহ[১৭] ছাড়া সজ্ঞানে, স্বপ্রণোদিত হয়ে অপর কোন ব্যক্তির এমন সম্পদ তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে হাতিয়ে নেয় যা অস্থাবর মূল্যবান এবং সুরক্ষিত স্থানে রক্ষিত। উপরন্তু সম্পদটি মুল্যমানের দিক থেকে হাট কর্তনযোগ্য নেসাবের সমপরিমাণ হয়। এ ধরনের পরধন হাতিয়ে নেয়াকে ইসলামী আইনে চুরি বলে অভিহিত করা হয়। এ সংজ্ঞা থেকে বুঝা যায়, চুরির অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে অন্যতম শর্ত হল চোরের জ্ঞান থাকতে হবে, তাকে হতে হবে প্রাপ্ত বয়স্ক এবং চুরিকৃত সম্পদের সর্বনিম্ন নেসাব পরিমাণ মুল্যমান থাকতে হবে এবং সম্পদটি অবশ্যই সুরক্ষিত জায়গায় থাকতে হবে আর সেই সাথে তা হাত কর্তনযোগ্য নেসাবের সমপরিমাণ হতে হবে।[১৮] চুরির দণ্ড পবিত্র কুরআনের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা- "চোর নারী পুরুষ যেই হোক তার হাত কেটে দাও; এটাই তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি; আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময়"।[১৯]

"And (as for) the male thief and the female thief, cut off (from the wrist joint) their (right) hands as a recompense for that which they committed, a punishment by way of example from Allah is All-Powerful, All-Wise" (Surah 5. Al-Maidah Part 6. Ayat 38).

চুরির মৌলিক উপাদান

চুরির চারটি মৌলিক উপাদান রয়েছে। এগুলো হল

---

১৫ আস সারাখসী, *আল মাবসূত,* খণ্ড. ৯, পৃ. ১৩৩

১৬ ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর,* খ. ৫, পৃ. ৩৫৫, *আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা, খ.* ২৪, পৃ. ২৯৩, *السرقة هى اخذ العا قل البالغ نصابا محرزا ملكا للغير او ما قيمة لا شبهة فيه على وجه الخفية -*

১৭ ফাতহুল কাদির, ৫ম খ. পৃ. ১২০

১৮ বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২য় খ. পৃ. ৩৭৩- ৭৭, প্রথম প্রকাশ: ১৩২৯ খৃ. মাতবায়ে জামালিয়া এবং আল- আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ারদী, পৃ. ২১৪- ১৫, মাতবায়াতুল ওয়াতান, মিসর, ১২৯৮ হি.

১৯ আল কুরআন, ৫: ৩৮ - السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله –والله عزيز حكيم

(ক) চোর

(খ) মালের মালিক অর্থাৎ যার সম্পদ চুরি করা হয়েছে

(গ) চুরিকৃত সম্পদ এবং

(ঘ) গোপনে সম্পদ হস্তগত করা।

চোর

চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কাটতে হলে চোরের মধ্যে আটটি শর্ত পাওয়া যেতে হবে। তা হল

(১) মুকাল্লাফ (প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন) হওয়া

(২) মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হওয়া

(৩) চুরির উদ্দেশ্যে মাল হস্তগত হওয়া

(৪) অপরের মাল জেনে শুনে হস্তগত করা

(৫) স্বেচ্ছায় ও প্রলোভনবশতঃ চুরি করা

(৬) চোর ও মালিক পরস্পর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় না হওয়া

(৭) হস্তগত মালের মধ্যে চোরের কোনরূপ মালিকানা না থাকা

(৮) চুরির নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা।

১। মুকাল্লাফ (প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ বিবেক সম্পন্ন) হওয়া

চোরকে বালিগ অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকা চুরি করলে তাদের উপর হাদ্দ কার্যকর করা যাবে না। অনুরূপভাবে চোরকে সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। কোন পাগল চুরি করলে তার উপর ‘হাদ্দ’ কার্যকর করা যাবে না, যদি সে পুরো পাগল হয়। যদি সে মাঝে মাঝে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে তাহলে তার উপর ‘হাদ্দ’ কার্যকর করা যাবে।[২০]

---

[২০] ইমাম মালিক, *আল মুদাওয়ানাহ,* দারুল কুতুব আল ইসলামিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৫৩৪; *আল কাসানি,* বাদা'ই, খ. ৭, পৃ. ৬৭

২। মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হওয়া

চুরির শাস্তি কার্যকর করার জন্য চোরকে মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হতে হবে। অমুসলিম রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নিরাপত্তা চুক্তির ভিত্তিতেই ইসলামী রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করে যদি কোন মুসলিম কিংবা অমুসলিম নাগরিকের কোন মাল চুরি করে, তাহলে তার উপর 'হাদ্দ' কার্যকর করা যাবে কি না তা নিয়ে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। মালিকি অ হাম্বলি মতের ইমামগণ এবং হানাফিগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) প্রমুখের মতে তার উপর 'হাদ্দ' কার্যকর করতে হবে।[২১]

৩। চুরির উদ্দেশ্য মাল হস্তগত হওয়া

হস্তগত মাল অন্যায়ভাবে দখল বা মালিকানাভুক্ত করে নেয়ার অভিপ্রায় থাকতে হবে। কোন মাল হস্তগত করা চুরি কি না হস্তগতকারীর নিয়্যতের উপর নির্ভর করে। যেখানে অন্যায়ভাবে গ্রহণের নিয়্যত না থাকে, সেখানে তা চুরি বলে গণ্য হবে না। যেমন কেউ যদি কারো মাল ব্যবহার করে পরে ফিরিয়ে দিবে এ উদ্দেশ্যে হস্তগত করল অথবা হাস্যচ্ছলে হস্তগত করল অথবা মালিককে কেবল অবহিত করার উদ্দেশ্যে বা এই মনে করে হস্তগত করল যে, মালিক না খোশ হবে না, তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না, যদি তার কথার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়।[২২]

৪। অপরের মাল জেনে শুনে হস্তগত করা

অপরের মাল জেনে শুনে তার কোন রূপ অবগতি কিংবা সম্মতি ছাড়া হস্তগত করলেই তা চুরি হিসেবে ধর্তব্য হবে। তাই কেউ যদি কোন মালকে মুবাহ (বৈধ) বা পরিত্যক্ত মনে করে হস্তগত করে, তা হলে তার উপর হাদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[২৩]

৫। স্বেচ্ছায় ও প্রলোভনবশতঃ চুরি করা

কোন চোর যদি একেবারে অনন্যোপায় হয়ে চুরি করতে বাধ্য হয় যেমন দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার তাড়নায় চুরি করল, তার উপর 'হাদ্দ' প্রয়োগ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, 'ক্ষুধায় বাধ্য হয়ে চুরি করলে হাত কাটা যাবে না'।[২৪]

---

[২১] আস সারাখসী, *আল মাবসুত,* খ. ৯, পৃ. ১৭৮; *আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা,* খ. ২৪, পৃ. ২৯৬

[২২] *আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা,* খ. ২৪, পৃ. ২৯৮

[২৩] *প্রাগুক্ত,*

[২৪] আস সারাখসী, *আল মাবসুত,* খ. ৯, পৃ. ১৪০; ইবনু নুজায়ম, *আল বাহরুর রা'ইক,* খ. ৫, পৃ. ৫৮ - لا قطع فى مجاعة مضطر

Dhaka University Institutional Repository

৬। চোর ও মালিক পরস্পর রক্ত সম্পর্কীয় আত্নীয় না হওয়া

চোর ও মালিক যদি পরস্পর রক্ত সম্পর্কীয় উর্ধ্ব বা অধঃস্তন জাতীয় আত্নীয় হয় (পিতামাতা ও পুত্রকন্যা এবং তাদের উর্ধ্ব ও অধঃস্তন পুরুষগণ), তাহলেও চোরের উপর 'হাদ্দ' কার্যকর হবে না। উপর্যুক্ত আত্নীয় স্বজন ছাড়া (ভাইবোন, চাচা চাচী, ফুফা ফুফী, মামা মামী, খালা খালু বা তাদের ছেলেমেয়ে, দুধ মা ও ভাইবোন, সৎ পিতা মাতা, শ্বশুড় শ্বাশুড়ী ও স্ত্রীর অপর ঘরের ছেলে মেয়ে প্রভৃতি) একে অপরের মাল চুরি করলে অধিকাংশ ইমামগণের মতে হাত কাটা যাবে।[২৫]

৭। হস্তগত মালের মধ্যে চোরের কোন রূপ মালিকানা বা অধিকার না থাকা

চোর যদি চুরিকৃত মালের অংশীদার হয়, তাহেলও এবং তার নিজের অংশ বাদ দেবার পর চুরিকৃত অবশিষ্ট মালের মূল্য নিসাব পরিমাণ হয়, তা হলেও অপরাধীর উপর হাদ্দ কার্যকর করা যাবে না; বরং তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া যাবে।[২৬]

৮। চুরির নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা

অধিকাংশ ইমামগণের নিকট চুরি প্রমাণিত হলে চোরের হাত কাটা হবে, চুরির নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না।[২৭]

মালের মালিকের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী

চুরির দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান হল চুরিকৃত মালের মালিক বিদ্যমান থাকতে হবে। যদি চুরিকৃত মাল কারো মালিকানাধীন না হয় তাহলে এরূপ মাল হস্তগত করার কারণে হাদ্দ প্রযোজ্য হবে না। হাদ্দযোগ্য চুরি প্রমাণের জন্য ইমামগণ মালের মালিকের জন্য প্রযোজ্য কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছেন। এ শর্তগুলো হলঃ

১। মালের মালিক জানা থাকতে হবে

২। মালের যথাযথ মালিক বা অধিকারী হতে হবে

৩। মুসলিম কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হতে হবে।

---

[২৫] ইবনু আবদীন, *রাদ্দুল মুহতার,* খ. ৪, পৃ. ৯৭,

[২৬] আল খারশী, *শারহু মুখতাছারি খলিল,* খ. ৮, পৃ. ৯৭

[২৭] নববী আল মাজমু', খ. ৭, পৃ. ৩৬২

চুরিকৃত মালের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

১। চুরিকৃত বস্তু মাল হওয়া;

২। চুরিকৃত বস্তুর আর্থিক মূল্য থাকা;

৩। চুরিকৃত মাল তুচ্ছ বস্তু না হওয়া;

৪। চুরিকৃত বস্তু সংরক্ষণযোগ্য হওয়া;

৫। চুরিকৃত বস্তু সাধারণভাবে সকলের জন্য বৈধ হওয়া;

৬। চুরিকৃত মাল অপরের দখলভুক্ত হওয়া;

৭। চুরিকৃত মাল নিরাপদ সংরক্ষিত স্থান থেকে করায়ত্ব করা;

৮। করায়ত্ব মাল চোর কর্তৃক পুরোপুরি নিজের দখলভুক্ত হওয়া;

৯। করায়ত্ব মাল চুরির নিসাব পরিমাণ মূল্যের হওয়া;

১০। করায়ত্ব মাল স্থানান্তরযোগ্য হওয়া।

গোপনে মাল সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করাঃ চুরির চতুর্থ উপাদান হল গোপনে মাল হস্তগত করা অর্থাৎ মালিকের সম্মতি বা অবগতি ছাড়া কিংবা তার অনুপস্থিতিতে অথবা নিদ্রিতাবস্থায় তার দখলভুক্ত কোন মাল হস্তগত করে নেয়া। এক্ষেত্রে মাল সম্পূর্ণরূপে হস্তগত হতে হবে।[২৮]

সম্পূর্ণরূপে হস্তগতকরণ বুঝাতে তিনটি শর্ত পূরণ হতে হবে

১। চোর চুরিকৃত বস্তু নিরাপদ সংরক্ষিত স্থান থেকে বের করে আনবে;

২। চুরিকৃত মাল মালিকের দখলভুক্ত হতে হবে;

৩। তা সম্পূর্ণরূপে চোরের নিজের দখলে আসতে হবে।

---

[২৮] আস সারাখসী, *আল মাবসুত,* খ ৯, পৃ ১৩৯, ১৪৭-৮

Dhaka University Institutional Repository

এ তিনটি শর্তের কোন একটি পূরণ না হলে হস্তগতকরণ পূর্ণাঙ্গ বলে পরিগণিত হবে না এবং সেক্ষেত্রে চুরির হাদ্দও প্রযোজ্য হবে না। হস্তগত হবার ব্যাপারটি যদি অপূর্ণ থাকে তাহলে চুরি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে না; বরং চুরি হয়েছে বলে ধরা হবে। এ অবস্থায় হদ্দের পরিবর্তে তা'যীরের শাস্তি প্রযোজ্য হবে।[২৯]

চুরির শাস্তি

চুরির শাস্তি হল হাত কাটা। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তারা যা উপার্জন করেছে তার প্রতিফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্ত। আর আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানী"।[৩০] এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, এ শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। এ বিষয়ে সমগ্র উম্মাহ সম্পূর্ণ একমত।[৩১] তবে হাত কতটুকু কাটতে হবে, কিভাবে কাটতে হবে এবং কোন হাত কাটতে হবে এ সকল বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। চার মাযহাবের ইমামগণের মতে প্রথমবারের চুরিতে ডান হাত কব্জি থেকে কাটতে হবে। কেননা এ ডান হাত দিয়ে সাধারণত চুরির কাজ সম্পন্ন হয় এবং ধরা ছোঁয়ার কাজেও ডান হাতের ব্যবহার হয় বেশী। তাই চুরির অপরাধে ডান হাত কর্তন করাটাই অধিকতর যথার্থ শাস্তি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার চুরির শাস্তিঃ দ্বিতীয়বার চুরি করলে বাম পা কেটে ফেলতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলে মাকবুল (সা) এর হাদীসঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে মাকবুল (সা) বলেছেন, চোর চুরি করলে তার হাত কেটে দাও। এরপর আবার চুরি করলে তার পা কেটে দাও।[৩২] এতে প্রসিদ্ধ ইমামগণের কারো দ্বিমত নেই। তবে তৃতীয় বার চুরি করলে কি শাস্তি দেয়া হবে তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফি ও কতিপয় হাম্বলি ইমামের মতে তৃতীয় বারের চুরির শাস্তি হল কারাগারে আটক রাখা। তাঁদের বক্তব্য হল, তৃতীয় বারও যদি তাদের হাত পা কেটে ফেলা হয়, তাহলে জীবনে তার চলার ও বেঁচে থাকার আর কোন শক্তিই থাকবে না। এটা প্রকারান্তরে তাকে ধ্বংস করারই নামান্তর। হাদ্দের উদ্দেশ্য কাউকে ধ্বংস করা নয়, বরং অপরাধের প্রতি ভীতি তৈরি করাই হল হাদ্দের একান্ত উদ্দেশ্য।[৩৩]

---

২৯ *আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা,* খ. ২৪, পৃ. ৩২৯

৩০ আল কুরআন ৫: ৩৮ - والسارق والسا رقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم

৩১ ইবনু কুদামাহ, *আল মুগনী,* খ. ৯, পৃ. ১০৫-৬

৩২ ইবনু কুদামা, *আল মুগনী,* খ. ৯, পৃ. ১০৫-৬; দারু কুতনী, *আস সুনান* (কিতাবুল হুদুদ), হা. নং : ২৯২, اذا سرق السارق فا قطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجله -

৩৩ আস সারাখসী, *আল মাবসুত,* খ. ৯, পৃ. ১৪০-১; আল কাসানী, *বাদা'ই,* খ. ৭, পৃ. ৮৬-৮৭; ইবনু কুদামা, *আল মুগনী,* খ. ৯, পৃ. ১০৯-১১০

চুরির তা'যীরি শাস্তি

চুরি প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কোন শর্তে ত্রুটি দেখা দেয়ার কারণে বা অন্য কোন কারণে যদি চোরের উপর 'হাদ্দ' কার্যকর করা সম্ভব না হয়, তাহলে সে আদালতের সুবিবেচনা অনুযায়ী তা'যীরি শাস্তি ভোগ করবে।

চুরিকৃত মাল কিংবা তার মূল্য ফেরত দান

চুরিকৃত মাল যদি মজুদ থাকে, তাহলে চোর অবস্থাসম্পন্ন হোক বা দরিদ্রক্লিষ্ট থাকুক, চোরের হাত কাটা হোক বা না হোক, চুরিকৃত মাল চোরের কাছে থাকুক না অন্যের কাছে থাকুক, সকল অবস্থায় মাল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। এ বিষয়ে ইমামগণ একমত।[৩৪] হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাফওয়ান (রা) এর চাদর চুরির ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা) চোরের হাত কাটার পর চাদর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।[৩৫]

দুই. সশস্ত্র ডাকাতি ও লুণ্ঠনের শাস্তি

ধন সম্পদের নিরাপত্তা লাভ ব্যক্তি জীবনের উন্নতির প্রধান চাবি- কাঠি। তদুপরি সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতির জন্যও এটি মৌলিক প্রয়োজন হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্যের সম্পদের উপর যে কোন ধরনের সীমালঙ্ঘনকে ইসলাম চরমভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কারো অগোচরে তার সম্পদ হরণ করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি শক্তি প্রদর্শন করে দাপটের সাথে কারো সম্পদ লুট করাও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চুরিতে মানুষের জান ও ইযযত আব্রুর উপর আক্রমণ করা হয় না; কিন্তু ডাকাতি ও অপহরণের সময় মানুষের জান ও ইযযত আব্রু দু'য়ের উপরই নগ্ন হামলা করা হয়। তাই এর শাস্তিও স্বাভাবিকভাবে কঠোর হওয়া চাই। তাই ইসলামও এ অপরাধের জন্য অত্যন্ত কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে। তদুপরি এ ধরনের অপরাধীকে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধকারী ও যমিনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী রূপে আখ্যা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) হাদীসে উম্মতকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি অস্ত্র ধারণ করবে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[৩৬]

হিরাবাহ এর সংজ্ঞা

সশস্ত্র ডাকাতি ও লুণ্ঠনকে আরবিতে (حرابه) বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ হল যুদ্ধ কিংবা লুণ্ঠন ও অপহরণ। এটি (حرب) শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর 'রা' বর্ণ সাকিন হলে শাস্তির বিপরীত অর্থাৎ যুদ্ধ অর্থে

---

৩৪ ইবনু কুদামা, *আল মুগনী,* খ. ৫, পৃ. ১৭১; খ. ৯, পৃ. ১১৩-৪ - من حمل السلاخ علينا فليس منا

৩৫ আন নাসাঈ, (কিতাবু কাত'ইস সারিক), হা. নং: ৭৩৬৯

৩৬ আল বায়হাকী, *আস সুনান আল কুবরা* (বাব তাহরিমুল কাতল) হা. নং: ১৫৬৩৩

এবং 'রা' বর্ণ যবর যুক্ত হলে লুণ্ঠন ও অপহরণ অর্থে ব্যবহার করা হয়।[৩৭] শারী'আতের পরিভাষায় এর অর্থ হল, কারো সম্পদ অর্জন করা, কিংবা কাউকে হত্যা করা বা কারো ইযযত আব্রু নষ্ট করা অথবা ত্রাস সৃষ্টি কারার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় প্রকাশ্যে দাপটের সাথে কারো উপর চড়াও হওয়া।[৩৮] অধিকাংশ ইমামের মতে, এরূপ আক্রমণ যেখানেই হোক চাই তা শহর নগর গ্রাম জনপদে হোক কিংবা নির্জন পথে ঘাটে কিংবা মাঠে ময়দানে হোক বা তা হিরাবাহ (ডাকাতি) হিসেবে ধর্তব্য হবে।[৩৯]

ডাকাতির মূল উপাদান

প্রকাশ্যে অস্ত্র বা শক্তি প্রদর্শন করে কারো উপর চড়াও হয়ে তার সম্পদ হরণ করা। এ অস্ত্র ও শক্তি প্রদর্শনকারী চাই এক ব্যক্তি হোক কিংবা একদল। অতএব প্রকাশ্যে অস্ত্র বা শক্তি প্রদর্শন করে সম্পদ লুণ্ঠন করা না হলে তা ডাকাতি হবে না; চুরি হবে। আর যদি সম্পদ ছিনিয়ে পালিয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে ছিনতাইকারী বলা হবে। তাদের অপরাধ ডাকাতির আওতায় আসবে না।[৪০]

ডাকাতির শর্তাবলী

ডাকাতির 'হাদ্দ' প্রয়োগ করার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু ডাকাতের সাথে, আর কিছু যাদের উপর হানা দেয়া হয় তাদের সাথে, আর কিছু উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাছাড়া ডাকাতি কৃত সম্পদ এবং যে স্থানে ডাকাতি করা হয় তার সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় শর্তও রয়েছে।

ডাকাতের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

(ক) মুসলিম কিংবা যিম্মি হতে হবে;

(খ) প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে;

(গ) পুরুষ হতে হবে;

(ঘ) ডাকাতদেরকে সশস্ত্র হতে হবে।

---

[৩৭] ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, খ. ১, পৃ. ৩০৪

[৩৮] মুহাম্মদ ইবনু আরাফাহ, *আল হুদুদ*, পৃ. ৫০৮; যাকারিয়া আল আনসারি, *আল গুরর আল বাহিইয়্যা*, খ. ৫, পৃ. ১০১; আল মারদাভী, *আল ইনসাফ*, খ. ১০,পৃ. ২৯১; আল রাজী, *আল মুন্তকা*, খ. ৭, পৃ. ১৬৯

[৩৯] আস সারাখসী, *আল মাবসুত*, খ. ৯, পৃ. ২০১-২; ইবনু কুদামা, *আল মুগনী*, খ. ৯, পৃ. ১২৪

[৪০] আল কাসানী, *বাদা'ই*, খ. ৭, পৃ. ৯০-১; ইবনু কুদামা, *আল মুগনী*, খ. ৯, পৃ. ১২৪; আল বহুতি, *কাশশাফ*, খ. ৬, পৃ. ১৫০

আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

(ক) মুসলিম বা যিম্মি হতে হবে;

(খ) সম্পদের উপর তাদের যথার্থ মালিকানা থাকতে হবে।

ডাকাত ও আক্রান্ত ব্যক্তি দু'পক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্ত

ডাকাত ও আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত সম্পর্কীয় আত্নীয় হবে না।

লুটকৃত সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

(ক) আর্থিক মূল্যসম্পন্ন হওয়া;

(খ) কারো মালিকানা বা বৈধ দখলভুক্ত হওয়া;

(গ) সংরক্ষিত থাকা;

(ঘ) নিসাব পরিমাণ হওয়া।[৪১] অর্থাৎ দশ দিরহামের সমপরিমাণ কিংবা ততোধিক হওয়া। যদি ডাকাতরা ভাগে প্রত্যেকেই নুন্যতম দশ দিরহামের সমপরিমাণ সম্পদ না পায়, তাহলে সম্পদ লুটের জন্য তাদের কারো উপর ডাকাতির হাদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না।[৪২]

স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

(ক) ইসলামী রাষ্ট্রে হতে হবে;

(খ) শহরের বাইরে হতে হবে।

ডাকাতির শাস্তি

ইসলামী শারী'আতে সশস্ত্র ডাকাত ও লুটেরাদের সুনির্দিষ্টভাবে চার ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। হত্যা করা, শূলবিদ্ধকরণ, হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা ও দেশ থেকে চির নির্বাসন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যে সব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালায় এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে তাদের শাস্তি হচ্ছে তাদের হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে কিংবা তাদের

---

৪১ আল কাসানী, *বাদা'ই*, খ. ৭, পৃ. ৯২

৪২ *যায়ল'ঈ, তাবয়ীন, খ. ৩, পৃ. ২৩৬; আল হাদ্দাদী, আল জাওয়ারাহ্*, খ. ২, পৃ. ১৭২

হাত ও পা বিপরীত পরম্পরায় কেটে ফেলা হবে কিংবা তাদের নির্বাসিত করা হবে। এই অপমান তো তাদের জন্য দুনিয়ায় আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি" ।[৪৩]

"The recompense of those who wage war against Allah and His Messenger and do mischief in the land is only that they be killed or crucified or their hands and their feet be cut off from opposite sides, or be exiled from the land. That is their disgrace in this world, and a great torment is theirs in the Hereafter." (Surah 5. Al-Maidah. Part 6. Ayat 33).

উপর্যুক্ত আয়াতটিতে আল্লাহ ও রাসূল (সা) তথা তাঁদের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামী এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের চার ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ইমামগণের মধ্যে তাদেরকে এ শাস্তিগুলো দেয়ার ব্যাপারে কোন দ্বি- মত নেই। তবে এ চারটি শাস্তি অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা অনুপাতে প্রয়োগ করা হবে, নাকি বিচারকের সুবিবেচনা অনুযায়ী এ শাস্তিগুলোর মধ্য থেকে যে কোন একটি শাস্তি দেয়ার ইখতিয়ার রয়েছে তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম শাফি'ঈ ও হাম্বলিগণের মতে অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা অনুপাতে এ শাস্তিসমূহের কোন একটি প্রয়োগ করতে হবে। যেমন যে হত্যা কাণ্ড ঘটাল, ধন সম্পদও অপহরণ করল তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে। আর যে হত্যা করল; ধন মাল অপহরণ করল না, তাকে শুধু হত্যা করা হবে। আর যে ধন মাল অপহরণ করল, হত্যা কাণ্ড ঘটাল না, তার দান হাত ও বাম পা কেটে ফেলা হবে। আর যে লোক ত্রাস সৃষ্টি করল; হত্যা বা ধন মাল অপহরণ কিছুই করল না, তাকে নির্বাসিত করা হবে।

পক্ষান্তরে হানাফি ও মালিকি ইমামগণের মতে, বিচারক এ চারটি শাস্তির যে কোন একটি এ পর্যায়ের যে কোন অপরাধে প্রয়োগ করতে পারেন। কৃত অপরাধের দৃষ্টিতে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী তা নির্ধারণ করবেন। ইমাম আবূ হানিফা (রহ) এর মতে হত্যা কাণ্ড ঘটানোর কিংবা কারো কোন ধন মাল ছিনিয়ে নেয়ার আগে কোন ডাকাতকে গ্রেফতার করা হলে তাকে তা'যীরের আওতায় যে কোন উপযুক্ত শাস্তি দেবার পর তাকে কারাবন্দি করে রাখা হবে, যে যাবত না সে বিশুদ্ধ তাওবাহ করবে এবং তার প্রমাণ মিলবে।

ইমাম মালিক (রহ) এর মতে যদি কেউ হত্যাকাণ্ড ঘটায়, তাহলে তো তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। তাঁর দৃষ্টিতে এ পর্যায়ের অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীর হাত পা কর্তন এবং নির্বাসন দণ্ড দেয়ার এখতিয়ার

---

[৪৩] আল কুরআন, ৫: ৩৩ *انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض- ذالك لهم خزي فى الدنيا ولهم فى الاخرة عذاب عظيم-*

Dhaka University Institutional Repository

বিচারকের থাকবে না; তবে তাকে শূলে চড়ানো ও হত্যা করার মধ্যে যে কোন একটি কার্যকর করার এখতিয়ার তাঁর থাকবে।

ডাকাতের তাওবাহ

ডাকাতির শাস্তি যেহেতু হাদ্দের পর্যায়ভুক্ত এবং এর সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত, তাই ডাকতকে আক্রান্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের অথবা সরকারের ক্ষমা করে দেয়ার এখতিয়ার নেই। তবে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়ার আগেই যদি সে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বিশুদ্ধ তাওবাহ করে ভাল হয়ে যায় এবং এর প্রমাণও মিলে, তবেই এই তাওবাহ তাকে নির্ধারিত শাস্তি থেকে রেহাই দেবে। তবে মানুষের অধিকারের সাথে যা কিছু জড়িত তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দাবির উপর নির্ভরশিল। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "কিন্তু যারা তোমাদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই তাওবাহ করবে, জেনে রেখো আল্লাহ তা'আলা মহা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু"।[৪৪]

Except for those who (having fled away and then) came back (as Muslims) with repentance before they fall into your power; in that case, know that Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful. (Surah 5. Al-Maidah. Part 6. Ayat 34).

এ আয়াতে যে ক্ষমার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঐ অপরাধের দরুন আল্লাহর অবাধ্যতা যতটা করেছে তার জন্য। এ কারণে ডাকাতির 'হাদ্দ' হিসেবে হয়ত তার হাত পা কাটা যাবে না বা হত্যার হাত থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু জনগণের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন প্রাণ নাশ, যখম ও ধন মাল লুট ইত্যাদি তা কখনো ক্ষমা হবে না। আল্লাহ মাফ করবেন না। সে ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট লোকদের সাথে জড়িত।

তিন. জোর করে সম্পদ অপহরণের শাস্তি

জীবন ও ইযযত আব্রুর মত সম্পদও মানুষের জন্য একটি পবিত্র বস্তু। রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেনঃ "তোমাদের জীবন, ইযযত আব্রু ও সম্পদ পবিত্র বস্তু, যেগুলোর উপর হস্তক্ষেপ করা হারাম"।[৪৫] ইসলামের দৃষ্টিতে কারো সম্পদ সামান্য পরিমাণ হলেও অন্যায়ভাবে দখল করা, ছিনিয়ে নেয়া ও ভোগ করা মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে ঈমানদার! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষন কর না তবে ব্যবসার মাধ্যমে পরস্পরের সম্মতিতে খেতে পার"।[৪৬]

---

[৪৪] আল কুরআন, ৫: ৩৪ - الا الذين تابوا من قبل ان تقد روا عليهم فا علموا ان الله غفور رحيم

[৪৫] আহমাদ, আল মুসনাদ, হা. নং: ২৩৫৩৬; তাবারানী, আল মু'জামুল কবীর, হা. নং- ৫৩৮

[৪৬] আল কুরআন, 8: ২৯ - يا يها الذين امنوا لا تا كلوا اموالكم بينكم با الباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

"O you who believe! Eat not up your property among yourselves unjustly except it be a trade amongst you, by mutual consent. And do not kill yourselves (not kill one another). Surely, Allah is Most Merciful to you. (Surah 4. An-Nisa'. Part 5. Ayat 29).

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ "কারো সন্তুষ্টি ছাড়া তার সম্পদ ভোগ করা মোটেই বৈধ নয়"।[৪৭]

গছব غصب এর সংজ্ঞা

জোর করে অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেয়াকে আরবিতে غصب বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ কোন কিছু অন্যায়ভাবে জোর করে ছিনিয়ে নেয়া। ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায় কোন বালিগ ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক অপরের অধিকারভূক্ত সম্পদ অন্যায়ভাবে জোর করে অপহরণ করাকে غصب বলা হয়।[৪৮] ইমাম আবূ হানিফা এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) এর মতে غصب এর সংজ্ঞা হল কারো প্রকাশ্যে জবরদস্তিমূলক হস্তক্ষেপের ফলে আর্থিক মুল্যবিশিষ্ট সম্পদ থেকে মালিকের দখলস্বত্ব অপসারিত হওয়া" ।[৪৯]

غصب এর প্রকৃতি

কোন প্রকৃতির অপহরণ শারী'আতে غصب রূপে গণ্য হবে তা নিয়ে ইমামগণের দু'টি মত পাওয়া যায়।

১। অধিকাংশ ইমামের মতে, কারো সম্পদ তার অনুমতি ছাড়া কেবল জোর করে করায়ত্ব করলেই غصب সাব্যস্ত হবে। চাই তাতে মালিকের দখলস্বত্ব বজায় থাকুক বা না থাকুক।

২। ইমাম আবূ হানিফা ও আবূ ইউসূফ (রহ) প্রমুখের মতে, কারো সম্পদ অপহরণকারীর ছিনিয়ে নেবার পর যদি মালিকের দখলস্বত্ব চলে যায়, তাহলেই غصب সাব্যস্ত হবে।[৫০]

অপহরণকারীর শাস্তি

অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনা করে বিচারক অপহরণকারীকে কারাদণ্ড কিংবা বেত্রাঘাত অথবা উভয়বিধ শাস্তি দিতে পারে। উল্লেখ্য যে, অপহরণের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির অধিকার যেমনি খর্ব হয়, তেমনি জনস্বার্থও

---

৪৭ আহমাদ, *আল মুসনাদ*, হা. নং- ২৩৫৩৬; দারু কুতনী, *আস সুনান*, (কিতাবুল বুয়ু) হা. নং- ৯১

৪৮ আল কাসানী, *বাদা'ই*, খ. ৭, পৃ. ১৪৩ - ازالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغا لبة بفعل فى المال

৪৯ আল কাসানী, *বাদা'ই, খ.. ৭, পৃ. ১৪৩* - ازالة يد المالك عن المتقوم على سبيل المهاجرة والمغالبة بفعل فى المال

৫০ আল কাসানী, *বাদা'ই*, খ. ৭, পৃ. ১৪৩

বিঘ্নিত হয়। তাই অপহরণের মামলা আদলতে উপস্থাপিত হবার পর সম্পদের মালিক যদি তাকে ক্ষমাও করে দেয়, তাহলেও বিচারক জনস্বার্থ বিবেচনা করে এবং সমাজে সার্বিক ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার খাতিরে শাস্তি কার্যকর করবে; তাকে ক্ষমা করে দিবে না।[৫১]

উপরন্তু অপহৃত বস্তু যদি অপহরণকারির দখলে থাকে, তাহলে তাও মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের কোন বস্তু গ্রহণ না করে, খেলাচ্ছলেও নয় এবং বাস্তবিকভাবে তো নয়ই। যদি কেউ তার ভাইয়ের ছড়িও নেয়, সে যেন তা ফিরিয়ে দেয়"।[৫২] অপহৃত বস্তু যদি নষ্ট হয়ে যায় কিংবা ক্ষতিগ্রস্থ বা হারিয়ে যায়, তাহলে অপহৃত বস্তুর হুবহু সমজাতীয় ও সমমানের বস্তু পাওয়া গেলে মালিককে ক্ষতিপূরণ হিসেবে তা- ই দিতে হবে। আর যদি অপহৃত বস্তুর হুবহু সমজাতীয় ও সমমানের বস্তু পাওয়া না যায়, তাহলে মালিককে অপহৃত বস্তুর মূল্য ফেরত দিতে হবে।[৫৩] মূল্য ফেরত দেয়ার ক্ষেত্রে অপহরণের দিনে বস্তুর যে মূল্য ছিল তা- ই বিবেচনায় নিতে হবে। এটা হানাফি ও মালিকিগণের অভিমত। শাফি'ঈগণের মতে, সম্পদ অপহরণের দিন থেকে ধ্বংস হবার সময় পর্যন্ত যে চড়া দামটি ছিল, তা- ই পরিশোধ করতে হবে। হাম্বলিগণের মতে, সম্পদ নষ্ট হবার দিনের মূল্যকে বিবেচনায় নিতে হবে।[৫৪] উল্লেখ্য যে, সম্পদ যে জায়গা থেকে অপহরণ করা হয়েছে, ঠিক সে জায়গায় পৌঁছিয়ে দিতে হবে। কেননা অনেক সময় স্থানবেধে জিনিসের মূল্যের মধ্যে তফাৎ হয়ে থাকে। আর পৌঁছানোর যাবতিয় ব্যয়ভার অপহরণকারীকেই বহন করতে হবে।[৫৫]

غصب এর প্রমাণ পদ্ধতি

চুরি ও ডাকাতির মত সাধারণতঃ যথাযথ সাক্ষ্য প্রমাণ কিংবা অপহরণকারীর স্বীকারোক্তি দ্বারা অপহরণ প্রমাণিত হবে। তবে কারো কারো মতে শপথের সাহায্যে এবং বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারাও অপহরণ প্রমাণ করা যেতে পারে।[৫৬]

১। সাক্ষ্য প্রমাণ ২। মৌখিক স্বীকৃতি ৩। শপথ ৪। লক্ষণ প্রমাণ।

---

৫১ *আল মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যা, খ. ৩১, পৃ. ২৩৫; ইবনু আবিদীন, আল 'উকুদ* খ. ২, পৃ. ১৬১; ইবনু ফারহুন, *তাবছিরাহ,* খ. ২, পৃ. ২০৯

৫২ আবূ দাউদ, হা. নং- ৫০০৩; বায়হাকী, *আস সুনানুল কুবরা,* হা. নং:- ১১২৭৯, ১১৩২৪ لا ياخذن احدكم متاع اخيه لاعبا ومن اخذ عصا اخيه فليردها -

৫৩ আল কাসানী, *বাদা'ই,* খ. ৭, পৃ. ১৪৮-১৫১

৫৪ আস সারাখসী, *আল মাবসুত,* খ. ১১, পৃ. ৪৯; আল কাসানী, *বাদ'ই,* খ. ৭, পৃ. ১৫০-১

৫৫ আস সারাখসী, *আল মাবসুত,* খ. ১১ পৃ. ৫৩; ইবনু নুজায়ম, *আল বাহরুর রা'ইক,* খ. ৮, পৃ. ১২৪

৫৬ আল কাসানী, *বাদা'ই,* খ. ৭, পৃ. ২১৪

১। সাক্ষ্য প্রমাণ

অপহরণ প্রমাণের জন্য দু'জন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম পুরুষের সাক্ষ্যের প্রয়োজন। সাক্ষী যদি দু'জনের কম হয় অথবা একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং অপরজন শ্রোতা সাক্ষী হয়, অথবা একজন পুরুষ সাক্ষী ও দু'জন মহিলা সাক্ষী হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে অভিযুক্তকে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া হবে।

২। মৌখিক স্বীকৃতি

অপহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় আদালতে বিচারকের সামনে অপহরণের সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি করে তাহলে অপহরণ প্রমাণিত হবে।

৩। শপথ

যখন অপহরণকৃত সম্পদের মালিকের দাবির পক্ষে কোন সাক্ষী থাকে না, আর অপহরণকারীও স্বীকার করে না, তখন অপহরণকারীকে শপথ করতে বলা হবে। যদি সে শপথ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন সম্পদের মালিককে শপথ করতে বলা হবে। যদি সে দাবির পক্ষে শপথ করে বলে, তাহলে শাফি'ঈগণের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী মালিকের এ শপথ দ্বারা অপহরণ প্রমাণিত হবে এবং এ জন্য অপহরণকারী শাস্তিযোগ্য হবে। তবে হানাফি, মালিকি ও হাম্বলি ইমামাগণের নিকট এরূপ অবস্থায় অপহরণ প্রমাণিত হবে না এবং এ জন্য অপহরণকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

৪। লক্ষণ প্রমাণ

কারো কারো মতে বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারাও অপহরণ প্রমাণিত হবে, যদি তাতে সুস্পষ্টভাবে অপহরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ভিত্তিতে অপহরণকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে এবং তাকে মালের ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। কেননা সাক্ষ্য ও অপহরণকারীর স্বীকারোক্তির চাইতে অপহরণ সাব্যস্ত করার জন্য সুস্পষ্ট লক্ষণ অধিকতর শক্তিশালী প্রমাণ। কারণ সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তি যেহেতু এক প্রকার সংবাদ দান, তাই এগুলোর মধ্যে সত্য মিথ্যার একটা অবকাশ সব সময় বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে অপহরণকৃত মাল অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে পাওয়া গেলে তাতে অপহরণের ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকবার কথা নয়।

মানব অপহরণ

যদি কেউ অপর কোন মানুষকে ছোট হোক বা বড় অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে কোন কাজে খাটায়, তাহলে তাকে তার কাজের যথাযথ পারিশ্রমিক আদায় করে দিতে হবে। আর যদি কোন কাজে না খাটিয়ে কেবল আটকে রাখা হয়, তাহলেও অপহরণকারী তার উপার্জনের মূল্যবান সময় নষ্ট করেছে, তাই তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[৫৭] যদি অপহৃত ব্যক্তি অপহরণকারীর কাছে থাকা কালে কোন কারণে নিহত হয় কিংবা হিংস্র কোন প্রাণীর আঘাতে বা সাপের দংশনে মারা যায় অথবা দেয়াল বা ছাদ থেকে পরে গিয়ে মারা যায়, তাহলে তার রক্তপণ আদায় করতে হবে। যদি হঠাৎ কিংবা জ্বরে মারা যায়, তাহলে তার রক্তপণ আদায় করতে হবে না।[৫৮] যদি কেউ কোন মহিলাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে, তাহলে অপহরণকারীর উপর যিনার হাদ্দ কার্যকর করতে হবে। অধিকন্তু তাকে মহিলাটির যথাযোগ্য মোহর সমপরিমাণ জরিমানা আদায় করতে হবে।[৫৯]

চার. যিনার শাস্তি

যিনা অত্যন্ত জঘন্য ও কুৎসিত একটি অপরাধ, যা সমাজে চরম নৈতিক বিপর্যয় ও চরম লাম্পট্য সৃষ্টি করে এবং পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। এটা ব্যাপকভাবে সমাজে প্রসার লাভ করলে যুবক যুবতীরা সনাতন বিবাহ পদ্ধতিতে জড়িত না হয়ে পশুদের মত পাশবিক যৌনতায় মেতে উঠে। বর্তমানে পশ্চিমা সমাজে যৌন স্বাদ আস্বাদনের কোন সীমা বা নৈতিক বিধি নিষেধের পরোয়া করা হয় না। যিনা সে সমাজে নিতান্ত ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার রূপে গণ্য। এ কারণেই সেখানে পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তদুপরি এ অবৈধ যৌনকর্ম এইডস নামক ঘাতক ব্যাধির জন্ম দিয়েছে। এর ফলেই আজ বিশ্বের সচেতন জন সমাজ যিনা পরিহার করে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বিবাহের মাধ্যমে যৌনকর্ম সমাধানের জন্য প্রতিনিয়ত আহবান জানাচ্ছে। সকল ধর্মেই অভিন্নভাবে যিনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে; তবে ইসলামী আইনে এর বীভৎস কদর্যতাকে অত্যন্ত প্রকট করে তুলেছে এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। এর নিকট যেতেও কঠিন ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা যিনার কাছেও যেয়ো না। কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও খুব বেশি খারাপ পথ"।[৬০]

---

[৫৭] ইবনু কুদামাহ, *আল মুগনী*, খ. ৫, পৃ. ১৭৫

[৫৮] যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন*, খ. ৬, পৃ. ১৬৬

[৫৯] *আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা*, খ. ৩১, পৃ. ১৪৮

[৬০] আল কুরআন, ১৭: ৩২ - ولا تقربوا الزنا انه كان فا حشة وسا سبيلا

Dhaka University Institutional Repository

"And come not near to the unlawful sexual intercourse. Verily, it is a Fahishah (i.e anything that transgresses its limits a great sin), and an evil way (that leads one to Hell unless Allah forgives him)." (Surah 17. Al-Isra'. Part 15. Ayat 32).

একজন ঈমানদারের জন্য তা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ "কোন ব্যক্তি যখন যিনায় লিপ্ত হয় তখন তার ঈমান বের হয়ে যায়"।[৬১]

যিনার সংজ্ঞা

যিনার আভিধানিক অর্থ হল পাপকর্ম করা। সাধারণ অর্থে যিনা বলতে নারী পুরুষের অবৈধ যৌনমিলনকে বুঝানো হয়। ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায় বিশুদ্ধ বৈবাহিক বন্ধন কিংবা সন্দেহ জনিত বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া বালিগ ও সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন দু'জন নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্মতিতে নারীর সামনের যৌনাঙ্গ দিয়ে পুরুষের সঙ্গম ক্রিয়াকে যিনা বলা হয়।[৬২]

পূর্ববর্তী ধর্মসমূহে যিনার শাস্তি

ইসলামে বিবাহিত নর নারীর ব্যভিচারের শাস্তি হল রজম (প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা)। কিন্তু এ শাস্তি নতুন ভাবে ইসলামে প্রবর্তন করা হয়নি; বরং তাওরাতেও এ শাস্তির কথা বর্ণিত রয়েছে।[৬৩] আর তাওরাতের যে বিধানগুলো রহিত হয়নি, সেগুলো পরবর্তীতে অবতীর্ণ ইঞ্জিলের বিধান রূপেও গণ্য হয়ে থাকে। তাওরাতে অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়েছে, তা সত্ত্বেও আজকের তাওরাতে সেই রজমের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে।[৬৪] তবে বর্তমানে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা এ শাস্তি কার্যকর করে না। তাতে অবশ্য এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না।

ইসলামে যিনার শাস্তির ক্রমবিবর্তন

ইসলামের আবির্ভাবের সময় আরব সমাজে যিনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এ অবৈধ যৌনচর্চায় কলুষিত সমাজকে সফলভাবে সংশোধন করার দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলামে প্রথমবারেই তার চূড়ান্ত শাস্তির বিধান জারি করা হয়নি; বরং তা ক্রমে ক্রমে জারি হয়েছে, যাতে জনগণের পক্ষে তা গ্রহণ করা সহজ হয়। ইসলামের প্রথম দিকে বিবাহিতের ব্যভিচারের শাস্তি ছিল গৃহবন্দী করে রাখা। আর অবিবাহিতের শাস্তি ছিল কথা ও

---

[৬১] আবু দাউদ, *(কিতাবুস সুন্নাহ),* হা. নং: ৪৬৯০; আল হাকিম, *আল মুস্তাদরাক,* হা. নং- ৫৬ - اذا زنى الرجل خرج منه الايمان

[৬২] *আল কাসানী, বাদা'ইউস সানা'ই, খ. ৭, পৃ. ৩৩-৪*

[৬৩] সহীহ আল বুখারী, *(কিতাবুল মানাকিব),* হা. নং- ৩৪৩৪

[৬৪] পুরাতন নিয়ম, দ্বিতীয় বিবরণ, সূত্র ২১, ২২ ও ২৩

কাজের সাহায্যে কিংবা বেত্রাঘাত কষ্টদান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমাদের যে সব মহিলা নির্লজ্জতার কাজ করবে, তোমাদের মধ্য থেকে তাদের এ অপকর্মের চারজন সাক্ষী কায়েম কর। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাদেরকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখ, যতক্ষণ না তারা মৃত্যুবরণ করবে অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন উপায় বের করে দেন। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন এ নির্লজ্জতার কাজ করবে, তাদেরকে কষ্ট দাও। তবে তারা যদি তাওবাহ করে নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদেরকে আর কষ্ট দিওনা। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিঃসন্দেহে তাওবাহ কবুলকারী ও অতিশয় মেহেরবান।[৬৫]

And those of your women who commit illegal sexual intercourse, take the evidence of four witnesses from amongst you against them; and if they testifine them (i.e. women) to houses until death comes to them or Allah ordians for them some (other) way.

And the two persons (man and women) among you who commit illegal sexual intercourse, hurt them both. And if they repent (promise Allah that they will never repeat, i.e. commit illegal sexual intercourse and other similar sins) and do righteous good deeds, leave them alone. Who forgives and accepts repentance), and He is) Most Mrciful. (Surah 4. A-Nisa'. Part 4. Ayat 15-16).

এখানে প্রথম আয়াতে من نسائكم বলে বিবাহিতদেরকেই বুঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে واللذان يا تيانها দ্বারা অবিবাহিত নারী পুরুষদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ দু'আয়াতে দু'ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এ দু'ধরনের শাস্তির মধ্যে একটি ছিল অধিকতর কঠোর। আর তা বিবাহিতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অপর শাস্তিটি ছিল হালকা। আর তা অবিবাহিতের জন্য প্রযোজ্য ছিল।

এ আয়াতে ব্যভিচারিণীদেরকে গৃহবন্দি করে রাখতে বলা হয়েছে, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অন্য কোন বিহিত ব্যবস্থা নির্দেশ করেন। এ থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, এ বিষয়ে অচিরেই একটি চূড়ান্ত বিধান অবতীর্ণ হবে। পরে সে বিধান নাযিল হয়েছে। হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, "তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর, তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য একটি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তা হল অবিবাহিত যুবক যুবতীদের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন এবং বিবাহিতদের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা"।[৬৬]

---

[৬৫] আল কুরান, 8: ১৫-১৬ والتي ياتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفهن الموت اؤ يجعل الله لهن سبيلا – والذان ياتينها منكم فاذو هما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما -

[৬৬] সহীহ মুসলিম, *(কিতাবুল হুদুদ)*, হা. নং: ১৬৯০; আবূ দাউদ, *(কিতাবুল হুদুদ)*, হা. নং- 88১৫

এ হাদীস থেকে জানা যায় যিনাকারীর অবস্থার পার্থক্যের কারণে যিনার শাস্তির মধ্যেও তারতম্য হবে। বিবাহিতের যিনার শাস্তি অবিবাহিতের তুলনায় অত্যন্ত কঠিন ও অধিকতর মর্মন্তুদ। এর কারণ এটা হতে পারে যে, অবিবাহিতের হালাল পথে যৌনস্পৃহা পূরণের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই তাদের দ্বারা তা সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে করা যায় না। অপরদিকে বিবাহিত নারী পুরুষের যেহেতু হালাল পথেই তাদের যৌন বাসনা পূরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা রয়েছে, তাই সে ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে বাইরে গিয়ে যিনা করার মানে হল তাদের মনের মধ্যে অন্যায় প্রবণতা বাসা বেঁধেছে, যা মূলোৎপাটন করা একান্তই জরুরী। এ কারণেই তাদের শাস্তি তুলনামূলক অধিকতর কঠিন হওয়াই যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক।

অবিবাহিতের যিনার শাস্তি

অবিবাহিত বালিগ ও বুদ্ধিমান মুসলিম নারী হোক বা পুরুষ, যদি যিনা করে, তার শাস্তি হল একশতটি বেত্রাঘাত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "ব্যভিচারি পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারী তাদের প্রত্যেককে একশতটি করে বেত্রাঘাত কর।[৬৭]

"The women and the man guilty of illegal sexual intercourse, flog each of them with a hundred stripes." (Surah 24. An-Nur. Part 14. Ayat 2).

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ "অবিবাহিত নারী পুরুষ যিনা করলে একশত বেত্রাঘাত"।[৬৮] এই বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। তবে শাস্তির অংশ হিসেবে ব্যভিচারি নারী পুরুষকে বেত্রাঘাত করার পরও একবছরের জন্য নির্বাসিত করতে হবে কিনা তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিরাট মতপার্থক্য রয়েছে। হানাফিগণের মতে, ব্যভিচারি নারী হোক বা পুরুষ এক বছরের নির্বাসন দণ্ড দেয়া ওয়াজিব নয়। শাফি'ঈ ও হাম্বলিগণের মতে ব্যভিচারি পুরুষ হোক বা নারী তাকে এক বছরের জন্য অবশ্যই নির্বাসিত করতে হবে। তাঁদের প্রধান দলিল হল ইতোপূর্বে বর্ণিত হযরত উবাদাহ ইবনু সামিত (রা) এর হাদীস, যা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অবিবাহিত ব্যভিচারি নারী হোক বা পুরুষ প্রত্যেককে এক বছরের জন্য নির্বাসন দণ্ড দিতে হবে।[৬৯] হানাফিগণের মতে কেবল ব্যভিচারি পুরুষকেই এক বছরের জন্য নির্বাসনের দণ্ড দেয়া ওয়াজিব। মহিলাদের জন্য নির্বাসন দণ্ড প্রযোজ্য নয়। তাঁদের বক্তব্য হল মহিলাদেরকে দূরে নির্বাসন দেয়া হলে সে সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত হয়ে যাবে। সে কোথায় থাকবে, কিভাবে দিন কাটাবে, তা একটি কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দিবে। তদুপরি তাকে একাকি অবস্থায়ও পাঠানো সম্ভব নয়। কোন গায়রে মুহরামের সাথে নির্বাসনে পাঠানো হলে,

---

[৬৭] আল কুরআন, ২৪: ২ *الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماة جلدة*-

[৬৮] সহীহ মুসলিম, *(কিতাবুল হুদূদ)*, হা. নং: ১৬৯০; আবূ দাউদ, *(কিতাবুল হুদূদ)*, হা. নং- ৪৪১৫ - *البكر بالبكر جلد ماة*

[৬৯] শাফিঈ, *আল উম্ম*, খ. ৭, পৃ. ১৭১; আল আনসারি, *আহসান মাতালিব*, খ. ৪, পৃ. ১২৯; আল মারদাভী, *আল ইনসাফ*, খ. ১০,পৃ. ১৭৩-৪; আল বহুতী, *কাশশাফ*, খ. ৬, পৃ. ৯১-২

তাকে চরম ব্যভিচারের পথে ঠেলে দেয়া হবে। আর কোন মুহরামকে তার সাথে নির্বাসিত করা হলে, তা হবে যে অপরাধী নয় তাকে শাস্তি দান করা।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, বিচারক প্রয়োজন ও কল্যাণকর মনে করলে এক বছরের জন্য নির্বাসন দণ্ড দিতে পারবে। এতে কারো কোন দ্বি-মত নাই। তবে বর্তমানে বিভিন্ন দেশের যে পরিবেশ তাতে তাদেরকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে নির্বাসনে পাঠানো হলে সংশোধনের পরিবর্তে তাদের আরো অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠার আশঙ্কা রয়েছে বেশী। যদি একান্ত প্রয়োজনই হয় তাহলে তাদেরকে নির্বাসনের পরিবর্তে এক বছরের জন্য কারাগারে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আটক রাখা যেতে পারে। এতে নির্বাসনের উদ্দেশ্যও অর্জিত হবে।

বিবাহিতের محصن যিনার শাস্তি

এখানে محصن বলতে বুঝানো হয়েছে বালিগ, বুদ্ধিমান, মুসলিম ও স্বাধীন, মুসলিম ও স্বাধীন ব্যক্তি যে বিশুদ্ধ নিয়মে বিয়ে করল এবং একবার হলেও স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করল। সুতরাং নাবালেগ, পাগল ও কাফির বিয়ে করলেও মুহসান রূপে গণ্য হবে না। অনুরূপভাবে অশুদ্ধ বিবাহ দ্বারাও মুহসান গণ্য হবে না। বিশুদ্ধ বিয়ের পর যৌন সঙ্গম না হলেও মুহসান বিবেচিত হবে না।[৭০] মুহসান পুরুষ বা নারী যিনা করলে তার শাস্তি হল 'রজম' (প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা)। এ শাস্তির বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (সা) এর কথা ও কাজ উভয় দিক থেকে সন্দেহাতিত ভাবে পাওয়া গেছে। ইতোপূর্বে হযরত 'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা) এর বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছেঃ "বিবাহের শাস্তি বেত্রাঘাত ও রজম"।[৭১]
উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, বিবাহিত নারী পুরুষ যিনা করলে তার শাস্তি রজম; কিন্তু তার পূর্বে তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে কিনা তা নিয়ে ইমামগণের নিকট কিছুটা মতভেদ আছে। তবে চার মাযহাবের ইমামগণের সর্বস্বীকৃত মত হল বিবাহিতদেরকে শুধু রজমই করতে হবে; বেত্রাঘাত নয়।[৭২]

খুলাফায়ে রাশীদুনের যুগে বিবাহিতদের যিনার কিছু সংখ্যক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কোন ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা) ও খুলাফায়ে রাশীদুন রজমের পূর্বে বেত্রাঘাতের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন এ ধরনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, বিবাহিতদের শাস্তি রজমের উপর ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রজম কার্যকর করার পদ্ধতি

(১) রজমের দণ্ডপ্রাপ্ত পুরুষকে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে। তাকে শক্ত ভাবে বাঁধার কিংবা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে তাকে দাঁড় করানোর প্রয়োজন নাই। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে

---

৭০ আস সারাখসী, *আল মাবসুত*, খ. ৯, পৃ. ৩৯-৪০; ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ৪, পৃ. ১৭-১৮

৭১ সহীহ মুসলিম, *(কিতাবুল হুদূদ)* হা. নং- ১৬৯০ - والثيب بالثيب جلد ماة والرجم

৭২ আশ শাফি'ঈ, *আল উম্ম*, খ. ৬, পৃ. ১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হযরত মা'ইয (রা) কে রজম করার নির্দেশ দিলেন, তখন আমরা তাকে বাকি'র দিকে নিয়ে গেলাম। তার জন্য আমরা গর্তও খনন করিনি, তাকে বাঁধিওনি।[৭৩]

(২) যিনা যদি সাক্ষ্য প্রমাণযোগে প্রমাণিত হয়, তাহলে শাস্তি দানের অনুস্থানে সাক্ষীদের উপস্থিত থাকতে হবে এবং তারাই সবার আগে প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করবে। যদি তারা প্রস্তর নিক্ষেপ করতে অস্বীকার করে, তাহলে হাদ্দ রহিত হয়ে যাবে। এটা হানফিগণের অভিমত। অন্যান্যদের মতে সাক্ষীদের উপস্থিতি জরুরী নয়।[৭৪]

(৩) প্রস্তর নিক্ষেপের সময় কেউ পালিয়ে যেতে থাকলে তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে হত্যা করতে হবে। কারো কারো মতে, যদি পালানোর আশঙ্কা থাকে, তাহলে তাকে কোন কিছুর সাথে বেঁধে রেখে কিংবা গর্ত খুঁড়ে সেখানে দাঁড় করিয়ে প্রস্তর নিক্ষেপ করা যাবে। তবে সে স্বেচ্ছায় স্বীকৃতিদানকারী বিভিচারি হলে তার পশ্চাদ্ধাবন করা যাবে না; তার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ স্থগিত রাখতে হবে। কেননা তার এ পলায়ন তার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয়ার ব্যাপারে সন্দেহের জন্ম দেয়।[৭৫]

(৪) বিশাল খোলামেলা জায়গায় রজম কার্যকর করা দরকার, যাতে কারো গায়ে কোন চোট লাগা ছাড়াই সহজে প্রস্তর নিক্ষেপ করা যায়। এ সময় বিপুল সংখ্যক মুসলিমজনতার উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। শাসক কিংবা তার কোন প্রতিনিধি এ সময় উপস্থিত থাকবেন। লোকজন নামাযের কাতারের মত বিভিন্ন সারিতে ভাগ হয়ে দাঁড়াবে। একদল প্রস্তর নিক্ষেপ করার পর পেছনে সরে যাবে আর অন্য এক দল এগিয়ে এসে প্রস্তর নিক্ষেপ করবে। এটা হানাফিগণের অভিমত। হাম্বলি ও শাফি'ঈগণের মতে স্বেচ্ছায় স্বীকৃতিদানকারীর ক্ষেত্রে এরূপ না করাই উত্তম। যাতে সে পালিয়ে শাস্তি থেকে আত্নরক্ষা করতে পারে।[৭৬]

(৫) পাথরের আকার মাঝারি অর্থাৎ সহজে হাতে বহন যোগ্য হতে হবে। তার আকার খুব বড়ও হবে না, যাতে সে খুব দ্রুত মারা যায়, আর তাতে প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড দানের উদ্দেশ্যই ক্ষুণ্ন হবে। আবার এমন ছোটও হবে না, যাতে মৃত্যু খুবই বিলম্বিত হয় এবং পীড়ন দীর্ঘায়িত হবে।[৭৭]

(৬) মালিকিগণের মতে নাভি থেকে দেহের উপর পর্যন্ত সহজে আক্রান্ত হয় এরূপ দেহের যে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রস্তর নিক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয়। তবে চেহারা ও গুপ্তাঙ্গে প্রস্তর নিক্ষেপ করা সমীচীন নয়। হানাফি ও

---

[৭৩] সহীহ মুসলিম, *(কিতাবুল হুদুদ)*, হা. নং: ১৬৯১; আবূ দাউদ, *(কিতাবুল হুদুদ)*, হা. নং- ৪৪১৮

[৭৪] ইবনু নুজায়ম, *আল বাহরুর রা'ইক*, খ. ৫, পৃ. ৯-১০; ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ৪, পৃ. ১২; ইবনু কুদামাহ, *আল মুগনী*, খ. ৯, পৃ. ৪০; আল বহুতী, *কাশশাফ*, খ. ৬, পৃ. ৮৪

[৭৫] আস সারাখসী, *আল মাবসুত*, খ. ৯, পৃ. ৬৯-৭০; ইবনু কুদামাহ, *আল মুগনী*, খ. ৯, পৃ. ৪০

[৭৬] যায়লঈ, *তাবয়ীন*, খ. ৩, পৃ. ১৬৭; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ৫, পৃ. ২২৫

[৭৭] আনসারি, *আসনাল মাতালিব*, খ. ৪, পৃ. ১৩৩

হাম্বলি ইমামগণের মতে চেহারার একটি বিশেষ মর্যাদা থাকার কারণে প্রস্তরের আঘাত থেকে তাকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন।[৭৮]

(৭) ব্যভিচারিণী গর্ভবতী হলে খালাসের পর শাস্তি কার্যকর করা হবে। যদি সন্তানকে দুগ্ধ করার মত কেউ না থাকে, তাহলে দুধ পানের মেয়াদ শেষ হবার পরেই শাস্তি কার্যকর করা হবে।[৭৯]

চ. মদ্যপানের শাস্তি

মাদক ছোট বড় বহু অপরাধের উৎস এবং নানা দৈহিক ও মানসিক মারাত্মক ক্ষতির কারণ। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুবাদে এর ক্ষতির দিকগুলো বর্তমানে সকলের কাছে সুবিদিত। মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ নি'আমত বিবেক বুদ্ধি, যা দ্বারা সে পৃথিবীর অন্যান্য সকল প্রাণীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব লাভ করেছে, মাদক সেবনের ফলে তা হারিয়ে যায়। এ সাথে সে হারিয়ে ফেলে মনুষ্যত্ববোধ ও মানবিক চেতনা। ভাল মন্দ জ্ঞানও সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। হারিয়ে ফেলে কর্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞান। এ অবস্থায় আকৃতিতে মানুষ হলেও সে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। তখন সে বড় বড় অপরাধ করে বসে। আপন পরের পার্থক্যবোধও থাকে না। এ দিকে লক্ষ্য রেখেই হযরত 'উসমান (রা) বলেছিলেনঃ "তোমরা মদ পরিহার কর। কেননা তা হচ্ছে সকল প্রকারের পাপ কাজের উৎস"।[৮০]

এ কারণেই ইসলাম পবিত্র ও সুন্দর মনের মানুষ তৈরী এবং সুস্থ সমাজ বিনির্মাণের মহৎ উদ্দেশ্যে সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবসা ও সেবন কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়; ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমান ও মদ সেবন একত্রিত হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ "কোন মদ্যপায়ি ঈমানদার অবস্থায় মদপান করতে পারে না"।[৮১] অর্থাৎ কোন ঈমানদার মু'মিন অবস্থায় মদ্যপান করতে পারে না। হয় ঈমানদার হবে, না হয় শুধু মদ্যপায়ি হবে।

মাদকের সংজ্ঞা

মাদককে আরবিতে خمر বলা হয় এর আভিধানিক অর্থ ঢেকে ফেলা, সমাচ্ছন্ন করা, মিশে যাওয়া। মদ সেবনের ফলে মানুষের বিবেক বুদ্ধি সমাচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে তাকে خمر বলা হয়।[৮২]

---

[৭৮] খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলিল*, খ. ৮, পৃ. ৮১-২; ইবনু গুনায়ম, *আল ফাওয়াকিহ্*, খ. ২, পৃ. ২০৫

[৭৯] আস সারাখসী, *আল মাবসুত*, খ. ৯, পৃ. ৭৩, যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, খ. ৩, পৃ. ১৭৫

[৮০] আন নাসাঈ, *আস সুনান আল কুবরা*, হা. নং- ৫১৭৬-৫১৭৭ - اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث

[৮১] সহীহ আল বুখারী, *(কিতাবুল মাযালিম)*, হা. নং- ২৩৪৩; সহীহ মুসলিম, *(কিতাবুল ঈমান)*, হা. নং: ৫৭

[৮২] ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, খ. ৪, পৃ. ২৫৪-৫

শারী'আতের পরিভাষায়

যে সকল বস্তু মাদকতা সৃষ্টি করে এবং বিবেক বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে অথবা বোধশক্তির উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাকে خمر (মাদক) বলা হয়।[৮৩]

প্রখ্যাত ভাষাবিদ আসমা'ঈ বলেন الخمر ما خمر العقل وهو المسكر من الشراب। " যা বিবেক বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে তা- ই হল" خمر (মাদক)।

ইমাম আবূ হানিফা (রহ) এর মতে আঙ্গুরের রস দ্বারা তৈরী মাদক পানিয়ই خمر (মাদক)।[৮৪] তিনি খামর ও নেশা উদ্রেককারী বস্তু সমূহের মধ্যে পার্থক্য করেন। তাঁর মতে, খামর সেবন শাস্তি যোগ্য অপরাধ, তাতে নেশার উদ্রেক হোক বা না হোক, কম হোক বা বেশী হোক। কিন্তু নেশা উদ্রেককারী অন্যান্য বস্তুসমূহের ব্যবহার শাস্তি যোগ্য নয়, যে যাবত তা নেশা উদ্রেক না করে।[৮৫]

কিন্তু অধিকাংশ ইমামের মতে আঙ্গুরের রস ও অন্যান্য বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নেই; বরং যে সকল বস্তু মাদকতা সৃষ্টি করে তা যে বস্তুই হোক তা خمر (মাদক) রূপে গণ্য হবে এবং যে কোন পরিমাণে অল্প হোক বা বেশী গ্রহণ করা হারাম।[৮৬]

পর্যায়ক্রমে মদের নিষেধাজ্ঞা অবতরণ

মুসলিম উম্মতের উপর আল্লাহ তা'আলার একটি বড় অনুগ্রহ হচ্ছে, তিনি শারী'আতের সকল বিধান একযোগে নাযিল করেননি; বরং ক্রমাগতভাবে শারী'আতের বিধানগুলো জারি করেছেন। তদুপরি অনেক বিষয়ের চূড়ান্ত বিধি নিষেধ এক দিনেও কার্যকর করেননি। ইসলামের আবির্ভাবের সময় মদ্যপান ছিল তৎকালীন আরবের তথা গোটা পৃথিবীর মানুষের অভ্যাস এবং তারা মদ্যপানকে কোনরূপ অপরাধযোগ্য কর্ম মনে করত না। কিন্তু ইসলামে মদ্যপান একটি মারাত্মক দণ্ডনীয় অপরাধ। তবে মানুষের এই চিরাচরিত অভ্যাস পরিবর্তন সাধনে ইসলাম ধীর পদক্ষেপে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হয়েছে। কেননা এই বস্তুটিকে যদি হঠাৎ করে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হত তাহলে তা মেনে চলা তখনকার লোকদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পরত। এ প্রসঙ্গে

---

[৮৩] ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব,* খ. ৪, পৃ. ২৫৪-৫

[৮৪] আস সারাখসী, *আল মাবসুত,* খ. ২৪, পৃ. ২-৪

[৮৫] আস সারাখসী, *আল মাবসুত,* খ. ২৪, পৃ. ২-৪; আল কাসানী, *বদা'ই,* খ. ৫, পৃ. ১১২

[৮৬] ইবনু কুদামাহ, *আল মুগনি,* খ. ৯, পৃ. ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়িশা (রা) বলেছেন, “প্রথম অবতীর্ণ আয়াতেই যদি বলা হত যে, তোমরা মদ পান করোনা, তাহলে তারা অবশ্যই বলত যে, আমরা কখনোই মদ্যপান ত্যাগ করব না”।[৮৭]

মদপানের চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য আল্লাহ তা'আলা চার পর্যায়ে চারটি আয়াত নাযিল করেছেন।

মক্কা শরীফে নাযিলকৃত মদের প্রথম আয়াত

“এমনিভাবে খেজুরের খাছ ও আঙ্গুরের ছড়া থেকেও আমরা একটি জিনিস তোমাদের পান করাই, যাকে তোমরা মাদকেও পরিণত কর এবং উত্তম পানিয়ও তাতে রয়েছে”।[৮৮]

“And from the fruits of date-palms and grapes, you derive strong drink and a goodly provision.” (Surah 16. An-Nahl. Part 14. Ayat 67).

মদের প্রতি ঘৃণার বীজ লোকদের মনে বপন করাই এই প্রথমবারের নাযিলকৃত আয়াতের মূল উদ্দেশ্য।

মদীনা শরীফে নাযিলকৃত মদের দ্বিতীয় আয়াত

“(হে রাসূল), আপনাকে তারা মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, এ দু'টিতে রয়েছে বড় পাপ, লোকদের উপকারও রয়েছে বটে। তবে উপকারের চাইতে পাপ অনেক বড়”।[৮৯]

“They ask you (O Muhammad sm concerning alcoholic drink and gambling. Say: “Inthem is a great sin, and (some) benefits for men, but the sin of them is greater than their benefit.” (Surah 2. Al-Baqarah. Part 2. Ayat 21.

এ আয়াতের সাহায্যে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, মদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এ আয়াত দু'টি নাযিলের পর মুসলিমদের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। অনেক মদ্যপাগল লোক তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পূর্ণ পরিহার করেছিল; কিন্তু তখনো তা হারাম করা হয়নি।

---

[৮৭] সহীহ আল বুখারী, *(কিতাবুল ফাদা'ইলিল কুর আন)*, হা. নং: ৪৭০৭; নাসাঈ, *আস সুনান আল কুবরা*, হা. নং: ৭৯৮৭, ১১৫৫৮; আবদুর রযযাক, *আল মুছান্নাফ*, হা. নং- ৫৯৪৩

[৮৮] আল কুরআন, ১৬: ৬৭ *ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا-*

[৮৯] আল কুরআন, ২: ২১৯ *يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما-*

মদীনা শরীফে নাযিলকৃত মদের তৃতীয় আয়াত

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের নিকটেও যাবে না; যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার”।

“O you who believe! Approach not As-Salat (the prayer) when you are in a drunken state until you know (the meaning) of what you utter.” (Surah 4. An-Nisa’. Part 5. Ayat 43).

এ আয়াতে নামাযের সময় মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু নামাযের বাইরে অন্যান্য সময় লোকেরা মদ্যপান করতে থাকে। এভাবে কিছু দিন চলল। ইত্যবসরে হযরত সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা) নিজের ঘরে একটি যিয়াফতের ব্যবস্থা করেন। তাতে কয়েকজন আনসারি সাহাবী যোগদান করেন। তাদের সামনে উটের মস্তক ভূণা করে পেশ করা হয়। তারা খাওয়া সেরে মদ্যপানে রত হলেন। মদের মাদকতায় মত্ত হয়ে তাদের কেউ কেউ হযরত সা'দকেই আঘাত করেন। ফলে তার নাকটি ভেঙ্গে যায়। আর এ সময়ই নাযিল হয় মদ্যপান চিরতরে হারাম হবার কুরআনি ঘোষণা।

মদীনা শরীফে নাযিলকৃত মদের চতুর্থ আয়াত

“হে ইমানদারগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, বলিদানের স্থান ও ভাগ্য পরীক্ষার কাজ নিঃসন্দেহে শয়তানি কদর্য কর্মকাণ্ড। অতএব তোমরা তা পরিত্যাগ কর। তাহলেই তোমরা সফলতা লাভ করবে। মনে রেখো, শয়তান এই মদ্যপান ও জুয়া খেলার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরে চরম শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি করতে সদা সচেষ্ট। সে তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে ইচ্ছুক। তাহলে তোমরা কি এ কাজ থেকে বিরত থাকবে”?[৯০]

“O you who believe! Intoxicants (all kinds of alcoholic drinks), and gambling, and Al-Ansab, and Al-Azlam (arrows for seeking luck or decision) are an abomination of Shaitan’s (Satan) handiwork. So avoid (strictly all) that (abominiation) in order that you may be successful.

Shaitan (Satan) wants only to excite enmity and haterd between you with intoxicants (alcoholic drinks) and gambling, and hinder you from the remembrance of Allah and

---

[৯০] আল কুরান, ৫: ৯০-৯১ يايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون- انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكرالله وعن الصلوة فهل انتم منتهون-

from As-Salat (the prayer). So, wil you not then abstain?” (Surah 5. Al-Ma’idah. Part 7. Ayat 90-91).

এ আয়াতগুলোর শেষে فهل انتم منتهون (অর্থাৎ তোমরা কি বিরত থকবে?) এর মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার যে জিজ্ঞাসা রয়েছে, তা নিষিদ্ধ হবার সাথে সাথে সাহাবায়ে কিরাম উত্তরে বলে উঠলেন, ‘আমরা বিরত হলাম, আমরা বিরত হলাম’। এ আয়াত নাযিল হওয়ার কিছু দিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, ‘মদ্যপান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ। তা হারাম হওয়ার নির্দেশ নাযিল হওয়াও অসম্ভব নয়’। রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেনঃ “প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী জিনিসই মদ। আর প্রত্যেক নেশা উদ্রেককারী জিনিসই হারাম”।[৯১]

মদ সেবনের শাস্তি

মাদক সেবন ইসলামী আইনে ফৌজদারী অপরাধরূপে গণ্য। এজন্য শারী‘আত অনুযায়ী শাস্তি দেয়া একান্তই কর্তব্য। তবে পবিত্র কুরআনে এর কোন শাস্তির কথা উল্লেখ নেই। রাসূল (সা) ও সুনির্দিষ্টভাবে এর শাস্তি নির্ধারণ করে যাননি। বিভিন্ন হাদীসে মদ্যপায়িদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাস্তি দানের কথা বর্ণিত রয়েছে। “হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এক মদ্যপায়িকে উপস্থিত করা হল, তখন তিনি লোকদেরকে তাকে মারপিট করতে নির্দেশ দিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তখন আমাদের কেউ তাকে হাত দ্বারা আবার কেউ জুতা দ্বারা আবার কেউ পাকানো কাপড় দ্বারা তাকে প্রহার করছিল।[৯২] কাতাদাহ (রা) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা) লাঠি ও জুতা দ্বারা চল্লিশবার প্রহার করেছেন”।[৯৩] আনাস (রা) বলেন, রাসূল (সা) দু’টি লাঠি একত্র করে চল্লিশবার প্রহার করেছেন।[৯৪] শাফি‘ঈ ও হাম্বলিগণের মতে, মদ্যপানের নির্ধারিত শাস্তি হল চল্লিশটি বেত্রাঘাত। তবে বিচারকের ইখতিয়ার রয়েছে। অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে আশিটি পর্যন্ত বেত্রাঘাত করতে পারবেন। হানাফি এবং মালিকিগণের মতে, মদ্যপানের শাস্তি হল আশিটি বেত্রাঘাত।[৯৫]

---

[৯১] সহহী মুসলিম, *(কিতাবুল মুসাকাত)*, হা. নং- ১৫৭৯; ইবনু হিব্বান, *আস সহীহ*, হা. নং- ৪৯৪২; আস সারাখসী, *আল মাবসুত*, খ. ২৪, পৃ. ৩
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام-

[৯২] আবূ দাউদ, *(কিতাবুল হুদূদ)* হা. নং- ৪৪৭৭

[৯৩] আবূ দাউদ, *(কিতাবুল হুদূদ)* হা. নং- ৪৪৮৯

[৯৪] সহীহ মুসলিম, *(কিতাবুল হুদূদ)* হা. নং- ১৭০৬

[৯৫] ইবনু কুদামাহ, *আল মুগনী*, খ. ৯, পৃ. ১৩৭; আল বাজী, *আল মুন্তকা*, খ. ৩, পৃ. ১৪২-৪

মদপায়ির শর্তাবলী

১। মুসলমান হতে হবে;

২। প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থবিবেক সম্পন্ন হতে হবে;

৩। বাক সম্পন্ন হতে হবে;

৪। নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে;

৫। মাদক জেনেই সেবন করতে হবে;

৬। ইচ্ছাকৃতভাবে মদ সেবন করতে হবে।

মদ সেবনের প্রমাণ

১। দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য;

২। মদ সেবনকারীর স্বীকারোক্তি;

৩। মুখে মদের গন্ধ;

৪। মাতলামি;

৫। বমি।

শাস্তি কার্যকর করার সময়

রুগ্ন ও মাতাল অবস্থায় হাদ্দ কার্যকর করা বিধেয় নয়। মাদকের নেশা কেটে যাওয়ার পর এবং মাদক সেবনকারীর সুস্থ হবার পর হাদ্দ কার্যকর করতে হবে। অন্যথায় শাস্তির উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তদুপরি মাতাল অবস্থায় বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলার কারণে শাস্তির ব্যথাও তার কম অনুভূত হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে, জ্ঞান ফিরে আসার আগে হাদ্দ প্রয়োগ করা হলে জ্ঞান ফিরে আসার পর পুণরায় হাদ্দ কার্যকর করতে হবে। তবে কারো কারো মতে, পুণরায় হাদ্দ প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। তবে বিশুদ্ধতম অভিমত হল, যদি মনে করা হয় যে, বেত্রাঘাতের ফলে সে যথার্থ শিক্ষাই পেয়েছে, তাহলে পুণরায় 'হাদ্দ' প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় পুণরায় 'হাদ্দ' প্রয়োগ করতে হবে।

ছয়. ইসলাম ধর্ম ত্যাগের শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্বাধীন বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও চিন্তা শক্তি দান করেছেন, যাতে সে জেনে বুঝে সত্য ও ন্যায়কে গ্রহণ করতে পারে এবং মিথ্যা ও অন্যায় থেকে বেঁচে থাকতে পারে। পৃথিবীতে বহু ধর্ম রয়েছে। মানুষ বিচার বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করে যে কোন ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। এ ব্যাপারে ইসলাম কারো স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে না। তবে একবার ইসলামকে নিজের জীবনের জন্য একমাত্র পবিত্র ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করার পর তাকে কোনরূপ অমর্যাদা করার, এর বিরুদ্ধে বিষদগার করার কোন অবকাশ ইসলাম দেয়না। ইসলামের দৃষ্টিতে তা জঘন্যতম অপরাধ। অনেক স্বার্থান্বেষী লোক ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্যে আকৃষ্ট না হয়ে কিংবা না জেনে বুঝে সুনির্দিষ্ট স্বার্থ সিদ্ধির পর কুফরিতে ফিরে যেতে পারে। অনুরূপভাবে কপট ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্মের নামে নানা অধর্ম ইসলামে প্রবেশ করিয়ে ইসলামের মারাত্নক ক্ষতিসাধন করতে পারে। এ কারণে সত্যিকার দীনকে রক্ষা এবং তার গতিশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে ইসলাম ধর্মান্তরের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে।

ধর্মান্তরের সংজ্ঞা

ধর্মান্তর বা ধর্মত্যাগকে আরবিতে ردة (রিদ্দা) বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ যে কোন অবস্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা। ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায় বালিগ ও সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন মুসলিম স্বেচ্ছায় ইসলাম থেকে কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে 'রিদ্দা' বলা হয়।[৯৬] উল্লেখ্য যে, এ প্রত্যাবর্তন সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েও হতে পারে, কোন কুফরি বক্তব্য উচ্চারণ করেও হতে পারে এবং কোন কুফরি কাজ সম্পাদন করেও হতে পারে।

ধর্মান্তরের শর্তাবলী

১। ধর্মান্তরকারীকে মুকাল্লাফ (প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন) হতে হবে

ধর্মান্তরকারীকে প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে। কোন অপ্রাপ্ত বালক কিংবা পাগল কোন সুস্পষ্ট কুফরি বাক্য উচ্চারণ করলে বা কাজ করলে তাকে ধর্মত্যাগী বলা যাবে না। অনুরূপভাবে ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন ও বেহুঁশ লোকদেরকে তাদের কোন কথা বা কাজের জন্যও ধর্মত্যাগী বলা যাবে না।[৯৭]

---

[৯৬] আল কাসানী, *বাদা'ই*, খ, ৭ পৃ. ১৩৪; ইবনু নুজায়ম, *আল বাহরুর রা'ইক*, খ. ৫, পৃ ১২৯; ইবনু কুদামাহ, *আল মুগনি*, খ. ৯, পৃ. ১৬

[৯৭] আল বহুতী, *কাশশাফ*, খ. ৬, পৃ. ১৭৫, আর রুহায়বানী, *মাতালিব*, খ. ৬, পৃ. ২৮৯

২। স্বেচ্ছায় কুফরি করা

কারো প্রবল চাপ ছাড়াই স্বেচ্ছায় সুস্পষ্ট কুফরিতে লিপ্ত হলেই তা ধর্মত্যাগ বলে ধর্তব্য হবে। অতএব কেউ প্রবল চাপের মুখে একান্ত বাধ্য হয়ে কোন কুফরি বাক্য উচ্চারণ করলে কিংবা কুফরি কাজ করলেই ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে না, যে যাবৎ তার অন্তঃকরণে পূর্ণ ঈমান বিদ্যমান থাকবে।[৯৮]

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “তবে সে ব্যক্তি ছাড়া যাকে জোর প্রয়োগ করা হয়েছে; কিন্তু তার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ থাকে”।[৯৯]

“Except him who is forced thereto and whose heart is at rest with faith.” (Surah 16. An-Nahl. Part 14. Ayat 106).

৩। সত্যিকার অর্থে মুসলিম থাকার প্রমাণ থাকা

ধর্মান্তরের জন্য সত্যিকার অর্থে ইসলাম থেকে কুফরিতে ফিরে যাবার প্রমাণ পাওয়া যেতে হবে। অতএব ভয়ে বা একান্তে চাপে পরে কিংবা আর্থিক সংকটে পরে কেউ মুসলিম হয়ে পরবর্তীতে ইসলাম ত্যাগ করে কুফরিতে চলে গেলে তাকে ধর্মত্যাগ করেছে বলে আখ্যা দেয়া যাবে না এবং এ জন্য শাস্তি স্বরূপ তাকে হত্যা করা যাবে না, যদি তার কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১০০]

মুরতাদের শাস্তি

ধর্মান্তর প্রমাণিত হবার পর যদি ধর্মান্তরকারি পুরুষ বা নারী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাওবাহ করে ঈমানের পথে ফিরে না আসে, তাহলে তার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ “যে তার ধর্মকে পরিবর্তন করল, তাকে তোমরা হত্যা কর”।[১০১] তবে হানাফিগণের মতে, কোন মহিলাকে ধর্ম ত্যাগ করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না; বরং কারাগারে বন্দী রাখা হবে, যে যাবত না সে তাওবা করে ঈমানের পথে ফিরে আসে।[১০২] মুরতাদকে হত্যা করার পর তাকে গোসল দেয়া যাবে না, তার নামাযে জানাযা পড়া হবে না এবং মুসলিমদের কবরস্থানেও দাফন করা যাবে না।[১০৩]

---

৯৮ আস সারাখসী, *আল মাবসুত,* খ. ১০, পৃ. ১২৩, খ. ২৪, পৃ. ৪৫-৬, ১২৯-৩০; ইবনু কুদামাহ, *আল মুগনী,* খ. ৯, পৃ. ৩০

৯৯ আল কুরআন, ১৬: ১০৬ - الا من اكره وقلبه مطمئن با لايمان

১০০ আল বাজী, *আল মুন্তকা,* খ. ৫, পৃ. ২৮৩

১০১ সহীহ বুখারী *(কিতাবুল জিহাদ),* হা. নং: ২৮৫৪; *(কিতাবু ইসতিতাবাতিল মুরতাদ্দীন),* হা. নং- ৬৫২৪ من بدل دينه فاقتلوه-

১০২ আস সারাখসী, *আল মাবসুত,* খ. ১০, পৃ. ১০৯

১০৩ আল হদ্দাদী, *আল জাওহারাহ,* খ. ২, পৃ. ২৭৬

বারংবার ধর্ম ত্যাগ করে পুনঃপুনঃ তাওবাহ করলে শাফি'ঈ ও হানাফিগণের মতে তা গ্রহণযোগ্য হবে। তাঁদের দৃষ্টিতে তাওবাহ পাওয়া গেলে ধর্ম ত্যাগের জন্য যতবারই হোক মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "কাফিরদেরকে বলুন, তারা যদি (শিরক থেকে) বিরত থাকে, তাহলে তাদের অতীতের সকল পাপই মোচন করে দেয়া হবে।[১০৪]

Say to those who have disbelieved, if they cease (from disbelief), their past will be forgiven. (Surah 8. Al-Anfal. Part 9. Ayar 38).

সাত. সরকারদ্রোহীতার শাস্তি

ইসলামী রাষ্ট্র একটি জনকল্যাণমূলক আদর্শ রাষ্ট্র। জনগণের কল্যাণ সাধনই এর প্রকৃত লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে কার্যত পৌঁছতে হলে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক গোলযোগ এবং আঞ্চলিক বিদ্রোহ একটি কল্যাণকর উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় অন্তরায়। তাই ইসলাম এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে সরকারদ্রোহীতার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে।

সরকারদ্রোহীতার সংজ্ঞা

সরকারদ্রোহীতাকে আরবীতে بغى বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ অন্যায় করা, সীমালঙ্ঘন করা। যেমন বলা হয় بغى عليه বা (সে অমুকের প্রতি অন্যায় করল কিংবা সীমালঙ্ঘন করল)।[১০৫]

ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায়

সাধারণতঃ بغى বলতে সরকারের আনুগত্য থেকে অন্যায়ভাবে বেড়িয়ে পরাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে কতিপয় মুসলিম দলবদ্ধভাবে কোন একটি খোঁড়া অযুহাত তৈরী করে সরকারের আনুগত্য থেকে বেড়িয়ে বিকল্প নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং সরকার উৎখাতের জন্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করাকে بغى বলা হয়। আর যে মুসলিম এভাবে সরকারের আনুগত্য থেকে বেড়িয়ে প্রকাশ্যে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাকে باغى (সরকারদ্রোহী) বলা হয়।[১০৬]

---

[১০৪] আল কুরান, ৮: ৩৮ - قل للذين كفروا ان ينتهو يغفرلهم ما قد سلف

[১০৫] আর রাযী, *মুখতারুস সিহাহ,* খ. ১, পৃ. ২৪

[১০৬] আর রাযী, *মুখতারুস সিহাহ,* খ. ১, পৃ. ২৪

ইবনু মানযুর বলেন, এর মূল অর্থ হল: হিংসা, তবে এটি অন্যায় অবিচার অর্থেই বহুল ব্যবহৃত। কেননা হিংসুটে ব্যক্তি প্রায়শঃ হিংসাকৃত ব্যক্তির সাথে অন্যায় আচরণ করে থাকে। তাছাড়া শব্দটি খোঁজ করা, অনুসন্ধান করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[১০৭]

ইসলামী শারী‘আতের পরিভাষায় সাধারণত بغى বলতে সরকারের আনুগত্য থেকে অন্যায়ভাবে বেড়িয়ে পরাকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে কতিপয় মুসলিম দলবদ্ধভাবে কোন একটি খোঁড়া অজুহাত তৈরী করে সরকারের আনুগত্য থেকে বেড়িয়ে বিকল্প নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং সরকার উৎখাতের জন্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করাকে بغى বলা হয়। আর যে মুসলিম এভাবে সরকারের আনুগত্য থেকে বেড়িয়ে প্রকাশ্যে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাকে باغى (সরকারদ্রোহী) বলা হয়।[১০৮]

উপর্যুক্ত সংজ্ঞা থেকে বুঝা যায়, সরকারদ্রোহীতার জন্য নিম্নের ছয়টি শর্ত পাওয়া গেলেই সরকারের বিরোধিতাকে সরকারদ্রোহীতা রূপে গণ্য করা হবে।

১।বিদ্রোহীদের মুসলিম হওয়া;

২। সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করা;

৩। অস্ত্র শস্ত্রের অধিকারী হওয়া;

৪। সরকারের বিরোধিতার পক্ষে কোন যুক্তি থাকা, যদিও তা সঠিক নয়;

৫। সরকারের বিরুদ্ধে বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তোলা;

৬। সরকার পতনের জন্য প্রকাশ্যে হত্যা ও বিভিন্ন অপরাধ সৃষ্টি করা।

অতএব অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করে বিদ্রোহ করলে তারা সরকারদ্রোহী হবে না; তারা হবে হারাবি (রাষ্ট্রদ্রোহী)। তাদের জন্য হারাবীদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে মুসলিমদের কোন দল যদি কোন যৌক্তিক কারণ প্রদর্শন ছাড়া এবং সরকারের ক্ষমতা দখল করার অভিপ্রায়

ব্যতীত সরকারের আনুগত্য থেকে বেড়িয়ে পরে তারাও সরকারদ্রোহী হবে না। তারা হবে সন্ত্রাসী। তাদের জন্য মুহারিব (সন্ত্রাসী) দের শাস্তি প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে কেউ কোন অযুহাতে নিয়মানুগ সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করলে কিংবা সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলে সে সরকারদ্রোহী রূপে গণ্য হবে না; যে যাবত না সে সরকার উৎখাতের জন্য দলীয় প্রচেষ্টায় কোন রূপ অপরাধ সংঘটিত করবে বা লড়াই

---

১০৭ ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, খ. ১৪, পৃ. ৭৯

১০৮ ইবনু নুজায়ম, *আল বাহরুর রা'ইক*, খ. ৫, পৃ. ১৫১

করবে। কেননা ব্যক্তিগত কিংবা দলীয়ভাবে নিছক সরকারের বিরোধিতার কারণে কেউ বা কোন দল শাস্তিযোগ্য হতে পারে না।[১০৯]

‘আল্লামা সান‘আনী বলেন “কেউ যদি জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়; কিন্তু সমাজে কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে এবং লড়াইয়ে অবতীর্ণ না হয়, তাহলে তার পথকে বাধাগ্রস্থ করা যাবে না। কেননা নিছক সরকারের বিরোধিতার কারণে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা সমীচীন নয়।[১১০]

শাফি‘ঈগণের মতে, সরকারের বিরোধিতা করা অন্যায় কিছু নয়; কেননা বিরোধিতাকারীরা তাদের ধারণা অনুযায়ী কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নিয়েই বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে, যদিও তারা তাদের ব্যাখ্যায় হয়তো সঠিক নয়। তাই তাদেরকে এক্ষেত্রে সমস্যা গ্রস্থ মনে করতে হবে।[১১১]

---

[১০৯] ইবনু নুজায়ম, *আল বাহরুর রা‘ইক,* খ. ৫, পৃ. ১৫১; যায়লা’ঈ, *তাবয়ীন,* খ. ৩, পৃ. ২৯৪; আল জুমাল, *ফুতুহাত,* খ. ৫, পৃ. ১১৭-৮; আল বুজায়রমী, *তুহফাতুল হাবীব,* খ. ৪, পৃ. ২৩৩

[১১০] *আল মাওযু‘আতুল ফিকহিয়্যা, খ. ৮, পৃ. ১৩১*

[১১১] হায়তমী, *তুহফাতুল মুহতাজ,* খ. ৯, পৃ. ৬৬

কিসাস বা প্রতিরোধমূলক শাস্তি

(Qisas) (Retaliation)

কিসাস এর সংজ্ঞা

কিসাস (قصاص) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হল পদাঙ্ক অনুকরণ করা, সমান বদলা গ্রহণ করা ও সাদৃশ্য বজায় রাখা। তবে শব্দটি হত্যার বদলায় হত্যাকারিকে হত্যা করার, যখমের বদলায় অঙ্গ কর্তনকারীর অঙ্গ কর্তন করার অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায় অপরাধীকে তার অপরাধ সদৃশ শাস্তি প্রদানকে কিসাস বলা হয়। যেমন হত্যার বদলায় হত্যা করা এবং যখমের বদলায় যখম করা।[১১২]

কিসাসের হুকুম

কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে, তা যদি যথাযথ রূপে প্রমাণিত হয়, তাহলে সরকারের দায়িত্ব হল হত্যাকারীকেও হত্যার বদলায় হত্যা করা, যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা তা- ই দাবি করে। তবে অভিভাবকদের এ এখতিয়ারও রয়েছে যে, তারা ইচ্ছা করলে হত্যাকারীকে ক্ষমাও করে দিতে পারে, ইচ্ছা করলে দিয়াতের বিনিময়ে সমঝোতাও করতে পারে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে যখম করলে কিংবা দেহের কোন অঙ্গ বা তার অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন করে ফেললে উপর্যুক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। এটাই সর্বসম্মত অভিমত। কিসাস তখনই দিয়াত হবে যখন ক্ষতিগ্রস্থদের উত্তরাধিকারী রক্তমুল্য বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ পূর্বক ক্ষমা করে দেয়। এ ধরনের শাস্তি কাজি বা সম্রাট হ্রাস কিংবা পরিবর্তন করতে পারতেন না। ইসলামী শাস্তি আইনে কিয়াসের সাথে সাথে দিয়াতের বিধান একটি ভারসাম্যমূলক ও দয়াপূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে বিধিবদ্ধ হয়েছে। নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা কিংবা আহত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে কিসাসের পরিবর্তে হত্যাকারী কিংবা যখমকারীর নিকট থেকে দিয়াত নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারে এবং এভাবে কিছু পরিমাণে নিজেদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে। কোন অভিভাবক বা আহত ব্যক্তি তা করলে অবশ্যই আল্লাহর নিকট থেকে তাকে বিপুল সাওয়াব দেয়ারও সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে ইমানদারগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী। তার

[১১২] ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, খ. ৮,পৃ. ৩৪১; আর রুকবান, *আল কিসাস ফিন নাফস*, পৃ. ১৩; আল জাযীরী, *কিতাবুল ফিকহ 'আলাল মাযাহিবিল 'আরবা'আহ*, খ. ৫, পৃ. ২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছু ক্ষমা করে দেয়া হলে ন্যায়নীতির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় করা বিধেয়। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সহজিকরণ রহমত বিশেষ"।[১১৩]

"You who believe! Al-Qisas (the Law of Equality in punishment) is prescribed for you incase of murder: the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female. But if the killer is forgiven by the brother (or the relatives, etc.) of the killed against blood-money, then adhering to it with fairness and payment of the bloog-money to heir should be made in fairness. This is an alleviation and a mercy from your Lord. So after this whoever transgresses the limits (i.e. kills the killer after taking the blood-money), he shall have a painful torment." (Surah 2. Al-Baqarah. Part 2. Ayat 178).

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ "তাদের জন্য আমরা তাতে বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমসমূহের বদলে অনুরূপ যখম। আর যে ক্ষমা করে দেয়, তা তার পাপের জন্য কাফফারা হবে"।[১১৪]

"And we ordained therein for them: "Life for life, eye for eye, nose for nose, ear for ear, tooth for tooth, and wounds equal for equal." But if anyone remits the retaliation by way of charity, it shall be for him an expiation." (Surah 5. Al-Maidah. Part 6. Ayat 45).

কুরআনের অন্য জায়গায় রয়েছেঃ কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি তার প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে। সে তো সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছে।[১১৫] রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যার কোন ব্যক্তি নিহত হবে, তার দুটি এখতিয়ার রয়েছে। সে ইচ্ছে করলে রক্তমূল্যও নিতে পারবে, ইচ্ছে করলে কিসাসও গ্রহণ করতে পারবে"।[১১৬]

---

[১১৩] আল কুরআন, ২: ১৭৮ *يا يها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبدبالعبد والانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسن ذالك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذالك فله عذاب اليم*

-

[১১৪] আল কুরআন, ৫: ৪৫, وكتبنا عليهم فيها ان النفس با لنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له-

[১১৫] আল কুরআন, ১৭: ৩৩, - ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطا نا فلا يسرف فى القتل انه كان منصورا

[১১৬] সহীহ আল বুখারী, *(কিতাবুদ দিয়াত)*, হা. নং- ৬৪৮৬; আবু দাউদ *(কিতাবুদ দিয়াত)*, হা. নং- ৪৫০৫

দিয়াত বা রক্ত মূল্য

(Diya) (blood money)

দিয়াত এর সংজ্ঞা

দিয়াত (دية) হল খুনের বদলায় হত্যাকারীর উপর আরোপিত সুনির্দিষ্ট পরিমাণ প্রদেয় সম্পদ বিশেষ। মানবদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধে অপরাধের বদলায় অপরাধীর উপর আরোপিত সুনির্দিষ্ট পরিমাণ দেয় সম্পদকেও দিয়াত বলা হয়।[১১৭] প্রায় একই অর্থে আরো কয়েকটি শব্দ প্রচলিত রয়েছে।

১। আরশ ارش।

সাধারণত মানবদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধে অপরাধের বদলায় অপরাধির উপর আরোপিত দেয় সম্পদকে আরশ বলা হয়।[১১৮]

২। গুররা غرة

ভ্রূন হত্যার বদলায় অপরাধীর উপর আরোপিত দেয় সম্পদকে গুররা বলা হয়। এর পরিমাণ হল পূর্ণ দিয়াতের বিশভাগের একভাগ।[১১৯]

৩। হুকুমাতু আদলিন حكومة عدل

মানব দেহের বিরুদ্ধে যে সব অপরাধের শাস্তি স্বরূপ প্রদেয় সম্পদের পরিমাণ শারী'আত নির্ধারণ করে দেয়নি, সে সব ক্ষেত্রে বিচারক কর্তৃক অপরাধীর উপর আরোপিত সম্পদকে হুকুমাতু আদলিন বলা হয়।[১২০]

---

[১১৭] যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন,* খ. ৬, পৃ. ১২৬; আল-জুরজানী, *আত- তা'রীফাত,* খ. ১, পৃ ১৪২; আল আনসারী, *ফাতহুল ওয়াহহাব,* খ. ২৩৮

[১১৮] ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব,* খ. ৬, পৃ. ২৬৩

[১১৯] আল জুরজানী, *আত-তা'রীফাত,* খ. ১, পৃ. ২০৮

[১২০] *আল মাওসু'আ'তুল ফিকহিয়্যা,* খ. ১৮, পৃ. ৬৮-৯, খ. ২১, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

দিয়াতের প্রকারভেদ

অপরাধের প্রকৃতি এবং নিহত বা আহত ব্যক্তির অবস্থাভেদে দিয়াতের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন খুনের বদলায় দিয়াত এবং মানবদেহের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধের দিয়াত। তাছাড়া দিয়াতকে কঠোর (مغلظة) ও সাধারণ (غيرمغلظة) দু'ভাগেও ভাগ করা হয়। ইচ্ছাকৃত ও প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য সাধারণ দিয়াত প্রযোজ্য হয়।

হত্যার অপরাধ

হত্যা (القتل) বলতে কোন কিছুর আঘাতে, অস্ত্রের সাহায্যে, পাথর নিক্ষেপে, বিষ প্রয়োগে বা অন্য কোন উপায়ে মানুষের প্রাণনাশ করাকে বুঝানো হয়. মানবহত্যা একটি মানবতা বিধ্বংসী জঘন্যতম অপরাধ. যখন কেউ তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে এই অপরাধ করে, তখন সে গোটা মানবতার সাথে শত্রুতা করে, একজন মানুষের জীবন বাঁচানো যেমন গোটা মানব জাতির জীবন বাঁচানোর সমতুল্য। ইসলামের দৃষ্টিতে শিরকের অমার্জনীয় অপরাধের পর মানবহত্যাই সবচাইতে বড় ও মারাত্মক অপরাধ। এই কারণেই ইসলামী আইনে এর জন্য ন্যায় বিচারভিত্তিক কঠিন শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যে কোন লোক কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম। সে চিরকালই সেখানে থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তার প্রতি অভিসাপ করেন। উপরন্তু তিনি তার জন্য কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন"।[১২১]

"And whoever kills a believer intentionally, his recompens is Hell to abide therein; and the Wrath and the Curse of Allah are upon him, and a great punishment is prepared for him." (Surah 4. An-Nisa'. Part 5. Ayat 93).

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ "কোন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাওয়াই আল্লাহর নিকট অধিকতর সহজ"।[১২২]

---

[১২১] আল কুরআন, 8: ৯৩ - ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه واعد له عذابا عظيما

[১২২] আত তিরমিযী, *(কিতাবুদ দিয়াত)*, হা. নং- ১৩৯৫; ইবনু মাজাহ, *(কিতাবুদ দিয়াত)*, হা. নং- ২৬১৯ لزوال الدنيا اهون على الله من قتل مؤمن بغير حق -

তা'যীর (সাধারণ দন্ড)

(Discretionary punishmen)

শাস্তিসমূহের মধ্যে তা'যীরের ক্ষেত্র হল বিশাল। ইসলামে একে অপরাধ রোধকারী একটি কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সুস্থ আচরণ শিক্ষা দেয়া, সংশোধন করা ও ভবিষ্যতে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করা। এ কারণে তা'যীরের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, তার মনস্তত্ব ও পরিবেশ পরিস্থিতি এবং অপরাধের ধরণ ও মাত্রার প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখতে হয়। কেননা সমাজে কিছু লোক থাকে, যাদের অল্প শাস্তিতে শিক্ষা হয়ে যায়। আবার এমন অনেক লোক থাকে, যাদেরকে কঠোর ও বেশী মাত্রার শাস্তি ছাড়া শিক্ষা হয় না। তাই প্রশাসনিক বা বিচারিক কর্তৃপক্ষ এই সব বিবেচনা করে তিরস্কার উপদেশ দান, সতর্কীকরণ, পদচ্যুতকরণ, বেত্রাঘাত, সম্পদ আটক, অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড প্রভৃতি শাস্তি সমূহের মধ্যে যা সঠিক মনে করবেন তা- ই দিতে পারবেন। তবে কখনো জন নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত উন্নিত হতে পারে।

তা'যীরি অপরাধের প্রকৃতি

হুদূদ ও কিসাস জাতীয় কয়েকটি অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট সব অপরাধই তা'যীরী অপরাধ। এ ধরনের শাস্তি কোনটা কর্তব্য সমাপন কিংবা ওয়াজিব আদায়ে অবহেলার কারণে হয়ে থাকে। যেমন যাকাত আদায় না করা, নামায তরক করা, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ শোধ না করা, আমানত আদায় না করা অপহৃত সম্পদ ফিরিয়ে না দেয়া ও পণ্যের ত্রুটি প্রকাশ না করা প্রভৃতি। আবার নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হবার কারণেও এ ধরনের শাস্তি হতে পারে। যেমন বেগানা মহিলাকে চুমো দেয়া, পর মহিলার সাথে নির্জনে সময় কাটানো, যিনা ব্যতিরেকে কাউকে অন্য কোন অপরাধের অপবাদ দেয়া, বিনা হেফাযতের মাল চুরি করা, গরু কিংবা কোন প্রাণীর সাথে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া, খাদ্যে ভেজাল দেয়া ইত্যাদি। তাছাড়া যে ব্যক্তি মুস্তাহাব পরিত্যাগ করে মাকরূহ কাজ সম্পন্ন করে, তাকে তা'যীর করা যাবে কিনা এ বিষয়ে ইসলামী চিন্তাবিদগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়।

একদল ফকিহের মতে তাকে কোনরূপ তা'যীর করা জায়িয হবে না। কেননা মুস্তাহাব কাজ সম্পাদন মাকরূহ কাজ বর্জন করতে কোন ধরনের শার'ঈ বাধ্যবাধকতা নেই। আর যে কাজে বাধ্যবাধকতা নেই, তাতে কোনরূপ তা'যীর করা সঙ্গত নয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিক কোন অপরাধের জন্য নয়; শধু শিক্ষা দান

Dhaka University Institutional Repository

করার উদ্দেশ্যেও তা'যীর করা জায়িয। যেমন পিতা মাতার জন্য সন্তানদেরকে কিংবা শিক্ষকের জন্য ছাত্রদেরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শাস্তিদান করা জায়িয।[১২৩]

তা'যীরি শাস্তির বিভিন্ন ধরণ

ক. হত্যা

ইসলামী আইনের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তা'যীরের আওতায় কাউকে হত্যা করা সমীচীন নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা এমন কাউকে বিনা অপরাধে হত্যা করোনা, যাকে আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন"।[১২৪] রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেনঃ "তিন ব্যক্তি ছাড়া কোন মুসলিমের রক্ত হালাল হবে না। এ তিন ব্যক্তি হলঃ অন্যায়ভাবে অপরকে হত্যাকারী, বিবাহিত ব্যভিচারি এবং মুসলিম দল ও ধর্মত্যাগকারী"।[১২৫]

খ. বেত্রাঘাত

তা'যীর হিসেবে বেত্রাঘাত করার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নাই। অনুরূপভাবে তার নিম্নতম পরিমাণ নিয়েও অধিকাংশ ইসলামী আইনবিদ একমত। বিচারক যদি মনে করেন যে, কোন অপরাধীর শাস্তি হিসেবে একটা বেত্রাঘাতই যথেষ্ট হবে, তাহলে এর অতিরিক্ত শাস্তিদান করা সমীচীন হবে।[১২৬]

গ. বন্দী করা

তা'যীর হিসেবে অপরাধিদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রমে কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে। কখনো পরিস্থিতি এরূপও হয়ে দাড়াতে পারে যে, অপরাধিকে বন্দী করে রাখা না হলে তার কার্যকলাপে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। এ ধরনের অপরাধীকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হলে তাকে যেমন তার কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে, তেমনি এটাও আশা করা যেতে পারে, কারাগার থেকে মুক্তির পর সে কারাজীবনের দুঃসহ কষ্টের কথা স্মরণ করে কোন অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকবে। এ কারণে কারাগারের অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে কয়েদীরা সেখানে এক অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে পড়ে ছটফট করতে থাকবে। তা হলেই পরবর্তী জীবনে এ দুঃসহ অবস্থার কথা চিন্তা করে তারা আর কোন অপরাধে লিপ্ত হতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হবে না। বর্তমানে কারাগারগুলোর

---

১২৩ *মাওযু'আতুল ফিকহিয়্যা,* খ. ১২, পৃ. ২৫৭-২৫৮

১২৪ আল কুরআন, ৬: ১৫১ - *ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق*

১২৫ সহীহ আল বুখারী, *(কিতাবুদ দিয়াত)* হা. নং: ৬৪৮৪; মুসলিম, *(কিতাবুদ কাসামাহ),* হা. নং- ১৬৮৬

১২৬ আল হাদ্দাদী, *আল জাওহারাহ,* খ. ২, পৃ. ১৬২ (হানাফী গণের মতে, বেত্রাঘাতের নিম্নতম পরিমাণ হল তিনটি)।

অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। এখানে বন্দীদের পরস্পরের সাথে মেলামেশা করার সুযোগ থাকার কারণে অপরাধীরা বন্দী হয়েও কারাগারের চার প্রাচিরের অভ্যন্তরে অপরিচিতির অস্বস্তি ভোগ করে না। ফলে কারাগারের শাস্তি তাদের শাস্তিরূপেই প্রতিভাত হয় না। তা হয়ে উঠে অপরাধের উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভের মনোরম কেন্দ্র বিশেষ। প্রাথমিক পর্যায়ের কোন অপরাধি কিছুকাল কারাজীবন লাভ করতে পারলে সে একজন ঘাগু ও দুঃসাহসী অপরাধী হয়ে বের হয়ে আসে। তাই এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমান পরিবেশে কারাগারে বন্দী করে রাখা না অপরাধিকে অপরাধবিমুখ করছে, না সমাজকে অপরাধমুক্ত বানাতে কিছুমাত্র সহায়তা করছে। তাই এ বিষয়ে গভীরভাবে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে।

ঘ. নির্বাসন বা দেশ থেকে বহিষ্কার

বিচারক কিংবা শাসক জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে অপরাধীকে তা'যীর হিসেবে নির্দিষ্ট কোন মেয়াদের জন্য দেশ থেকে বহিষ্কারের শাস্তি কিংবা নির্বাসন দণ্ড দিতে পারেন।[১২৭] নির্বাসন স্থলে তাকে বন্দী করে রাখার প্রয়োজন নেই। তবে সার্বক্ষণিক ভাবে তাকে নজরদারী করতে হবে, যাতে সে নিজ দেশে ফিরে আসতে না পারে।[১২৮]

ঙ. শূলে চড়ানো

অনেক ইমামের মতে, তা'যীর হিসেবে বিচারক সমীচীন মনে করলে জঘন্য কোন অপরাধের জন্য অপরাধীকে জীবিত অবস্থায় তিন দিনের জন্য শূলে চড়ানোর দণ্ড দিতে পারেন। তবে তাকে শূলে চড়ানোর সাথে কিংবা আগে হত্যা করা যাবে না। বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ নাব নামক জনৈক ব্যক্তিকে পাহাড়ের উপর শূলিতে শাস্তি দিয়েছিলেন।[১২৯]

চ. উপদেশ বা তিরস্কার কিংবা ধমক দান

তা'যীর হিসেবে বিচারক তার দরবারে ডেকে এনে উপদেশ, তিরস্কার ও ধমক দিতে পারেন। যেমন কেউ যদি সাধারণ কোন ব্যক্তিকে এমন কোন নামে ডাকে যা সে অপছন্দ করে, (যেমন কুত্তা, গাধা, শালা, মিথ্যুক, ফাসিক, কাফির, জারজ সন্তান, মুনাফিক প্রভৃতি) তাহলে বিচারক তাকে ডেকে এনে উপদেশ দিতে পারেন

---

১২৭ ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. পৃ. ১৪

১২৮ *আল মাওসু'আ'তুল ফিকহিয়্যা*, খ. ১৩, পৃ. ৪৭

১২৯ আল মাওয়ারদী, *আল আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, পৃ. ২৯৬

কিংবা (অত্যাচারী, অভদ্র, জাহিল বা সীমালঙ্ঘনকারী প্রভৃতি শব্দ বলে) তিরস্কার করতে পারেন বা ধমক ও দিতে পারেন। তাকে এজন্য বড় ধরনের অপমানিত করা কিংবা কারাদণ্ড দেয়া সমীচীন নয়।[১৩০]

ছ. অপমান করা

তা'যীর হিসেবে বিচারক প্রয়োজন মনে করলে অপরাধিকে ছোট খাট অপমানকর শাস্তিও দিতে পারেন।[১৩১] যেমন কেউ যদি কোন পদস্থ ও সম্মানিত ব্যক্তিকে খারাপ নামে ডাকে, তাহলে বিচারক প্রয়োজন মনে করলে তাকে ছোট খাট অপমানকর শাস্তি দিতে পারেন। যেমন- কান ধরে উঠা বসা করা, এক পায়ের উপর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা প্রভৃতি। এ ধরনের অপরাধের জন্য কারাদণ্ড দেয়া সমীচীন নয়।

জ. বয়কট করা

বয়কট অর্থ সম্পর্ক ছিন্ন করা অর্থাৎ উঠা বসা না করা, কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়া, লেনদেন করা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি। তা'যীর হিসেবে বিচারক অপরাধীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিতে পারেন।[১৩২] যে তিনজন সাহাবী তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন তাদেরকে বয়কট করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ নির্দেশের কারণে আল্লাহর কাছে তাদের দোয়া কবুল হওয়া পর্যন্ত সাহাবীগণের মধ্যে কেউ তাদের সাথে কথা বলতেন না, কেউ তাদেরকে সালাম দিতেন না, কেউ তাদের সাথে উঠা বসা মেলামেশা করতেন না।[১৩৩]

ঝ. ঢোল, শুহরত, প্রচার ও মাইকিং প্রভৃতি

বিচারক মনে করলে তা'যীর হিসাবে মাইকিং, ঢোল, শুহরত, রেডিও, টিভি ও পত্রিকা প্রভৃতির মাধ্যমে অপরাধির নাম লোকদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারেন। বর্ণিত রয়েছে, কাযী শুরাইহ (রহ) সাক্ষ্যদানকারীর নাম বাজারে ঢোল মেরে প্রচার করতেন, বেত্রাঘাত করতেন না।[১৩৪] ইমাম আবূ হানিফার (রহ) মতে, মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীকে বাজারে ঘুরিয়ে তার অপকর্মের কথা প্রচার করা হবে। যদি সে বাজারি লোক হয়। অন্যথায় গ্রামের মধ্যে আসরের নামাযের পরে যেখানে লোকজন জড়ো হয়। সেখানে তাকে

[১৩০] আবূ দাউদ, *(কিতাবুল হুদুদ)*, হা. নং- ৪৪৭৮

[১৩১] আল বাবরতী, *আল 'ইনায়াহ*, খ. ৫, পৃ. ৩৪৪ ; আল খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, খ. ৮, পৃ. ১১০

[১৩২] ইবনু ফারহুন, *তাবছিরাতুল হুক্কাম*, খ. ২, পৃ. ২৯১

[১৩৩] সহীহ আল বুখারী, *(কিতাবুল মাগাযী)*, হা. নং- ৪১৫৬

[১৩৪] ইবনু হাজার আসকালানী, *আদ দিরায়াহ*, খ. ২, পৃ. ১৭৩

নিয়ে তার অপকর্মের কথা ঘোষণা করা হবে। তাকে কোন রূপ প্রহার করা বিধেয় নয়। তবে সাহেবাইনের মতে, তাকে বেত্রাঘাত ও বন্দি করতে হবে।

ঞ. আদালতে তলব

যদি কোন বিশিষ্ট মর্যাদাবান লোক থেকে কোন ধরনের পদস্খলন ঘটে, ছোট খাট ত্রুটি সংঘটিত হয়, তাহলে বিচারক প্রয়োজন মনে করলে তাকে আদালতে ডেকে এনে তার কৃত অপরাধ সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে পারেন।[১৩৫]

ট. চাকুরিচ্যুতকরণ

অপরাধিকে তা'যীর হিসাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যাবে। যেমন ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ বা দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারী কর্মকর্তাকে জনস্বার্থে পদচ্যুত করতে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে যে বিচারক ইচ্ছাকৃতভাবে পক্ষপাতমূলক ফায়সালা করে তাকেও পদচ্যুত করা যাবে।

ঠ. সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দেয়া

তা'যীর হিসেবে অপরাধিকে কোন কোন নির্ধারিত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায়। যেমন রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করা, চাকুরিতে প্রমোশন স্থগিত করে রাখা বা ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করে দেয়া প্রভৃতি।

ড. উপায় উপকরণ ও সম্পদ নষ্ট করা

যে সকল বস্তু পাপ ও অন্যায় কাজে সাহায্য করে কিংবা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার হয়, সে সকল বস্তু ও সরঞ্জাম নষ্ট করে দেয়াও জায়িয। যেমন বাদ্য যন্ত্র ভেঙ্গে দেয়া এবং মদের পাত্র নষ্ট করা প্রভৃতি বৈধ। তদুপরি ভেজাল মিশ্রিত সম্পদও নষ্ট করে দেয়ে জায়িয। যেমন দুধে পানি মিশ্রিত করে ভেজাল দিলে তা মাটিতে ফেলে দেয়া জায়িয হবে। তদ্রূপ খারাপ সূতা দিয়ে কাপড় বুনলে তাকে ছিঁড়ে ফেলে ও আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া বৈধ হবে।[১৩৬]

ঢ. কাজ কারবারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ

তা'যীর হিসেবে অপরাধীর কাজ কারবার ও লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যেতে পারে।

---

[১৩৫] যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন,* খ. ৩, পৃ. ২০৮; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার,* খ. ৪, পৃ. ৬২

[১৩৬] ইবনু তাইমিয়্যা, *আল ফাতাওয়া আল কুবরা,* খ. ৪, পৃ ২১১-২; ইবনুল কাইয়িম, *আত তুরুকুল হুকমিয়্যাহ,* পৃ. ২২৭-৮; *আল মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ১২, পৃ. ২৭২

ণ. সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা

তা'যীর হিসেবে অপরাধির অর্থ সম্পদ একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আটক করে রাখা যেতে পারে, যাতে সে পরিণাম বিবেচনা করে সংশোধন হতে পারে। অপরাধী সংশোধন হয়ে গেলে তার সম্পদ তাকে ফিরত দিতে হবে। সরকার তা রাজকোষে যোগ করতে পারবে না। কারণ কারো সম্পদ তার সম্মতি কিংবা আইন সম্মত পথ ছাড়া অন্য কোন ভাবে ভোগ করা কারো জন্য বৈধ নয়। তবে অপরাধীর সংশোধন হবার ব্যাপারে বিচারিক বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ নিরাশ হলে তার আটককৃত মাল জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যাবে।[১৩৭]

ত. আর্থিক দন্ড

অধিকাংশ ইমামের মতে, তা'যীর হিসেবে কোন অপরাধের জন্য কাউকে আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করা সঙ্গত নয়। এটাই হল ইমাম আবূ হানিফা (রহ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ) এর অভিমত। ইমাম শাফি'ঈ (রহ) প্রথমে জায়িযের মত পোষণ করলেও পরবর্তীতে সে মত থেকে ফিরে আসেন। তাঁর নতুন মত অনুযায়ি অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়িয নয়। হাম্বলি ইমামগণের মতে, অর্থ জরিমানা করা হারাম। অনুরপভাবে শাস্তি হিসেবে সম্পদ নষ্ট করাও হারাম। তাঁদের কথা হল, এই বিষয়ে শারী'আতের নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে হানফিগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) ও অধিকাংশ মালিকি মতাবলম্বি ইমামের মতে, অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়িয, যদি তাতে কোন কল্যাণ নিহিত থাকে।[১৩৮]

ইবনু তাইমিয়্যা (রহ) ও ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) প্রমুখের মতে, অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়িয। তাঁদের কথা হল, অরক্ষিত সম্পদ কেউ যদি চুরি করে কিংবা এ ধরনের চুরি যাতে হাদ্দ প্রয়োগ করা যায় না, তাতে দ্বিগুণ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা যায়।[১৩৯]

ইসলামী শাস্তি আইন ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছদ্য অংশ। এ আইনের মৌলিকত্য ও সারবত্তা পরিবর্তনযোগ্য নয়। তবে সময় ও অবস্থার তাগিদে এবং নতুন পরিবেশে উদ্ভূত সমস্যাদির সমাধান কল্পে ইজতিহাদের মাধ্যমে ক্ষেত্র বিশেষে এর যুগোপযোগী কার্যকর রূপ দান করা যাবে এবং তা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত করা যাবে।

ইসলামী শাস্তি আইনের প্রধান লক্ষ্য মানবজাতির কল্যাণসাধন ও সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা। এ আইন নাযিল হয়েছে আল্লাহর বান্দাহদের সর্বপ্রকারের অপরাধ মনোবৃত্তি দমনের একমাত্র চিকিৎসারূপে। এ

---

১৩৭ ইবনু নুজায়ম, *আল বাহরুর রা'ইক,* খ. ৫, পৃ. ৪২

১৩৮ ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর,* খ. ৫, পৃ. ৩৪৫; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার,* খ. ৪, পৃ. ৬১; *আল মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা,* খ. ১২, পৃ. ২৭১২

১৩৯ ইবনু তাইমিয়্যা, *আল ফাতাওয়া আল কুবরা,* খ, ৪, পৃ. ২১১; ইবনুল কাইয়্যিম, *আততুরুকুল হুকমিয়্যাহ,* পৃ. ২৭৭-৮

চিকিৎসা প্রয়োগের পর অপরাধ নামক কোন রোগের নাম চিহ্নও থাকতে পারে না, যদি তা যথাযথভাবে প্রয়োগ ও কার্যকর করা হয়। এ আইন দ্বারা মুসলিম উম্মাহ শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল ধরে সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। ইতিহাস অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, একমাত্র ইসলামী আইনই সব ধরনের পাপাচার ও অপরাধ নির্মূল করতে সক্ষম। সমাজ যখনই তা কার্যকর করেছে, তখন মানুষ পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের সুযোগ পেয়েছে। অপরদিকে মানব রচিত শাস্তি আইন সকল অপরাধ দমনে ব্যর্থ ও অকেজো প্রমাণিত হয়েছে। এ আইন দ্বারা শাসিত গোটা সমাজকে ব্যাপক বিপর্যয়, অশান্তি ও চরম দুর্যোগ গ্রাস করেছে এবং প্রতিনিয়ত করছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর আগমনের প্রাক্কালে তাবৎ দুনিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নৈরাজ্যের প্রান্তসীমায় উপনীত হয়েছিল। ধর্ম, নীতিবোধ ও বিচার বলতে কিছুই ছিল না। 'খুনের বদলে খুন' ও 'জোর যার মুল্লুক তার' প্রভৃতিই ছিল তখনকার সমাজের প্রচলিত নীতি। রাসূলুল্লাহ (সা) পারস্পরিক বিবদমান ও অপরাধপ্রবণ গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি সুসংহত জাতিতে পরিণত করেন। ইসলামী আইনের কঠোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি মদীনায় মাত্র দশটি বছরে সর্বপ্রকারের অপরাধ মূলোৎপাটন করে শান্তি শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, সুনীতি ও পবিত্রতার এক অতুলনীয় সমাজ গড়ে তোলেন। সে ছিল এক বিস্ময়কর বিপ্লব। এই বিপ্লবে প্রথমে আরবে ভূমি কেঁপে উঠলেও ক্রমে তার প্রতিকম্পন ছড়িয়ে পড়েছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ জুড়ে।

টমাস কার্লাইলের ভাষায়-

The revolution brought by prophet Mohammad (sm) was a great spark of fire which within a twinkle of an eye, burnt out all rubbishes of inhumanity and untruths that erected their heads from Delhi to Granada of from earth to sky.

"হযরত মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক সংঘটিত বিপ্লব ছিল প্রচণ্ড এক অগ্নি স্ফুলিঙ্গ, যা দিল্লী থেকে গ্রানাডা এবং মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত যে অসত্য ও অমানবিকতার আবর্জনা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তা চোখের পলকে পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলল"।

আমাদের বর্তমান কালে মুসলিম উম্মাহ ইসলামের এ শাস্তি আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন না করার কারণে প্রতিনিয়ত, দুরবস্থা ও বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হচ্ছে। আল্লাহর দীনের একাংশের প্রতি ঈমান অপরাংশের প্রতি কুফরি এ নীতি দ্বারা মুসলিম জাতির বর্তমান দুরবস্থার পরিবর্তন কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। এর ফলে অপরাধ দমন ও মূলোৎপাটন তো সম্ভবই নয়; বরং প্রতিনিয়ত এর মাত্রা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে এবং এর পরিণাম হবে অবর্ণনীয় ক্ষতি ও বিপর্যয়। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের মনোবৃত্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "তোমরা কি

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আর কিছু অংশের প্রতি কুফরি করবে? (জেনে রেখো) দুনিয়ায় এ নীতি অবলম্বনকারীদের লাঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না"।[১৪০]

"Then do you believe in a part of the Scripture and reject the rest? Then what is the recompense of those who do so among you, except disgrace in the life of this world." (Sursh 2. Al-Baqarah. Part 1. Ayat 85).

অতএব সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে ইসলামের শাস্তি আইন সম্পর্কে আমাদের সম্যক অবগত হওয়া, অতঃপর তা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ কাজে এগিয়ে আসার তাওফিক দান করুন।

---

[১৪০] আল কুরআন, ২: ৮৫- افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذالك منكم الا خزي في الحيوة الدنيا

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠায় সমস্যা ও তা প্রতিকারে করণীয়

বাংলাদেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠায় সমস্যা ও তা প্রতিকারে করণীয়

ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়; একটি কল্যাণমূলক জীবন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ ইসলামী বিচার ব্যবস্থা। ইসলামী বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অন্যতম নমুনা। এ বিচার ব্যবস্থা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য শ্রেষ্ঠতম নি'আমত। মানব সমাজের বৃহত্তর পর্যায়ে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে পার্থিব জীবনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুশাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র দেশ। মুসলিম অধ্যুষিত স্বাধীন সার্বভৌম দেশটির রয়েছে ইসলামী ঐতিহ্যের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। এদেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলামী আদর্শের অনুরাগী। তাই দেশটিতে ইসলামী আইন প্রবর্তনে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন সম্পর্কে সর্বস্তরের বিশেষ করে শিক্ষিত মহলের সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে এসব দেশে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন কিছুটা জটিলও বটে।

হিজরী প্রথম বর্ষ থেকেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে। দীর্ঘকাল ধরে এ ধারা অব্যাহত থাকে। ইউরোপীয় মুসলিম স্পেন ও বর্তমান পর্তুগালসহ অনেক দেশ দীর্ঘ আট'শ বছর ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত হয়েছে। উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত (১৭৫৭ খৃ.) ইসলামী আইন কার্যকর ছিল। গত শতকের প্রথম দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে তুর্কী খিলাফাতের অবসান হওয়া পর্যন্ত আফ্রিকার উত্তর, উত্তর পূর্ব ও উত্তর পশ্চিমসহ মধ্য প্রাচ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত হয়েছে। উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের পতনের পর বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা দখল করে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা ইসলামী আইন বলবৎ রাখে। অতঃপর তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আইন প্রণয়নের পর ধীরে ধীরে প্রতিটি বিভাগ থেকে ইসলামী আইনের বিলুপ্তি ঘটতে থাকে। তবে আইন প্রণয়নে তারা ব্যাপকভাবে ইসলামী আইনের সহায়তা গ্রহণ করে। এ কারণেই তাদের প্রণীত আইনের মধ্যে ইসলামী আইনের উপাদান ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম পার্সোনাল ল' আকারে ইসলামী আইনের কয়েকটি অধ্যায় তারা বলবৎ রাখে। এমন কি ব্যক্তিগত আইনও পরিবর্তন করে সরাসরি মুসলমানদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের কাঠামো ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করার ঝুকি নেয়নি। তবে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে ইসলামী আইনের যে ভীত রচিত হয়েছিল তা এতই মজবুত ও বাস্তবসম্মত ছিল যে, বিশ্ব মানবতা হাজার বছরেরও বেশী সময় এই আইনের দ্বারা শাসিত হয়েছে। এজন্য বিগত প্রায় দু'শ বছরে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো বৃটিশ ল' এর একচ্ছত্র আধিপত্য সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী আইনের আবেদন ও গ্রহণযোগ্যতা কোন না কোন পর্যায়ে অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে। কিন্তু আজকের মুসলমানদের সমস্যা ভিন্নতর। কেননা বৃটিশদের এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পূর্বে এক শ্রেণির লোকদের তাদের শিক্ষা, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তোলার পর এদের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করে যায়। এই নব্য শাসক শ্রেণি চিন্তা চেতনায়, মননে ও ভাবাদর্শে কার্যতঃ সম্পূর্ণ রূপে বৃটিশদের অনুগামী। বৃটিশরা এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও এদেশীয় শাসক শ্রেণি তাদের প্রণীত

Dhaka University Institutional Repository

আইন কাঠামো বলবৎ রাখে। তাদের ধারণা হল ইসলামে একটি আধুনিক দেশ ও জাতিকে শাসন করার মত উপযুক্ত কোন আইন নেই। ইসলাম আধুনিকতা বিবর্জিত ও সময়োপযোগী কোন জীবন দর্শন তো নয়ই, বরং ইসলামই চির আধুনিক ও একমাত্র কালজয়ী পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র জীবন বিধান"।[১]

"Truly, the religion with Allah is Islam." (Surah 3. Al-Imran. Part 3. Ayat 19).

অপর এক আয়াতে আছেঃ "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন (ধর্ম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান মনোনীত করলাম"।[২]

"This day, I have perfected your religion for you, completed My Favour upon you, and have chosen for you Islam as your religion." (Surah 5. Al-Maidah. Part 6. Ayat 3).

ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম ইহলৌকিক বা পারলৌকিক জীবনে সফলতা দানের নিশ্চয়তা দেয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবন বিধান গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত"।[৩]

"And whoever seeks a religion other than Islam, it will be accepted of him, and in the Hereafter he will be one of the losers." (Surah 3. Al-Imran Part 3. Ayat 85).

ইসলাম যেহেতু গতিশীল সর্বাধুনিক জীবনবিধান, কাজেই যুগে যুগে অবস্থা ও প্রয়োজনের দাবি অনুসারে ইসলামের আইনগুলো আধুনিক রূপ নিবে, বাহ্যিক পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হতে পারে; কিন্তু মূল ও আভ্যন্তরীণ গুণাবলীতে কোন পার্থক্য দেখা যাবে না। ইসলামী আইন এবং পাশ্চাত্য আধুনিকতার মধ্যে পার্থক্য এখানেই। তাই আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতাকে আত্মস্থ করেই ইসলামী আধুনিকতা নিজস্ব পথে এগিয়ে চলে। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এদেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ৮৮% মুসলিম, আর এদেশে ইসলাম আগমনের পিছনে রয়েছে সোনালী ইতিহাস। তৎকালীন ভারত উপমহাদেশের বাইরে থেকে যেসব মুসলমান আগমন করেছিলেন তাদেরকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমনঃ

---

১ আল কুরআন, ৩: ১৯ - ان الدين عند الله الاسلام

২ আল কুরআন, ৫: ৩ - اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا

৩ আল কুরআন, ৩: ৮৫ - ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخسرين

(১) কিছু সংখ্যক মুসলিম ব্যবসায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আগমন করে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করেন।

(২) কিছু সংখ্যক মুসলিম হলেন ওলি, দরবেশ, ফকির। তাঁরা ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে সারাজীবন অতিবাহিত করে এখানেই ইন্তেকাল করেন।

(৩) এক শ্রেণির মুসলিম এসেছিলেন বিজয়ীর বেশে। তাদের বিজয়ের ফলে এদেশের মুসলিমদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭১২ খৃষ্টাব্দে ভারতের সিন্ধু প্রদেশে সর্বপ্রথম মুহাম্মদ ইবনে কাসিম বিজয়ীর বেশে আগমন করেন। তাঁর বিজয় পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বাংলায় মুসলমানদের আগমন দূর অতীতের কোন শুভক্ষণে হয়ে থাকলেও তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল হিজরী ৬০০ সাল মোতাবেক ১২০৩ খৃষ্টাব্দে। তৎকালীন ভারত সম্রাট কুতুবুদ্দিন আইবেকের (৬০২/১২০৬) সময় ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার খিলজি (১২০৩ খৃ.) বাংলায় অলৌকিকভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।[৪] এ সময় থেকে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল, আফগানিস্তান, ইরান, আরব, তুরস্ক থেকে অসংখ্য মুসলিম বাংলায় আগমন করেন। তখন বাংলার শাসক ছিলেন লক্ষণ সেন। মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী নিয়ে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার খিলজি নদীয়া জয় করেন এবং শতাব্দীকাল পর ১৩৩০ খৃ. মুহাম্মদ তুগলক শাহ পূর্বাঞ্চল জয় করেন এবং সাতগাঁও ও সোনারগাঁওয়ে যথাক্রমে রাজধানী স্থাপন করেন।[৫] ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের পর থেকে ২৩ জুন ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশি প্রান্তরে মুসলিম শাসনের পতন পর্যন্ত (১২০৩ ১৭৫৪) ৫৪৫ বছরে ১০১ জন বা ততোধিক শাসক বাংলায় শাসনকার্য পরিচালনা করেন।[৬]

মুসলিমজাতি তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা যথাযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়। এজন্য দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট এই উপমহাদেশে পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ১৯৭১ সনে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

৪ আব্বাস আলী খান, *বাংলায় মুসলমানদের ইতিহাস,* ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪ খৃ. পৃ. ২৪

৫ *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৪

৬ *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৪

ইসলামী আইনের সমস্যা

১. শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি;

২. রাজনৈতিক কারণ;

৩. ধর্মীয় কারণ ও ধর্মীয় নেতাদের অনৈক্য;

৪. ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব;

৫. ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা;

৬. ইসলামী আইনের কার্যকারিতা ও উপস্থাপনের দুর্বলতা;

৭. দেশী বিদেশী প্রচার মাধ্যমের অপপ্রচার।

(১) শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি

আমাদের দেশে পরস্পর বিপরীতধর্মী দু'টি শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে। একটি মাদরাসা শিক্ষা এবং অপরটি সাধারণ শিক্ষা নামে পরিচিত। প্রথমটি ইসলামী শিক্ষা বলে দাবি করে এবং দ্বিতীয়টি আধুনিক শিক্ষা হিসেবে গৌরব বোধ করে। যারা মাদরাসা শিক্ষা লাভ করেন তারা কুরআন, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন বটে, কিন্তু আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার তেমন কোন সুযোগ পান না। ফলে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের যত সমস্যা আছে, সেগুলোর আধুনিক রূপ ও গতি প্রকৃতি সম্পর্কে তারা কোন জ্ঞানই লাভ করেন না। ফলে মানবজীবনে সমস্যার যে সুষ্ঠু ও নির্ভুল সমাধান কুরআন ও হাদীসে দেয়া হয়েছে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার কোন সুদূর প্রসারি দৃষ্টিভঙ্গিই তারা লাভ করতে পারেন না। এ কারণে সুদীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করেও তারা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন তা আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজন পূরণে প্রযুক্তির দৌড়ে কার্যতঃ ব্যর্থতার গ্লানি বয়ে আনে।

পক্ষান্তরে যারা আধুনিক শিক্ষা অর্জন করেন তারা প্রচলিত দুনিয়ার জ্ঞান অর্জন করতে পারেন বটে, কিন্তু নির্ভুল আদর্শিক জ্ঞানে তারা সমৃদ্ধ হতে পারেন না। এ শিক্ষার নির্ভুল আদর্শিক পাশাপাশি ইসলামের পূর্ণ আনুগত্য করতে তাদেরকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি শিখে নিজেদেরকে খাঁটি মুসলমান রূপে গড়ে তুলতে অতিরিক্ত শ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয়।[৭]

---

৭ ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক, *ইসলামী বিচার ব্যবস্থা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খ্রি. ২০০৭, পৃ. ৩৭৬

Dhaka University Institutional Repository

(২) রাজনৈতিক কারণ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেক দলের নাম লক্ষ্য করা গেলেও তারা মূলতঃ প্রধান দু'টি মেরুতে অবস্থিত। (ক) একটি ধারা সমাজ জীবনের সকল পর্যায়ে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের ঘোড় বিরোধী এবং (খ) অপরটি ইসলামী আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রচেষ্টারত। এ দেশে ইসলামী আইন ও ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে এই দ্বি- মুখী রাজনৈতিক মেরু একটি বড় অন্তরায়।[৮]

(৩) ধর্মীয় নেতাদের অনৈক্য

বাংলাদেশে যারা ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে দেখতে চান তাদের শ্লোগান, লেখনি ও বক্তৃতা ও বিবৃতিতে ঐক্য লক্ষ্য করা গেলেও কার্যতঃ তারা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত। ফলে তারা রাজনৈতিক অঙ্গনে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারছেন না। তাদের এ অনৈক্য বাংলাদেশকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার পথে বড় অন্তরায়।[৯]

(৪) ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব

আমাদের দেশের উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের আওতায় শিক্ষাদান করা হলেও ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের তেমন কোন ধারণাই দেয়া হয় না। কোন কোন পর্যায়ে ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সামান্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল খণ্ডিত ও বিকৃত। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের কাছে ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। এর প্রভাব পরে সাধারণ জনগোষ্ঠীর উপর। এটাও বড় ধরনের সমস্যা।[১০]

(৫) ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা তথা মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার পিছনে আলিয়া ও কাওমী নামে যে দু'টি ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে তাতেও ইসলামী বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আধুনিক মন মানসের উপযোগী কোন শিক্ষাক্রম নেই। ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যারা উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছেন তাদের অধিকাংশই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের মতই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কখনো খণ্ডিত ধারণা লাভ করছেন, এবং আধুনিক বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যাচ্ছেন। ফলে তারাও জনগণের সামনে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি

---

[৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৭৬

[৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৭৬

[১০] *প্রাগুক্ত*, পৃ৩৭৬

হিসেবে জনসমাজে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার সুফল ও প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার কুফল সম্পর্কে অবহিত করতে পারছেন না। এটিও একটি বড় সমস্যা।[১১]

(৬) ইসলামী আইনের কার্যকারিতা উপস্থাপনে দুর্বলতা

ইসলামী আইন যে বহু ধর্মীয় জাতি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত একটি আধুনিক সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সক্ষম তা ইসলামের আদর্শের অনুসারীগণ জনগণের ভিতরে একটি অস্পষ্টতা, ভীতি, সংশয় ও অজ্ঞতা থেকে যাচ্ছে। এটিও একটি সমস্যা।[১২]

(৭) দেশী বিদেশী মিডিয়ার অপপ্রচার

হযরত ঈসা (আ) এর ইন্তিকালের সুদীর্ঘ ৫৭০ বছর পর মুহাম্মদ (সা) এর শুভ আবির্ভাব হয়। এই দীর্ঘ সময়ে কোন নবী রাসূল না থাকায় তদানিন্তন জনগোষ্ঠী যেমন আল্লাহর একত্ববাদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে গিয়েছিল এবং শয়তানের অপপ্রচার তাদের সন্দেহের আবর্তে ফেলে দিয়েছিল। ঠিক তদ্রূপ ১৯৫৭ সালে পলাশির আম্রকাননে ইংরেজদের কাছে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মুসলিম জাতিসত্তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল এবং ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কার্যত মুছে গিয়েছিল। ইসলাম বিদ্বেষী দেশী বিদেশী প্রচার মাধ্যমগুলো ইসলাম, বিশেষত ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে অপপ্রচার চালিয়ে আসছিল। এ ধারা এখন নতুন মাত্রা পেয়েছে। এতে বিশাল জনগোষ্ঠী ইসলামী দর্শন সম্পর্কে বিভ্রান্তির শিকার হয়। এটিও একটি মারাত্মক সমস্যা।[১৩]

ইসলামী আইনের সম্ভাবনা

(১) শিক্ষা ব্যবস্থায় সমন্বয় সাধন

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হলেও এর মধ্যে কোন সম্ভাবনা লুকিয়ে নেই, বিষয়টি তদ্রূপ নয়। ইসলামী বিচার ব্যবস্থাকে সম্ভাবনাময় পর্যায়ে নিয়ে আসতে হলে প্রয়োজন সাধারণ আইন শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী আইন শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এজন্য যেমন প্রয়োজন ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের, তদ্রূপ প্রয়োজন একটি আইন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা। এ একাডেমি- ই আমাদের পূর্ব পুরুষদের কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করবে এবং ইসলামী আইনের গ্রন্থ রয়েছে তা শুধু মাতৃভাষায় অনুবাদই করবে না, ইসলামী

[১১] *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৭৭

[১২] *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৭৭

[১৩] *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৭৭

আইন ও বিচার ব্যবস্থা জানার জন্য যা অপরিহার্য, বর্তমান যুগ চাহিদার দাবি অনুসারে তা নতুনভাবে ঢেলে সাজাবে। এ পদ্ধতিতেই পূর্ণ সফলতা অর্জন করা সম্ভব। উল্লেখ্য, ইসলামী আইনের গ্রন্থসমূহ প্রধানত আরবি ভাষায় রচিত। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণত আরবি ভাষায় অনভিজ্ঞ। এই অনভিজ্ঞতার কারণে কিছু শোনা কথার উপর ভিত্তি করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেই প্রায়শঃ ইসলামী আইন সম্পর্কে নানা ধরণের ভুল ধারণা পোষণ করেন এবং তা প্রচার করেন। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, যারা এরকম অর্থহীন চিন্তাধারা ও বিবেকের দৈন্যদশারই প্রকাশ ঘটান। যদি তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের ইসলামী আইন শাস্ত্রের (ফিকহশাস্ত্র) গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে গবেষণা করতেন তাহলে দেখতে পেতেন গত দেড় হাজার বছরে আমাদের পূর্ব পুরুষগণ শুধু অর্থহীন বিতর্কেই জড়িয়ে সময় নষ্ট করেননি, বরং তারা পরবর্তী বংশধরদের জন্য রেখে গেছেন এক মহান উত্তরাধিকার।

(২) অতীত ঐতিহ্য অনুসরণ

এছাড়াও বলা যায়, বিগত দিনসমূহে পৃথিবীর এক বিশাল এক অংশ জুড়ে মুসলমানগণ যে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার সব ক'টি আইনই ছিল ইসলামী আইন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। তারাই রাষ্ট্রের জজ ম্যাজিস্ট্রেট ও চিফ জাস্টিস নিযুক্ত হতেন। তাদের রায় দ্বারা বিচার বিবরণীর বিপুল সম্পদ তৈরী হত এবং তারা আইনের প্রায় সব বিভাগ নিয়েই আলোচনা করেছেন। এ জন্য প্রয়োজন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি দলকে বাছাই পূর্বক এ কাজে নিয়োজিত করা, যারা বর্তমান যুগের আইনের গ্রন্থরাজির পাশাপাশি সে সব মূল্যবান বিষয়কেও সাজিয়ে দিবেন। বিশেষত এমন কতিপয় আইনও ও বিচার সম্পর্কীয় গ্রন্থ আছে যার বঙ্গানুবাদ হওয়া একান্ত জরুরী।

(৩) কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ অনুবাদ

কুরআনের আইন বিষয়ে বিশেষতঃ তিনটি অনবদ্য গ্রন্থ আছে।

(ক) ইমাম আবূ বকর আহমাদ ইবন আলি আর- রাজি আল জাসসাস আল হানাফি (জ. ৩০৫/৯১৭, মৃ. ৩৭৫/৯৮০) প্রণীত 'আহকামুল কুরআন' এর আংশিক বঙ্গানুবাদ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

(খ) ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল- আনসারি আল কুরতুবী (মৃ. ৬৭১/ ১২৭২) প্রণীত 'আল জামে' লি আহকামিল কুরআন'।

(গ) ইমাম আবূ বকর মুহিউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন আলী (তবে তিনি ইবনুল আরাবি নামে সমধিক পরিচিত, জ. ৫৬০/ ১১৬৫, মৃ. ৬৩৮/ ১২৪০) প্রণীত 'আহকামুল কুরআন'।

এসব গ্রন্থের অনুশীলন আইন শিক্ষার্থীদের কুরআন থেকে সমাধান বের করার পদ্ধতি শিক্ষা দিবে। এসব গ্রন্থে কুরআনের সমস্ত বিধি নিষেধ সম্পর্কিত আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। হাদীসে এর যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এগুলোতে তা বর্ণনা করা হয়েছে এবং মুজতাহিদগণ এর থেকে যে বিধি- বিধান বের করেছেন সেগুলো যুক্তি সহকারে পেশ করা হয়েছে।

(৪) হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ অনুবাদ

দ্বিতীয় মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে হাদিসের ভাষ্য গ্রন্থসমূহ, যাতে বিধি বিধান ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ের উদাহরণ ও তার ব্যাখ্যামূলক বিবরণ পাওয়া যায়। এসবের মধ্যে নিম্নবর্ণিত গ্রন্থগুলোর বঙ্গানুবাদ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ ‘ফাতহুল বারী’ ও ‘উমদাতুল কারী’; মুসলিম শরিফের ভাষ্যগ্রন্থ ‘নববী’ ও মাওলানা শিবলী আহমাদ উসমানী (রহ) এর ‘ফাতহুল মুলহিম’। আবূ দাউদ শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ ‘আওনুল মা‘বুদ’ এবং ‘বজলুল মাজহুদ’। মুয়াত্তার ভাষ্যগ্রন্থ শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ) প্রণীত ‘আওযাজুল মাসালিক’। মুনতাকাল আখবারের ভাষ্যগ্রন্থ ইমাম শাওকানীর ‘নাইলুল আওতার’। মিশকাত শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ ইদরীস কান্দলভীর ‘আত তালিকুস সাবিহ’ এবং ইমাম তাহাবীর ‘শারহু মাআনিল আসার’। শেষোক্ত গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় বাজারে এসেছে।

(৫) ফিকহের গ্রন্থ অনুবাদ

এরপর ফিকহ শাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থগুলোরও অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। হানাফি ফিকহ গ্রন্থগুলোর মধ্যে ইমাম সারাখসীর ‘আল মাবসুত’ এবং ‘শারহুস সিয়ারিল কাবির’, আল কাসানির ‘বাদাইউস সানাই’, ইবনুল হুমামের ‘ফাতহুল কাদির’, ‘আল হিদায়া’ ও ‘ফাতওয়া আলমগীরি’ ইত্যাদি। সম্প্রতি শেষোক্ত গ্রন্থ দু’টির বাংলা অনুবাদ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

শাফি‘ঈ মাযহাবের ‘কিতাবুল উম্ম’, ‘শারহুল মুহাজ্জাব’ ও মুগনিল মুহতাজুল মুদাওয়ানাহ’, হাম্বলি মাযহাবের ইমাম ইবন কুদামার ‘আল মুগনী’; ইমাম ইবন হাযমের ‘আল মুহাল্লা’ ইবন রুশদের ‘বিদায়াতুল মুজতাহিদ’, আল জাযায়েরির ‘কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবা‘আ’ এবং ইমাম ইবনুল কায়্যিমের ‘যাদুল মা‘আদ’। উল্লেখ্য যে, শেষোক্ত গ্রন্থটি ইতোমধ্যে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ) এর ‘কিতাবুল খারাজ’, ইয়াহইয়া ইবন আদামের ‘কিতাবুল খারাজ’, আল কাসিমের ‘কিতাবুল আমওয়াল’, হিলাল ইবন ইয়াহইয়ার ‘আহকামুল ওয়াকফ’ ও ইমাম দিয়য়াতির ‘আহকামুল মাওয়ারিস’। এছাড়াও ইমাম ইবন হাযমের ‘উসূলুল আহকাম’, ইমাম শাতিবির ‘আল মুয়াফিকাত’, ইমাম ইবনুল কায়্যিমের ‘ইমামূল মুয়াক্কিঈন’ এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ) এর ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ’। শেষোক্ত গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করতে হলে ইসলামী শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে তুলতে হবে এবং আধুনিক শিক্ষাকে ইসলামিক শিক্ষা কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসতে হবে। উভয় শ্রেণির আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে ইসলামী আইনের প্রয়োগ সাপেক্ষ হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব নয়। আরো বলা যায়, ইসলামী শিক্ষা কিংবা সাধারণ শিক্ষা নয়, বরং তা হতে হবে এমন এক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা, যা গ্রহণ করার ফলে একজন শিক্ষার্থী যেমন দীনি ব্যাপারে পাণ্ডিত্য অর্জন করবে, তদ্রূপ বৈষয়িক বিষয়েও নেতৃত্বদানের গুণাবলি অর্জন করবে। আমাদের সোনালী যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা এদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমাদের দেশের প্রায় আড়াই লক্ষ মাসজিদের ইমাম খতিব, মুয়াজ্জিন, খাদিম ও মুসল্লী, আলিয়া ও কাওমী মাদরাসার হাজার হাজার উস্তাদ ও ছাত্র, অগণিত খানকার পীর মুরিদ এবং তাবলিগ জামা'আতের সাথে জড়িত লক্ষ লক্ষ মুবাল্লিগ ও কর্মী বিপুল সংখ্যক আলোচক ও শ্রোতাবৃন্দ এবং তাফসির মাহফিলের মুফাসসির ও শ্রোতা মিলে বাংলাদেশে বিশাল ইসলামী জনশক্তি রয়েছে। ধর্মীয় ময়দানে এ জনশক্তি স্পষ্টই চোখে পড়ার মতো। কিন্তু রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামী শক্তি এখনো উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে উন্নিত হয়নি। নির্বাচনে যে ক'টি ইসলামী দল অংশগ্রহণ করেছে তারা সবাই মিলেও মোট ভোটের শতকরা ১০ ভাগও পায়নি। এর মূলে রয়েছে ইসলামী দলগুলোর রাজনৈতিক ময়দানে অনৈক্য। পক্ষান্তরে ইসলাম বিরোধী শিবিরে বৃহত্তর ইস্যুতে ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। ইসলামী দলগুলোর এই অনৈক্য ধর্ম প্রাণ ইসলাম দরদী জনগোষ্ঠীকে হতাশ করে। অথচ ইসলামী দলগুলো অহরহ ঐক্যের নসিহত করে বেড়ায়। তাদের অনৈক্য পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রতিটি অঙ্গনে পরিলক্ষিত হয়।

কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না"।[১৪]

"And hold fast, all of you together, to the Rope of Allah (i.e. this Qur'an), and be not divided among yourselves." (Surah 3. Al-Imra. Part 4. Ayat 103).

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা তাদের মত হইওনা যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি"।[১৫]

---

[১৪] আল কুরআন, ৩: ১০৩ - *واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا*

[১৫] আল কুরআন, ৩: ১০৫ - *ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينت واولئك لهم عذاب عظيم*

"And be not as those who divided and differed among themselves after the clear proofs had come to them. It is they for whome there is an awful torment." (Surah 3. Al-Imran. Part 4. Ayat 105).

কাজেই বাংলাদেশে একটি অর্থবহ ও কার্যকর ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে নীচের বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবেঃ

(ক) ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ বিরোধী কার্যক্রম ও ষড়যন্ত্রের গভিরতা সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে এবং একই সাথে বাংলাদেশের বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে।

(খ) বৃহত্তর ঐক্যের প্রয়োজনেই গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অভিন্ন বক্তব্য প্রদান ও কর্মপন্থা গ্রহণে সবার্ত্নক প্রয়াস চালাতে হবে।

(গ) ইসলামী দল, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও ব্যক্তিদের মাঝে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

(ঘ) ইসলামী দল, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ওলামায়ে কিরাম যেন পারস্পরিক অনাকাঙ্খিত বিরোধে জড়িয়ে না পরেন; বরং সর্বোচ্চ ত্যাগের দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ ব্যাপারে প্রতিপক্ষ যেন সুযোগ গ্রহণ করে ইসলামী শক্তিকে দুর্বল করতে না পারে এবং অনৈক্যের আবর্তে ফেলে দিতে না পারে সে বিষয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

(ঙ) প্রচার মাধ্যমগুলোর সংবাদ দেখে কারো বিরুদ্ধে বক্তব্য বিবৃতি দেয়ার পরিবর্তে সমঝোতার চেষ্টা করতে হবে। কেননা আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছেঃ "আপোষ নিস্পত্তিই শ্রেয়"।[১৬]

"And making peace is better." (Surah 4. An-Nisa'. Part 5. Ayat 128).

(চ) সংবাদের সত্যতা যাচাই করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় মারাত্নক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারি তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবে। এ কারণে যে, ভুলবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্থ করে বস এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়"।[১৭]

---

[১৬] আল কুরআন, ৪: ১২৮ -والصلح خير

[১৭] আল কুরআন, ৪৯: ৬ -يايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم ندمين

“O you who believe! If a Fasiq (Liar evil person) comes to you with any news, verify it, lest you should harm people in ignorance, and afterwards you become regretful for what you done.” (Surah 49. Al-Hujurat. Part 26. Ayat 6).

(ছ) ইসলামী দল ও প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমকে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী না ভেবে সহায়ক শক্তি মনে করতে হবে। ফিকহি ইখতিলাফি মাসাইল নিয়ে নিজেদের মধ্যে যাতে অহেতুক মনোমালিন্য সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, ফিকহ শাস্ত্র কুরআন সুন্নাহর ন্যায় চিরন্তন নয়। বরং প্রয়োজনে কুরআন সুন্নাহকে সামনে রেখে অবস্থার দাবি হিসেবে ভিন্নতর সমাধানও দেয়া যেতে পারে।

কাজেই ইসলামী দল ও এর নেতৃবৃন্দ যেন পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগামহীন, অসংলগ্ন বিষদগারমূলক মন্তব্য না করেন কিংবা ইসলাম বিরোধী শক্তির ক্রীড়নকের ভুমিকায় অবতীর্ণ না হন, সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সর্ব অবস্থায় প্রজ্ঞা, সহনশীলতা ও ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক ওলামায়ে কিরাম রয়েছেন। তারা বিভিন্নমুখী দীনি খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ইসলামকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা কেন সক্রিয় নন এ প্রশ্ন অবান্তর নয়। অবশ্য এর পিছনে একাধিক কারণও রয়েছে। যেমনঃ

(ক) আলিম সমাজের অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত। তারা ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করার সাথে সাথে মাদরাসায় শিক্ষকতা, মাসজিদে ইমামতি কিংবা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে নিজেদের আসীন করাকেই যথেষ্ট বড় মনে করেন। ফলে সমাজ পরিবর্তনের বিশাল ঝুকি গ্রহণ করা তাদের অনেকের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না।

(খ) যৎসামান্য আয় দিয়ে ঘর সংসার ও পারিবারিক ব্যয়ভার নির্বাহ করতে গিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে শরীক হওয়ার গুরুত্ব তাদের নিকট খুব একটা অনুভূত হয় না।

(গ) ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজের গুরুত্ব সম্পর্কীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকাও একটি বড় কারণ।

(ঘ) সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে মহানবী (সা) কে সকল ক্ষেত্রে একমাত্র শ্রেষ্ঠ নমুনা হিসেবে মান্য করা যে অপরিহার্য এ সম্পর্কিত বিশ্বাসের ঘাটতি।

কিছু সংখ্যক পাশ্চাত্য পণ্ডিত শাস্তির ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুধাবন করতে না পেরে এবং কখনো ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাবে আক্রান্ত হয়ে ইসলামী আইনে আরোপিত সীমিত কতিপয় অপরাধের শাস্তিকে

মানুষের জন্য মর্যাদাহানিকর ও বর্বর বলে উদ্দেশ্যমুলকভাবে ইসলামের গোটা আইন ব্যবস্থা সম্পর্কে তুচ্ছতাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তারা কল্পনার দৃষ্টিতে অবলোকন করেন যে, বর্তমানে পাশ্চাত্যে ফৌজদারী আইনের আওতায় অহরহ যেভাবে শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে, তদ্রূপ মুসলিম সমাজেও একই হারে প্রতিদিন চুরির অপরাধে হস্তকর্তন, মাদক গ্রহণের কারণে বেত্রদণ্ড এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে প্রস্তারাঘাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হচ্ছে। তাদের এই বাস্তবতা বিবর্জিত মানসিক কল্পনা তাদেরকে ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে দায়িত্বহীন ও উদ্দেশ্যমূলক মন্তব্য করতে প্ররোচিত করছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ও খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগ থেকে পরবর্তী চারশত বছরের ইতিহাসে মাত্র ছয় বার চুরির অপরাধে হস্ত কর্তনের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। এই তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, শাস্তির কঠোর বিধান প্রয়োগ যথাযথ করা হয়নি বা করার প্রয়োজন হয়নি। অনুরূপভাবে বিবাহিত নারী বা পুরুষের ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে প্রস্তারাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

অথচ উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে দণ্ডবিধির কঠোরতা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও অমানবিক। সেখানে দুইশত তেইশ রকম অপরাধের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। অথচ চৌদ্দশত বছর পূর্ব থেকে ইসলামী আইনে মাত্র চারটি অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড নির্দিষ্ট। ইংল্যান্ডের আইনে যেসব অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড নির্দিষ্ট ছিল এক শিলিং এর অধিক মূল্যবান সম্পদ চুরি, দাঙ্গা, ব্যাংক ধ্বংস, বিচার প্রশাসনের বিরুদ্ধে অপরাধ, গণস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে অপরাধ, নারীধর্ষণ, অপহরণ ও অন্যান্য যৌন অপরাধ তার অন্তর্ভুক্ত। কিছুদিন পূর্বেও রাশিয়াতে চুরি, পেশাদার জালিয়াতি, নারীধর্ষণ ও ঘুষ গ্রহণের ক্ষেত্রে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল এবং বর্তমানেও কম্যুনিস্ট চীনে অনুরূপ শাস্তি বলবৎ আছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এসব দেশে বহু অপরাধের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের শাস্তির তুলনায় কঠোর ও ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলাম কখনো অযাচিত ও অন্যায় শাস্তি নির্ধারণ করে না এবং যথোপযুক্ত বিবেচনা ছাড়া তা কার্যকরও করে না। ইসলাম সঠিক পদ্ধতিতে বিচারের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক ঘটনা, পরিবেশ ও পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে। ইসলামী শারী'আতে কঠোর শাস্তির বিধান আছে সত্য, কিন্তু তা হালকা বা অগভীর দৃষ্টিতে চিন্তা ও বিবেচনা করলে নির্মম বা কঠোর মনে হতে পারে। কিন্তু অপরাধে জড়িত হওয়ার ইচ্ছা ছিল না বা অপরাধী বাধ্য হয়ে অপরাধটি করেনি, এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী আইনে শাস্তি প্রয়োগ করা যায় না। ইসলামী আইনে যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে সে সব ক্ষেত্রে অপরাধ প্রমাণের বিষয়টির সাথে অত্যন্ত কঠিন শর্তাবলী যুক্ত করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সামান্যতম সন্দেহের সৃষ্টি হলেই শাস্তি রহিত হয়ে যায়। কেননা মহানবী (সা) বলেছেন, যতদূর সম্ভব তোমরা মুসলমানদের থেকে হাদ্দ (কঠোর শাস্তি) প্রতিহত কর। যদি রেহাই দেয়ার কোন সুযোগ থাকে, তবে অপরাধীর পথ ছেড়ে দাও। কারণ ইমামের (কর্তৃপক্ষের) শাস্তি প্রয়োগ করে

ভুল করার তুলনায় ক্ষমা করে ভুল করা উত্তম। অপর হাদীসে আছে, "তোমরা সন্দেহের ক্ষেত্রে হাদ্দ রহিত করো"। হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) ও হযরত উকবা ইবন আমির (রা) বলেন, "হাদ্দ কার্যকর করা তোমার জন্য সংশয়পূর্ণ হয়ে পড়লে তা রহিত করে দাও"।

অমুসলিমদের অধিকার ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ

ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ করা হয় যে, তা কার্যকর হলে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার চরমভাবে ব্যাহত হবে। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অবাস্তব। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রের একজন মুসলমানের মান সম্মান ও ইযযতের যে মূল্য দেয়া হয় ঠিক একই মর্যাদা দেয়া হয় অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি। মুসলিম রাষ্ট্রের ইসলামী আইন অনুযায়ী মুসলিমদের সম্পত্তিতে যে পরিমাণ কর দিতে হয়, ঠিক তেমনি অমুসলিমদেরকেও একই পরিমাণ কর দিতে হয়। বরং অমুসলিমদের উপর যাকাতের বিধান বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু মুসলমানদের উপর তা বাধ্যতামূলক। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের কাঠামোতে কেবল রাষ্ট্র প্রধান, প্রধান সেনাপতি, প্রধান বিচারপতি তথা নির্বাহীসমূহ ব্যতীত অমুসলিমদের জন্য যে কোন পদে নিয়োগ লাভ করতে আইনগত কোন বাধা নেই। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হযরত উমর (রা) এর খিলাফাত কালে মিসর প্রদেশের অর্থ বিভাগ তথাকার খ্রিষ্টানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এদশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মপরায়ণ বটে। এতদসত্ত্বেও এ দেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না এবং এ ক্ষেত্রে যে সমস্যা রয়েছে আন্তরিক হলে তা সমাধান করা সময় সাপেক্ষ হতে পারে কিন্তু অসম্ভব নয়। এ ছাড়া মনে রাখতে হবে, ইসলাম একটি গতিশীল জীবন বিধান হিসেবে কোন যুগের সাথে এ প্রতিষ্ঠা পাওয়ার বিষয়টি সম্পৃক্ত নয়। কাজেই আমরা মনে করি, বাংলাদেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যেমন সমস্যা লক্ষ্যনীয় তদ্রূপ সম্ভাবনাও অত্যুজ্জ্বল।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

গবেষণার প্রাপ্তি/অর্জন/আবিষ্কার

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যে দিন এ পৃথিবীতে আদম ও হাওয়া (আ) কে পাঠিয়েছেন, সে দিন থেকে তাঁরা ও তাঁদের বংশধরেরা কিভাবে এখানে জীবন যাপন করবে তার দিক নির্দেশনাও দিতে থাকেন। যাদের মাধ্যমে মানুষ এই দিক নির্দেশনা লাভ করেছে তাঁরাই হলেন নবী ও রাসূল। অসংখ্য নবী ও রাসূলের আগমন ঘটেছে এই পৃথিবীতে। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হলেন মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর প্রদর্শিত পথই হল ইসলামী জীবন বিধান। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রাসূল এই পৃথিবীতে আসবেন না, তাই তাঁর আনীত জীবন বিধানই আল্লাহর সর্বশেষ বিধান। এই বিধানের উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। এ পৃথিবীতে চলার পথে মানুষ কোন পথ ও পন্থা অবলম্বন করবে তা কুরআন সুন্নাহের আলোকে নির্ধারণ করবে। আর এটাই হবে ইসলামী পথ ও পদ্ধতি।

আল্লাহর দুনিয়ায় আইনের রাজত্ব। এ বিশাল সৃষ্টিজগতে জলে স্থলে মহাকাশে যা কিছু আছে মহাশূন্যে সঞ্চরমান সুবিশাল গ্রহ- নক্ষত্র থেকে শুরু করে জমিনে বিচরণশীল ক্ষুদ্রতম কীট- পতঙ্গ পর্যন্ত সবই আইনের অধীন। প্রাকৃতিক আইন কেউ অমান্য করে না। আইন ভঙ্গ করার বা আইন এড়িয়ে চলার সাহস ও প্রবণতা কারোর নেই।

অথচ আমরা দেখতে ও উপলব্ধি করতে পারছি, যে তাঁরা প্রত্যকে এক ও একাধিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কেউ গাফিলতি করেছে না। ফলে সর্বত্র একটা শৃঙ্খলা বিরাজ করছে। আইন ও শৃঙ্খলা শব্দ দু'টো এক সাথে জড়িত। এক সাথে চলে। আইন যেখানে থাকে সেখানে শৃঙ্খলা থাকে। শৃঙ্খলা নেই মানে সেখানে আইন নেই।

"ইসলামী আইনঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে অভিসন্দর্ভের আলোচ্য বিষয়কে নয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশের আদালত ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ, বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামী আইনের পরিচিতি, ইসলামী আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন, ইসলামী আইনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামী আইনের উৎস, ইসলামী আইনের মূলনীতি, ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য, ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশে মুসলিম আইনের প্রচলন, মুসলিম আইনের ইতিহাস, মুসলিম আইনের প্রবর্তন ও বিধিসমূহ

নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে শারী'আত ও ফিকহ্ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ওয়ারিশাধিকার ও সম্পদ বন্টন আইন, দান বা হিবা আইন, ওয়াকফ আইন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে বিবাহ খোরপোষ ও দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার আইন, বিবাহ বিচ্ছেদ ও তালাক আইন, দেনমোহর আইন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে ইসলামের শাস্তি আইন, ইসলামী দণ্ডবিধি আইন, হাদ্দ, কিসাস, দিয়াত, তা'যীর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষ নবম অধ্যায়ে বাংলাদেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠায় সমস্যা ও তা প্রতিকারে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়ে গবেষণা, অধ্যয়ন ও তথ্য- উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে বাংলাদেশে ইসলামী আইন ও শারী'আহ সম্পর্কে ব্যাপক অপপ্রচার পরিলক্ষিত হয়েছে। এই অপপ্রচার প্রতিরোধে কতিপয় কর্মকৌশল ও প্রস্তাবনা পর্যায়ক্রমে তুলে ধরছিঃ

১। সকল প্রচার ও গণমাধ্যমগুলোতে ইসলাম বিদ্বেষী ও চক্রান্তকারীদের নেতিবাচক প্রচারণার বিপরীতে ইসলামপন্থীদের ইতিবাচক প্রচারণা জোরদার করা। এ ক্ষেত্রে পরিকল্পিত উপায়ে ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রেস মিডিয়া সৃষ্টি এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরীর সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

২। ইসলামী আইন ও পাশ্চাত্য আইন সম্পর্কে একদল অভিজ্ঞ, দক্ষ ও যোগ্য লোক তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় একাডেমিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং এগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় পর্যাপ্ত ফাইনান্সিয়াল সাপোর্টিং এর ব্যবস্থা করা।

৩। আধুনিক সকল উপায়- উপকরণ, প্রযুক্তি ও মাধ্যমকে ইসলামের পক্ষে ব্যবহার ও প্রয়োগ করার যোগ্যতা মুসলিম স্কলারদের অর্জন করা।

৪। প্রচার মাধ্যমের সবগুলোতেই মুসলিম স্কলারদের মযবুত অবস্থান নিশ্চিত করার কার্যকর কর্মপন্থা অবলম্বন করা।

৫। নারীকে দাওয়াতি কাজের সকল ক্ষেত্রেই যোগ্য করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা। নারী সম্পর্কে ইসলাম বিরোধীদের অসত্য প্রচারের জবাব দিতে যোগ্যতাসম্পন্ন নারী ব্যক্তিত্বের শূন্যতা দূর করা। এ ক্ষেত্রে নারীদের জন্য আলাদা বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা। এ প্রতিষ্ঠানে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

৬। ছোট খাট মতপার্থক্য পরিহার করে মুসলিম উম্মাহ ও জাতীয় স্বার্থে সকল মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য সুসংহত করা।

৭। গবেষণামূলক কর্ম ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে মতপার্থক্যের উর্ধ্বে রেখে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা।

৮। আলিম ওলামা, পীর- মাশায়েখ, ওয়ায়েজ, ইমাম খতীব, আল্লাহওয়ালা, বুজুর্গ ও ইসলামী স্কলারদের ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে শতভাগ ঐকমত্য পোষণ করা।

৯। শিক্ষা কমিশনে ইসলামী স্কলার নিয়োগের বন্দোবস্ত করা, যাতে শিক্ষা ব্যবস্থার সকল পর্যায়ে ইসলামী আইন বিষয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ সিলেবাস নিশ্চিত করা যায়।

১০। পাঠ্য বিষয়ে ইসলামী আইনের উপর পরীক্ষা গ্রহণ ও নাম্বার যুক্ত করা যেতে পারে, যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মনোযোগসহ অধ্যয়ন আবশ্যক হয়।

১১। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু ও ইসলাম প্রিয়। কিন্তু ইসলামী আইন সম্পর্কে যথার্থজ্ঞানের অপ্রতুলতার কারণে ইসলামী আইনভীতিতে প্রকটভাবে আক্রান্ত। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন ইসলামী আইন সম্পর্কে সহজতর পদ্ধতিতে জ্ঞানদান এবং সকল স্তরে ইসলামী আইনের কার্যকর প্রয়োগের ব্যবস্থা করা।

১২। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, কলাম, চলচ্চিত্র, নাটক ইত্যাদিতে ইসলামী আইনের সুফল সম্পর্কে ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরার ব্যবস্থা করা। কারণ ইসলামী আইন চালু হলে শুধু মুসলমানরা নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে অমুসলিমরা অধিকতর সুবিধা ভোগ করবে। কারণ ইসলাম হলো ন্যায়, সমতা, ইনসাফপূর্ণ ও কল্যাণময়ী ধর্ম।

সিদ্ধান্ত ও সমাপ্তি

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম। এদের জীবনাদর্শ ইসলাম। তারা ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে, সাংস্কৃতিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, এবং আন্তর্জাতিক জীবনে, ইসলামী বিধি- বিধান, হুকুম- আহকাম, কৃষ্টি- কালচার, তাহযীব- তামুদ্দুন তথা ইসলামী আইন মনে প্রাণে মেনে চলতে আগ্রহ পোষণ করে। কিন্তু দেশীয় ও আন্তর্জাতিকসহ সার্বিক পরিবেশ প্রতিকূলে থাকায় এই বিশাল জনগোষ্ঠী ইসলামী মনোভাবাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ সমর্থন করতে পারছে না। আর অন্যদিকে অমুসলিমরা ইসলামী আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে ইসলামী আইন ভীতিতে ভুগছে। অথচ ইসলাম হলো ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী, আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা নির্বিশেষে সকলের জন, এই শ্লোগানটায় তারা আস্থাশীল হতে পারছে না। বাস্তবিকপক্ষে ইসলাম হলো অধিকতর আধুনিক, যুগোপযুগী, বিজ্ঞানসম্মত এবং ভারসাম্যপূর্ণ। ইসলামী আইন মানে অন্য ধর্মের লোকদেরকে তার ধর্ম পালনে সহযোগিতা প্রদান করা, সমাজ ও রাষ্ট্রে সহাবস্থান নিশ্চিত করা, সকল ধর্মাবলম্বীয় মানুষের মৌলিক অধিকার পরিপালনে

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যক্ষ সহযোগিতা দান ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে একটা বিষয় নিশ্চিত করে বলা দরকার যে, সকল ধর্মীয় আইনেই পরমতসহিষ্ণুতা, নীতি নৈতিকতা, মানবতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সকল মানুষকে ভালবাসা, সকলের অধিকারের প্রতি যত্নবান হওয়া ইত্যাদির কথা রয়েছে।

উপরোক্ত গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, বাংলাদেশের মানুষ ইসলামপ্রিয়। তা সত্ত্বেও কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর কারণে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার বর্তমান চিত্রটা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। এ অবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। তা না হলে ইহকালীন সুখ ও শান্তি এবং পরকালীন মুক্তি সবই হারাতে হবে। ‘ইসলামী আইনের’ মূলকথাই হলো জীবনের প্রতিটা বাঁকে বাঁকে, বিভাগে বিভাগে, প্রতিটা ক্ষণে ক্ষণে, লগ্নে লগ্নে, প্রতিটা মুহূর্তে এটাকে শর্তহীনভাবে অনুগতচিত্তে মেনে চলা, অনুসরণ করা, বাস্তবায়ন করা, প্রতিষ্ঠা করা। কুরআন ও হাদীস গবেষণা করলে ঘুরে ফিরে এ কথাটাই বার বার বলা হয়েছে। ইসলামী আইন শুধু মুসলমান নয়, সকল ধর্মের মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল পর্যন্ত ইসলামী আইন অনুসরণ পৃথিবীকে চরম অন্ধকার থেকে কাঙ্খিত আলোর দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম এবং এটাই আল্লাহ তা‘আলার সিদ্ধান্ত। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের জন্য সাবলীল, ও ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী আইনের বিকল্প বাংলাদেশে মানব রচিত কোন আইন উত্তম, কল্যাণকর ও সায়েন্টিফিক হতে পারে না এ কথা পূর্ণ আস্থার সাথে বলতে পারি।

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবূল করার প্রার্থনা জানাচ্ছি। সেই সাথে এ কামনা করছি যে, দয়াময় মহান রাব্বুল ‘আলামীন সবাইকে বিশেষভাবে বাংলাদেশের মানুষকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।

والله اعلم بالصواب – هذا ما عندي والعلم عند الله – اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. আজ-জিযানী, মুহাম্মদ ইবন হুসাইনঃ (الجيزانى محمد بن حسين) ১৯৯৬ খৃ. মা'আলিমু উসূলিল ফিকহি 'ইনদা আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত (معالم اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة), রিয়াদঃ দারু ইবনুল জাওযী, ১ম প্রকাশ।

২. আত-তাফযানী, সা'আদ উদ্দীন মাস'উদঃ (التفتازانى سعد الدين مسعود), ১৯৯৬ খৃ. শরহুত তালভীহ আলাত তাওদীহ লি মাতানিত তানকীহ ফি উসূলিল ফিকহ (شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح فى اصول الفقه), বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

৩. আত-তাবরানী, সুলাইমান ইবন আহমদ ইবন আইয়্যুবঃ (الطبرانى سليمان ابن احمد ايوب), ১৯৮৩ খৃ. আল মু'জামুল কাবীর (المعجم الكبير), বিশ্লেষণঃ হামদী বিন আবদুল মাজীদ, মুসিল মাকবাতাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ২য় প্রকাশ।

৪. আত-তিলিমসানী, শরফুদ্দীন আল-ফাহরীঃ (التلمسانى شرف الدين الفهرى), ১৯৯৯ খৃ. শারহুল মা'আলিম ফি উসূলিল ফিকহ (شرح المعالم فى اصول الفقه), বৈরুতঃ আলামুল কুতুব।

৫. আত-তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসাঃ (الترمذى ابو عيسى محمد بن عيسى), সন বিহীন, আল-জামি' আল-সাহীহ (الجامع الصحيح), বিশ্লেষণঃ আহমদ মুহাম্মদ শাকির ও অন্যান্য, বৈরুতঃ দারু ইয়াহইয়াইত তুরাসিল আরাবী।

৬. আত-তুফী, নজমুদ্দীনঃ (الطوفى نجم الدين), ১৪১৩ খৃ. রিসালাতুন ফি রিআ'য়াতিল মাসলাহা (رسالة فى رعاية المصلحة), বিশ্লেষণঃ ড আব্দুর রহীম আস-সায়িহ, লেবাননঃ দারুল মিসরিয়্যাহ লিবনানিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

৭. আদ-দাউদী, গালিব আলীঃ (الداودى غالب على), ২০০৪ খৃ. আল-মাদখাল ইলা ইলমিল কানূন (المدخل الى علم القانون), আম্মানঃ দারু ওয়াঈল লিত তিবাআতি ওয়ান নাশরি, ৭ম প্রকাশ।

৮. আদ-দারাকুতনী, আলী ইবন উমর আবুল হাসানঃ (الدار على بن عمر ابو الحسن), ১৯৬৬ খৃ. সুনান আদ-দারুকুতনী (سنن الدار قطنى) , বিশ্লেষণঃ সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ হাশিম ইমানী, বৈরুতঃ দারুল মা'রিফা।

৯. আদ-দালাইমী, আকরাম আবদ খলীফাঃ (الديلمى اكرم عبد خليفة), ২০০৬ খৃ. জাম'উল কুরআন দিরাসাহ তাহলীলিয়্যাহ লি মারভিয়্যাতিহি), (جمع القران دراسة تحليلية لمروياته) বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

১০. আদ-দাসুকী, শামসুদ্দীনঃ (الدسوقى شمس الدين), সন বিহীন, হাশীআতুদ দাসূকী আলাশ শরহিল কাবীর (حاشية الدسوقى على الشرح الكبير), মিসর মাতবাআতু ঈসা আল-বাবী আল হালবী ওয়া শুরাকাউহু।

১১. আন-নাশমী, আজীল জাসিমঃ (النشم عجيل جاسم), ১৪০৪ হি. আল-ইসতিহসান হাকীকাতুহু ওয়াল মাযাহিবুল উসূলিয়্যা (الاستحسان حقيقته والمذاهب الاصلية), জার্নাল অব শারী'আহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, কুয়েতঃ কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ ১, সংখ্যা ১।

১২. আন-নাসাঈ, আবূ আব্দুর রহমান ইবন শুয়াইবঃ (النسائ ابو عبد الرحمن احمد ابن شعيب), ১৯৯১ খৃ. আস-সুনান (السنن) , বিশ্লেণঃ ড. আবদুল গাফফার সুলাইমান আল-বান্দারি, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

১৩. আন-নাইসাপুরী, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হুজ্জাজ আল-কুশাইরীঃ (النيسابوري ابو الحسين مسلم بن حجاج القشيرى), সন বিহীন আস-সহীহ (الصحيح), বৈরুতঃ দারুল জীল ও দারুল আফাকিল জাদীদাহ।

১৪. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীমঃ ২০০৬ খ্রি. ইসলামী শারী'আতের উৎস, ঢাকাঃ খয়রুন প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ।

১৫ আবূ ইয়া'লা, আহমদ ইবন আলী ইবন মুসান্নাঃ (ابو يعلى احمد بن على ابن مثنى), সন বিহীন, মুসনাদু আবি ইয়া'লা আল-মাউসিলী (مسند ابي يعلى الموصلى), বিশ্লেষণঃ হুসাইন সালীম আসাদ, দামিশক দারুল মামুন লিত তুরাস।

১৬. আবূ ইয়া‘লা, কাযী মুহাম্মদ হুসাইনঃ (ابو يعلى قاضي محمد بن حسين), ১৯৯০ খৃ. আল-উদ্দাহ ফী উসূলিল ফিকহ (العدة في اصول الفقه), বিশ্লেষণঃ ড.আহমদ ইবন আলী, রিয়াদঃ বিশ্লেষক কর্তৃক প্রকাশিত, ২য় প্রকাশ।

১৭. আবূ যাহরাহ, মুহাম্মদঃ (ابو زهرهد محمد), ১৯৯৭ খৃ.

১৮. মালিক ইবন আনাস হায়াতুহু ওয়া ‘আসরুহু আরাউহু ওয়া ফিকহুহুঃ (مالك بن انس حياته وعصره ارائه وفقهه), কায়রোঃ দারুল ফিকরিল ‘আরাবী।

১৯. আবূ যাহরাহ, মুহাম্মদঃ (ابو زهره محمد), সন বিহীন, উসূলুল ফিকহ (اصول الفقه), বৈরুতঃ দারুল ফিকরিল আরাবী।

২০. আবু সানাহ, শায়েখ আহমদ ফাহমীঃ (ابو سنه الشيخ احمد فهمى), ১৯৪৭ খৃ. আল ‘উরফ ওয়াল ‘আদাত (العرف والعادة), কায়রোঃ মাতবা‘আতুল আযহার।

২১. আবূ যাহরাহ, মুহাম্মদঃ (ابو زهره محمد), ১৯৪৫ খৃ. ইবন হাযম (ابن حزم), মিসরঃ মাতবা‘আতু আহমদ ‘আলী মুখাইমির, ২য় প্রকাশ।

২২. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, মুহাম্মদ ছাইদুল হক ও মোঃ আতিকুর রহমানঃ ২০১১ খৃ. ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ।

২৩. আয-যারকানী, মুহাম্মদ আবদুল আযীমঃ (الزرقاني محمد عبد العظيم), মানাহিলুল ইরফান ফী উলুমিল কুরআন (مناهل العرفان في علوم القران), বিশ্লেষণঃ আহমদ ইবন ‘আলী, কায়রো: দারুল হাদীস।

২৪. আয-যারকাশী, বদর উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহঃ (الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله), ১৪২১ হি. আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিকহ (البحر المحيط في اصول الفقه), বিশ্লেষণ মুহাম্মদ তামির, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

২৫. আয-যারকাশী, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহঃ (الزركشي ابو عبدالله محمد بن عبدالله), ১৪২৩ হি. শারহু মুখতাসার আল- খারকী (شرح مختصر الخرقي), বিশ্লেষণ ‘আবদুল মুন‘ইম খলীল ইবরাহীম, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ।

২৬. আর-রাযী, ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন ‘আলীঃ (الرازي فخر الدين محمد بن على), ১৯৯২ খৃ. আল-মাহসূলু ফি উসূলিল ফিকহ (المحصول في اصول الفقه), বিশ্লেষণঃ ড. ত্বহা জাবির আল আলওয়ানী, বৈরুতঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ।

২৭. আর-রাযী মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর ইবন আবদুল কাদিরঃ (الرازي محمد بن ابي بكر بن عبد القادر), ১৯৯৪ খৃ. মুখতাসারুস সিহাহ (مختار الصحاح), বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ।

২৮. আল আমিদি, সাইফুদ্দিন আলী ইবন মুহাম্মদঃ (الامدى سيف الدين على بن محمد), ২০০৩ খ্রি. আল ইহকামু ফি উসূলিল আহকাম (الاحكام في اصول الاحكام), বিশ্লেষণঃ শায়খ আব্দুর রাযযাক আল আফীফী, রিয়াদঃ দারুস সামিয়ী লিন নাশর ওয়াত তাওযী‘ঈ, ১ম প্রকাশ।

২৯. এম. মুনিরুজ্জামানঃ ২০১৩ খৃ. ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন, ঢাকাঃ ধানসিঁড়ি পাবলিকেশন্স, পঞ্চম সংস্করণ।

৩০. মালিক ইবন হাসানঃ (مالك بن انس) , মালিক, ২০০৪ খৃ. আল-মুওয়াত্তা (الموطا), বিশ্লেষণঃ মুহাম্মদ মুসতাফা আল-আযামি, দুবাইঃ মুআসসাসাতু যাইদ ইবন সুলতান ‘আলী নাহিআন, ১ম প্রকাশ।

৩১. আবদুল করিমঃ বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল।

৩২. ইবনে খলদুনঃ আল মুকাদ্দিমা (গোলাম সামদানি কোরায়শী কর্তৃক অনুদিত), ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

৩৩. কিরণচন্দ্র চৌধুরীঃ ভারতের ইতিহাস।

৩৪. গাজী শামছুর রহমানঃ ইসলামের দণ্ডবিধি, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২।

৩৫. মাওলানা মুহিউদ্দিন খানঃ (অনুবাদক) পবিত্র কুরআনুল করিম, ফাহাদ প্রিন্টিং প্রেস, মদীনা স্টিভেনসন, ডগলাস কে, আমেরিকার জীবন ও প্রতিষ্ঠান (সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম কর্তৃক অনুদিত), যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য সার্ভিস, ঢাকাঃ ১৯৮১।

৩৬. যায়দান, আবদুল করিমঃ (زيدان عبد الكريم), ২০০১ খৃ. আল-মাদখাল লিদ দিরাসাতিশ শারী‘আতিল ইসলামিয়্যাহ (المدخل لدراسة الشرعية الاسلامية), আলেকজান্দ্রিয়াঃ দারু উমার ইবনিল খাত্তাব।

৩৭. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানঃ ২০০৮ খৃ. ইসলামী জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন, ঢাকাঃ আমিন ল’ বুক সেন্টার, ২য় প্রকাশ।

৩৮. গাজী শামসুর রহমানঃ ১৯৯৩ খৃ. আইনবিদ্যা, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

৩৯. মুহাম্মদ ফজলুর রহমানঃ ২০০৯ খৃ. আধুনিক আরবি বাংলা অভিধান, ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী, ষষ্ঠ সংস্করণ।

৪০. সম্পাদনা পরিষদঃ ১৪০৪ হি. আল মাওসূআহ আল-ফিকহিয়্যা আল-কুয়িতিয়্যাহ (الموسوعة الفقهية الكويتية), কুয়েতঃ আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১ম প্রকাশ।

৪১. সম্পাদনা পরিষদঃ ২০০১ খৃ. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় ভাগ।

৪২. হাসনাইন, হাসনাইন মাহমুদঃ (حسنين حسنين محمود), ১৪০৭ হি. মাসাদিরুত তাশ রী'ই ইসলামী (مصادر التشريع الاسلامي), বৈরুতঃ দারুল কলম, ১ম প্রকাশ।

৪৩. হাসবুল্লাহ, আলীঃ (حسب الله علي), ১৯৯৭ হি. উসূলুত তাশরী'ইল ইসলামী (اصول التشريع الاسلامي), বৈরুতঃ দারুল ফিকরিল 'আরাবী।

44. The Noble Qur'an: English Translation of the meanings and commentary. The Ministry of Islamic Affairs, Endoments, Daw'ah and Guidance of the Kingdom of Saudi Arabia which supervises King Fahad complex For The Printing of The Qur'an in Madinah Munawwarah is greatly pleased at the publication, by the Complex, of this edition of the Noble Qur'an with the translation of its meaning in English.

45. Berman: David J. 2010. Custom as a source of law. Cambridge: Cambridge university Press.

46. Hallaq: Wael B. 2005. A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni usul al-fiqh. Cambridge: Cambridge University Press.

47. Hallaq: Wael B. 2008. Authority, Continuity and change in Islamic Law. Cambridge University Press.

48. Hallaq: Wael B. 2009. Shariah Theory, Practice, Transformations. Cambridge: Cambridge University Press.

49. Kamali: Mohammad Hashim, 1997. Istihsan (Juristic preference) and its application to contemporary issues. Jeddah Islamic Research & Training Institute.

50. Kamali: Mohammad Hashim. 2007. Principles of Islamic Jurisprudence. Cambridge: Islamic Texts Society.

51. Kamali: Mohammad Hashim. 2008. Shari'ah law: an introduction. Oxford, England: Oneworld Publications.

52. Kayadibi: Saim. 2010. Istihsan: the doctrine of juristic preference in Islamic law. Petaling Jaya, Selangor: Islamic Book Trust.

53. Hammudah Abdalati: Islam in Focus, Second Edition 1416 A.H 1966 A.C.

54. Muhammad Iqbql Siddiqi: The Penal Law of Islam, Ist Edition 1979, March. Kazi publications, 121 Zulqarnain Chambers, Ganpat Road, Lahore (Pakistan).

55. Syed Abul A'la Maududi: What Islam Stands for, Dawah Academy, International Islamic University, P.O. Box 1485 Islamabad (Pakistan).

৫৬. কাজী এবাদুল হকঃ বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪০৪/জানুয়ারি ১৯৯৮। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৫৭. মুহাম্মদ রুহুল আমিনঃ ইসলামী আইনের উৎস, Sources of Islamic Law. বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার। প্রকাশক বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার এর পক্ষে মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। ৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার।

৫৮. মোঃ আব্দুল হালিমঃ বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫, সপ্তম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩, ২২/২ শেখ সাহেব বাজার রোড, আজিমপুর, ঢাকা- ১২১৫।

৫৯. ড. মুহাম্মদ আত- তাহের আর- রিযকীঃ মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪১৪, সফর ১৪২৯, মার্চ ২০০৮, প্রকাশক, জেনারেল সেক্রেটারি, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ। স্যুট- ১৩/বি (লিফট- ১২), নোয়াখালী টাওয়ার, ৫৫/বি পুরানা পল্টন, ঢাকা- ১০০০।

৬০. ড. আবদুল আযীয আমেরঃ ইসলামী দণ্ডবিধি, (التعزير في الشريعة الاسلامية - د- عبد العزيز عامر) বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার।

৬১. লেখকমণ্ডলী ও সম্পাদকমণ্ডলীঃ ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, রজব ১৪৩২, জুন ২০১১, আষাঢ় ১৪১৮।

৬২. ড. আহমদ আলীঃ ইসলামের শাস্তি আইন, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ: শাওয়াল ১৪৩০, কার্তিক ১৪১৬, অক্টোবর ২০০৯, আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭।

৬৩. ইমাম ইবনে তাইমিয়াঃ শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা, অনুবাদ মওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী, আহসান পাবলিকেশন, ১৯১ মগবাজার (ওয়ারলেস রেলগেট), ঢাকা- ১২১৭। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৮, জিলহাজ্জ, ১৪২৯, পৌষ, ১৪১৪।

৬৪. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদঃ ইসলামে সামাজিক সুবিচার, অনুবাদ মাওলানা কারামত আলী নিযামী, প্রকাশক, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, প্রকাশকাল, চতুর্থ সংস্করণ আগস্ট ২০০২ইং, ইসলামিয়া কুরআন মহল ৬৬, প্যারিদাস রোড, ঢাকা- ১১০০।

৬৫. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীঃ ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা, অনুবাদ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আধুনিক প্রকাশনী, ২২তম প্রকাশ, শাবান ১৪৩১, শ্রাবণ ১৪১৭, জুলাই ২০১০, ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০।

৬৬. নুরুল মোমেনঃ মুসলিম আইন, বাংলা একাডেমীঃ ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪/জুন ১৯৭৭।

৬৭. ইসলামী আইন ও বিচারঃ ত্রৈমাসিক পত্রিকা, প্রকাশনায় ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ এর পক্ষে এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, ৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার, ঢাকা- ১০০০ ।

68. Editor- Abdullah Al Mamun: Sub-Editor- Muhammd Obaiduullah, Peaceland Journal, Peaceland Trust, House # 42, Road # 07, Sector # Uttara, Dhaka-1230.

69. Dr. Muhammad Ekramul Haque: Islamik Law of Inheritance, First Published: 2009, Reprint: 2012.

70. Nyazee: Imran Ahsan Khan. 2002. Theories of Islamic law: the Methodology of Ijtihad. Kuala Lampur: The other Press.

71. Nyazee: Imran Ahsan Khan. 2006. Islamic Jurisprudence: usul al-Fiqh. Islamabad: International Institute of Islamic Thought.